সূচিপত্রে যেতে এই প্রচ্ছদে ক্লিক করো

জয়ঢাক

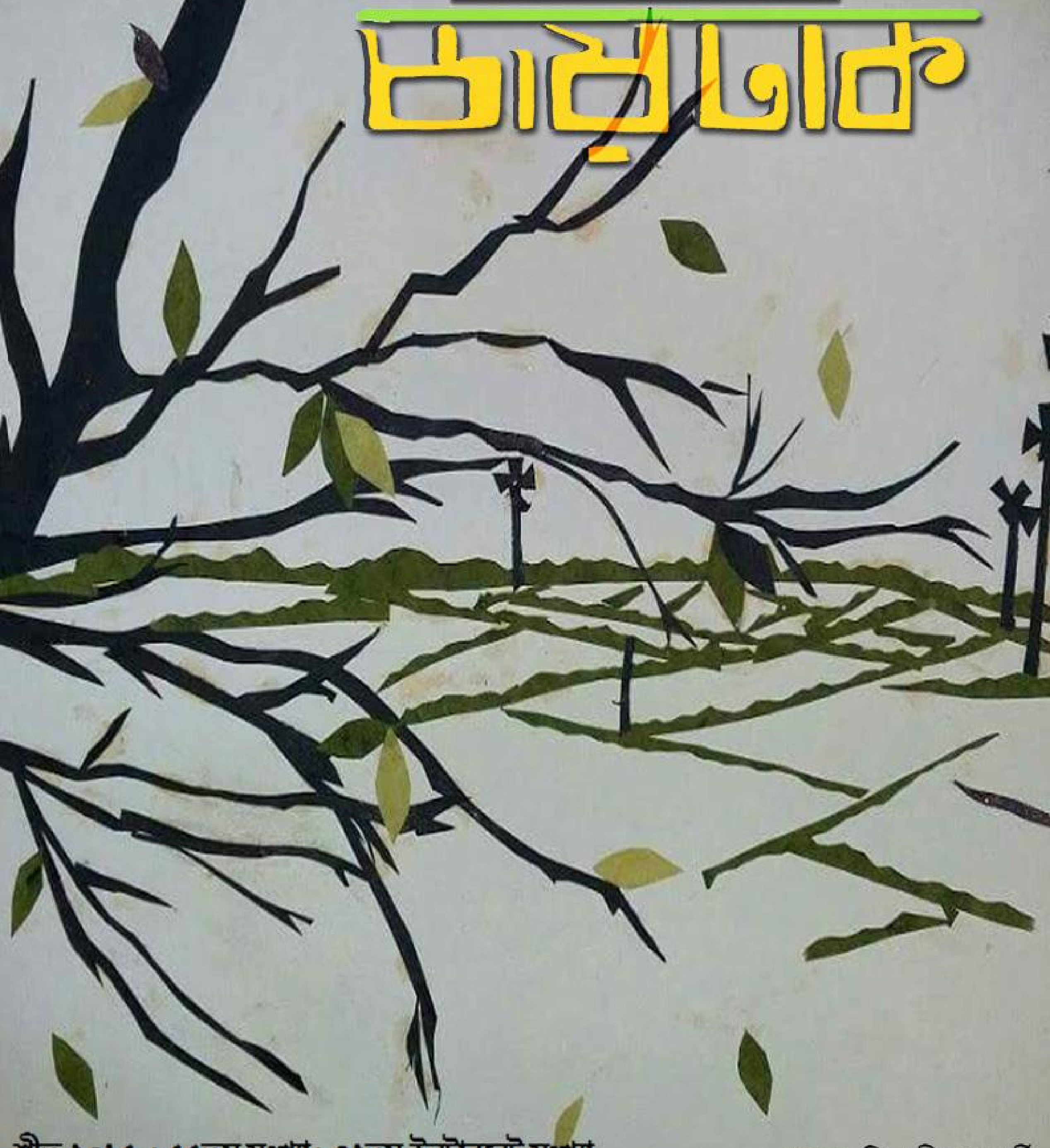

শীত ২০১৫ । ৫৫তম সংখ্যা। ৩২তম ইনটারনেট সংখ্যা

প্রচ্ছদঃ পিয়ালী ব্যানার্জী

জয়ঢাক শীত ২০১৫ (৫৫তম সংখ্যা। ৩২তম ইনটারনেট সংখ্যা) নির্দিষ্ট লেখার পাতায় পৌঁছোতে লেখার নামে ক্লিক করুন		
বিভাগ	লেখা	লেখক
মলাট		
জয়ঢাকের দলবল		
সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল	
জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	বিজ্ঞাপন	তাপস মৌলিক, ইন্দ্রশেখর
কমিক্‌স	বিন্নিদের বাড়ি	মালিনী
কমিকস	দুর্জয়	দেবসেনা নন্দী
কমিক্‌স	পাথর	মৌসুমী
কমিক্‌স	রাশিয়ান কমিকস-ব্যাং রাজকন্যা	লৌকিক গল্প
কমিক্‌স	টোটা আর টিটো-অশ্বারোহণ পর্ব	হ্যারল্ড নের। অনুঃ তাপস মৌলিক
খুদে উপন্যাস	বুড়োদাদুর পুরোনো বাড়ি	অদিতি ভট্টাচার্য
নাটক	সেলফিশ জায়েন্ট	অনুপম চক্রবর্তী
গল্প	কাশীতে	শিবশংকর ভট্টাচার্য
গল্প	পতিত ও ম্যানুয়েল পেড্রো	শিশির বিশ্বাস
গল্প	পিপীলিকাপুরের রানি পিঁপড়ে	রতনতনু ঘাটী
গল্প	বন্ধু	রুচিস্মিতা ঘোষ
গল্প	মোতিবিবি	সত্যজিত দাশগুপ্ত
গল্প	স্বপ্নের কাতুকুতু	উদয়ারুণ রায়
গল্প	রঘু ডাকাতের গল্প	তরুণ সরখেল
গল্প	বোতলের ভূতুয়া	অপর্ণা গাঙ্গুলি
গল্প	জন্মান্তর রহস্য	সহেলী চট্টোপাধ্যায়
গল্প	কালপুরুষ	সায়ক আমান
গল্প	কাকের বাসায় কোকিল ছা	দীপক দাস
ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো-ডুমক	ইন্দ্রনাথ
ভ্রমণ	অতীত ভ্রমণের অন্তরালে	রাখী নাথ কর্মকার
ভূতের আড্ডা	ভূতের গল্প-খুলির আর্তনাদ -তৃতীয় পর্ব	মহাশ্বেতা
ভূতের আড্ডা	ভূতের বাড়ি-কুলধারা	ইন্দ্রশেখর
ভূতের আড্ডা	দেশবিদেশের ভূতেরা-বেঘোভূত আর	সংহিতা
ভাষা শেখবার আসর	বোম ফেলেছে জাপানি	দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাষা শেখবার আসর	ইতালির ইলিবিলি	অদিতি সরকার
ভাষা শেখবার আসর	ফরাসি-রুকু ও দৈত্য	শাশ্বতী ব্যানার্জি
বিচিত্র দুনিয়া	অপরাজিত মোজদাল	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
বিদেশী গল্প	ইংরিজি গল্প -অতলের ইশারা মূল-ডি প্রোফান্ডিস-আর্থার কোনান ডয়েল	অনুবাদ অমিত দেবনাথ
বিদেশী গল্প	জাপানি-গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট (ষষ্ঠ পর্ব)	বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড অনুঃ সংহিতা
বিদেশী গল্প	রাশিয়ান গল্প-রাজপুত্রের বীণা	অনুবাদঃ দেবজ্যোতি
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক

বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মাথে মে ট্রিকস-কবুতরখানার চাল	সূর্যনাথ ভট্টাচার্য্য
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	গল্পে বিজ্ঞান-ছদ্মবেশী ফল	রবি সোম
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মহাবিশ্বে মহাকাশে-সৌড়ঝড়ের আঘাতে টালমাটাল পৃথিবী	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	টেকনো টুকটাক-উড়ব এবার আকাশে	কিশোর ঘোষাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	ভারতের বৈজ্ঞানিক- অসীমা চট্টোপাধ্যায়	সংহিতা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	লক্ষ করি পক্ষীকে-বছরভোর বসন্তবৌরি	মনস্বিনী ঘোষাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	বিচিত্র জীবজগত-	ইন্দ্রশেখর
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	প্রতিবেশী গাছ-ডুমুর	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	কেম্যাজিক	পান্নালাল গোস্বামী
বনের ডায়েরি	ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প - বিস্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়ার বঙ্গানুবাদ	পিয়ালী চক্রবর্তী, (মূল লেখাঃ জন লকউড কিপলিং)
বনের ডায়েরি	ভারতের বনাঞ্চল-আসাম	সংহিতা
বনের ডায়েরি	কাল্লুর সঙ্গে দেখা	রিশলু লাহিড়ী
ছড়ার পাতা	সাপুড়ে	গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়
ছড়ার পাতা	তোমরা যখন	দেবাশিস বসু
ছড়ার পাতা	যাবি	আবু হোসেন
ছড়ার পাতা	ভারতবর্ষ	অংশুমান
ছড়ার পাতা	প্যাঁচ কষছেন	তরুণ সরখেল
ছড়ার পাতা	গিন্নিপনা	পিযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
ছড়ার পাতা	হিন্দি সমস্যা	বহ্নি মুখার্জি
ছড়ার পাতা	রূপবদল	শুভজিৎ বরকন্দাজ
ছড়ার পাতা	আচার বিচার	উত্তীয় কোলে
ছড়ার পাতা	চিচিং ফাঁক	শেখর রায়
ছড়ার পাতা	যেমনতেমন	কবিরুল ইসলাম কঙ্ক
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	কুইজ	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	জানো কি	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	আশ্চর্য উলকি	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
ধারাবাহিক উপন্যাস	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল
~~ধারাবাহিক উপন্যাস~~	~~অলোকপর্ণার বিড়াল~~	~~রোহণ কুদ্দুস~~
কাতুকুতু	ভুলো, ঘোড়া ইত্যাদি	রসিকলাল দাস
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	রক্তের উপকারিতা	ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	পুজো আসছে	শরণ্যা ঘোষ
পুরাণ কথা	নচিকেতা চতুর্থ পর্ব	সংহিতা
পুরাতনী	প্রচলিত বাংলা ছড়া	প্রচলিত
স্মরণীয় যাঁরা	ঈশা খাঁ	উমা ভট্টাচার্য

টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ -অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
টাইম মেশিন	ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
টাইম মেশিন	সীমান্তের অন্তরালে	সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
টাইম মেশিন	ঠাকুরবাড়ির পাদুকাবিলাস	অনুপূর্বা রায়
টাইম মেশিন	ইতিহাসের খন্ডচিত্র-অকথিত ধ্যানচাঁদ	অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়
বই পড়া	নতুন বই-অতএব আফ্রিকা	তাপস মৌলিক
বই পড়া	পুরোনো বই-কোটাল কাহিনি	পিয়ালি ব্যানার্জি
বই পড়া	বাংলাদেশের বই-যখন সবকিছু	মহাশ্বেতা
বই পড়া	বইবাতিক	দীপক গোস্বামী
বিশ্বের জানালা	ত্রিপুরা	উমা ভট্টাচার্য
লোককথা	জলসাঘরের ভূত	মহাশ্বেতা
আমার শহর	ফেলে আসা কলকাতা	সুজয় রায়
সেই মেয়েরা	ননীবালা দেবী	উমা ভট্টাচার্য
দেশ ও মানুষ	অটো চন্দ্রন	উমা ভট্টাচার্য
খেলার পাতা	এভারেস্ট	এরিক শিপটন অনুবাদ বাসব চট্টোপাধ্যায়
খেলার পাতা	অন্নপূর্ণা	মরিস হারজগ অনুবাদ তাপস মৌলিক
সুরঢাক	এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখার্জি
ক্যামেরার পেছনে	ওয়ান টু থ্রি ক্লিক	শম্পা গুহমজুমদার
সিনেমা হল		মহাশ্বেতা

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদিদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প, দেশবিদেশের ভূত

মহাশ্বেতা

লোককথা, সিনেমা হল ভূতের আড্ডা'র গল্প

তাপস মৌলিক

অন্নপূর্ণা, বিজ্ঞাপন, নতুন বই

কার্যনির্বাহী সম্পাদক- শব্দগল্পদ্রুম

এই সংখ্যার আঁকিয়েরা

তন্ময় বিশ্বাস

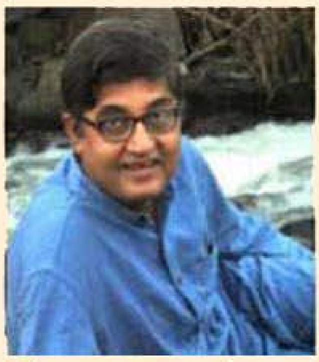

শিবশংকর ভট্টাচার্য

পিয়ালী

মৌসুমী

শিমুল

শংখ

শ্রীময় দাশ

অংশুমান

মধুশ্রী

শাম্ব

মনস্বিনী

জয়ঢাকের ইউনিকোড কম্পোজিটর টিম দেখতে ছোটো, কিন্তু কি বোর্ডে বেজায় হাত চলে সবকটার

মহুল

সুজাতা

দেবপ্রিয়া

ঋত্বিক

জয়ঢাকি বোল

মেঘগুলো দেশ ছেড়ে চলে গেছে নাকি?
মিছে কথা তারা সব এখানেই আছে
কুয়াশার রূপ ধরে কাজে দিয়ে ফাঁকি
ঐ দ্যাখ দোল খায় তারা গাছে গাছে
পুজো শেষ উৎসব শেষ নয় মোটে
সবুজ মাঠের গায়ে দ্যাখ লাল বল
কাট পুল সুইপের গুঁতো খেয়ে ছোটে
বই ছেড়ে এইবেলা চল মাঠে চল
শুনশান চুপচাপ বাড়িটিকে ঘিরে
হিমেল হাওয়ারা গায় উত্তুরে গান
ডাক দেয় এইখানে আয় তোরা ফিরে
ঝিম রোদে শুয়ে থাকে শীতের উঠান

বিষুবরেখার উত্তরপাড়ের সমস্ত দেশের সব বন্ধুদের শীতের দিনের উষ্ণ ভালোবাসা জানাই।
ভালো থেকো। আনন্দে থেকো।

তোমাদের জয়ঢাকি দাদাদিদিরা।

জয়ঢাকের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

'রামভক্ত হনুমান' সিরিয়ালে অভিনয়ের জন্য দুই লক্ষাধিক বানরসেনা প্রয়োজন

TM

হনুমান ও বাঁদর ছাড়া বারো বছরের নিচে মানুষের ছানাও আবেদন করতে পারে। তাদের আদর দিয়ে বাঁদর করে তোলা হবে (ফ্রি গ্রুমিং) এবং ফ্রিতে ল্যাজ দেওয়া হবে (ফেরত দিতে হবে না)।

যোগাযোগঃ জয় হনুমান প্রডাকশনস, কিষ্কিন্ধ্যা

স্বর্গ, মর্ত্য,পাতাল,জিনগ্রহ, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ মেরু যেকোন জায়গার যেকোন বিষয়ের বিজ্ঞাপন পাঠান এই ঠিকানায় joydhak@gmail.com

রেট ইঞ্চিপ্রতি তিন মিনিট বা একটি বিল্লিবেরি চকোবার

বিন্নিদের বাড়ি

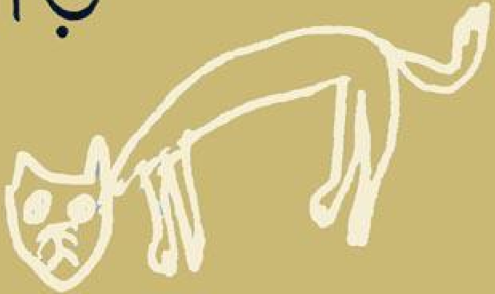

উজান
মালিনী

বিন্নিদের বাড়ি

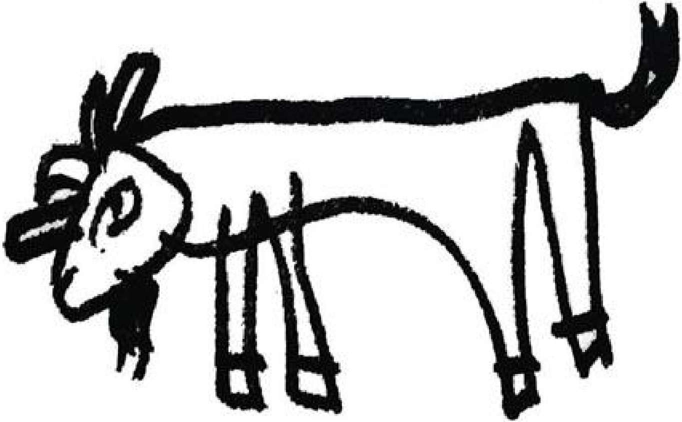

উজান

মালিনী

ডিম

বিন্নিদের গরুর নাম কলাবতি ।

বিন্নিদের মুরগির নাম মিছরি।
মিছরি রোজ একটা করে ডিম দেয়।

কলাবতির ইচ্ছে সে-ও ডিম পাড়বে।
গরম গরম ডিমের ওপর বসে হামবা
হামবা ডাকবে আর তা দেবে।

একদিন সকালে বিন্নিরা
দেখে গোয়ালে একটা ব-ড় **ডিম।**

কার ডিম বলতো ?

দাদু

বিন্নির দাদুর বয়স কেউ জানে না ।

দাদুর হাঁটু ঠক ঠক
পা লগবগ
কান কটকট
মাথায় টাক
চোখে চশমা
দাঁত — নেই ।

দাদুর মনে ভারি দুখখু । তাই দাদু ঠিক
করেছে আর বুড়ো হবে **না** ।

দাদু তাই মাংস কড়মড় করে খায়।

বিন্নিদের সাথে ঘুড়ি ওড়ায়।

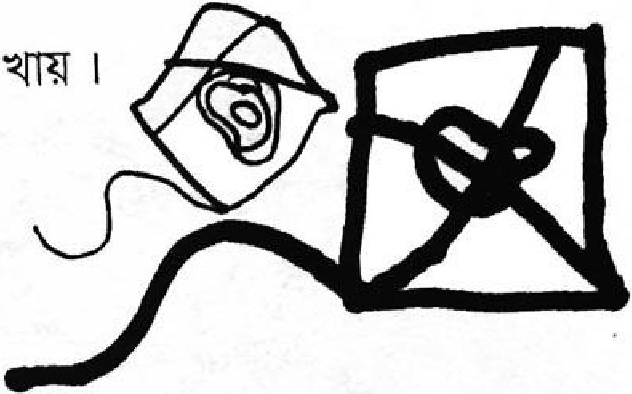

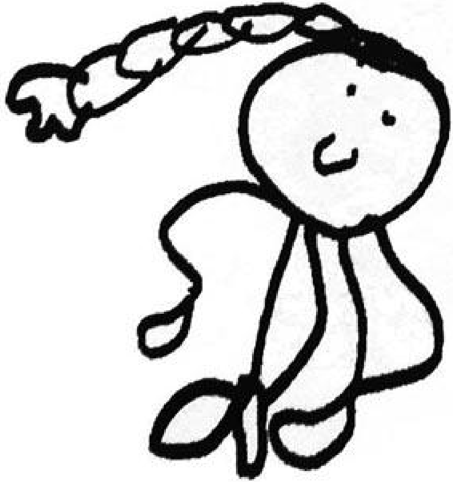

নানারকম করে চুলে টেরি কাটে।

পুজোর সময় ধুনচি নাচে দাদুর জুড়ি

মেলা ভার।

দাদু এখন পাড়ার হিরো ।

যদুরাম

যদুরাম আর বিন্নির ভারি দোস্তি। বিন্নি যখন নামতা পড়ে, যদুরাম তখন জানলার পর্দায় দোল খেতে খেতে সাথে সাথে পড়ে।

শক্ত অংকে যদুরামের মাথা খুব পরিষ্কার।

বাগানে ঘুরে ঘুরে সে বিন্নিকে জোনাক পোকা ধরে দেয়।

তবে মাঝে মাঝে বিন্নির মায়ের
ডালের কড়াইয়ে কে যেন এক
গামলা জল ঢেলে রাখে ।

অথবা পালোয়ান সিং-এর
পাগড়িতে পাওয়া
যায় মরা ইঁদুর ।

সারা বাড়িতে যখন
এই নিয়ে হট্টগোল-
যদুরাম তখন বিন্নির
ঘরে ফুলদানির
ভিতর লুকিয়ে
থাকে।

ইচ্ছেফুলি

বিন্নির দাদু বাগানে যে বড় ফুল গাছটা লাগিয়েছিলেন, সেটার নাম ইচ্ছেফুলি।

গাছটা ফুলও দেয়না ফলও দেয়না ।
তাও কেউ গাছটা কাটেনা ।

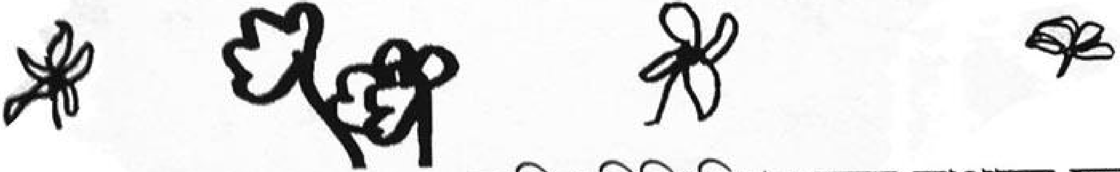

সেদিন বিন্নি দিদার জন্য বাগানে ফুল
তুলতে গিয়ে অবাক । গাছ ভরে
জবাফুল ।

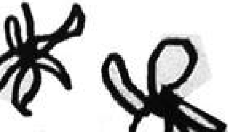

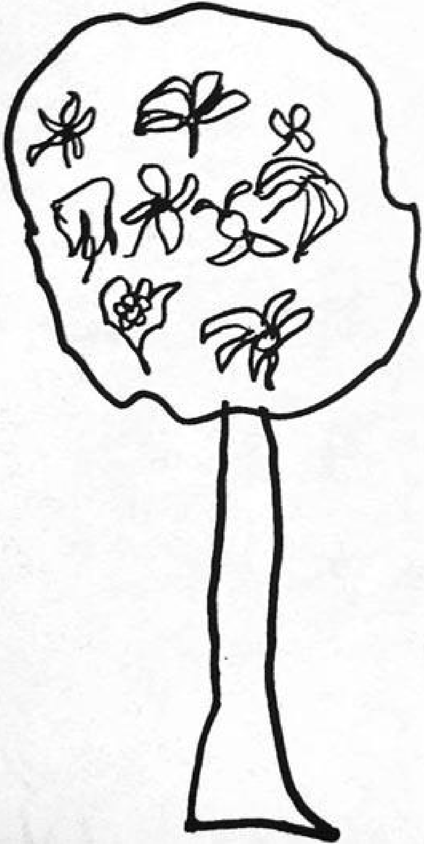

কদিন পরে ২৫শে বৈশাখ।
বিন্নির ইস্কুলে লাগবে সাদা ফুল।
গাছ ভরে তখন টগর।

এখন বিন্নি ঠিক জানে নেহেরুজির
জন্মদিনে কোথায় পাওয়া যাবে লাল
গোলাপ।

আস্তাকুঁড়ে

বিন্নিদের আস্তাবলে যে বুড়ো ঘোড়াটা থাকে, সে আস্ত কুঁড়ে। তাই তার নাম আস্তাকুঁড়ে।

সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। কেবল নাস্তার সময় সে ভারি খুশি।

বলতে গেলে রাজুদাদা রেগে যায় - মেরা ঘোড়া দৌড়কে নেহি, **উড়কে** যাতা।

সত্যি বলতে কি এক রাতে উঠে বিন্নি
আস্তাবলে ডানা ঝটপট শব্দও শুনেছে।

খেতে বসে গল্প বলো।
ঘুমোতে গিয়ে গল্প বলো। তাই যদুরাম টুপ করে
পাখায় এসে বসে পা দোলায়।
জানলার বাইরে ডেকে ওঠে কলাবতি।
মালিনীর গল্প আর চার বছরের
উজানের ছবি নিয়ে এই বই।

জয়ঢাকের গ্রাফিক উপন্যাস
পর্ব ২
দুর্জয়
লেখা দেবসেনা নন্দী
চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপঃ- শ্রীময় দাশ

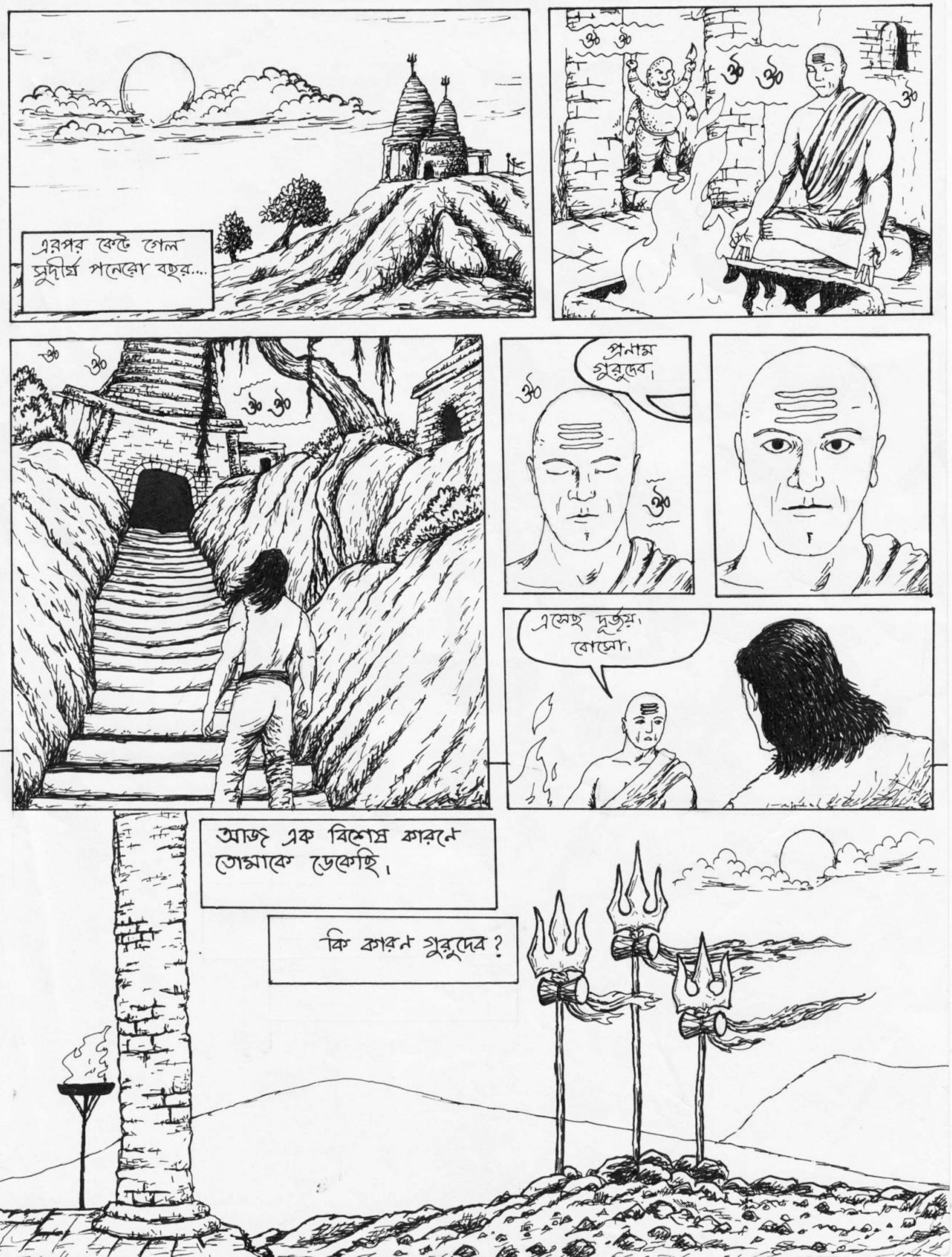
এরপর কেটে গেল সুদীর্ঘ পনেরো বছর....
ওঁ ওঁ
ওঁ ওঁ
ওঁ
ওঁ ওঁ
ওঁ ওঁ
প্রনাম গুরুদেব।
ওঁ
ওঁ
এসেছ দুর্জয়। বোসো।
আজ এক বিশেষ কারনে তোমাকে ডেকেছি।
কি কারন গুরুদেব ?

আজ সেইদিন যেদিন তুমি তোমার জীবনের ত্রিশ বছর পূর্ণ করলে। কুষ্ঠি অনুসারে তুমি আজ এক নতুন মানুষে পরিণত হবে।
তোমার আসল পরিচয় আজ তোমাকে বলব।
আসল পরিচয়? কি আমার আসল পরিচয়?
বিক্রমগড়ের রাজা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র তুমি, তোমার জন্মের রাত ছিল এক অভিশপ্ত রাত ....
আ-আ-আ-আ
আ আ মা গো!!
কড়্ কড়্
কড়াত

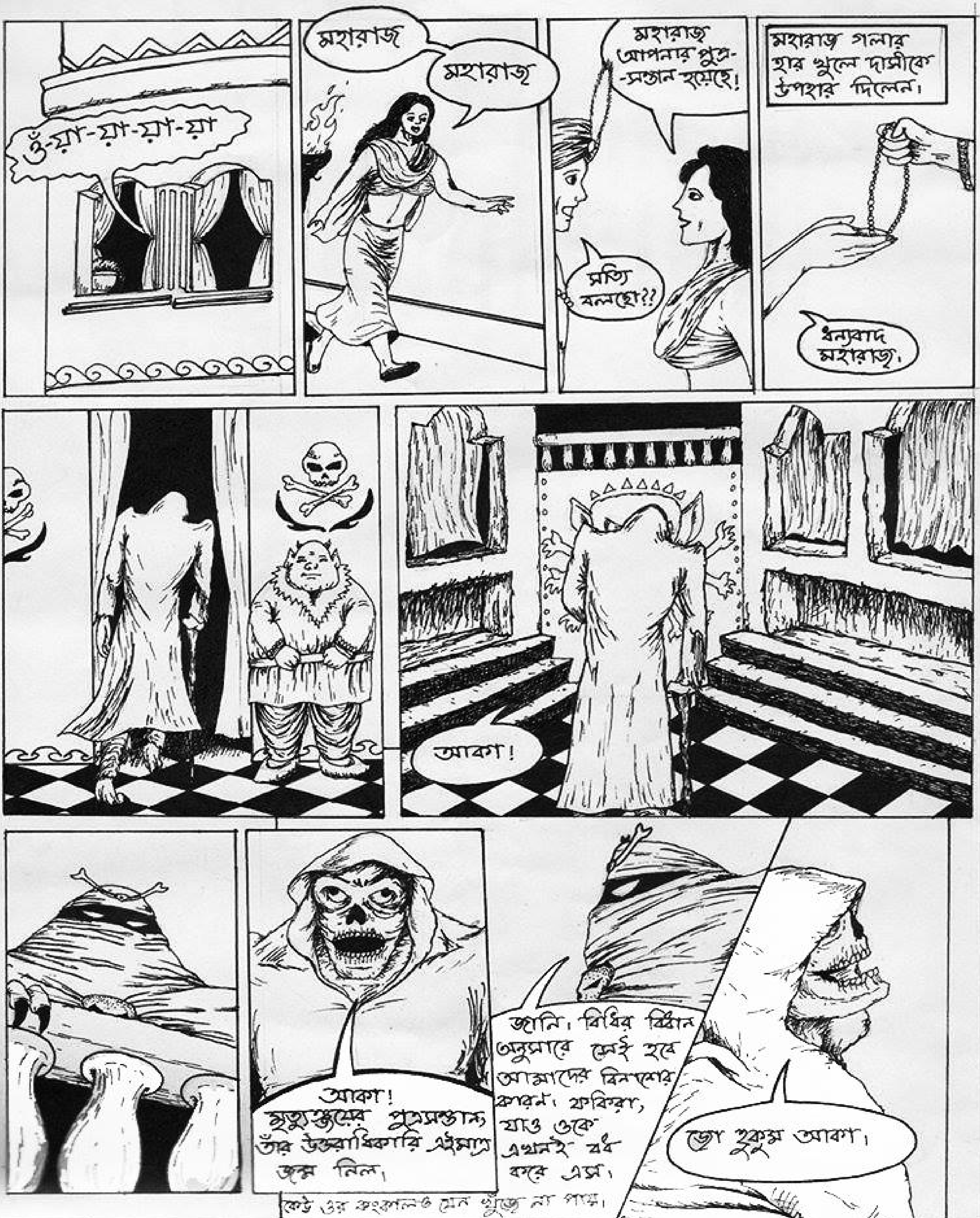
ওঁ-য়া-য়া-য়া-য়া
মহারাজ
মহারাজ
মহারাজ আপনার পুত্র-সন্তান হয়েছে!
সত্যি বলছো??
মহারাজ গলার হার খুলে দাসীকে উপহার দিলেন।
ধন্যবাদ মহারাজ।
আকা!
আকা! মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্রসন্তান, তাঁর উত্তরাধিকারি এইমাত্র জন্ম নিল।
জানি। বিধির বিধান অনুসারে সেই হবে আমাদের বিনাশের কারন। ফকিরা, যাও ওকে এখনই বধ করে এস।
কেউ ওর কংকালও যেন খুঁজে না পায়।
জো হুকুম আকা।

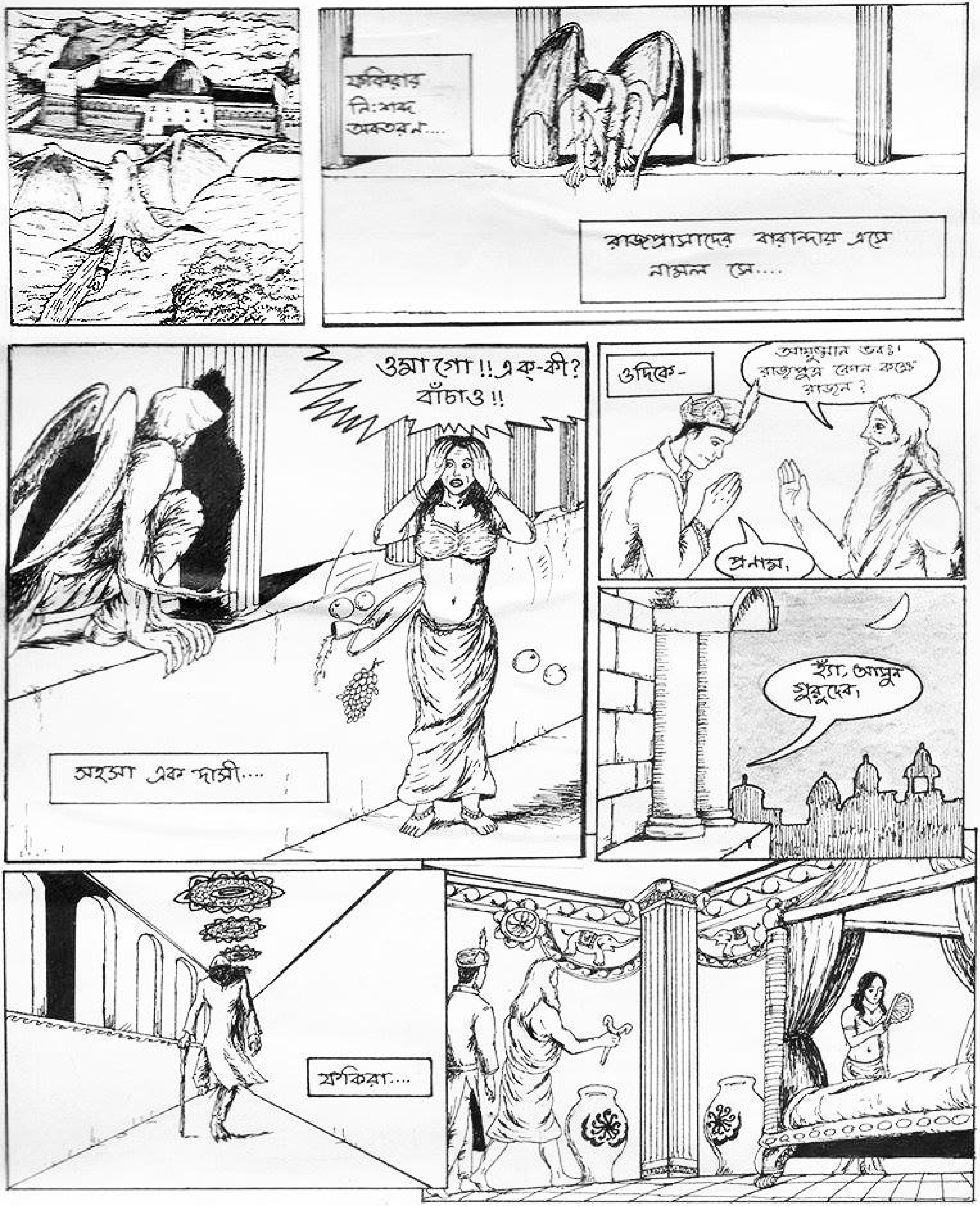
ফকিরার
নিঃশব্দ
অবতরণ....
রাজপ্রাসাদের বারান্দায় এসে
নামল সে....
ওমা গো !! এ-ক্-কী?
বাঁচাও !!
সহসা এক দাসী....
ওদিকে-
আয়ুষ্মান ভবঃ।
রাজপুত্র কেমন আছে
রাজন ?
প্রনাম।
হ্যাঁ, আসুন
গুরুদেব।
ফকিরা....

দাসী মূর্ছিত অবস্থায় বারান্দায় পড়ে থাকে।
প্রনমি গুরুদেব।
আয়ুষ্মান ভব:।
দেখি পুত্রটিকে....
এ সন্তান বড়ই সুলক্ষন-সম্পন্ন রাজন।
এর মৃগশিরা নক্ষত্রে দেবগন সিংহরাশিতে জন্ম হল।
এ বড়ই বীর নিপুন যোদ্ধা ও শৌর্য বীর্যবান ক্ষত্রিয় হয়ে উঠবে।
!?
কড় কড়াত
??

পাথরের টুকরো

লেখা, ছবিঃ মৌসুমী

সেবারে যাওয়া হয়েছিল হিমালয়ে। সেখানে তখন শীত কেটেছে। বরফ গলে গলে আইসক্রিম। বরফ ঝেড়েঝুড়ে গাছপালা,ঘাসপাতা আর ঝোপঝাড়েরা উঁকি দিচ্ছে।আমরা সেই পাহাড়ে উঠতে চাইলাম যেখানে এখনো বরফ রয়েছে।

যেতে যেতে চোখে পড়ল ঝরনা, রডোডেনড্রন ফুলের বাহার আর পাথর গড়ানো ঢাল।

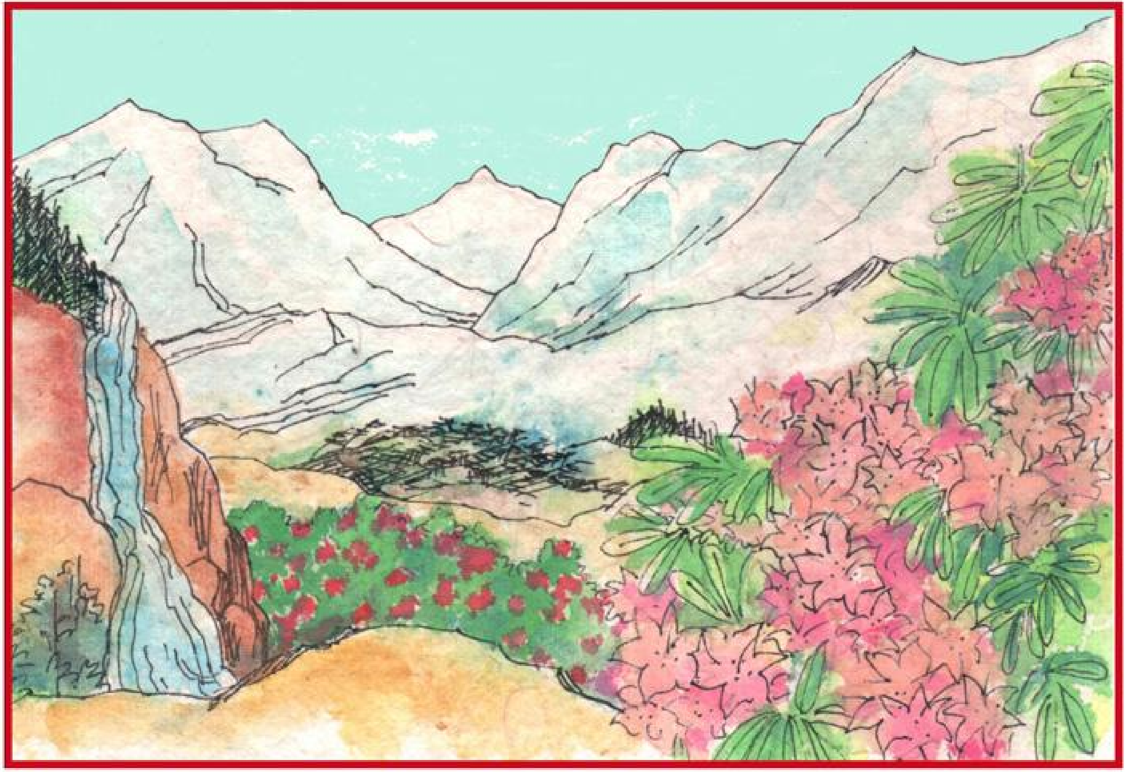

ফেরার পথে নদীর পাড়ে বসলাম। সেখানে পাথরের ছড়াছড়ি।

চারপাশে বরফগলা পাহাড় নেমে এসেছে। সেইসঙ্গে মেঘ, কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

হঠাৎ একটুকরো পাথর ছিটকে এল আমার কোলে। তাকে হাতে নিয়ে দেখি..

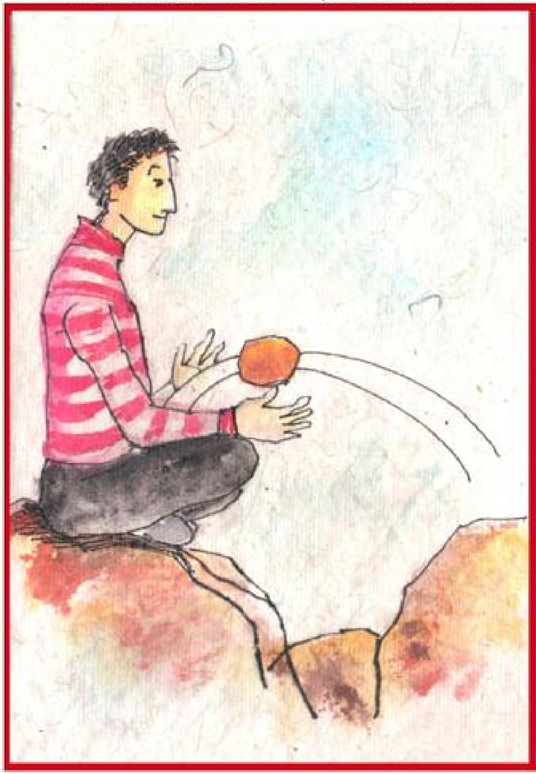

বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। যেন ভয় পেয়েছে।

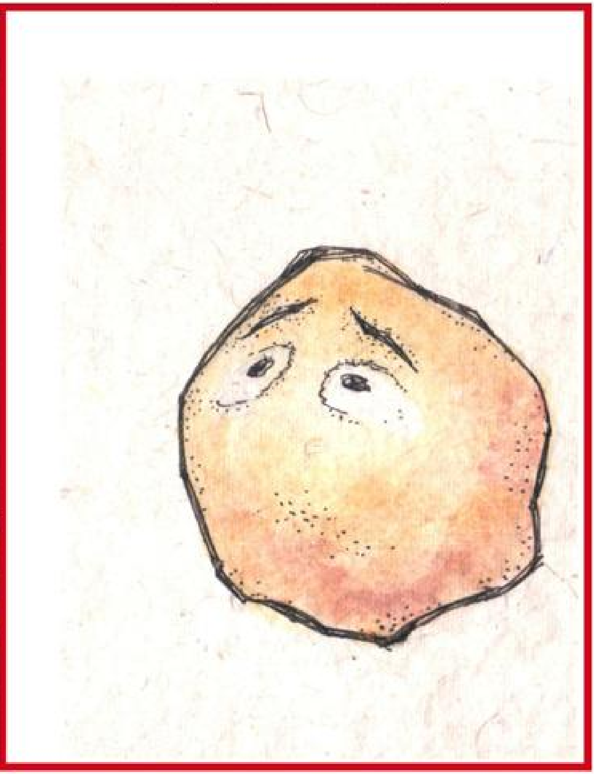

আর তখনই দুলে উঠেছে পৃথিবী, পাহাড় আর সবকিছু। ভূমিকম্প !!

ভয় পেয়ে ছুটে এসেছি রাস্তায়। তারপর ফিরে এসেছি শহরে।

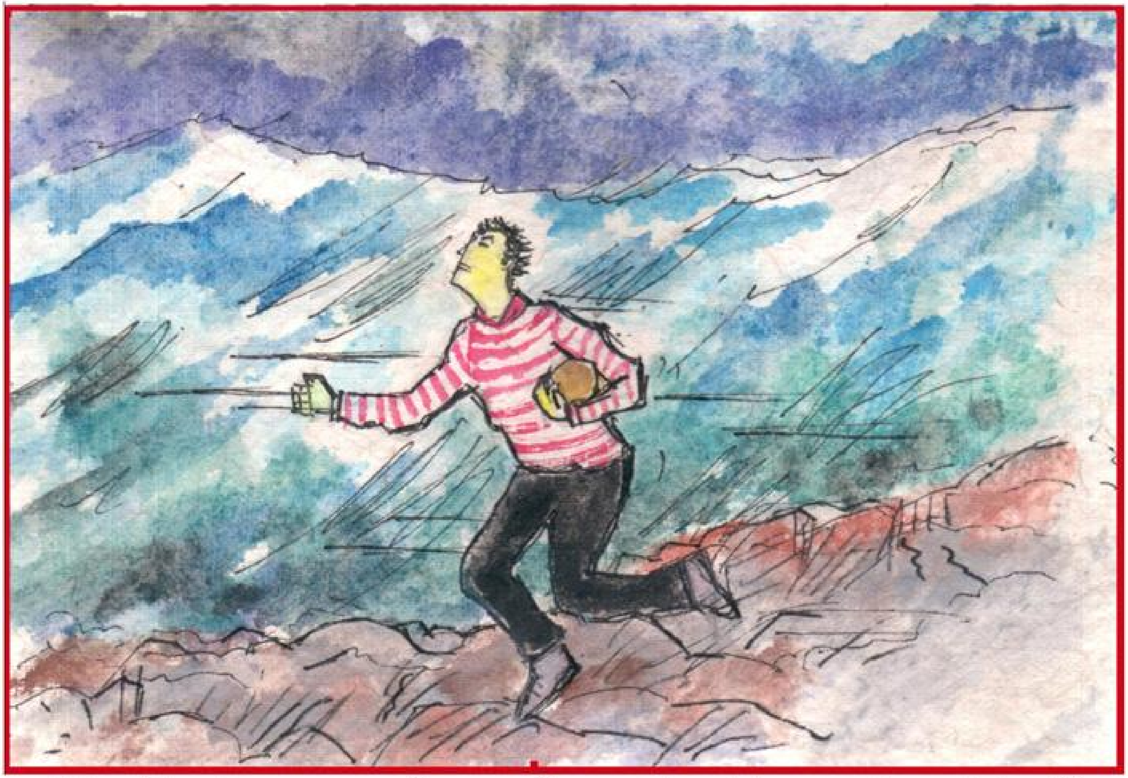

পাথরের টুকরোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। সে এখন আমার ঘরে আছে। আমার বাড়ি এলে দেখতে পাবে।

ব্যাঙ

রাজকন্যে

রুশ লৌকিক কাহিনীর এ ছবিগুলি কিন্তু পেশাদার শিল্পীর কাজ নয়, এগুলি এঁকেছে ১৫ বছরের ইউলিয়া গুকোভা। স্কুলের ৯ম শ্রেণীতে সে পড়ে, সেইসঙ্গে ললিতকলা বিদ্যালয়েও অনুশীলন করে।

...এক রাজার ছিল তিন ছেলে। একদিন সবাইকে ডেকে সে বললে: 'বুড়ো হতে চলেছি, আমার ইচ্ছে তোমরা বিয়ে করো। এক-একটা তীর নিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে ছোড়ো। তীর যেখানে পড়বে সেখানেই তোমাদের নির্বন্ধ।' বড়ো ছেলের তীর গিয়ে পড়ল ভুঁইয়ার বাড়িতে, ভুঁইয়ার মেয়ে সেটি তুলে নিলে। মেজো ছেলের তীর পড়ল সদাগর বাড়িতে, আর ছোটো ছেলে ইভান রাজপুত্রের তীর উড়ে গেল কে জানে কোথায়! অনেক খোঁজাখুঁজি করে সে পেঁছল জলায়, দেখে তীর ধরেছে ব্যাঙ। ব্যাঙ বলল: 'আমায় বিয়ে করো, তোমার নির্বন্ধ তাই।'

(১) তিনটে বিয়ে হল... ছেলেদের ডেকে রাজা বললে: 'তোমাদের কোন বৌমের হাতের কাজ ভালো তা দেখতে চাই। কালকের মধ্যে একটা করে জামা বানিয়ে দিক তারা।' ছেলেরা কুর্নিশ করে চলে গেল যে যার বাড়িতে।

(২) মাথা হেঁট করলে ইভান, ব্যাঙকে বললে বাপের হুকুমের কথা। 'দুঃখু কোরো না ইভান রাজপুত্র, ঘুমোও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।' ইভান ঘুমোল আর ব্যাঙ তার খোলস ছেড়ে হয়ে গেল বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা। হাততালি দিয়ে সে ডেকে বললে, 'মায়েরা, মাসিরা, সকালের মধ্যে আমায় একটা জামা বানিয়ে দাও যা বাবাকে পরতে দেখেছি।'

(৩) সকালে ঘুম ভেঙে ইভান দেখে, টেবিলের ওপর জামা তৈরি। ভাইয়েরা গেল রাজার কাছে। বড়ো ছেলে তার জামা খুলে দেখাল, রাজার মন উঠল না। মেজো ছেলের বেলাতেও তাই। আর ইভান তার জামা দেখাতে রাজা বললে 'হ্যাঁ, একেই বলে জামা, পরবের দিনে পরবার মতো।'

(৪) এবার নতুন কাজের ভার দিলে রাজা, সকালের মধ্যে রুটি বানাতে হবে। 'দেখতে চাই কোন বৌমা ভালো রাঁধে।' ফের মন ভার হল ইভানের, ফের তাকে সান্ত্বনা দিলে ব্যাঙ। ঘুমোতে গেল ইভান। আর অন্য যে বৌয়েরা আগে ইভানকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল তারা ঠিক করল চালাকি খাটাবে।

(৫) ব্যাঙ কী করে দেখতে পাঠাল এক বুড়িকে। সেটা টের পেয়ে ভাসিলিসা ময়দা মেখে তালটা স্রেফ উনুনের মধ্যে ফেলে দিলে। বুড়ি ব্যাপারটা বললে বৌমাদের, তারাও তাই করলে '

(৬) ভাসিলিসা পরে মা-মাসিদের ডাকলে, নানান নকশা আঁকা রুটি বানালে তারা।... বাপের কাছে এল ভাইয়েরা। বড়ো ভাইদের রুটি তো নয়, পোড়া আবর্জনা। আর ইভানেরটা দেখে রাজা বললে, 'হ্যাঁ, একেই বলে রুটি, পরবে খাওয়ার মতো।'

(৭) রাজা তিন ছেলেকে হুকুম দিলে, পরের দিন বৌদের নিয়ে ভোজে আসতে।... ব্যাঙকে সে কথা বললে ইভান। ব্যাঙ বলে, 'দুঃখু কোরো না, ভোজে তুমি যেও একলা, আমি যাব পরে।' শিখিয়ে দিলে কী বলতে হবে।

(৮) ভোজে জুটেছে সবাই, ইভান রাজপুত্রকে নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে: 'রুমালে করে বৌকে নিয়ে আসলেও পারতিস!' খেতে বসেছে, এমন সময় হুড়মুড় শব্দ। ভয় পেয়ে গেল সবাই। ইভান বলে: 'ভয় নেই অতিথিসজ্জন, আমার ব্যাঙ আসছে বাক্সে চেপে।' গাড়ি এসে থামতে বেরিয়ে এল বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা...

(৯) খানা হল, পিনা হল, শুরু হল নাচ। ইভানকে নিয়ে নাচতে লাগল ভাসিলিসা। সে কী নাচ, ওরা সবাই অবাক মানে। ইভান রাজপুত্র ওদিকে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে ছুটল বাড়ির দিকে...

(১০) ...ব্যাঙের খোলস ফেলে দিল উনুনে। বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা ফিরে এসে সব বুঝল। মন খারাপ করে বললে, 'হায়, কী করেছ ইভান রাজপুত্র, এবার বিদায়। তিন দশের রাজ্যে অমর কাঁকলাশের কাছে আমার খোঁজ কোরো।' এই বলে পাখি হয়ে সে উড়ে গেল জানলা দিয়ে। কেঁদে-কেটে ইভান বেরুল তার বৌয়ের খোঁজে।

(১১) চলল অনেক দিন। বনে দেখা এক বুড়োর সঙ্গে। সে বললে, 'জানি তোর দুঃখের কথা। তোর বৌ আছে অমর কাকলাশের কাছে। তার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তার মরণ আছে সূঁইয়ের ডগায়, সূঁই আছে ডিমে, ডিম হাঁসে, হাঁস আছে খরগোশে, আর খরগোশ যে সিন্দুকে আছে সেটা রয়েছে উঁচু ওক গাছের ডগায়।' ইভানের সাফল্য কামনা করে সে তাকে দিলে সুতোর গুটি।

(১২) গুটি যেদিকে গড়ায়, সেদিকে যায় ইভান। পথে দেখা এক ভালুকের সঙ্গে। মারবে বলে ইভান তীর-ধনুক বাগিয়েছে, ভালুক তাকে বললে মানুষের গলায়: 'মেরো না আমায়, তোমার কাজে লাগব।' ভালুকের জন্যে মায়া হল ইভানের।

(১৩) চলল আরো এগিয়ে। দেখে মাথার ওপরে উড়ছে হাঁস। তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরতেই হাঁস বললে মানুষের গলায়: 'মেরো না আমায়, তোমার কাজে লাগব।' হাঁসের জন্যেও মায়া হল ইভানের।

(১৪) চলল আরো এগিয়ে। দেখে এক ট্যারাচোখো খরগোশ। তাকেও মারলে না ইভান। আর মানুষের গলায় খরগোশ বললে, 'ধন্যবাদ ইভান রাজপুত্র, আমি তোমার কাজে লাগব।'

(১৫) নীল সাগরের কাছে এল ইভান: দেখে তীরে, বালির ওপর পড়ে আছে পাইক মাছ, প্রায় মরোমরো, বলে, 'দয়া করো ইভান রাজপুত্র, নীল সাগরে ছেড়ে দাও আমায়।' মাছকে জলে দিয়ে ইভান চলল আরো এগিয়ে।

(১৬) গুটি গড়িয়ে গেল বনে। বনে এক ওক গাছ, তার ওপরে সিন্দুক। কিন্তু সেখানে ওঠা কঠিন। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল ভালুক, শিকড় থেকে উপড়ে ফেললে গাছকে, সিন্দুক আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল। সিন্দুক থেকে বেরিয়ে ছুটল খরগোশ। অন্য খরগোশ তার পিছু ধাওয়া করে কামড়ে তাকে কুটিকুটি করল।

(১৭) খরগোশ থেকে বেরিয়ে হাঁস উঠল আকাশে। অন্য হাঁস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোকর দিলে। হাঁসের ডিম খসে পড়ল সাগরে। আর ডিম মুখে করে সাগর থেকে ভেসে এল পাইক মাছ। ডিম ভেঙে ইভান চুরমার করলে সুঁইয়ের ডগা...

(১৮) মরতে হল কাঁকলাশকে। ইভান রাজপুত্র গেল তার শ্বেত পুরীতে। বুদ্ধিমতী ভাসিলিসা ছুটে এল তাকে বরণ করতে, চুমু খেল তার মিষ্টি ঠোঁটে। দুজনে মিলে ফিরে এসে সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাল বহুকাল।

টোটা আর টিটো

অশ্বারোহণ পর্ব

মূল কমিকসঃ হ্যারল্ড নের

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

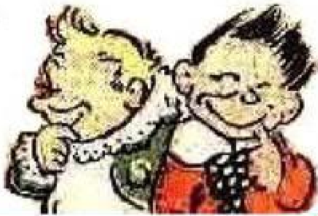

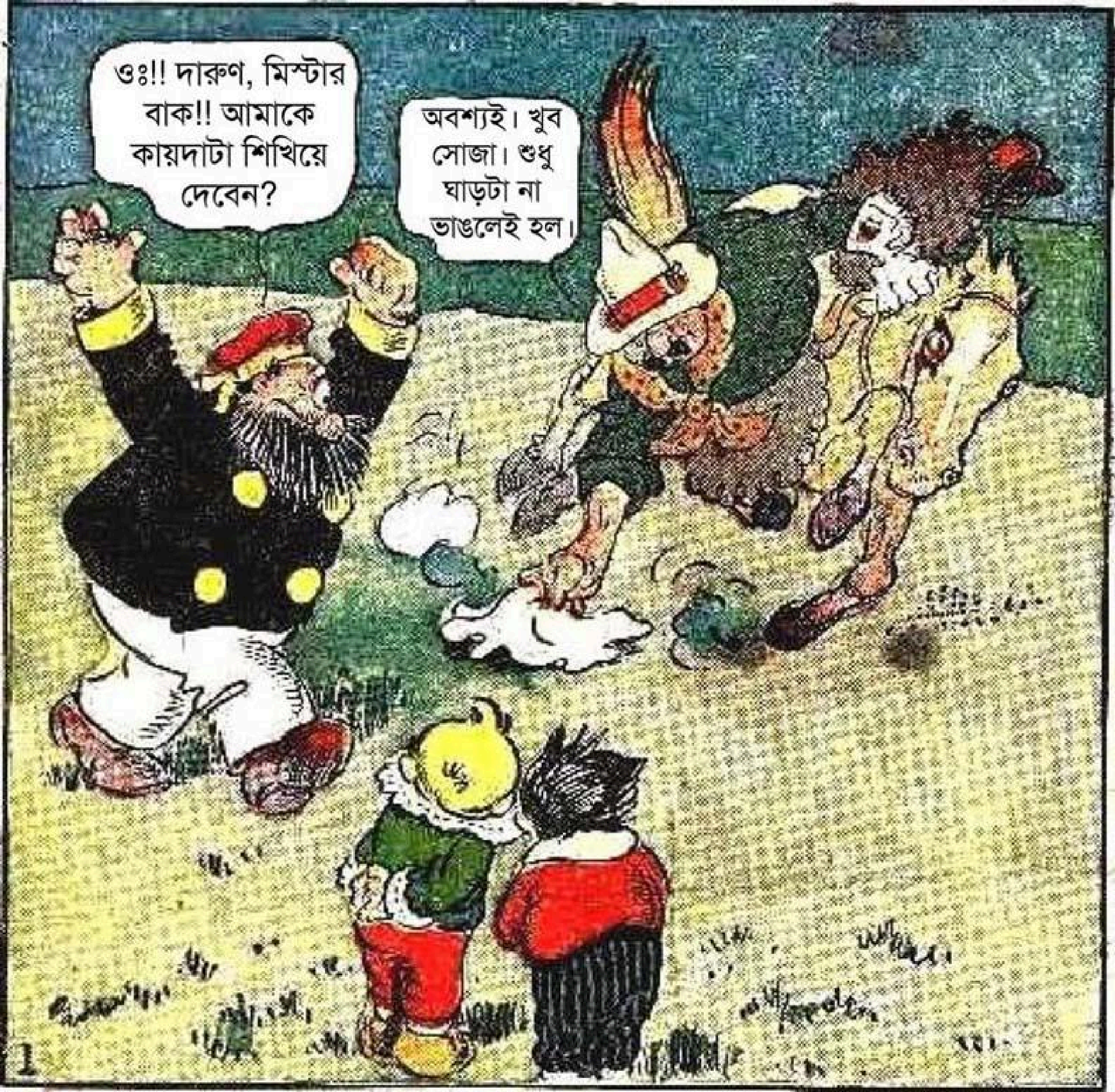
ওঃ!! দারুণ, মিস্টার বাক!! আমাকে কায়দাটা শিখিয়ে দেবেন?
অবশ্যই। খুব সোজা। শুধু ঘাড়টা না ভাঙলেই হল।

ক্যাপটেনের সত্যি জবাব নেই!! নতুন কিছু চেষ্টা করে দেখার ব্যাপারে কখনও পিছপাও হন না।
হুমমম!!! বিশেষ করে সেটা যদি খুব সোজা হয়!
2

ক্যাপটেন, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে এই রুমালটা তুলে দেখান তো দেখি!!
ক্যাপটেনের কাছে এটা কোনও ব্যাপারই নয়!
দূর দূর!! এ তো নস্যি! দেখাচ্ছি দাঁড়াও।
3

হা হা!! আমার মতো সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে এরকম সস্তা সার্কাসের খেলকুঁদ দেখানোর কোনও মানে হয়?
সেটা ঠিকই! ওফ!! অসাধারণ, দুর্ধর্ষ, অভাবনীয়, মর্মান্তিক...
4

অকল্পনীয়,
অননুকরণীয়,
অপরিণামদর্শী!!
অহো!! দুর্দান্ত!
ভয়ংকর সুন্দর!!
5

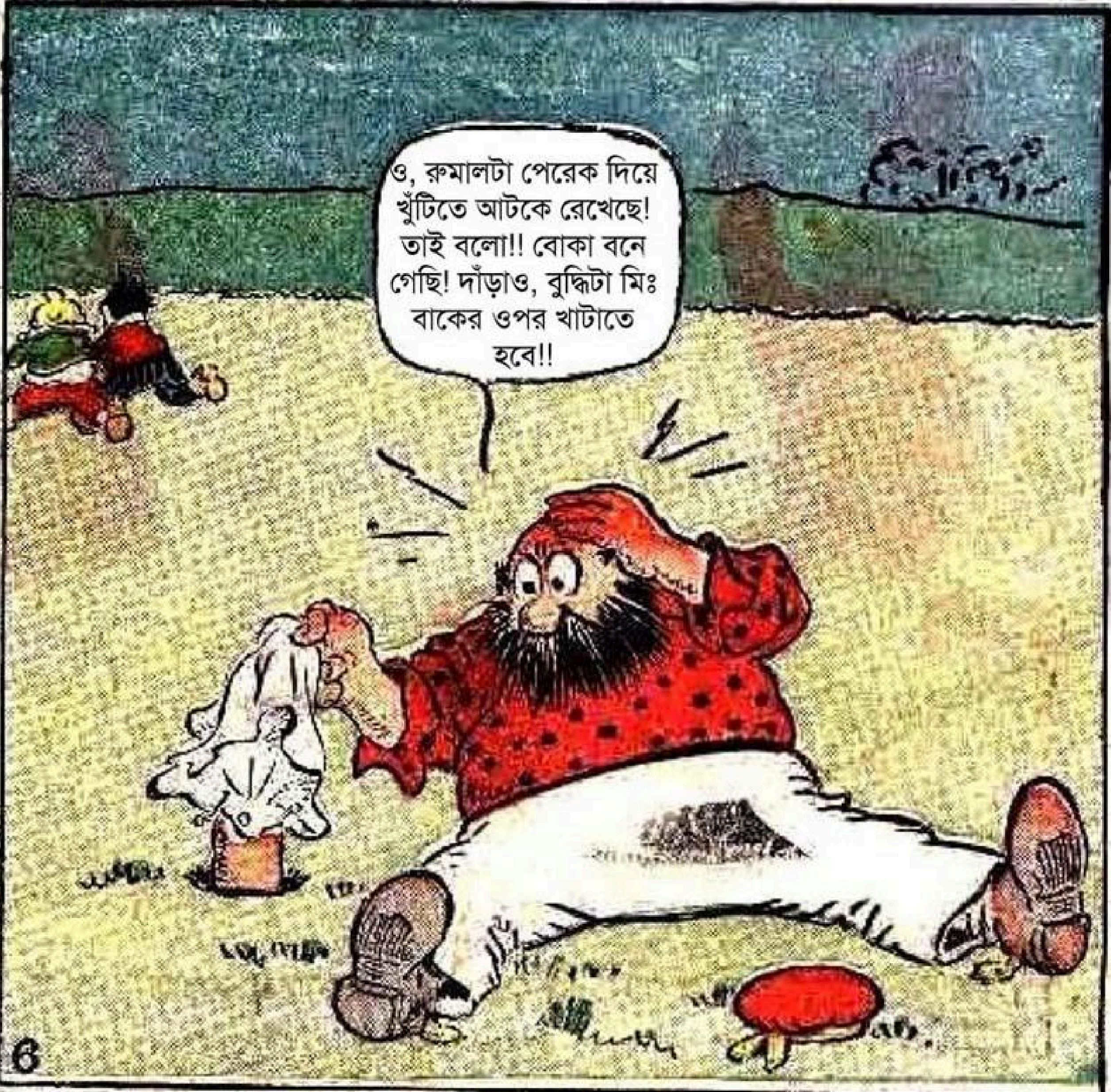
ও, রুমালটা পেরেক দিয়ে খুঁটিতে আটকে রেখেছে! তাই বলো!! বোকা বনে গেছি! দাঁড়াও, বুদ্ধিটা মিঃ বাকের ওপর খাটাতে হবে!!
6

ভাল করে দেখ
মিস্টার বাক, আরেকবার প্লিজ দেখাবেন আপনি কেমন করে তোলেন এটা? ভুলে গেছি!
7

জলের মতো সোজা!!
এইবারে জমবে খেল! এই গেল! এই গেল! আর একটু! গেল রে...
৪

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!! কেমন বোকা বানালাম, মিঃ বাক? হিঃ হিঃ, আমায় যেমন বুদ্ধু বানিয়েছে, আমিও তেমনি করেছি!

এটা কী ধরনের গুপীযন্তর? কার কম্ম?
হাঃ হাঃ হাঃ! এটা টোটা আর টিটোর কাণ্ড। আমায় বোকা বানানোর জন্য করেছে। আমি বোকা বনেছি, আর তারপর আপনাকেও বোকা বানিয়েছি। হাঃ হাঃ! কেমন? দারুণ না?

তাই যদি হয় তবে এটা তোমার ঘাড়ে ভাঙা উচিত। ব্যাটা অলম্বুষ!! এত বয়েস হয়েছে তবু কুবুদ্ধি যায় না! দ্যাখ কেমন লাগে!!
ইঁ ইঁ ইঁ ই ক..

না ক্যাপটেন, একদম না। এবারে ওদের পেটাবে না। সব বলেছে আমায় ওরা। তাতে যা বুঝলাম, তোমারই দোষ।

লোহার জং ধরা গেটটাতে হাত রেখে ঘাড় উঁচু করে পুরোনো বাড়িটাকে দেখছিল অভি। বাড়িটা পূবমুখো, সকালের রোদের তাই অবাধ যাতায়াত বাড়িটার ভেতরে, বাইরে। পুরোনো বাড়ি। হ্যাঁ, এই নামেই সবাই জানে বাড়িটাকে। অন্তত অভি তার মা, দিদা, দাদু, মামা, মামীদের কাছে এই নামই শুনে এসেছে। পুরোনো বাড়িতে থাকতেন কে? বুড়োদাদু মানে অভির মার ঠাকুর্দা যিনি প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি এসে এই ক'দিন আগে মারা গেছেন।

অভি একবার ছোটোবেলায় বুড়োদাদুকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার বাড়িটাকে সবাই পুরোনো বাড়ি বলে কেন?"

বুড়োদাদু হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, "আমাকে তোরা সবাই বুড়োদাদু বলিস কেন বল তো? আমি বুড়ো বলে। বুড়ো মানেই তো পুরোনো। আমিও পুরোনো, আমার বাড়িও পুরোনো।"

ছোটোবেলায় যুক্তিটা বেশ মনঃপূত হলেও বড়ো হয়ে অভি বুঝেছিল কারণটা অন্য। এই অঞ্চলে এককালে বুড়োদাদুর বাপ, ঠাকুর্দাদের ভালোই জমিজমা ছিল, প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল। বাড়িটা নাকি সেই সময়ের। বুড়োদাদু তাকে যথাযোগ্য সংস্কার করে ভালোভাবে টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। সেইজন্যেই বোধহয় পুরোনো বাড়ি নাম। অবশ্য আদ্যিকালের বাড়ির এর থেকে উপযুক্ত নাম আর কীই বা হতে পারে। পুরোনো বাড়ি বুড়োদাদুর খুব প্রিয় ছিল। বয়স হয়েছিল, ছেলেমেয়েরা তো কবেই নানান দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, কেউ কাছে থাকত না, বুড়োদাদু কিন্তু পুরোনো বাড়ি ছেড়ে নড়েন নি, হাজারবার বলা সত্ত্বেও। না বাড়ি বিক্রি করেছেন, না এখানে বসবাসের পাট তুলেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তো এখানেই রয়ে গেলেন।

পুরোনো বাড়ি দেখতে দেখতে এসবই ভাবছিল অভি। এর আগে একবার গরমের ছুটিতে এখানে এসেছিল অভি। তখন বেশ ছোটো ছিল। বুড়োদাদুও বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন। মুগুর ভাঁজা চেহারা ছিল ওনার। অভিকে নিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতে যেতেন, ঘুড়ি ওড়াতেন, আরো কত কী! ঘুড়ির সুতোর কতরকম মাঞ্জা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর আসা হয় নি এরপর। বুড়োদাদুর সঙ্গে দেখা হয়েছে পারিবারিক অনুষ্ঠানে। অবশ্য শেষ কয়েক বছর বুড়োদাদু বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতেন না। এত বছর পর অভি যখন আবার এল, তখন বুড়োদাদুই নেই।

বুড়োদাদু কিন্তু শেষ অবধি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। বরাবর ব্যায়ামের অভ্যেস ছিল আর অত নিয়মে থাকতেন বলেই কী! অথচ বুড়োদাদুর ছেলেমেয়েদের দেখো, নানা অসুখবিসুখে কাবু। অভির দাদুই তো আসতে পারেন নি শরীর খারাপ বলে। মেজদাদু আর ছোড়দাদু এসেছেন রাজুমামা, তপুমামাকে সঙ্গে নিয়ে। অভির হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ, তাই ও-ও জুটে গেছে ওনাদের সঙ্গে। পুরোনো বাড়ির একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। এখানে থাকার তো আর কেউ রইল না। আজকাল জমির দাম এদিকেও বেশ ভালোই।

অভির অবশ্য এসব আলোচনা ভালো লাগছে না, খালি জমি বাড়ির দাম নিয়ে কচকচি। ও তাই খালি এদিক ওদিক ঘুরেই বেড়াচ্ছে। এত বড়ো বাড়িটা ওর কাছে বরাবরই রহস্যময় লাগে। এত ঘর, কোনো কোনো জায়গা দিনের বেলাতেও অন্ধকার, কোনো ঘরে রাজ্যের জিনিস ডাঁই করে রাখা, পা ফেলারও জায়গা নেই। লম্বা লম্বা টানা বারান্দা, আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা সেখানে নিত্য চলে। ছোটোবেলায় অভির খুব থাকতে ইচ্ছে করত এখানে, কিন্তু সুযোগ হত না। এত বছর পরে এখানে এসে অভির মনে হচ্ছে বুড়োদাদু এখনও এখানে আছেন। দেখতে তো পাচ্ছে না ওনাকে কিন্তু তিনি যেন রয়ে গেছে এই পুরোনো বাড়ির আনাচে কানাচে। মনে হওয়াও কিছু আশ্চর্যের নয়, এসে অবধি কত কিছু যে শুনছে পুরোনো বাড়ির সম্পর্কে, বুড়োদাদুর সম্পর্কে! এমন কী এও কানাঘুষো শুনেছে যে পুরোনো বাড়িতে নাকি ভূত আছে!

কথাটা প্রথম শুনেছিল এ বাড়ির পুরোনো চাকর বিশুর কাছে। বুড়োদাদুর কাছে যে চব্বিশ ঘন্টা থাকত সেই বিশুর কাছে। শুনে তো অভি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

"কী যে বলো তুমি বিশুদা! ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি!"

"বললে পেত্যয় যাবে নি, রাতবিরেতে যে কত কী হয় এখেনে তার ঠিক নেই! আমি তো রাতে কত্তাবাবুর ঘরের সামনের ওই ছোটো ঘরটাতে সেই যে ঢুকতুম, দরজা বন্ধ করে শুতুম, ভোরের আগে খুলতুমও নি, নড়তুমও নি," বলেছিল বিশু।

"ওই ঘরে ভূত ঢোকে না?"

"না। এই দেখো লক্ষ্মণ ওঝার কাছ থেকে মন্ত্রপূত তাবিজ নিয়ে এসেছি। সব সময় এটিকে ধারণ করি। এটি সঙ্গে থাকলে আর বিপদের ভয় নেই," বিশু হাতে বাঁধা একটি তাবিজ দেখায়, তারপর হাত জোড় করে, চোখ কপালে তুলে বার কয়েক রামনাম করে।

"তোমার নাহয় তাবিজ আছে, কিন্তু বুড়োদাদু? বুড়োদাদু কী করত? বুড়োদাদুকে ভূত ধরত না?" অভি জিজ্ঞেস না করে পারে নি।

বিশু সন্তর্পণে এদিক ওদিক দেখে দুকানে হাত ঠেকিয়েছিল, তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, "কত্তাবাবু আমার মনিব ছিলেন, অন্নদাতা। মিছে কথা বলব নি, দয়ার শরীর ছিল, বিপদে আপদে সাহায্য করতেন, কিন্তু......"

"কিন্তু? কিন্তু কী?"

“কিন্তু ওসব ভূত পেরেতের সঙ্গে ওনার ওঠাবসা ছিল। ভূত নামানো, তাদের বশ করা এসব উনি জানতেন,” বিশু বলেছিল।

“কী!” অভি তো অবাক, আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে “অ্যাই বিশে কোথায় গেলি” বলে মেজোদাদু এক হাঁক পেড়েছিলেন।

বিশুও অমনি দৌড়েছিল, যাবার আগে বলেছিল, “এসব কথা আমি যে তোমাকে বললুম কাউকে আবার বোলো নি যেন।”

এখন বিশুদাকে বাজার নিয়ে আসতে দেখে অভির কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেল। বিশুদার সঙ্গে রাজুমামাও গেছিল। রাজুমামার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর। অভিকে দেখে শুধু “কী রে এখানে কী করছিস” বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে গেল।

অভি ভাবছিল ভূতের কথা। শুধু ভূতে হচ্ছে না, আবার বুড়োদাদুকেও এর সঙ্গে জড়ানো! ভূত বশ করা! ধুর! যত্তসব আজগুবি কথা! তার থেকে রাজুমামা মুখটাকে অমন গোমড়া করে রেখেছিল কেন সেটাই বরং খোঁজ নেওয়া যাক। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখল সবাই সেখানেই আছে। এখন আর শুধু রাজুমামা নয়, বাকি সবার মুখও গম্ভীর। কী ব্যাপার? না বাজারে গিয়ে রাজুমামা জানতে পেরেছেন যে এ বাড়ির ভূতের বদনাম ভালোই আছে। চট করে কেউ কিনতে চাইবে না, কিনলেও জলের দরেই দিতে হবে।

“এসব হচ্ছে চালাকি বুঝলি? যাতে ভালো দামে বিক্রি না করা যায়,” মেজোদাদু বললেন, “যারা রটাচ্ছে তারাই কিনবে। এই হচ্ছে মতলব।”

“এইটি বাবা করে গেলেন। কত বছর ধরে বলে আসা হচ্ছে এখানকার সব কিছু বিক্রি করে আমাদের কাছে চলে আসতে! কিন্তু না, শুনল না! জেদ করে এখানেই রয়ে গেল। এখন

ঠেলা সামলাই আমরা। ফেলে রাখলেও দেখব দুদিন বাদে জবরদখল হয়ে গেছে,” বললেন ছোড়দাদু।

“ভূতের বাড়িই যদি হবে তাহলে শ্যামসুন্দরের কষ্টিপাথরের মূর্তি চুরি হয়ে গেল কী করে? চোরেরা তার মানে ভূতের ভয় পায় না!” রাজুমামা বলল।

অভির এখন মনে পড়ল, একবার শুনেছিল বটে পুরোনো বাড়ি থেকে ঠাকুরের মূর্তি চুরি হয়ে গেছে।

“তোমরা পুলিশে খবর দাওনি?” অভি জিজ্ঞেস করল।

“থানা পুলিশ সবই করা হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অতবড়ো কষ্টিপাথরের বিগ্রহ, ও একবার গেলে আর পাওয়া যায় রে! গয়নাগাঁটিও মন্দ ছিল না। আগেকার দিনে অনেক বাড়িতেই এরকম থাকত। একরাতেই সব হাপিশ হয়ে গেল,” বললেন মেজোদাদু।

“ভূতের বদনামটা মনে হয় শেষের দিকে হয়েছে, একেবারেই হালে। নাহলে আগে তো শুনতাম অনেকে কিনতে টিনতে চাইছে বাড়িটা,” রাজুমামা বলল।

“আমার তো মনে হয় দাদুর মাথাটাও আর ঠিক ছিল না শেষ দিকে। কথাবার্তাও কীরকম যেন গোলমেলে ঠেকত। আরে বয়সটা দেখো! সে যাই হোক, কথা হচ্ছে আমরা আর ক’দিন এখানে কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে বসে থাকব? যে ক’দিন আছি তার মধ্যেই যা করার করতে হবে,” তপুমামার বক্তব্য।

এ ব্যাপারে সবাই একমত। মুশকিল হচ্ছে বাড়িটা কারুর দায়িত্বেও রেখে যাওয়ার উপায় নেই। বিশু পরিষ্কার বলে দিয়েছে সে এখানে একা থাকতে পারবে না। এখনই তো কাজকর্ম করে রাতে কেটে পড়ছে। বিশ্বাসী লোক ছাড়া রাখাও যায় না।

অভির মনে কিন্তু বেশ উত্তেজনা। জীবনে এই প্রথম কোনো ভূতুড়ে বাড়িতে থাকার সুযোগ হল! যদিও গতকাল রাতে কিছুই বোঝে নি, এক ঘুমেই রাত কাবার হয়েছে। অভি ঠিক করেই নিয়েছে ভূত না দেখে ও নড়বে না এখান থেকে। এই সুযোগ ছাড়া যায় নাকি! তাছাড়া বাড়িটা ওর বরাবরই খুব ভালো লাগে। পুরো বাড়িটাই তো ভালো করে এখনো দেখা হল না।

অভি উঠে গিয়ে বিশুর সঙ্গে আবার গপ্পো জুড়ল। ওই তো থাকত বুড়োদাদুর সঙ্গে।

“আচ্ছা বিশুদা, কাল তো খুব বললে যে এ বাড়িতে রাতবিরেতে কত কিছু হয়। কী হয় সেটা বলবে তো, নাহলে বুঝব কী করে?”

“সে অনেক কিছু হয় বাবা, অনেক কিছু হয়। আমি বেশি কিছু বললে তোমার দাদুরা ভেবে বসবেন আমিই এসব রটাচ্ছি! চাকর বই তো নই,” বিশু কিছুই বলতে চায় না।

“কেউ কিচ্ছু ভাববে না। তাছাড়া জানতে পারলে তো ভাববে! আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। বলো না, বলো না,” অভিও নাছোড়বান্দা।

“রাতবিরেতে যে কত কী হয়! থেকে থেকে পেতনির কান্না!”

“পেতনির কান্না! সেটা আবার কী?”

“এই দেখো, তুমি কলকেতার ছেলে, পেতনির কান্না তুমি জানবে কী করে? সে অতি সব্বনেশে জিনিশ। মনে হবে খুনখুন করে কেউ কেঁদেই যাচ্ছে। খুব জোরে নয়, কিন্তু একটানা কেঁদেই যায়, মাঝে একটু হয়তো থামল, আবার শুরু হল। কিন্তু সেই কান্না শুনে তুমি যদি উঠে খোঁজাখুঁজি করতে যাও, তাহলেই আর রক্ষে নেই! পেতনি দেবে ঘাড়টি মটকে!”

“এ বাড়িতে পেতনি কাঁদে?”

"কাঁদেই তো। আমি কতবার শুনেছি। কানে বালিশ চেপে রামনাম জপেছি। সে কান্না যে শুনেছে সেই জানে," বিশু বলতে বলতেই শিউরে ওঠে।

"তখন বুড়োদাদু কী করত?"

"ওনার কথা আলাদা। বললুম না ওনার সঙ্গে তেনাদের যোগসাজশ ছিল।"

"কী করে বুঝলে তুমি?"

"এক রাত্তিরের কথা বলি শোনো। তোমার বুড়োদাদুর ঘরখানা তো দেখেছ। পেল্লায়। কত জিনিসপত্তর। মাঝখানে এই বড়ো এক পালঙ্কে তিনি শুতেন। ঘরের সামনেই একখানা ছোটো ঘর। ওটাতে আমি শুতুম। এক রাতে খটখট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলুম কত্তাবাবুর কি কিছু দরকার হল? দু ঘরের মাঝের দোর বন্ধ থাকে না। দোর খুলে ঢুকে যা দেখলুম......" বিশু চুপ করে যায়।

"কী দেখলে বলো না, ও বিশুদা, বলো না," অভিরও না শুনলেই নয়।

"দেখলুম ঘরে কত্তাবাবু নেই। ঘরে একটা টিমটিম করে আলো জ্বলত। তাতেই দেখলুম পালঙ্কে কত্তাবাবুর জায়গায় অন্য কে একটা শুয়ে আছে। তার মুখখানা, ওরে বাবা সে কথা ভাবলেও এই এতদিন পরে এই দিনের আলোতেও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। একটা অন্য লোক শুয়ে। মুখ হাঁ করে এই অ্যাত্তো বড়ো বড়ো দাঁত বার করে। দেখেই আমি দৌড়। কত্তাবাবু কোত্থাও নেই!"

"আরে বাথরুমেও তো যেতে পারে, কী বাইরে যেতে পারে।"

"না না বাথরুমের দোরে তো বাইরে থেকে হুড়কো লাগানো ছিল। আর ঘরের বাইরে যেতে হলে তো আমার পাশ দিয়েই যেতে হবে। সে দোর তো আমি নিজে বন্ধ করে শুয়েছি। কিছুক্ষণ পরেই কত্তাবাবুর ডাক, 'বিশে, এই বিশে।' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গেলুম। কত্তাবাবু বললেন, 'কী হয়েছে? ঘরে ঢুকেছিলিস কেন?' আমতা আমতা করে কোনরকম বললুম, 'কীসের যেন আওয়াজ হল তাই...' কত্তাবাবু আমাকে দেখে বললেন, 'হুঁ, যা এবার।' কত্তাবাবু তো ঘরেই ছিলেন না, জানলেন কী করে যে আমি ঘরে ঢুকেছিলুম? আর সেই লোকটাই বা গেল কোথায়? লোক নয়, লোক নয়, অন্য কিছু," বিশু আবার রাম রাম করতে শুরু করল।

"রাত্তিরে অন্ধকারে কী দেখতে কী দেখেছ," অভি বিশ্বাসই করতে চাইল না, "আচ্ছা বলো তো তুমি নিজে দেখেছ বুড়োদাদুকে কিছু করতে মানে ওই ভূত টূত নামাতে? মানে এমনি আয় আয় করে ডাকলেই তো আর ভূত এসে হাজির হবে না! দেখেছ কিছু করতে বুড়োদাদুকে? কোনো অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কিছু?"

"মিছে কথা বলব নি। কত্তাবাবুর আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখেনে। এই বাড়ি ছেড়ে কত্তাবাবুর আত্মা যাবে নি। মিছেকথা বললে আমারই ঘাড় মটকে দেবেন। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, মিছে কথা বলব নি। আমি কিচ্ছু দেখি নি। আমাকে অনেকে শুধিয়েছে এ কথা, কিন্তু আমি কিচ্ছু দেখি নি। অনেক উপকার করেছেন কত্তাবাবু, মিছে কথা বলব নি।"

"তুমি তো সবসময় থাকতে বুড়োদাদুর সঙ্গে। তোমার কি মনে হয় বুড়োদাদুর মাথার কোনো গোলমাল টোলমাল হয়েছিল? মানে বয়স তো অনেক হয়েছিল, হতেই পারে," অভি জানতে চাইল।

"না না ও কথা মুখেও এনো নি," বিশু একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল, "ও কথা কত্তাবাবুর শত্তুরেও বলবে না। বয়স যতই হোক জ্ঞান বুদ্ধি এক্কেবারে টনটনে ছিল। শরীরও

বটে একখানা ছিল। মিছে কথা বলব নি অমন লোহার শরীর কজনার থাকে? কত্তাবাবু বলতেন, 'বুঝলি বিশে, মুগুর ভাঁজা শরীর আমার, সেঞ্চুরি করেই ছাড়ব।' শেষ কটা দিন শুয়েছিলেন, নইলে এক্কেবারে চাঙ্গা ছিলেন। কিন্তু তুমি এত কথা শুধোচ্ছ কেন বলো দিকিনি?"

অভি ভাবছিল অন্য কথা। তপুমামা বলছিল বুড়োদাদুর মাথার ঠিক ছিল না, উলটোপালটা কথাবার্তা বলত আর বিশুদা বলছে ওসব কিছুই না। কার কথা সত্যি? হতে পারে বিশুদা মনিবের নামে কিছু বলতে চায় না। বুড়োদাদু অনেক উপকার করেছে ওদের, তাই বলছে।

বিশুর কথায় চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, "তোমাকে ছাড়া আর কাকে জিজ্ঞেস করব? আমরা কি কেউ থাকতাম এখানে? একমাত্র তুমিই তো থাকতে বুড়োদাদুর সঙ্গে সারাক্ষণ। এই যে বাড়িটার নামে উলটোপালটা কথা রটেছে, এতে কত ক্ষতি হল বলো তো? এখন তো আর এখানে থাকার কেউ রইল না। ফাঁকা পড়ে থাকলে এবার সত্যি সত্যিই ভূতের বাড়ি হবে, এতদিন না হয়ে থাকলেও," বিজ্ঞের মতো বলল অভি।

বিশুও সায় দিল, বলল, "এইটা তুমি হক কথা বলেছ। কিন্তু এ বাড়ির নামে হাজার কথা আছে। নেহাত কত্তাবাবু ছিলেন তাই আমি থাকতুম। আমাকেই কম লোকে শুধিয়েছে নাকি? দিনের বেলা তো বেরোতুম, বাড়ি যেতুম, দোকান বাজার করতুম, ওই যখন বামুনমাসি রান্নাবান্না করতে আসত, কাজলের মা ঘরদোর পরিষ্কার করতে আসত। রাস্তায় বেরোলেই হাজার কথা। এ এই শুধোয় তো ও ওই শুধোয়! বলব কী, কতজন তো এ বাড়ির কোন ঘরে কত্তাবাবু থাকেন, কোনদিকে কী দরজা জানলা আছে তা পয্যন্ত শুধোত। তবে এই বিশের মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোত না। আগে তো কত্তাবাবুর কাছে আমার খুড়ো থাকত। খুড়ো মরল যেবার ওই খুব জল হল সেবার। মরার আগে খুড়ো আমাকে কত্তাবাবুর কাছে নিয়ে এসেছিল, বলছিল, 'দেখ বিশে কেটে দু টুকরো করে ফেললেও একটা কথাও বাইরে বলবি নে।' আমি ভাবতুম না জানি কী আছে এখেনে। পরে বুঝলুম ওই তেনাদের জন্যেই সবার এত কুতূহল। ভাবে সব সময়েই বোধহয় তেনারা যাচ্ছেন আসছেন।"

এদিকে ভূতের বাড়ি বলে এত ভয়, আবার ওদিকে এত কৌতূহলও! কী জানি বাবা কী ব্যাপার। বিশু কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল, অভিও উঠে পড়ল ওখান থেকে। ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের সামনে এল। বাড়ির সংলগ্ন ছোট্ট মন্দির। শ্যামসুন্দরের মূর্তি চুরি হয়ে যাবার পরে ফোটো রাখা আছে একটা। ওতেই পুজো হয়। একজন পুরুতমশাই আসেন রোজ, পাঁচ মিনিটেই পুজো সেরে কেটে পড়েন। অভি দেখেছে তাঁরও কীরকম তাড়া। যেন দিনের বেলাতেও বেশিক্ষণ থাকলে ভূতে ধরবে। নাহ এই ভূতের ব্যাপারটার মীমাংসা না করলেই নয়। আজ রাতে জেগে থাকতে হবে, যদি পেতনির কান্না শোনা যায়। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন গোলমেলে লাগছে।

অভি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় আবার বিশুর সঙ্গে দেখা।

"তুমি খালি এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ কেন বলো তো? যাও, বৈঠকখানায় যাও, সরকারবাবু এসেছেন, এই চা দিয়ে এলুম," বিশুদা বলল।

"সরকারবাবুটা আবার কে?" অভি জিজ্ঞেস করল।

“বাজারের কাছে ওই লাল রঙের বাড়িটায় থাকেন। কত্তাবাবুর কাছে খুব আসতেন। কত্তাবাবুর থেকে অনেক ছোটো, কিন্তু ওই এক ওনার সঙ্গেই কত্তাবাবু খুব গল্পগাছা করতেন। যাও, যাও, বাইরে বাইরে ঘুরে না বেড়িয়ে ঘরে যাও।”

অভি গেল। দেখল বৈঠকখানায় একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। সাদা চুল, ধুতিপাঞ্জাবি পরা। দাদুরের বয়সী হবেন বলে অভির মনে হল। মেজদাদু অভির সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অভি বুঝল সেই বাড়ি বিক্রি নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে।

“যা বদনাম রটেছে এই বাড়ির! এ আর বিক্রি করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। করলেও দাম পাব না। থাক পড়ে থাক, কী আর করা যাবে,” তপুমামা বেশ হতাশ।

“আপনারাও কি তাহলে এটাকে ভূতের বাড়ি বলেই মেনে নিচ্ছেন?” সরকারবাবু জানতে চাইলেন।

“আমাদের মানামানিতে কী যায় আসে? লোকে তো তাই মানছে দেখছি,” বললেন মেজদাদু।

“আপনারা থাকুন ক’দিন। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। তাছাড়া বাড়িতেও তো অনেক জিনিসপত্র আছে, সেসবেরও তো ব্যবস্থা করতে হবে।”

“জিনিস বলতে কটা খাট আলমারি চেয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল – এইসব। তাও বাবা আগেই অনেক কিছু বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এত কাঠের জিনিসের যত্ন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে। অবশ্য যেগুলো আছে সেগুলোও সব সেগুন, মেহগনী কাঠেরই, সেগুলোর দাম ভালোই হবে। ওগুলো বিক্রি করে দেব। কিন্তু আসল জিনিসেরই তো কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আমরাই বা কদ্দিন থাকব? ছেলেদেরও অফিস আছে,” এবার ছোড়দাদু বললেন।

“আপনারা ক’দিন থাকুন না এখানে। তাহলে হয়তো এর ভূতুড়ে বদনাম ঘুচলেও ঘুচতে পারে। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি তো কিছু হয় না। থাকুন, দেখুন। আপনাদের বাবার খুব আক্ষেপ ছিল যে আপনারা এখানে আসেন না বা এলেও বেশি থাকেন না।”

“কী দেখব মশাই? দেখার কিছুই নেই। বহু পুরোনো বাড়ি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে বিক্রি করা যায় ততই ভালো। বাবা যে কী করে এখানে থাকতেন বাবাই জানেন,” বললেন মেজদাদু।

“আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। সব ভালো করে দেখেশুনে নিন। এত বছর একটা মানুষ এখানে বাস করতেন, নানান জিনিস তো থাকবেই। বাড়ি ফাঁকা রেখে চলে গেলে চুরিচামারির ভয়ও আছে।”

“আর কী চুরি হবে! চুরি যা হবার তা তো হয়ে গেছে। অত দামী কষ্টিপাথরের মূর্তিটা চুরি হয়ে গেল, সঙ্গে গয়নাগাটিও! পুলিশে খবরও তো আমি আর বড়োদা এসে দিয়েছি। বাবা শুধু খানিক হইচই করা আর আমাদের খবর দেওয়া ছাড়া কিছুই করেন নি। সাধে বলি বাবার মাথার গোলমাল হয়েছিল!” মেজদাদু বেশ বিরক্তই।

সরকারবাবু অল্প একটু হেসে উঠে পড়লেন।

সরকারদাদু কেন এতবার এখানে থাকতে বলছেন? উনি কি ভূতের ব্যাপারে কিছু জানেন? ওনার সঙ্গে তো বুড়োদাদুর ভালোই ভাব ছিল। অভি সারা দুপুর এসব ভাবল আর পুরো বাড়িটায় ঘুরঘুর করে বেড়াল। দোতলার বেশিরভাগ ঘরই বন্ধ, জিনিসপত্রও কিছুই নেই বিশেষ। দোতলার তিনটে ঘরে অভিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এই ক’দিন। গোটাতিনেক খাটবিছানা আছে। আগেও দাদুরা এলে এখানেই থাকতেন। বুড়োদাদু নাকি বেশ কয়েকবছর

একতলায় থাকতে শুরু করেছিলেন, দক্ষিণদিকের বড়ো ঘরটায়। ওনার থাকার সুবিধের জন্যে ওদিকটা ঠিকঠাকও করা হয়েছিল। ঘরটাকে একটা সুইটের মতো করা হয়েছিল। ঘরের সঙ্গে আরেকটা ছোটো ঘর যেখানে বিশুদা শুত, লাগোয়া বাথরুম তো ছিলই। ঘরখানা পেল্লায়, বুড়োদাদুর খাটটাও। ঘরে ড্রেসিং টেবিল আছে, আলমারি আছে, সবই পুরোনো দিনের আসবাবপত্র। এগুলোর কথাই বোধহয় ছোড়দাদু বলছিলেন।

অভি সারা দুপুর ওই ঘরে কাটাল। আলমারি সব খোলাই, সব ঘাঁটাঘাঁটি করে বেড়াল। বই আছে অনেক, বুড়োদাদুর বই পড়ার নেশা ছিল বোঝা যায়। গোয়েন্দা গল্পের বই আছে, হাসির গল্পের বই আছে, অনেক ক্লাসিক বই আছে, বাংলা, ইংরিজি – দুইই, কিন্তু ভূতপ্রেতের মানে ভূত নামানো বা ভূত বশ করা এসবের কোনো বই নেই। বুড়োদাদু গানও শুনতেন। একখানা চোঙওয়ালা পুরোনো গ্রামোফোন রাখা রয়েছে, সেটা অবশ্য এখন আর চলে না। সিডি প্লেয়ার, টিভি এসব তো আছেই। ঘরটা খুব সুন্দর। এত আলো- হাওয়া। জানলা দিয়ে তাকালে বাগান, কত গাছপালা। অনেককাল বাগানের যত্ন নেওয়া হয় না মনে হয়, ঝোপঝাড় হয়ে গেছে।

****

বিকেলে বিশু বেরোচ্ছিল, অভিও তার সঙ্গে গেল। বিশু বাজারে যাচ্ছিল, রাস্তাতেই পড়ল সরকারবাবুর বাড়ি। উনিও কোথাও বেরোচ্ছিলেন।

অভি ওনাকে দেখে বলল, “বিশুদা তুমি বাজারে যাও, আমি সরকারদাদুর সঙ্গে কথা বলি। তুমি তো মুরগি কিনতে যাচ্ছ, আমি ঠিক খুঁজে নেব।”

বিশু চলে গেল। অভি সরকারদাদুর কাছে গেল।

“কি, বিশুর সঙ্গে বেরিয়েছ?” উনি জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ, সারাদিন বাড়িতে থেকে থেকে আর ভূত ভূত শুনে শুনে বোর হয়ে যাচ্ছি।”

সরকারদাদু হেসে উঠলেন অভির কথা শুনে, বললেন, “তা তোমার কী মনে হয়? ভূত ওখানে আছে সত্যি?”

“খামোখা ভূত কেন থাকতে যাবে তাই তো বুঝতে পারছি না। হতে পারে ইচ্ছে করে রটানো হয়েছে যাতে আমরা বাড়িটা ভালো দামে বিক্রি করতে না পারি।”

“ভূতুড়ে বদনাম কিন্তু আজকের নয়। তখন তোমার মার দাদু বেঁচে।”

“কিন্তু ভূতটা দেখেছে কে? আর রটালোই বা কে?” অভি জিজ্ঞেস করল, বিশুর কাছে যা শুনেছে সেসব একদম চেপে যায়।

সরকারদাদু কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, “বিশু এমনিতে খুবই বিশ্বস্ত। কিন্তু ভূতের কথা ওর কাছেও লোকজন শুনেছে। আগে তো বিশুর এক কাকা থাকত তোমার বুড়োদাদুর কাছে। তারপর বিশু আছে।”

“ভূত থাকলে বুড়োদাদু থাকতেন কী করে? আপনার সঙ্গে তো বুড়োদাদু অনেক গল্প করতেন, ভূতের ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেন নি কখনো? আপনার কী মনে হয় ও বাড়িতে সত্যিই ভূত আছে?”

“আমাকে কেউ এই ব্যাপারে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করে নি। এই তুমি করলে বলে বলছি। যদি সত্যিই ও বাড়ি থাকার পক্ষে বিপজ্জনক হত তাহলে আমি তোমাদের থাকতে বলতাম না। আর যাই হোক ও বাড়িতে ভূত নেই। এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। মুশকিল কী জানো, লোকে বিশুদের কথাই বিশ্বাস করতে ভালোবাসে।”

"আমার তো অনেককাল বুড়োদাদুর সঙ্গে দেখাই হয় নি। সেই কোন ছোটোবেলায় একবার এসেছিলাম। ইদানীং তো উনি কোথাও যেতেন না, তাই আর দেখাও হয় নি। ওনার সঙ্গে কথা বলতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগত আপনার। এখানে এসে অবধি এত কিছু শুনছি যে কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে।"

সরকারদাদু বললেন, "তোমার বুড়োদাদুর মতো বুদ্ধিমান লোক আমি খুব কম দেখেছি। শেষ বয়স অবধি মাথা একেবারে ঠিক ছিল। ছেলেরা বিশেষ এখানে না আসায় একটা দুঃখ ছিল, বলতেন, 'এদের খালি জমির দাম, বাড়ির দামে উৎসাহ, অন্য কিছুতে নয়।' নানারকম কথাবার্তা হত আমার সঙ্গে। আমি বোঝাতাম, 'ছেলেদের ডেকে এবার সব বাড়ি, জমি – কোথায় কী আছে না আছে সব বুঝিয়ে দিন। আপনিও নিশ্চিন্ত।' তাতে বলতেন, 'আমি মরলে ব্যাটারা ঠিক আসবে। এসব দিকে নজর খুব। জানুক, নিজেরা চেষ্টা করে যা জানার জানুক। এসব তো ওদেরও। নিজেদের বাড়ি, ঘর, জায়গা নিজেরা বুঝবে।' এই ছিল ওনার বক্তব্য। নিজের মতো নিজে দিব্যি কাটিয়ে গেলেন এত বছর।"

"এদিকে সবাই ভূত ভূত করে কিন্তু চুরি তো একবার হয়েছিল, শ্যামসুন্দরের মূর্তি?"

"হ্যাঁ তা হয়েছিল। এ নিয়ে একবার কথা হয়েছিল ওনার সঙ্গে, বলেছিলেন, 'চোর চুরি করবে –এ আর আশ্চর্যের কী, চোরের কাজই চুরি করা। গৃহস্থকে সাবধান থাকতে হবে।' এর বেশি কিছু বলেন নি, এ নিয়ে আর কোনদিন কোনো কথাও হয় নি। তবে ও বাড়ির সব কিছুকে নেহাতই পুরোনো আবর্জনা ভাবাটা বোধহয় ঠিক হবে না। আর কিছু না হোক অনেক স্মৃতি বিজড়িত তো বটেই। ওই যে বিশু আসছে, তুমি তো এবার ফিরবে। আমিও একটু ঘুরে আসি। পরে আবার দেখা হবে।"

সরকারদাদু চলে গেলেন। অভিও বিশুর সঙ্গে বাড়িমুখো হল। মাথায় সরকারদাদুর কথাই ঘুরছে। আশ্চর্য ব্যাপার। একদিকে লোকের বিশ্বাস এটা ভূতুড়ে বাড়ি, অন্যদিকে সরকারদাদু জোর গলায় বলছেন যে ভূতের কোনো ব্যাপারই নেই। বরং ওঁর কথার মধ্যে যেন অন্য কিছুর ইঙ্গিত আছে মনে হল।

"বিশুদা, তোমার খুড়ো তোমাকে বলে গেছিলেন কোনো কথা বাইরে না বলতে আর তুমি ভূতের কথা রটিয়ে বেড়ালে?" অভি বলল।

বিশু একটু থমকাল, তারপর বলল, "কী বলছ তুমি! আমি এধারের কথা ওধার করি না। ধম্মে সইবে না। তবে মিছে কথা বলব নি, সে রাতে কত্তাবাবুর বিছানায় অমন একটা লোককে দেখে ভয় পেয়েছিলুম। সে কথাটা বলেছিলুম। তা কত্তাবাবুই তো বলতেন, 'বুঝলি বিশে, আমার পূর্বপুরুষেরা গোপনে অনেক তন্ত্রচর্চা করেছেন। আমিও একেবারে কিছু জানি না ভাবিস না। একলা বুড়ো পেয়ে কেউ কিছু করবে সে ভয় নেই। আমাকে পাহারা দেবার জন্যে আছেন তেনারা।' এরপর আর অবিশ্বেস করি কী করে। লোকে যে কানাকানি করে এ বাড়িতে ভূত আছে সে কথাও কত্তাবাবু জানতেন। তবে কত্তাবাবু সঙ্গে থাকলে ভয় ছিল না। কত্তাবাবু মানুষ ভালো ছিলেন। তেনারাও ছিলেন, তবে আমাকে জ্বালান নি। এই ভর সন্ধ্যেবেলায় মিছে কথা বলব নি। ওই এক রাতেই যা......... রাম রাম রাম........."

"মেজদাদু তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তান্ত্রিক ছিলেন বা বুড়োদাদু এসব চর্চাটর্চা করতেন?" বাড়ি ফিরেই অভি মেজদাদুকে এসব জিজ্ঞেস না করে পারল না।

মেজদাদু তো আকাশ থেকে পড়লেন, "তান্ত্রিক? তন্ত্রচর্চা? কস্মিনকালেও তো এসব শুনি নি বাবা! তুই কোথা থেকে শুনলি?"

"এই শুনলাম। বাজারে গিয়েছিলাম না? বুড়োদাদুই নাকি বলতেন........."

"কী বলতেন? উনি তান্ত্রিক? এসব স্রেফ রটনা। কার কাছে শুনলি তুই? ওই বিশে? সুযোগ পেয়ে তোর কাছে গপ্পো ফেঁদেছে। এসব উলটোপালটা কথা রটানো হচ্ছে। ইচ্ছে করেই, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি সব চাল। জলের দরে বাড়িটা বাগানোর মতলব। ভূতই কি যথেষ্ট ছিল না, আবার তন্ত্রচর্চা! আমাদের কথা শুনে বাবা যদি আগেই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন তাহলে আর এ অবস্থা হত না," মেজদাদু বেশ রাগ রাগ গলায় বললেন।

"লোকে এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছে জেনেও চুপচাপ বসে রইল। সাধে আমার মনে হত যে বাবার মাথার ঠিক নেই!" বললেন ছোড়দাদু।

"বুড়োদাদু তো রেলে চাকরি করতেন। সবসময় তো এখানে থাকতেন না। কে থাকত তাহলে এখানে? বাড়ি ফাঁকাই থাকত?" অভির প্রশ্ন আর শেষই হয় না।

"ফাঁকা কোনোকালেই থাকত না। আমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা থাকতেন। পুষ্যি ছিল গোটাকতক। তাছাড়া ছোটোকাকা ছিলেন যাকে বলে এক নম্বরের বাউণ্ডুলে। আজ এখানে তো কাল ওখানে। মধ্যপ্রদেশ না রাজস্থান কোথাকার এক এক রাজার এস্টেটে মাঝে চাকরি করতেন। বেশ কিছুকাল ওখানেই ছিলেন। বাবাও গেছেন। তারপর যখন কাজকর্ম সব ছেড়েছুড়ে এখানে থাকতে শুরু করলেন, বাবাও এখানে চলে এলেন। দু ভাই- এ ভাব ছিল খুব। ছোটোকাকা মারা গেছেন অনেক কাল। বাবার মতো দীর্ঘায়ু ছিল না ওনার," মেজদাদু বললেন।

"আচ্ছা মেজদাদু, এ বাড়িতে ওইসব পুরোনো খাট আলমারি ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে কি?" অভি জিজ্ঞেস করেই ফেলল, মাথায় সরকারদাদুর কথাটা ঘুরছে যে।

মেজদাদু অভিকে দেখলেন, তারপর বললেন, "তোর কী হয়েছে বল তো? এতক্ষণ তো এ বাড়ির ইতিহাস শুনলি, এখন আবার এ কী প্রশ্ন! কী ভাবছিস তুই? কিছু লুকোনো টুকোনো আছে? ওই যে কী যে্ন বেশ বলে, গুপ্তধন? পাগল ছেলে!" মেজদাদু হেসেই ফেললেন, "দেখছিস তো ভূতের চোটেই অস্থির হয়ে যাচ্ছি, তুই আর ডালপালা জুড়িস না। আগেকার দিনে কিছু পয়সাকড়ি থাকলেই লোকে এরকম একটা বড়ো বাড়ি ফেঁদে বসত। যৌথ পরিবার ছিল তো তখন, মেলা লোকজন। তাছাড়া শুনেছি জমিজমাও মন্দ ছিল না, তবে বিরাট জমিদারি কিছু নয়। গয়নাগাটি যা ছিল মা দিয়ে গেছেন, যাকে যা দেবার। টাকা পয়সা ব্যাঙ্কে। এছাড়া আর কিচ্ছু নেই। তুই আর রাতদিন ওই বিশেটার সঙ্গে লেগে থাকিস না। মাথায় আরো হাজার কথা ঢুকবে।"

অভি আর কিছু বলল না। বুঝল বলা বৃথা। রাতে তাই শোবার পর পরই যখন তপুমামা বিকট আওয়াজ করে নাক ডাকাতে লাগলেন, অভি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বাইরে এল। বাকি সবাইও ঘুমিয়ে পড়েছে। পুরো বাড়িটা নিস্তব্ধ, শুধু ওই নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়া। অভির কাছে টর্চ আছে, আসার সময় মা জোর করে দিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা এখন দিব্যি কাজে লাগছে। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে অভি সোজা গিয়ে উপস্থিত হল বুড়োদাদুর ঘরে।

দরজা খোলাই ছিল, অভি ঢুকে গিয়েই সেটা বন্ধ করে দিল। সুইচ বোর্ড কোথায় জানত, তাই চট করে আলোও জ্বালিয়ে ফেলল।

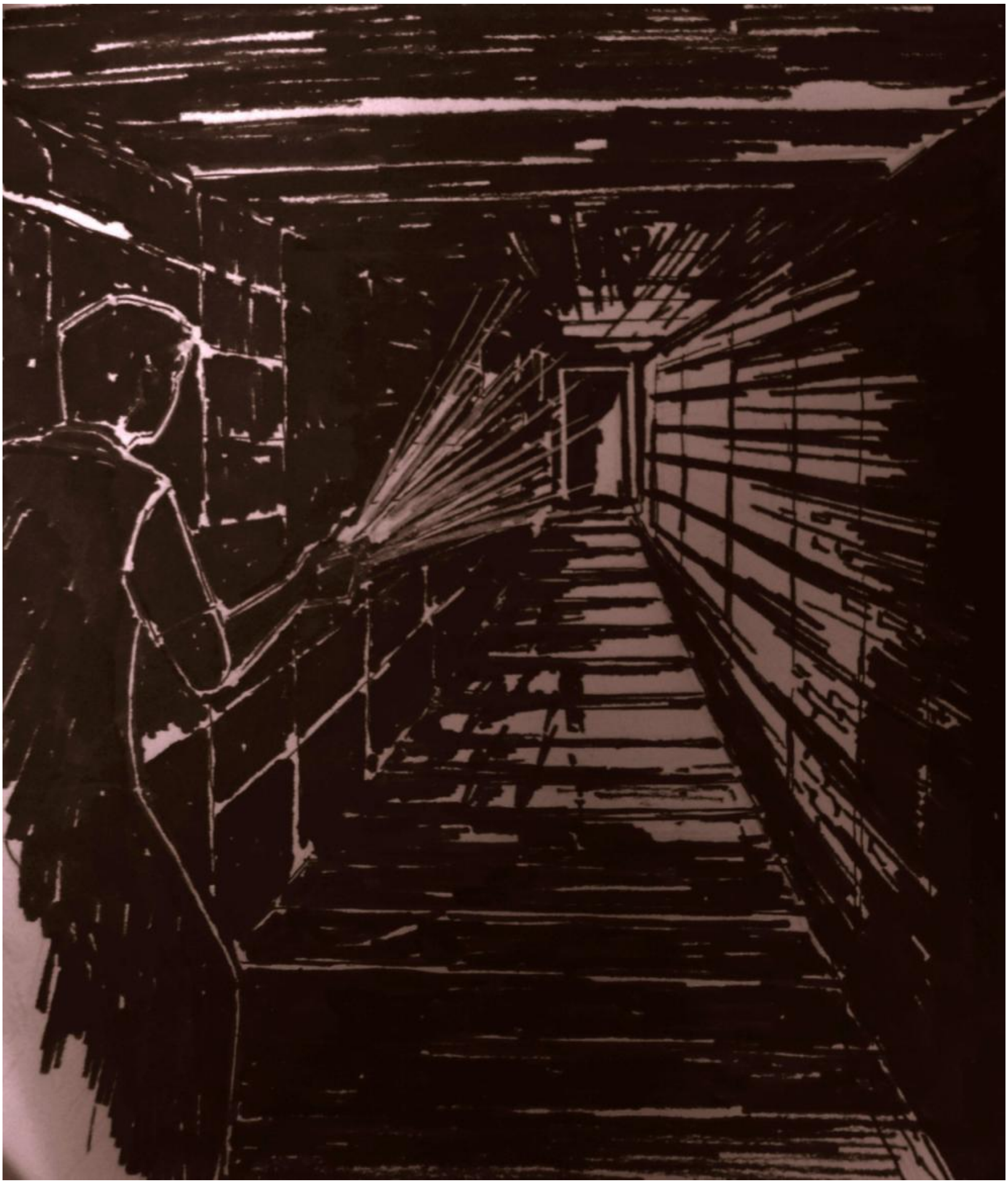

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। জানলায় সব বড়ো বড়ো ভারী ভারী পর্দা, কাজেই ঘরে যে আলো জ্বলছে সেটা বাইরে থেকে বোঝার সম্ভবনা কম। তাছাড়া দাদুরা আর মামারা গভীর ঘুমে মগ্ন। কে জানবে? আবার অভি সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াল, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল। কিন্তু কিছুই হল না, বরং পুরোনো বই- এর ধুলোয় বার দুই হাঁচল। ভাগ্যিস এ ঘরটা একতলায়, তাই কেউ শুনতে পেল না। খাটের তলা অবধি দেখতে ছাড়ল না। কোত্থাও কিচ্ছু নেই। অভির মনে হল মেজদাদুর কথাই ঠিক। কিছু থাকলে তো জানবেন ওনারাই। সরকারদাদুই ভুলভাল বলছেন। পুরোনো জিনিস, পুরোনোই। তাকে পুরোনো ভাবা হবে না তো কী ভাবা হবে! হয়তো বুড়োদাদুর মাথাটাই শেষ দিকে.........। যতই বিশুদা আর সরকারদাদু বলুন না কেন, অভিরও এখন তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভূতের ব্যাপারটা কী? শুধুই রটনা? বিশুদার সব কথাই বাজে? ঘরের দেওয়ালে বুড়োদাদুর একটা ফটো ঝুলছে।

রজনীগন্ধার মালাটা শুকিয়ে গেছে, পালটানো হয় নি। অভির মনে হল বুড়োদাদুর মুখটা বেশ হাসি হাসি, যেন মজা দেখছেন। অভি সেদিকেই তাকিয়েছিল, গাটা কীরকম যেন ছমছম করে উঠল। আলো নিভিয়ে ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

সবে দোতলার ঘরে ঢুকেছে তপুমামা ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “কী করছিস? বাইরে গেছিলিস কেন?”

অম্লানবদনে “বাথরুমে গেছিলাম” বলে অভি শুয়ে পড়ল।

তপুমামাও আবার ঘোঁররররর... ঘোঁ ... করে নাসিকাধ্বনি শুরু করলেন। এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে অভিও কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙল তখন বাইরে ঝলমলে রোদ্দুর। ঘড়ির কাঁটা আটটা ছুঁই ছুঁই করছে। উঠে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল অভি। মনে পড়ল কাল রাতে ও বুড়োদাদুর ঘরে গেছিল। ঘরটার কথাই ভাবছিল, হঠাৎ কী যেন মাথায় খেলে গেল। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে ও ছুটল হাত মুখ ধুতে। বুড়োদাদুর ঘরে যেতে হবে শিগগির, খুব দরকার। একটা জিনিস ভালো করে দেখতে হবে। কিন্তু সে ঘরে ঢোকার আগেই ছোড়দাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

“ঘুম ভেঙেছে অভিবাবুর? নে চটপট খেয়ে নে। জলখাবার রেডি। এদিকে আবার আসবাবপত্রগুলো দেখতে লোক আসবে। চল চল খেতে চল।”

বুড়োদাদুর ঘরে যাওয়া হল না, ছোড়দাদু একরকম জোর করেই খেতে নিয়ে গেলেন। আর খাওয়া শেষ হতে না হতেই কতগুলো লোক এসে গেল বুড়োদাদুর ঘরের জিনিসপত্র দেখতে। খাট, আলমারি – এইসব। যতক্ষণ ওরা আছে কিচ্ছু করা যাবে না। অভি ছটফট করে বেড়াতে লাগল। ইশ, কাল রাতে এ কথাটা কেন মনে এল না! অভি আবার বাগানে ঘুরঘুর করতে লাগল।

“এই যে তুমি আবার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছ। বাড়ির ভেতর দেখি তোমার মন টেঁকে না!” বিশু অভিকে দেখে বলল, “শোনো ওদিকে যেয়ো নি, ওদিকটা জঙ্গল হয়ে আছে। আর শোনো কত্তাবাবুর ঘরের ওই জানলার দিকেও যেয়ো নি বাপু। ওখেনে কত্তাবাবুর যুঁই ফুলের গাছ আছে আর একগাদা ফুলের টব আছে। কত্তাবাবুর খুব পছন্দের, কাউকে ধরতেও দিতেন নি। মিছে কথা বলব নি, কত্তাবাবুর আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তেনারাও আছেন, কিছু হলে তখন তো আমার ওপরেই সবাই পড়বে। আগে থেকে সাবধান করে দিলুম, পরে আবার বোলো নি যেন।”

বিশু চলে গেল, অভিও গেল বুড়োদাদুর ঘরের দিকটাতেই। জানলার ধারে যুঁই ফুলের গাছ। জানলার নীচে টিন দিয়ে একটা ছোটো শেড মতো করা। তার নীচে সত্যিই একগাদা টব। কয়েকটাতে তো ফুলগাছ টুলগাছ আছে বলেও তো মনে হল না, জংলা গাছ হয়ে আছে। জানলা খোলা এখন, পর্দা হাওয়ায় দুলছে। জানলার ধারে একটা ছোটো ফুটো দিয়ে টেলিফোনের তার, কেবলের তার ঢুকেছে। অভি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল লোকগুলো এখনও ঘরের ভেতর আছে। ধুস্, কখন যে যাবে এরা! বিরক্তিতে অভি তারগুলো ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে জানলার নীচ কী যেন নড়ার আওয়াজ হল। অভি অবাক হল, আবার নাড়াল তারগুলোকে, আবার কী নড়ল টবগুলোর পেছনে। অভি টবগুলোকে সরাল। বেশ ভারি ওগুলো। তাও কষ্ট করে সরাল আর সরাতেই যা দেখল তাতে চক্ষুস্থির! এটা এখানে কে রাখল? কেনই বা? তবে ...... তবে কী? অভির মনে হল অন্ধকার একটু একটু করে কাটছে। কেউ দেখে ফেলার আগেই অভি টবগুলোকে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

লোকগুলো ততক্ষণে বুড়োদাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদুদের সঙ্গে কথা বলছে, তপুমামা, রাজুমামাও রয়েছে। অভি দৌড়ল ঘরের দিকে। ঘরে বিশু! বিশু এখানে কী করছে?

"তুমি আবার এখেনে এলে! এইসব বইপত্তর এখেন থেকে বের করতে হবে। সব বিককিরি হবে যে। নাও সরো, আমাকে কাজ করতে দাও দিকিনি," বিশু বলল।

সর্বনাশ, বিশুদা এখন এখানে থাকবে! তাহলেই তো সব পণ্ড! অভি ভাবতে লাগল কী করে বিশুদাকে এখান থেকে সরান যায়।

"বিশুদা, এখানে অনেক ভালো ভালো বই আছে। আমাকে দেখতে দাও। আমি কতগুলো নিয়ে যাব বেছে বেছে। তুমি যাও, বইগুলো আমি দেখছি। বাছা হয়ে গেলেই আমি তোমাকে ডাকব।"

"হ্যাঁ আমি যাই আর তোমার দাদুরা আমাকে উস্তুম কুস্তম করুন! মিছে কথা বলব নি তোমার ওই মেজদাদুর মেজাজটা বেশ ইয়ে, বাপের মতো হননি। তুমি এখন যাও দিকিনি।"

"প্লিজ বিশুদা বইগুলো দেখতে দাও। কত ভালো ভালো বই! আমি তোমাকে এক্ষুণি ডাকব, দেখা হয়ে গেলেই। তুমি বরং দেখো মেজদাদু চা চাইছে কি না। আমি বই ঘাঁটছি আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ দেখলে মেজদাদু আরো রেগে যাবেন, তাই না? তুমি যাও, মেজদাদু কিছু বললে আমি বলব যে আমিই তোমাকে যেতে বলেছি," অভি শেষ চেষ্টা করল।

"দাদু এক বলে, নাতি আরেক বলে। মিছে কথা বলব নি এরা সব যেন………" বিশু গজগজ করতে করতে চলে গেল।

অভিও তার পেছন পেছন গিয়ে দরজাটা ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে এল। ঠিকই কিছু তো একটা আছে এ ঘরে। বুড়োদাদুর ঘর রঙ করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। সব দিকের দেওয়াল ঠিকঠাক রঙ করা শুধু একদিকের বাদে। কীরকম যেন বেখাপ্পা। দায়সারা করে রঙ করে হয়েছে, তাও যেন নেহাতই আনাড়ি হাতে। দেওয়ালে একখানা বড়ো ছবি ঝুলছে। বিরাট বড়ো তার ফ্রেমটা, মেঝে অবধি। সময় কম, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। ছবি ছেড়ে অভি জানলার কাছে গেল। তারগুলো বাইরে থেকে ঢুকে একটা বই- এর র‍্যাকের পেছন দিয়ে গেছে। কিন্তু অন্যপাশ দিয়ে যখন বেরিয়েছে একটা তার কম। গেল কোথায় সেটা? র‍্যাকের বই নামাতে লাগল অভি। হ্যাঁ আছে, র‍্যাকের পেছন দিয়ে তার ঢুকেছে যন্ত্রে। পেছনের দেওয়ালে প্লাগ পয়েন্টও আছে। র‍্যাক আর দেওয়ালের মধ্যে ফাঁক খুবই কম আর সামনে বই ভর্তি, দেখবে কে? একটা রহস্য তো ভেদ হল, কিন্তু এর প্রয়োজন কেন হয়েছিল? সেটা পরে ভাবলেও চলবে।

এই দেওয়ালটাই বা ঠিক করে রঙ করা হয়নি কেন? যেন মনে হয় কিছু একটা কারণ আছে। ভাবতে ভাবতে অভি ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল। ইশ কী ধুলো ছবিটায়! ছবিটাও তো নষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। অভি ফ্রেমটার দুপাশ ধরে নাড়ানাড়ি করল। আরে এটা তো বেশ হালকা, দেখে যে রকম ভারি মনে হয় সেরকম তো নয়! ছবিটাকে দেওয়ালের হুক থেকে খুলে নামিয়ে ফেলতে অভির একটুও অসুবিধে হল না। নামাতেই দেখল ছবির পেছনে দেওয়ালে একটা ছোটো দরজা। দেওয়ালের মতোই রঙ করা দরজাটা। তার মানে এই দরজা আড়াল করার জন্যেই ছবিটা রাখা হয়েছে। এরকম ব্যাপার গল্পে পড়েছে, সিনেমায় দেখেছে কিন্তু তাদের পুরোনো বাড়িতেই যে এ জিনিস আছে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল।

এই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? কিন্তু জানার বা দেখার উপায় নেই, দরজায় তালা দেওয়া। চাবি, চাবি কোথায় আছে? চাবির গোছা তো ছোড়দাদুর কাছে। অভির মন খারাপ হয়ে গেল। এখন মেজদাদু, ছোড়দাদু, তপুমামা, রাজুমামা – সব্বাইকে সব কিছু বলতে হবে, তারপর চাবি পাওয়া যাবে! কী আর করা। অভি ছবিটাকে আবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে বলে হাতে নিল। হুকে ঝোলাতেই যাবে এমন সময় কীসে যেন হাত ঠেকল। ছবিটার পেছনে কিছু একটা আছে মনে হল। ছবিটাকে উলটে ধরে ভালো করে দেখে বুঝল একটা ছোটো চাবি, কাগজের একটা খোপের মধ্যে রাখা। আনন্দে, উত্তেজনায় অভি প্রায় লাফিয়ে উঠল, খোঁচাখুঁচি করে চাবিটা বার করে নিতেও দেরি হল না। এই তালারই চাবি এটা। তালা খুলে দরজাটা একটু জোরে ঠেলতেই ক্যাঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল। কী অন্ধকার রে বাবা! ইশ টর্চটা তো আনে নি। কিন্তু টর্চ একটা যে কাল দুপুরে দেখেছিল এখানে। অভি দৌড়ে এসে দেরাজটা খুলল। হ্যাঁ এইতো একটা টর্চ রয়েছে। বুড়োদাদুর। সুইচ টিপে দেখল দিব্বি জ্বলছে। ব্যাস তাহলে আর চিন্তা কিসের? টর্চ জ্বালিয়ে অভি ছোট্ট দরজাটা দিয়ে গলে গেল।

দরজাটা থেকে বেরিয়েই ছোট্ট একটা ল্যান্ডিং আর তারপরেই সরু সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। গেছে কোথায় এ সিঁড়ি? সুড়ঙ্গ আছে বাড়ির বাইরে যাওয়ার? এরকম গোপন পথ আগেকার দিনে থাকত অনেক রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়িতে বিপদে আপদে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার জন্যে – অভি পড়েছে। নাকি এটা মাটির নীচের ঘর? উত্তেজনায় অভির আর কাউকে খবর দেওয়ার কথা মনেই রইল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যতে লাগল নীচে। সিঁড়ি যেখানে শেষ হল সেখানে আরেকটা দরজা। এটাতে তালা ছিল না, শুধু হুড়কো আটকানো। খুব শক্ত, বোধহয় অনেকদিন খোলা হয় নি। বেশ কসরত করে খুলতে হল অভিকে। ঘরের ভেতর বড়ো বড়ো ট্রাঙ্ক রয়েছে গোটাকতক, সব কটা তালা দেওয়া। এগুলোর চাবি অভির কাছে নেই, কাজেই এবার দাদুদের ডাকতেই হবে।

ওদিকে বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে, অভি কোথায় গেল! রাজুমামা বুড়োদাদুর ঘরের দরজাটা খুলে ‘অভি অভি’ করে ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। সামনে পুরোনো বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, অভি নেই। সারা বাড়ি খোঁজা হয়েছে, কোত্থাও নেই।

“আশ্চর্য! ছেলেটা গেল কোথায়? এই বিশে বাগানটা দেখ আরেকবার, সারাদিন তো বাগানেই ঘুরঘুর করে বেড়ায়। তপু ফোন কর,” মেজদাদু বললেন।

ফোন বেজে গেল, কেউ ধরল না। সবার চিন্তা আরো বাড়ল। বিশু বাগানে ঘুরে এসে বলল অভি সেখানেও নেই। আর ফোন? দেখা গেল সেটা দোতলার ঘরেই পড়ে আছে। সবাই যখন ভাবছে এবার কী করা হবে, অভি এসে হাজির।

“কী রে তুই ছিলিস কোথায়? আমরা সারা বাড়ি, বাগান খুঁজে খুঁজে হয়রান,” সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন।

“আমি তো বাড়িতেই ছিলাম, বুড়োদাদুর ঘরে,” বলল অভি।

“দাদুর ঘরে? আমি যে এত ডাকলাম শুনতে পাস নি? দেখতেও তো পেলাম না তোকে? কী করছিলিস ওখানে এত মন দিয়ে?” রাজুমামা তো অবাক।

অভি চুপ, মুখে চোখে উত্তেজনার ছাপ, আবিষ্কারের আনন্দ স্পষ্ট।

“মিছে কথা বলব নি, ও ঘরে তেনারা আছেন, কত্তাবাবুর আত্মা আছেন, ও ঘরে ওমন যখন তখন যাওয়া ঠিক নয়। রাম রাম রাম......” বিশু রামনাম জপতে শুরু করল।

“এই চুপ কর ব্যাটা, একদম চুপ!” মেজদাদু ধমকে উঠলেন, “আর একবার যদি ভূতের নামও করেছিস! যা এখান থেকে।”

বিশু রামনাম করতে করতেই দৌড়ল।

“ছোড়দাদু, পুরোনো বাড়ির সব চাবি তোমার কাছে আছে তো?” অভি জিজ্ঞেস করল।

“চাবি? হ্যাঁ এই তো চাবির গোছা আমার পকেটেই আছে, কিন্তু চাবি নিয়ে তুই কী করবি?” অবাক হয়ে ছোড়দাদু জানতে চাইলেন।

অভি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “এছাড়া আর কোনো চাবি পেয়েছ কি?”

“আরেকটা গোছা আছে কিন্তু সেগুলো কোন তালারই নয়। বোধহয় পুরোনো চাবি। কেন বলবি তো?”

“কোথায় সেই গোছাটা? শিগগির বলো?”

“আরে কী হয়েছে বলবি তো! চাবি ওপরের ঘরে আছে। খাটে, আমার বালিশের নীচে।”

অভি কোনো কথা না বলে দুদ্দাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। ওর আর তর সইছে না।

চাবি নিয়ে এসে অভি বলল, “তপুমামা বাইরের দরজা টরজা সব বন্ধ করে দাও। বিশুদাকে বলো আমরা বুড়োদাদুর ঘরে কাজ করছি, ওইসব আলমারি টালমারি খালি করছি, এখন যেন আমাদের বিরক্ত না করে। তোমরা এসো আমাদের সঙ্গে।”

কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না, তাও সবাই গেলেন অভির পেছন পেছন বুড়োদাদুর ঘরে। এবার অভি দরজা বন্ধই করে দিল। তারপর দেখাল সেই গোপন ছোটো দরজাটা। সবার তো চক্ষুস্থির!

“কী কাণ্ড! এর কথা তো আমরা জানতামই না!” বললেন মেজদাদু, “আমরা অবশ্য বাইরে বাইরেই থেকেছি, ছোটোবেলায় ছুটিছাটায় আসতাম, বাবা যখন এখানে থাকতে শুরু করলেন আমরা তখন সবাই কলকাতাতেই। কিন্তু তাও নিজের বাড়ি তো, এটাই জানতাম না। তা এই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?”

“এসো দেখাচ্ছি,” অভি বলল, “টর্চগুলো জ্বালো।”

অভি ওপর থেকে সবকটা টর্চই নিয়ে এসেছে চাবি নিয়ে আসার সময়।

সরু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সবাই সেই মাটির নীচের ঘরে ঢুকলেন।

“এইবার দেখতে হবে কোন চাবিতে এই ট্রাঙ্কের তালাগুলো খোলে,” অভি বলল।

তপুমামা লেগে গেলেন কাজে। একে একে সব ট্রাঙ্কই খুলল। প্রথম দুটোয় পুরোনো হয়ে যাওয়া অনেক বই পাওয়া গেল, ডায়রি, খাতাও রয়েছে কতগুলো।

মেজদাদু, ছোড়দাদু সব দেখেশুনে বললেন, “এগুলো তো ছোটোকাকার জিনিস মনে হচ্ছে। বাবা সব রেখে দিয়েছিল দেখছি ট্রাঙ্ক ভর্তি করে।”

“নাহ কাজের জিনিস কিছুই নেই। অভি তোর এত পরিশ্রম মাঠে মারা গেল!” বললেন ছোড়দাদু।

“দাঁড়াও, এই শেষ ট্রাঙ্কটাও দেখি, কী আছে এর ভেতর,” অভি বলল।

এই ট্রাঙ্কটাতে সব কাপড়ের পুঁটলি বাধাঁ জিনিস। ওপরেরটা ঠিক পুঁটলিও নয়, যেন কিছু মোড়ানো আছে, লম্বা মতো।

“খোল শিগিগির, রাজু, তপু, সাবধানে খোল এটা,” কিছু অনুমান করে উত্তেজনায় এবার মেজদাদুর গলাই কেঁপে যায়।

খোলা হল কাপড়ের মোড়ক। হ্যাঁ যা ভাবা গেছিল তাই, কষ্টিপাথরের শ্যামসুন্দরের মূর্তি। শুধু মূর্তি নয়, মূর্তির গয়নাগাটি আর কিছু বাসনকোসনও রাখা আছে পুঁটলি করে।

“শ্যামসুন্দরের মূর্তি তো চুরি হয়ে গেছিল, তাহলে এখানে এল কী করে?” রাজুমামা বললেন।

“চুরি হয় নি মনে হয়। বুড়োদাদুই মূর্তি, গয়নাগাটি সব কিছু এখানে সরিয়ে রেখেছিলেন, বোধহয় চুরি হয়ে যাবার ভয়ে। কারণ এই ঘরে আসার রাস্তা তো একটাই, বুড়োদাদুর ঘর থেকে। অন্য কারুর আসার কোন সম্ভবনা আছে বলে তো মনে হয় না,” অভি বলল।

“তুই দেখালি বটে অভি! এতো আমরা কেউ জানতেই পারতাম না। আর্দ্ধেক জিনিস তো আমরা নিতাম না, পড়ে থাকত। কে হয়তো এ ঘরের সন্ধান পেত, পেয়ে সব নিয়ে নিত। যাক এখন এসব ওপরে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে,” বললেন ছোড়দাদু।

“আশ্চর্য, বাবা এসব কিছু বলে গেল না! অভি যদি না দেখত কী হত!” মেজদাদু বললেন।

“আমাদের ওপর রাগে। বাড়ি বিক্রি করার কথা বললেই তো রেগে যেত, বলত, ‘বাড়িতে কী আছে জানল না, খালি বিক্রি করার ধান্দা!’ এখন এর মানে বুঝতে পারছি।”

তপুমামা, রাজুমামা, অভি মিলে জিনিসপত্র ওপরে তুলতে শুরু করল। বিশুকেও ডাকতে হল। এখন তো আর না জানিয়ে উপায় নেই।

বিশুর তো চক্ষু চড়কগাছ, খালি বলছে, “মিছে কথা বলব নি, এমন কাণ্ড বাপের জন্মে দেখি নি। খুড়োও কিছু বলে নি।”

সবকটা ট্রাঙ্ক ওঠানো হল বুড়োদাদুর ঘরে। নীচের ঘরে আর কিছু পড়ে রইল কীনা ভালো করে দেখা হল, তারপর তপুমামা ছোটো দরজাটাতে তালা লাগিয়ে আবার ছবিটা দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিল।

“তুই এই দরজাটা বার করলি কী করে অভি?” রাজুমামা জানতে চাইলেন।

“কাল রাতে তোমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি এসেছিলাম এখানে। কী যেন একটা অসঙ্গতি, বেমানান কিছু আছে এ ঘরে মনে হয়েছিল। তখন ধরতে পারি নি। আজ খেয়াল হল। সব দিকের দেওয়াল এত সুন্দর করে রঙ করা, কিন্তু এ দেওয়ালটা নয়। যাহোক তাহোক করে কাজ সারা হয়েছে, যেন রঙ ফুরিয়ে গেছিল। আর তো কিছু নেই এ দেওয়ালে, শুধু এই ছবিটা ছাড়া। এটা দেওয়াল থেকে নামাতেই দরজাটা বেরিয়ে পড়ল। আর দরজায় লাগানো তালার চাবিটাও ছবির পেছনে আটকান ছিল।”

“তাই বলি, কত্তাবাবু রঙের মিস্তিরিদের এই দেওয়াল রঙ করতে দেন নি কেন!” বিশু বলে উঠল, “কাজ পছন্দ হচ্ছে না বলে মিস্তিরিদের ভাগালেন। তারপর আমাকে বললেন, ‘এই বিশে, মই- এ ওঠ, রঙ কর।’ আমি যত বলি, ‘কত্তাবাবু, আমি পারব না ভালো করে

করতে,’ কত্তাবাবু ততই বলেন, ‘যা পারিস কর।’ শেষ অবধি আমিই দু পোঁচ লাগালুম। মিছে কথা বলবনি, তখনই আমার মনের ভেতর কেমন একটা সন্দ হয়েছিল।”

বিশু কথা বলায় ব্যস্ত, অন্য কেউও অত খেয়াল করছে না, অভি দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারল না। হঠাৎ নাকি সুরে কান্নার আওয়াজে সবাই চমকে উঠল।

বিশু ভয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, “রাম রাম..., দিনে দুপুরে পেতনি কাঁদছে গো! মিছে কথা বলব নি, কত্তাবাবুর আত্মা রুষ্ট হয়েছেন। রাম রাম রাম ......”

অভি তো হেসেই গড়িয়ে পড়ল, “এই তোমার পেতনির কান্না বিশুদা? ঠিক আছে আমি এক্ষুণি বলছু পেতনিকে কান্না থামাতে।”

অভি জানলার পাশে র‍্যাকের কাছে গিয়ে বলল, “পেতনি আর কেঁদো না, চুপ করো,” পেতনি চুপ করে গেল।

“এই অভি এসব কী করছিস?” ছোড়দাদু বললেন।

“আরে বাগানে ছোট্ট একটা স্পিকার রাখা আছে টবের আড়ালে। এই দেখো তার ঢুকেছে, এই দেখো তার গেছে বই- এর র‍্যাকে। আর র‍্যাকে বই- এর আড়ালে ছোট্ট রেকর্ড প্লেয়ার। এটা অন করলেই পেতনি কাঁদে আর অফ করলেই চুপ করে যায়, বুঝলে?”

“মানে?” মেজদাদু তখনও যেন বুঝতে পারছেন না।

“মানে ভূত ফূত সব বাজে কথা। যা মনে হচ্ছে এসব বুড়োদাদুই করেছিলেন কাউকে ভূতের ভয় দেখানোর জন্যে।”

“কিন্তু কেন? বাবার এসব করার দরকার কী ছিল?”

বিশু অবশ্য এখনও এসব বিশ্বাস করতে নারাজ, “আর সেই লোকটা? যে মুখ হাঁ করে কত্তাবাবুর খাটে শুয়েছিল? সে কে? মিছে কথা বলব নি, কত্তাবাবু ঘরে ছিলেন নি।”

“লোকটা? এত কিছু যখন পাওয়া গেছে তখন লোকটার খোঁজও পাওয়া যাবে,” অভি বেশ কনফিডেন্ট, “মেজদাদু, বুড়োদাদুর সব আলমারি টালমারি ভালো করে দেখা হয়েছে?”

“না সব হয়নি। ওপর ওপর দেখেছি দরকারি জিনিসপত্রের জন্যে। ওটা? ওটাতে তো বাবার জামাকাপড় আছে। এই বিশে তুই আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ‘মিছে কথা বলবনি’ না করে যা, খেতে দে, পেট খিদেয় চুঁই চুঁই করছে। কটা বাজে খেয়াল আছে?”

বিশু চলে গেল। সবাই ট্রাঙ্কের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেজদাদু ফোন করেই সবাইকে খবর দিলেন। ট্রাঙ্কে বেশিরভাগই মেজদাদুদের ছোটোকাকার ব্যবহৃত জিনিসপত্র। বই, খাতাপত্রও আছে।

“বই খাতাগুলো আমাকে না দেখিয়ে যেন ফেলো না মেজদাদু, আমি দেখব কী আছে,” অভি আলমারির জামাকাপড় ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল।

“না বাবা তোকে না দেখিয়ে কিচ্ছু ফেলা হবে না, কিচ্ছু করা হবে না, তুই নিশ্চিন্ত থাক,” মেজদাদু হাসলেন, “চল এবার খেতে চল, অনেক কাজ আছে এর পরে।”

সবাই চলে গেল, অভিও মুচকি হেসে সঙ্গে সঙ্গে চলল। একটু পরেই রান্নাঘরের দিক থেকে আঁ আঁ...... করে বিশুর বিকট চেঁচানি আর অভির উচ্চৈঃস্বরে হাসি শোনা গেল। তপুমামা, রাজুমামা দৌড়লেন, আবার কী করল অভিটা! গিয়ে দেখলেন অভি একটা মুখোশ নয়ে বিশুকে ভয় দেখিয়েছে। বিশু ঠ্যাং ছড়িয়ে মাটিতে বসে আছে আর বলছে, “আর একটুকুন হলেই আমার পেরাণটা বেরিয়ে যাচ্ছিল! মিছে কথা বলব নি, তুমি খুব ইয়ে!”

“এই মুখোশটাই রাতে বিছানায় রেখে বুড়োদাদু সিঁড়ি দিয়ে মাটির নীচের ঘরে গেছিলেন। দরজা খুলতে আওয়াজ হতে পারে, তুমি উঠে আসতে পারো, তাই এটাকে বিছানায় এমনভাবে রেখে গেছিলেন যাতে মনে হয় কেউ শুয়ে আছে আর তাই দেখে তুমি ভয়ে আর না ঢোকো। বুঝলে বিশুদা? মুখোশটা আলমারিতেই ছিল।”

“কিন্তু বিশু দরজাটা দেখতে পায় নি কেন?” রাজুমামা বললেন।

“দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলে বোঝা শক্ত। তাছাড়া ঘরে তো আলো খুব কম ছিল আর ভয়, ভয়ে কোনো কিছু খেয়াল করেছে নাকি!” অভি তখনও হাসছে।

“যাও যাও খেতে বোসো দিকিনি। এরকম করে কোনো মনিষ্যিকে ভয় দেখায়!” বিশু রেগেই আছে।

খেতে খেতেও এইসব কথাই হচ্ছিল।

“তোর কীসে স্ট্রাইক করল অভি? তুই বারবার দাদুর ঘরে যেতিসই বা কেন?” তপুমামা জানতে চাইলেন।

“সরকারদাদুর কথায়,” অভি বলল, “সরকারদাদুর কথায় আমার প্রথম মনে হয় যে এর মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে। উনি তোমাদের অত করে এখানে থাকতে বলছিলেন আর আমাকে তো পরিষ্কার বলেছিলেন যে ভূত টূত কিচ্ছু নেই। উলটে আরো হিন্টস দিয়েছিলেন যে এ বাড়ির সব কিছুই হাবিজাবি জিনিস নয়।”

“তোর সঙ্গে আবার এত কথা কখন হল ওনার?” ছোড়দাদু অবাক।

“কাল বিকেলে বেরিয়েছিলাম না বিশুদার সঙ্গে? বাজার যেতে গিয়ে সরকারদাদুর সঙ্গে দেখা হল। বিশুদা বাজারে গেল, আমি ততক্ষণ ওনার সঙ্গে কথা বললাম।”

“ওহ! এসব করেছ, অথচ আমাদের কিছুই জানাও নি!” মেজদাদু বললেন।

“এমনি এমনি বললে তোমরা বিশ্বাস করতে? আমি তাই শিওর হতে চাইছিলাম।”

সরকারদাদুকে খবর পাঠানো হয়েছিল, তিনি এলেন সন্ধের দিকে। সব শুনে বললেন, “কিছুটা আমি আন্দাজ করেছিলাম। বিশুর কাকা মারা যাতে আপনাদের বাবা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, ‘অনেক কাজ করত নেপালটা, সেসব বোধহয় আর কাউকে দিয়ে করাতে পারব না। অত বিশ্বাসী কি আর কেউ হবে?’ আমি একবার ওনাকে বলেছিলাম, ‘একা থাকেন, দামি কোনো কিছু রাখবেন না। একবার তো চুরি হল, কিছু ব্যবস্থা করুন এবার।’ উত্তরে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘যদ্দিন এই গগনচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে বেঁচে আছে তদ্দিন এ বাড়ির একটা জিনিস এদিক থেকে ওদিক হবে না।’ আরো অনেক কথাবার্তা তো হত, শুনে আমার মনে হত এ বাড়িতে মূল্যবান কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তবে শ্যামসুন্দরের মূর্তির ব্যাপার আন্দাজ করতে পারি নি। নিজেই লুকিয়ে রেখেছিলেন চোরের হাত থেকে বাঁচাতে! উনি একবার বলেছিলেন বটে, ‘চোরের কাজ চুরি করা, গৃহস্থের কাজ সাবধান হওয়া।’ এইরকমভাবে সাবধান হয়েছিলেন! হতে পারে চুরির চেষ্টা হুয়েছিল। তখন হচ্ছিলও মূর্তিচুরি। আশেপাশের দু একটা পুরোনো মন্দির থেকে হয়েছিল। খবরের কাগজে তখন বেরিয়েওছিল মূর্তিচুরির খবর।”

“আর ভূতের ব্যাপারটা?” অভি জিজ্ঞেস করল, “আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন যে এখানে ভূত নেই। তার মানে আপনি জানতেন? ওই পেতনির কান্নাটান্না সব ক্যাসেটে বাজে? সব সাজানো?”

সরকারদাদু হাসলেন, বললেন, “হ্যাঁ আমি জানতাম। ওই কীর্তিটা মানে বই-এর র‍্যাকে লুকিয়ে রেকর্ড প্লেয়ার রাখা, বাইরে সেইরকমই লুকিয়ে সাউণ্ড বক্স ফিট করা – এসব আমরাই করেছি। প্ল্যানটা গগনবাবুর, একদিন বললেন, ‘বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বানিয়ে দিলে কেমন হয়?’ আমি প্রথমে মজা ভেবেছিলাম, তারপর দেখি যে না উনি বেশ সিরিয়াস! ওই কান্নার ক্যাসেট আমিই দিয়েছিলাম। আমার কাছে ওরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নানানা আওয়াজের ক্যাসেট, সিডি আছে। আমার শখ বলতে পারেন।”

“এত কিছু করেছেন কিন্তু আমাদের কখনও জানান নি, কিছু বলেন নি,” মেজদাদুর গলায় অভিমান।

সরকারদাদু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, “এসব ব্যাপারে আমার কথা বলা উচিত নয় তাও বলছি। অভিমান ওনারও ছিল। আপনারা বিশেষ আসতেন না বলে। আমি অনেকবার বলেছি আপনাদের কাছে চলে যেতে, বলতেন, ‘না না ছেলেদের ওই খুপরিতে কে যাবে? দুদিন রাখার পর একজন বলবে, এবার কদিন ওর কাছে থাকো। তারপর সেখান থেকে আরেকজনের কাছে। না না ওসব আমার পোষাবে না। যতদিন আছি এখানেই থাকব।’ ওনার মনোভাব বুঝে আমিও আর কিছু বলি।

তবে অভি একটা কাজের কাজ করেছে। বুদ্ধিমান ছেলে, বুড়োদাদুর মতো মাথা!”

এটা অবশ্য সবাই একবাক্যে মানছেন। অভি না এলে যে কী হত!

অভি এদিকে সারা সন্ধে পুরোনো বইখাতা নিয়েই বসে আছে, রাতেও ঘুমোল না। ঘুমোল অবশ্য কেউই না ওই রাতে। একে তো এইসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা, তার ওপর বাড়িতে এত দামি দামি জিনিস। সবাই একরকম জেগেই রইল।

পরদিন একটু বেলা হতে না হতেই পুরো বাড়ি সরগরম। অভির আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে সবাই এসে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সবাই মাটির নীচের ঘর দেখতে যাচ্ছে। অভির কিন্তু এসব দিকে কোনো খেয়াল, ও ওইসব পুরোনো বইখাতা নিয়েই পড়ে আছে। দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে যখন সবাই গল্প করছে, অভি এল সেখানে, হাতে একটা ছোট্ট জিনিস।

বলল, “এইটা পেলাম। বই খাতার ডাঁই-এর মধ্যে থেকে বেরোল। একটা ছোটো গনেশ, একটা বাক্সে ছিল।”

সবাই দেখলেন সেটা। একেবারেই ছোটো, বড়োজোর দেড় কী দুই ইঞ্চি। পেতলের তৈরি।

“এটা তুইই নে। এত বুদ্ধি তোর, এটা তোরই প্রাপ্য,” বললেন মেজদাদু।

“আমি কিন্তু ওর মধ্যে থেকে কিছু বই আর বুড়োদাদুর ভাই-এর ডাইরিগুলো নেব,” অভি বলল।

“নিয়ে যাস, নিয়ে যাস, কেউ বারণ করবে না,” ছোড়দাদু হেসে বললেন।

“কী সর্বনাশ অভি! তুই ওই একগাদা পুরোনো বইপত্তর ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবি!” অভির মা বললেন।

কিন্তু ওঁর আপত্তি ধোপে টিকল না। সবাই এখন অভির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

চুপচাপ বসে থাকা অভির ধাতে নেই। ও গণেশটা নিয়ে খুটখুট করেই যাচ্ছে। হঠাৎ বলল, “আরে এর ভেতর তো কিছু আছে মনে হচ্ছে! হ্যাঁ এই দেখো, কী নড়ছে দেখো,” অভি গণেশটা পাশে বসা বাবার হাতে দেয়।

উনি ওটা কানের কাছে এনে নাড়িয়ে বললেন, “হ্যাঁ ঠিকই, কিছু নড়ছে ভেতরে।”

গণেশ একে একে সবার হাতে হাতে ঘুরল। সবাই একমত যে ভেতরে কিছু আছে। কিন্তু খোলা হবে কী করে? আবার অভির দ্বারস্থ সবাই।

“দেখ বাবা তুই কী করে খুলবি।”

কিছুক্ষণের চেষ্টার পর সফল হল অভি। গণেশের মূর্তির পেছন দিকে একটা ছোটো স্লাইডিং ঢাকনা। সেটা খুলতেই কালো রঙের মেহগনি কাঠের টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট জিনিস। ঘরের টিউবের আলোতেও সেগুলো বেশ ঝলকাচ্ছিল।

“হিরে!” ঘরে একটা অস্ফূট গুঞ্জন উঠল

অভি একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “বুড়োদাদুর ছোটো ভাই মধ্যপ্রদেশে এক রাজার এস্টেটে কাজ করতেন। অনেক কিছুই করতেন, অড জব ম্যান বলতে পারো। একবার রাজার এক আত্মীয়র বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন ডাকাত পড়ে। ওনার উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসের জোরেই ডাকাতরা ধরা পড়ে। রাজা খুশি হয়ে ওনাকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন। এগুলো সেই সময়েই পাওয়া।”

“তুই এত কথা জানলি কী করে?” অভির বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

“ওনার ডায়রিতে লেখা আছে এক জায়গায় দেখলাম, কী কী উপহার পেয়েছিলেন।”

“এগুলো তুলে রাখুন। এরকম ছড়িয়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়,” অভির বাবা হিরেগুলো তুলে নিয়ে মেজদাদুর হাতে দিলেন।

“এখন কথা হচ্ছে এগুলোর কী হবে,” বললেন মেজদাদু, “আমি গণেশটা অভিকে দিয়েছি। তার মানে গণেশের পেটের ভেতর থাকা হিরেও অভিরই প্রাপ্য। ও যদি নিতে চায় তো ও নিক, আমাদের কেউ আপত্তি করবে না।”

অভির মা বাবা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ছোড়দাদু থামিয়ে দিলেন, “না তোমরা কিচ্ছু বলবে না। অভির যা ইচ্ছে তাই হবে।”

অভি একবার বাবা মার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, “না এগুলো আমি নেব না। এগুলোর কী হবে সে তোমরা ঠিক করো। আমি শুধু বইখাতা, ডায়রিগুলো নেব। ওগুলো আমার।”

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সবাই অভিকে দেখলেন। ইচ্ছে করলে ও সবকটা হিরেই নিতে পারত। সবার সামনে নাও বলতে পারত যে গণেশটার ভেতরে কিছু আছে, কেউ কিছু জানতেই পারত না। অভির অবশ্য এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ও গণেশটা নিয়ে ওপরে উঠে গেছে। আবার ওই পুরোনো খাতাগুলো খুলে বসেছে। ডায়রিতে তো সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জি আছে কিন্তু খাতাগুলোতে বুড়োদাদুর ছোটো ভাই- এর প্রবাস জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। মনে হয় এগুলো উনি পরে লিখেছিলেন। কত কিছু যে করেছিলেন উনি! তাছাড়া যে কাজের পুরস্কার হিরে হতে পারে সে কাজের রোমহর্ষক বিবরণ না পড়ে শেষ করা অবধি শান্তি আছে নাকি!

বৈঠকখানায় যখন সবাই বাড়ি, জমি ইত্যাদির দরদস্তুর, হিসেবনিকেশে ব্যস্ত অভি তখন মগ্ন পুরোনো খাতার পাতায়। হলুদ পাতায় খুদে খুদে অক্ষরগুলো ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বহু বছর আগেকার সেই দিনগুলোতে। অভি পড়ে চলে, পড়েই চলে।

ছবিঃ শিমুল

শীতের নাটক

স্বার্থপর দৈত্য

(The Selfish Giant: Oscar Wilde) বঙ্গানুবাদ ও নাট্যরূপ - অনুপম চক্রবর্তী

(স্টেজে পাঁচ-ছয়জন বাচ্চাদের খেলতে দেখা যাবে। বাগান, ফুলগাছ আর এক কোণে দু: একটি বড়ো গাছ দেখা যাচ্ছে। আর একদিকে উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। পর্দার পেছন থেকে শোনা যাবে)

"অনেক দিন আগের কথা...এক জায়গায় থাকতো এক দুরন্ত বাচ্চার দল। তারা সব্বাই স্কুল :এ যেত, পড়াশোনা করত আর স্কুল থেকে ফিরে বিকেলবেলায় ভিড় করতো ওদের সব্বার প্রিয় খেলার জায়গায় ।"

১মঃ আমাদের এই খেলার জায়গাটা হ'ল একটা মস্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বড়ো বাগান।

২য়ঃ সেই পাঁচিলের একটা কোণে আছে একটা অনেক বড় ফাটল। রোজ বিকেলবেলায় আমরা সব্বাই মিলে সেই ফাটল দিয়ে গলে এই বাগানে ঢুকে পরি...আর তারপর ?

৩য়ঃ আর তারপর শুরু হয় আমাদের অনেক রকম খেলা... চোরপুলিশ, আব্বুলিশ, কানামাছি ভোঁ:ভোঁ, কিৎ :কিৎ ...আরও কতরকম খেলা। সেই সব খেলতে খেলতে কোথা দিয়ে যে বিকেল গড়িয়ে যায় আমরা বুঝতেই পারি না !!

১মঃ এই বাগানটা মস্ত বড়ো। নরম ঘাস দিয়ে ঢাকা। আর এই ঘাসের মধ্যেই ফুটে আছে কত রংবেরঙের ফুল ! ঠিক যেন আকাশে ফুটে থাকা তারার মত!!

৩য়ঃ আর ঐ কোণে দেখ - বারোটা বড় বড় আমগাছ !! ওখানে বসন্তকাল থেকেই কত মুকুল ধরে থাকে......

৪র্থঃ আর গরমকালে? ঐ গাছগুলোতে পাকা পাকা মিষ্টি আম হয়, আর আমরা পেড়ে পেড়ে খাই !!
১মঃ আর গাছগুলোতে থাকে অনেক রকম পাখি। তারা এমন মিষ্টি গান করে...যেই শোনে মুগ্ধ হয়ে যায়।
২য়ঃ যা বলেছিস। আমরাও তো কতবার খেলতে খেলতে থমকে দাঁড়িয়ে পাখিদের গান শুনেছি...।
(সবাই মিলে:) "আহা, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে "......

কিন্তু ওদের এই আনন্দ বেশিদিন রইলো না। এই যে এত সুন্দর বাগান, সেটা আসলে ছিল একটা দৈত্যের বাগানবাড়ি। সেই দৈত্য ৭ বছর আগে তার এক বন্ধুর সাথে দেখা করবে বলে, লম্বা লম্বা পা ফেলে কোথায় যেন গিয়েছিলো। এতদিন বাদে তার সাধ হোল ফিরে আসতে। তখন সেই দৈত্য তার ঝোলাঝুলি নিয়ে আবার তার লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই অনেকদুরের দেশ থেকে ফিরে এলো তার নিজের বাগানবাড়িতে !!

(দৈত্যর প্রবেশ)
১মঃ হ্যাঁরে, ওটা কী রে? এদিকে আসছে?
৪র্থঃ উরিবাবা !! এতো রাক্ষস টাক্ষস মনে হচ্ছে রে ?
২য়ঃ বাবারে !! চল পালাই ?
৩য়ঃ মা !! আমাকে বাঁচাও !!
দৈত্যঃ অ্যাই, তোরা কে রে? আমার বাগানে তোরা কী করছিস? দেখিস নি আমার বাগানের পাঁচিলের গায়ে কি লেখা আছে? লেখা আছে -"বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ !!"
৩য়ঃ আমি বাড়ি যাবো।
৪র্থঃ আমাদের যেতে দাও ।
দৈত্যঃ ঠিক আছে। আজ তোদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এর পর যদি কোনও দিন ঢুকিস, আমি তোদের গায়ের চামড়া খুলে নুন মাখিয়ে শুকোতে দিয়ে দেবো।
ছেলেমেয়েরাঃ পালা পালা পালা......
দৈত্যঃ হা হা হা, জেনে রাখিস, এই বাগান আমার। শুধুই আমার। আমি ছাড়া আর কারুর এই বাগানে ঢোকার অধিকার নেই। এই দেখ, আমার বাগানের পাঁচিল:এ কি লেখা আছে...।লেখা আছে "অনধিকার প্রবেশ নিষেধ"

(স্টেজের আলো নিভে যাবে, তারপর হলুদ আলো জ্বলবে,...পরের দিন......)

৫মঃ আমরা কোথায় খেলবো রে?
৪র্থঃ হ্যাঁরে... আমাদের তো কোথাও খেলার জায়গা নেই...।
২য়ঃ এবার আমাদের রাস্তার ওপরেই খেলতে হবে...।
৩য়ঃ ওখানে খালি নুড়ি পাথর...

১মঃ আর গাড়ি চলে, ধোঁয়া আর ধুলোয় ভর্তি
২য়ঃ আমার একদম ভালো লাগছে না !!
৫মঃ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বাগানে খেলতে কী মজাটাই না হত রে !!!
১মঃ ঐ দৈত্য টা খুব স্বার্থপর, খুব দুষ্টু !!
(সব্বাই মিলেঃ) দুষ্টু , দুষ্টু , পচা, স্বার্থপর !!

(বসন্তর প্রবেশ)
বসন্তঃ আমি বসন্ত, আমি সারা পৃথিবীতে নিয়ে আসি নতুন প্রাণের ছোঁয়া। আমার আসার খবর পেয়েই পুরনো শুকনো পাতারা সব ঝরে যায়, আর ফুটে ওঠে নতুন সবুজ পাতা।

কিন্তু, এ কী !! এই বাগানের পাঁচিলে লেখা দেখছি.. "অনধিকার প্রবেশ নিষেধ" !!!

নিশ্চয়ই এ সেই স্বার্থপর দৈত্যর বাগান...তাই বুঝি পাঁচিল গুলো এত্ত উঁচু !! আমি তবে কেমন করে যাব ভেতরে ? থাক তবে, ফিরেই যাই !!
(শীতের প্রবেশ)
শীতঃ হা হা হাঃ !! ভাগ্যিস, আমি আগেই ঢুকে পড়েছিলাম এই বাগানে !...আজ বসন্ত ফিরে গেল...। তার মানে এখন আমিই থাকব এই বাগানে...হাড় কাঁপানি শীতের হাওয়া দেবো... গাছেরা সব শুকিয়ে যাবে। পাখিদের বাসায় হিম পড়বে... সক্কাল বেলা থেকে পাখিদের ঐ কিচির -মিচির ...সব সব বন্ধ হয়ে যাবে !!
দৈত্যঃ সব দিক জুড়ে আজ বসন্ত। শুধু আমার বাগানেই আজও বসন্ত:র দেখা নেই? আজও শীতের হাড় কাঁপানো হাওয়া আর বরফ পড়ে চলেছে ...
আমার বাগানে বসন্ত আসতে এতো দেরি কেন? পাখিদের গান শুনতে পাইনা কেন? গাছে গাছে ফুল ফোটা গেছে থেমে...বলি ব্যাপারটা কী?
শীতঃ কেন দৈত্য ? তুমিই তো বলতে...শীত হল তোমার প্রিয় ঋতু ? হাওয়ার এই শিরশিরানি , ঐ যে গাছের নিচে, বাড়ির মাথায় বরফ জমেছে ...এই তো তোমার প্রিয়?
দৈত্যঃ প্রিয়, প্রিয়,...কিন্তু বরফ পড়ে পড়ে যে আমার বাড়ির ছাত ভেঙে যায় , বরফ জমে জমে আমার বাগানের ঘাস মরে যায় !!...আমার বাগান ভরা ফুল...তারা সব শীতের শুকনো হাওয়ায় শুকিয়ে মরে গেছে...... আমার বাগানে আর পাখি ডাকে না...! একী ভয়ানক নির্জনতা !! আমার বাগানে কি আর কখনও বসন্ত আসবে না?
বুঝেছি, বুঝেছি ...এসব আমার:ই পাপের ফল। আমিই একদিন আমার বাগানে হাসিখুশি বাচ্চাদের ঢুকতে বারণ করেছিলাম। আজ তাই এ বাগানের সব খুশি আর আনন্দ বন্ধ হয়ে গেছে।.........আমি কী বোকা !! আমি কী স্বার্থপর !!
শীতঃ আমি তো আছি...
দৈত্যঃ চলে যাও ...চলে যাও, শীত । আসতে দাও বসন্তকে, ... ঝরে যাক শুকনো পাতা। সরে যাক বরফের ঢাকা ......আবার সূর্যের আলো পড়ুক আমার বাগানে।
স্টেজের আলো নিভে যায় ।

আবার আলো জ্বলে । দৈত্য শুয়ে আছে......বাইরে বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ......... দৈত্যর ঘুম ভাঙে.....)

দৈত্যঃ ওই তো, ওই তো বাচ্চারা এসেছে।

(দৈত্য দুচোখ কচলে বাগানে আসে। বাগানে বাচ্চারা খেলা করছে)

১মঃ আজ অনেকদিন পড়ে এই বাগানে ঢুকলাম

৪থঃ ভাগ্যিস, পাঁচিলের গায়ে ফাটলটা ছিল...

২য়ঃ কিন্তু, সেই দৈত্যটা আবার আসবে নাতো রে?

৫মঃ নারে নাঃ, দেখছিস না? এতো বরফ জমে আছে ? ঐ বাড়িটার মাথায় তো বরফের পাহাড় হয়ে গেছে ...দৈত্যটা নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় জমে মরেই গেছে।

(দৈত্য:র প্রবেশ............বাচ্চাদের আর্তনাদ)

দৈত্যঃ ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। আজ থেকে তোমরা সবাই এই বাগানে যতখুশি খেলতে পারবে। আমি কিচ্ছু বলব না !!

২য়ঃ তুমি আমাদের মারবে না ?

দৈত্যঃ না না, একদম না।

৩য়ঃ আমাদের চামড়া ছিঁড়ে নেবে না?

দৈত্যঃ ছি ছি, কক্ষনো না ।

১মঃ তুমি আমাদের ধরে রাখবে না?

দৈত্যঃ একদম না। তোমরা খেল। আমি তোমাদের খেলা দেখব।

৩য়ঃ কী মজা !!

সব্বাইঃ কী মজা! হুররে !!!

(সব বাচ্চারা হাত ধরে গোল করে ঘুরতে থাকে, দৈত্য বসে থাকে। এক কোণে একটি বাচ্চা একটা গাছে উঠতে চেষ্টা করছে...কিন্তু পারছে না ...)

দৈত্য: আরে খোকা , তুমি গাছে চড়বে ?
৫মঃ হ্যাঁ , আমি গাছে উঠতে চাই।
দৈত্য: নিশ্চয়, দেখেছ, গাছটাও তোমাকে কোলে নেবে বলে ওর ডাল নিচে ঝুঁকিয়ে রেখেছে! এসো, আমি তোমাকে গাছে চড়িয়ে দিই।
৫মঃ আমি পড়ে যাব না?
দৈত্য: কিচ্ছু ভয় নেই। এই তো আমি ধরে আছি।

(বাচ্চাটাকে দৈত্য গাছে উঠিয়ে দেয়। বাচ্চাটি খিল খিল করে হাসতে থাকে)

দৈত্য: সত্যি, আমি কী বোকা ছিলাম !...আমি কি স্বার্থপর......আমার বাগানে পাঁচিল তুলে, বাচ্চাদের আসতে বারণ করে কী পাপটাই না করেছি !! আজ আমি আমার এই পাঁচিল ভেঙে দেব।
(দৈত্য দৌড়ে গিয়ে একটা কুড়ুল নিয়ে এসে পাঁচিল ভাঙতে শুরু করে)

দৈত্য: আজ থেকে এই বাগান তোমাদের...তোমরা রোজ এখানে এসে খেলা করবে......... কেউ তোমাদের বকবে না ।

(বাচ্চারা খুশিতে হাততালি দেয়)

৪র্থঃ কী মজা, কী মজা
২য়ঃ আমাদের খেলার বাগান ফিরে পেলাম
৩য়ঃ আমাদের আর রাস্তায় খেলতে হবে না ।
১মঃ হ্যাঁ, রাস্তায় ভীষণ ধুলো। আমাদের একটুও ভালো লাগত না ।
দৈত্য: আজ সন্ধে হতে চলল। তোমরা সবাই বাড়ি যাও। কাল সবাই মিলে আবার খেলতে এস।
(সবাই দৈত্যকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে যায়। শুধু ৫ম বালককে দেখতে পাওয়া যায় না)
দৈত্য: ও কই, যাকে আমি গাছে তুলে দিয়েছিলাম?
৩য়ঃ ও তো কখন গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে গেছে।
দৈত্য: ঠিক আছে। ওকেও বোলো কিন্তু, কাল যেন আবার আসে।

(স্টেজের আলো নিভে আবার জ্বলে। দেখা যায় বাচ্চারা খেলা করছে। দৈত্য বসে বসে ওদের খেলা দেখছে, মাঝে মাঝে খেলায় যোগও দিচ্ছে । বাগানে আর বরফ নেই। অনেক ফুল ফুটেছে আবার। পাখিদের গান শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ ।)

এরপর থেকে রোজই বিকেলবেলায় বাচ্চারা বাগানে ভিড় জমাত আর দৈত্য ওদের সাথে খেলায় মেতে উঠত। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পার হয়ে গেলো। দৈত্য এখন বুড়ো হয়েছে। একদিন দৈত্য শুয়ে শুয়ে পাখিদের গান শুনছে, এমন সময়—

(স্টেজের আলো কমে যাবে। বাচ্চারা নেই...কিন্তু পাখিদের আওয়াজ আছে...দৈত্য মাটিতে শুয়ে... দেবশিশু রূপে ৫ম বালকের প্রবেশ......পরনে নীল -সাদা কাপড়, মাথায় মুকুট, হাতে বাঁশি ।)

দৈত্য: কে তুমি?

দেবশিশুঃ চিনতে পারছোনা আমাকে? একদিন আমাকে আদর করে কোলে তুলে তুমি গাছে চড়িয়ে দিয়েছিলে ?

দৈত্য: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমি রোজ খুঁজতাম তোমাকে, সব বাচ্চারা আসতো ...কই তুমি তো আর এলে না ?

দেবশিশুঃ এই তো আমি এসেছি । তোমাকে নিয়ে যেতে...

দৈত্য: কোথায় ? কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে ?

দেবশিশুঃ তোমাকে নিয়ে যাবো স্বর্গের বাগানে । তুমি বাচ্চাদের নিজের বাগানে খেলতে দিয়েছ। আমাকে আদর করে গাছে উঠতে সাহায্য করেছ।.আজ তাই আমি তোমাকে আমার বাগানে নিয়ে যাব।

দৈত্য: কেমন সে বাগান ? সেখানে এতো হাসি আর খুশি আছে ?

দেবশিশুঃ আছেই তো। সেখানে আছে অপার শান্তি। সেখানে কোনও কষ্ট নেই, কোনও হিংসে নেই, কোনও ঘেন্না নেই, ভয় নেই। কেউ কাউকে মারে না। বকে না। সবাই সবাইকে ভালবাসে।

দৈত্য: তবে চলো , আমাকে নিয়ে চলো সেইখানে......

*(দৈত্য উঠে দেবশিশুর হাত ধরে। তারপর দুজনে ধীরে ধীরে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যায়।
আলো নিভে যায়, ও আবার জ্বলে ওঠে। বাচ্চাদের প্রবেশ)*

২য়ঃ আজ দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছিনা ?

৩য়ঃ দৈত্য, দৈত্য, তুমি কোথায় ?

৪র্থঃ ওই দেখ। ওখানে কত সাদা ফুল পড়ে আছে ?

১মঃ নিশ্চয়ই দৈত্য চলে গেছে। আর আমাদের জন্যে ফুল জমিয়ে রেখে গেছে ।

২য়ঃ ঠিক, ঠিক।

১মঃ দৈত্য, তুমি খুব ভালো। যেখানেই থেকো, খুব ভালো থেকো।

সব বাচ্চারাঃ খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো।

যবনিকা নেমে আসে

কাশীতে

শিবশংকর ভট্টাচার্য

“এই শুনছো? ঘুমিয়ে পড়লে? এই-” গৌরী ঠেলছেন শান্তিকে। কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল শান্তির।

“কী বলছ?”

“কী কান্ড, দরজা জানলা বন্ধ না করেই শুয়ে পড়েছ!”

ধড়মড় করে উঠে বসলেন শান্তি। উঠেই থতমত খেয়ে গেলেন। মাঘমাসের কড়া শীতের রাত। দরজা জানলা সব হাট করে খোলা! কিন্তু তিনি তো একরকম ভুল করেন না! রোজ সব বন্ধ করেই তো তিনি শুতে আসেন। যাক হয়তো ভুলেই গেছেন। উঠে সব খিল-ছিটকিনি এঁটে সদর দরজায় তালা দিয়ে এসে শুয়ে পড়লেন শান্তিজীবন। দূরে কোথাও পেটাঘড়িতে ঘন্টা পড়ল ঢং। রাত একটা।

শান্তিজীবন কাশীতে বদলি হয়ে এসেছেন বেশ কিছুদিন হল। বড়ো দায়িত্ব নিয়ে সরকারী অফিস সামলাতে হয়। থাকবার জন্য যে বাড়িটা পেয়েছেন তাকে রাজবাড়ি বললে ভুল হবে না। কাশীর মত প্রাচীন আর বনেদি শহরেও এরকম বিশাল বাগানওয়ালা বাড়ি বেশি নেই।

কলকাতা থেকে কাশীতে বেড়াতে এলেন শান্তিজীবনের বড়দিদি বীণাপাণি আর তাঁর ছেলে শ্যামল। বাড়িটা বড় ভালো লেগে গেল তাঁদের। শ্যামলের ছবি আঁকার হাত আছে। বাড়িটার কয়েকটা ছবি এঁকে ফেললেন। ছবিতে প্রাণ দেবার জন্য কিছু মানুষও আঁকলেন। রাতে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখলেন দোতালার সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসছে আনেক লোকজন। বাড়িতে যেন কারো বিয়ে হচ্ছে। ঘুম ভেঙে যাবার পরেও যেন লোকজনের ব্যস্ত চলাফেরার শব্দ পেলেন শ্যামল। রাতের ঘুম চলে গেল তাঁর।

বীণাপাণীরও মনে হল কারা যেন তাঁর দিকে নজর রাখছে সবসময়। বাগানে গিয়েও শান্তি নেই। কে যেন পিছু পিছু হাঁটছে। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। ভাইকে বাড়ি বদল করতে বলে কলকাতায় ফিরে গেলেন বীণাপাণী।

শহরে মাঝখানে পনেরো কুড়ি বিঘে জমির মাঝ বরাবর বাড়ি। দু’মানুষ উঁচু দেউড়ি থেকে চওড়া নুড়িবিছানো রাস্তা চলে গেছে বাড়ি অবধি। দোতলা বাড়ি এখনকার মাপে ছ’তলা সমান উঁচু। দশ-বারোটা চওড়া সিঁড়ি ভেঙে একতলার ঘর। পথের দুপাশে ফুলের বাগান, লেবু আর পেয়ারাবাগান। বাড়ির পেছনে তরিতরকারির বাগান আর বিশাল মিষ্টি জলের ইঁদারা। তিন-চারজন মালি বাগানে দেবার জল তোলে পুরোন কাঠের লাটাখাম্বা ধরে ঘুরে ঘুরে সুর করে গান গাইতে গাইতে। মাঝে মাঝে ময়ূররা এসে বসে থাকে ছাদের ওপর। পায়রার দল সকাল-বিকেল উঠোনে নেমে আসে দানা খেতে। তাদের বকমবকম ছাড়া সারাদিন কোথাও কোন শব্দ নেই।

কাশীর শীত বড় তেজি! কিন্তু রোদ পোহাবার জন্য ছাদে যাবার উপায় নেই। দোতলার লোহার দরজায় বড়ো বড়ো তালা ঝুলছে! অতবড়ো বাড়ির ওপরতলায় কেউ থাকে না। বাড়ির মালিদের কাছে খবর পাওয়া গেল আগে মালিক জমিদারবাবু থাকতেন, এখন তিনি অন্য জায়গায় থাকেন। ম্যানেজার বা নায়েববাবু মাসে মাসে ভাড়া নিয়ে যান। কেন থাকেন না জিজ্ঞেস করলে কোন জবাব পাওয়া যায় না।

কী জানি কেন শান্তিজীবনের মনে একটু খটকা লেগেই রইল। বিশেষ করে সে রাতের ঘটনার পরে। গুন্ডা বদমাশদের ব্যাপারে কাশী শহরের বেশ বদনাম আছে। যতবড়ো পাঁচিলওয়ালা বাড়িই হোক, রাত্তিরে দরজা বন্ধ রাখার একটা রেয়াজ আছে। শান্তি কিছুতেই মানতে পারেন না সেদিন তাঁর ভুল হয়ে গেছিল। তবে আজকাল ডায়েরি লেখার আগে দরজা জানলা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেন, ডায়েরিতে সে কথা লেখাও থাকে।

দিন কতক বাদে আবার গৌরী ব্যস্ত হাতের ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল শান্তির! ভয়ে গৌরীর কথা বলার ক্ষমতা নেই। আবার দরজা জানলা হাট করে খোলা। আর চাঁদের ঝাপসা আলোয় দেখা গেল ঘরের মধ্যে দুটো বড়ো বড়ো কুকুর! ভয় পাবার কথা হল এ রকম কুকুর কাশীর শ্মশানঘাটে দেখতে পাওয়া যায়, যারা আধপোড়া মরা মানুষের মাংস খায় বলে শোনা যায়! তখন গরিব মানুষেরা অনেক মৃতদেহের মুখাগ্নি

করে গঙ্গার ধারেই ফেলে রেখে যেত।

হাতের কাছেই বেডসুইচ ছিল। আলো জ্বলে উঠবার পর কুকুরটুকুর দেখা গেল না। শান্তি ডায়েরি দেখালেন গৌরীকে। দরজা বন্ধ করার কথা স্পষ্ট লেখা আছে। বাকি রাত জেগেই কাটল দুজনের।

কয়েকদিন বাদে আবার এক মেরুদন্ড হিম করে দেবার মতো ঘটনা! সেদিন ভরা অমাবস্যা। মাঝরাতে শান্তির ঘুম নিজের থেকেই ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে বেশ কিছুক্ষন অনুভব করলেন পালঙ্ক ঘিরে কিছু মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনছেন শান্তি। কারো পায়ে পরা নুপুরের শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। গৌরীরও ঘুম ভেঙেছে! ভয়ে ভয়ে বেডসুইচ টিপলেন শান্তি। ঘরে কেউ নেই! দরজা জানালা হাঁ করে খোলা।

সকালে উঠেই পুলিশে খবর দিয়ে রাখলেন শান্তি। অবশ্য এ ব্যাপার তারা কী করতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল তাঁর। পুলিশ অভয় দিলেও তাদের আচরণে মনে হলো যেন কিছু গোপন করতে চায় তারা। সহকর্মীরা সকলেই বাড়ি বদলের পরামর্শ দিলেন। প্রতিবেশীদের সাথে তেমন যোগাযোগ না থাকলেও কেউ কেউ সেধে এসে বলে গেলেন অন্য বাড়ি দেখে নিতে।

শান্তি উঠেপড়ে বাড়ি খোঁজ করতে লেগে গেলেন। সে সময় কাশীতে ভালো বাড়ি খালি পাওয়া বেশ কঠিন ছিল।

কোনও কারণে বেশ কিছুদিন আর কোনও ঘটনা না ঘটায় বাড়ি ছাড়ার তাগিদাটা কমে গেল। কেউ কেউ বললেন ভাল বাড়িটা হাত করবার জন্য বদলোকেরা কোনও রকমে ভয় দেখাতে চায়। বাড়ি ছাড়ার দরকার নেই তাড়াহুড়ো করে। হয়তো জানালা দরজায় কোন গোলমাল আছে। নিজের থেকেই খুলে যায়।

বাড়ির ছোটোদের সাথে মাঝে মাঝে জমিদারের নাতি খেলতে আসত। অন্য বাড়ি থেকে চাকরেরা নিয়ে আসত তাকে। বছর সাত কি আট বয়স তার। বাইরের বাগানে খেলাধুলো করে বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরে যেত ছেলেটা। ভুলেও বাড়ির ভেতর আসতে চাইতো না। কে এক বীরুমালা নাকি ভয় দেখাবে। বন্ধুরা যখন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করত ও বাড়িতে বীরুমালা বলে কেউ থাকেনা। ও আঙুল দিয়ে ছাদের দিকে দেখাত- ওইতো!

ছোটোদের কথার গুরুত্ব চিরকালই কম দেয়া হয়। তবে তারা মাঝেমাঝেই নানান খবর দিতে আরম্ভ করল। বাড়িটা নাকি জ্যান্ত। দোতলার জানালাগুলো চোখ পিটপিট করে। পেয়ারা আর লেবু কে যেন আগে পাড়িয়ে কুড়িয়ে এনে দেয় বাগানে গেলেই। এ খবর যার মুখে শোনা গেল তার বয়েস তখন সবে তিন পেরিয়েছে। মাঝ থেকে ছোটোদের বাগানে যাওয়া বন্ধ হল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বলতে যা বোঝায় তাই ঘটল এবার। সপ্তাহদুয়েক কোনও রকম অসুবিধে না হওয়ায় নিশ্চিন্ত সকলে। ঠাকুরমা নাতিনাতনীদের গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়াচ্ছেন। শান্তি দরজা- জানালা বন্ধ করে ডায়েরি লেখা শেষ করেছেন। হঠাৎ দোতলার ওপর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ তাঁর কানে এল! ধুপ ধুপ শব্দ। যেন কেউ

ভারী পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দোতলায় তো কেউ থাকে না! ওপরে যাবার সিঁড়ির ভারী লোহার গেট তালাবন্ধ থাকে, শান্তিজীবনের কাছে তার চাবি!

শব্দের জোর বাড়ছে একটু একটু করে। কখনও হামানদিস্তায় মশলা বাটার শব্দ। খাট্ পালংক টানাটানি। কাচ ভাঙার শব্দ। সব মিলিয়ে ভয়ংকর অবস্থা! তবে কি পাইপ বেয়ে কেউ ছাতে উঠে গেল? যদি উঠেও থাকে তবে সে সবাইকে জানান দিতে চায় কেন? ফোন গেল থানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক গাড়ি বন্ধুকধারী পুলিশ নিয়ে ইন্সপেকটর বাড়ি ঘিরে ফেললেন।

রাতের অন্ধকারে বাড়িটা যেন কোন নাম না জানা প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের মতো খাপ পেতে রয়েছে। কাছে গেলেই গিলে খাবে। সারাবাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শব্দের কোনও কিনারা করা গেলনা। দোতলার মর্চে ধরে যাওয়া তালা খুলে সার্চলাইটের আলো ফেলে দেখা হল। মেঝেতে বছরের পর বছর জমে থাকা ধুলোর ওপর কোন পায়ের ছাপ পড়েনি কারও। খাট পালংক যথাস্থানেই আছে। কাচ ভাঙার বা অন্য কিছু ভাঙচূরের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। পুলিশ বা আর কাউকে শব্দের ব্যাপারটা বিশ্বাস করানোই মুশকিল হলো।

পরদিন অবশ্য পুলিশের সামনেই শুরু হলো শব্দের তান্ডব, ঠিক একই সময়ে! স্থানীয় পত্রিকার এক উৎসাহী সাংবাদিক খবর পেয়ে হাজির ছিলেন। ভূতুড়ে তাণ্ডবের খবর ছড়িয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে!

তান্ডব চাললো অনেকদিন ধরে একটানা। শুরু হত প্রতিদিন ঠিক রাত দশটায়। দর্শক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হাজার ছাড়ালো। অনেকেই দূর দেহাত থেকে আসায় সারারাত থেকে যেতেন। দুমাস ধরে সমস্ত পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে লাগলো এই ঘটনা, কিন্তু কেউ কোনও কিনারা করতে পারল না। অতিথিদের চা খাওয়াবার খরচ সারা মাসের খরচের থেকেও বেশি হতে লাগল। পুলিশের ক্ষমতার বাইরে চলে গেল এই মেলার মতো ভিড় সামলানো!

ইরান থেকে কোন এক সৈয়দ ধর্মগুরু চিঠি পাঠালেন শান্তিজীবনের নামে। তাতে তিনি তিনটি অতৃপ্ত আত্মার কথা লেখেন। তারা ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের। তিনি মন্ত্রবলে জানতে পেরে একটি মন্ত্রপূত কবচ পাঠাচ্ছেন, শান্তি যেন ধারণ করেন। ডাকবিভাগ অবশ্য খাম খুলে কবচটি বার করে নিয়েছিল আগেই।

কাশীর দু তিনজন পান্ডা একদিন শান্তিজীবনের কাছে এলেন। এ বাড়িতে বছরচারেক আগেও নাকি ভূতের উৎপাত হয়েছিল, জমিদারবাবু যজ্ঞ করবার পড়ে গোলমাল থেমে যায়। তাঁদের মতে আবার যজ্ঞ করা দরকার। তা না হলে বাড়ির লোকেদের অমঙ্গল হতে পারে। শান্তি তাঁদের যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। কারণ গত কয়েকমাসে বাড়ির ছোটোদের শরীর একেবারেই ভালো চলছিল না। ডাক্তারি পরীক্ষায় কোন কারণ না পেলেও ক্রমাগত পেটের অসুখ আর জ্বর্ লেগেই ছিল।

অগত্যা ধুমধাম করে যজ্ঞ করবার পর হঠাৎ সেই শব্দের তান্ডব একদিন থেমে গেল। যজ্ঞের আগুনে নানারকম নোংরা আবর্জনা যে কোথা থেকে এসে পড়ছিল কেউ

বলতে পারে না! পান্ডারা বললেন আগেরবারের যজ্ঞে আগুন থেকে নাকি মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধ পাওয়া গেছিল।

****

অফিস থেকে খোঁজ করে অবশেষে নতুন বাড়ি পেয়ে গেলেন শান্তিজীবন। কাশীর ঐ বাড়িটি ছেড়ে চলে আসার পরে পুলিশের পুরো খাতা থেকে জানা গেল এক ভয়ংকর ইতিহাস!

বাড়িটির মালিক এক বাঙালি বনেদি জমিদার। বিপত্নীক জমিদারের তিন মেয়ে থাকত দোতলায়। তিনি নিজে একতলায় থাকতেন। কিছু চাটুকার বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝেই জমিদার রাতে বাড়িতে থাকতেন না। নায়েবের ছেলেকে বিশ্বাস করে মেয়েদের দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে। বড়ো মেয়ে বিয়ে হয়ে যাবার পরেও এ বাড়িতেই থাকতো, মাঝে মাঝে জামাই এসে থেকে যেত। জমিদারের বড় মেয়ের ছেলে হবার পর এক রাতের ঘটনায় সব ওলটপালট হয়ে গেল।

শীতের মতো কাশীর গরমকালও বিখ্যাত। গৃহস্থদের ছাতে শোবার রেওয়াজ। ছমাসের ছেলেকে নিয়ে তিন বোন ছাদে ঘুমিয়ে আছে। রাইফেল হাতে নায়েবের ছেলে আছে পাহারায়। এমন সময় হঠাৎ ছোটো মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়। নায়েবের ছেলে গুলিভরা রাইফেলের নল বড় মেয়েটির কপালে ঠেকিয়ে চাপা গলায় তর্জন করছে। বিপদ বুঝে ছোটো শিশুটিকে কোলে নিয়ে ছোটো মেয়েটি ছাদের একটি বাথরুমে লুকিয়ে পড়ে। তারপর সেখান থেকে পরপর তিনটি গুলির শব্দ কানে আসে তার। নায়েবের ছেলে বড় মেজো দুই বোনকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনার কারণ কী কেউ বলতে পারে না। টাকা দিয়ে পুলিশের মুখও বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে ও বাড়িতে কারও থাকা হয়নি।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

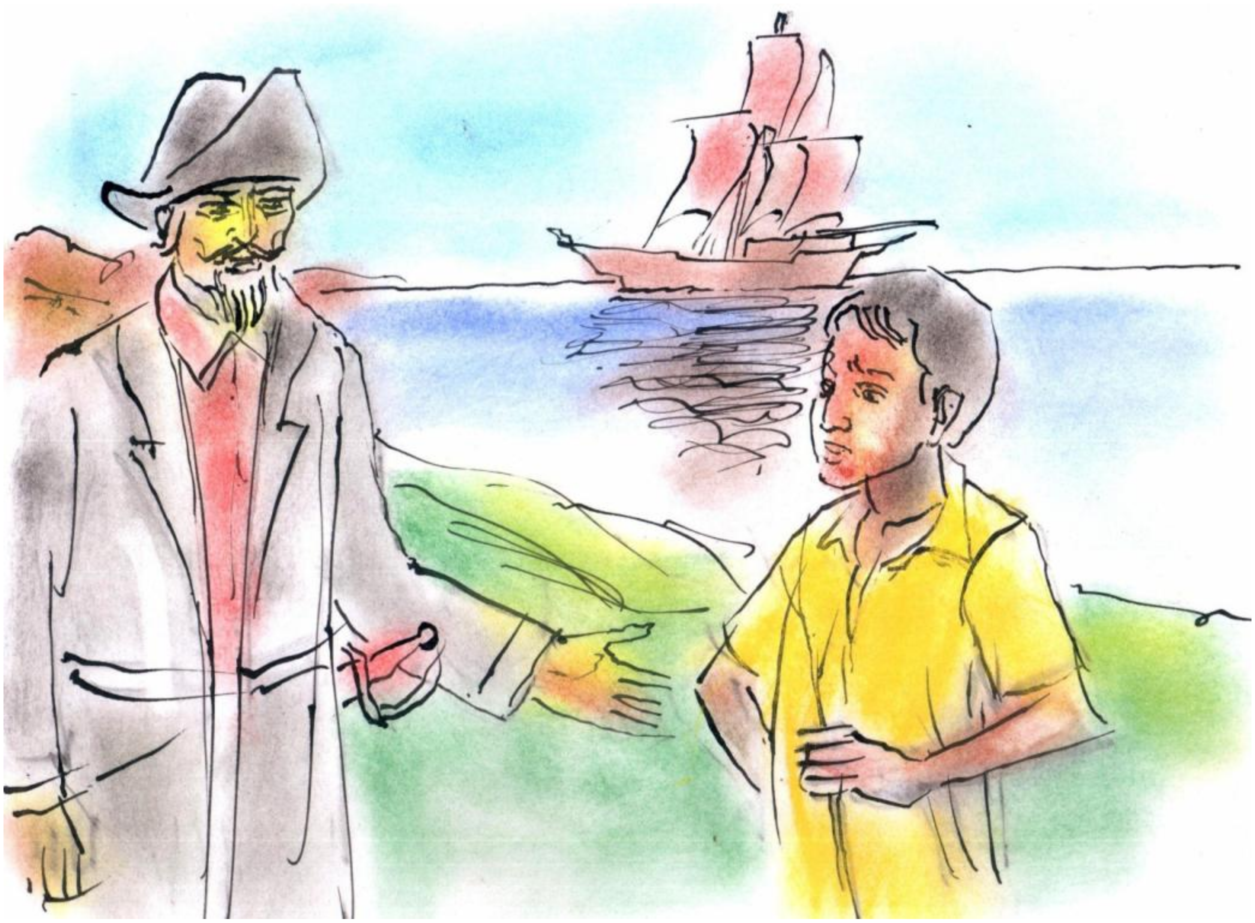

পতিত ও ম্যানুয়েল পেড্রো

শিশির বিশ্বাস

উঁচু একটা কাঁচা রাস্তা নদীর ধার বরাবর চলে গেছে পাকা সড়কের দিকে। পুরোনো কেল্লার কাছে পরিত্যক্ত লাইটহাউসের পাশ দিয়ে খালের দিকে আর একটা উঁচু রাস্তা। দু'য়ের মাঝে খানিকটা নিচু জমি। ভরা জোয়ারের সময় নদীর জল একটা কাটা নালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ভিতরে। সেই সাথে মাছ। জোয়ার শেষে ভাটা শুরু হলে পুবপাড়ার ছিদাম মন্ডলের ছেলে পতিত নালার মুখে জাল লাগানো কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ভাটায় জল নেমে গেলে আটকে পড়া মাছগুলো নিয়ে ছুটতে হয় বাজারে মহাজনের আড়তে।

রাস্তার ঢালে খেজুর গাছের পাশে ছোট এক খড়ের চালা। পতিতের আস্তানা। মাছ পড়ুক না-ই পড়ুক, সারাদিন পাহারা দিতে হয়। দিন-রাত মিলিয়ে দুটো জোয়ার।

কেজিটাক মাছও আজকাল ধরা পড়ে না। কাজটা আগে ছিদাম মন্ডলই দেখাশোনা করত। কিন্তু ওই সামান্য আয়ে সংসার চলে না। ছিদাম তাই ন'গাছিতে মাটি কাটার কাজে গেছে। অগত্যা স্কুল ছাড়তে হয়েছে পতিতকে। বারো বছরের ছেলে পতিত কাজটা ভালই রপ্ত করেছে। কখন জোয়ার-ভাটা শুরু হবে, এখন আর ওকে জলের টান দেখে বুঝতে হয় না। আকাশে সূর্য দেখেই বলে দিতে পারে। রাত্তিরে তারা। আসলে সব ব্যাপারই বেশ চটপট ধরে নিতে পারত। স্কুলে যখন যেত, ক্লাসেই পড়ানো বিষয়গুলো চটপট ধরে নিতে পারত। ক্লাস ফোর পর্যন্ত উঠেওছিল।

এই যে পুরোনো কেল্লা, লাইটহাউস, এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই ও বলে দিতে পারে। সেবার বেশ মজা হয়েছিল। পিকনিকের মরসুম। জনাকয়েক যুবক ঘুরতে-ঘুরতে চলে এসেছিল এদিকে। কেল্লার পিছনে ধানক্ষেতের ধারে পড়ে থাকা মস্ত লোহার বস্তুটা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। জিনিসটা কী, অনেক ভেবেও কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। গায়ের লেবেলটাও পড়া যাচ্ছে না। হরফগুলো ইংরেজির মতো, কিন্তু ইংরেজি নয়। অনেক ভেবেচিন্তে একজন মত প্রকাশ করল, এটা লোহার থাম জাতীয় কিছু।

পতিত একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল। হঠাৎ বলে ফেলল, "ওটা কামান দাদাবাবু।"

গোটা দলটাই প্রায় চমকে উঠে ওর দিকে তাকিয়েছিল। কয়েকজোড়া চোখে অবিশ্বাসের ছাপ।

"কামান! তুই কী করে জানলি?"

একটুও ঘাবড়ায়নি পতিত। তবে পুরো জবাবটা দেয়নি। দেয়নি ইচ্ছে করেই। শুধু বলেছিল, "এটা যে কেল্লা দাদাবাবু। কেল্লায় কামান থাকবে না?"

একমাথা রুক্ষ চুল, খালি গা, ময়লা ইজের পরা ছেলেটার কথায় কৌতুকের খোরাক পেয়ে এবার হেসে উঠেছিল সবাই। অবশ্য কয়েকজন একেবারে উড়িয়ে দেয়নি। মত প্রকাশ করেছিল, জিনিসটা কামান হলেও হতে পারে। তবে কামানের এমন ঢাউস আকার সাধারনত হয় না। তাই বিশ্বাস করা শক্ত।"

কেন যে শক্ত, সেটা বুঝে উঠতে পারেনি পতিত। অবশ্য কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল সেখান থেকে। এই কামানগুলো বসানো থাকত কেল্লার মাথার উপর নদীর দিকে মুখ করে। পুরো নদীটা ছিল তার পাল্লার মধ্যে। শত্রুপক্ষের কোনও জাহাজ যে নদীর ওপার ঘেঁষে পালিয়ে যাবে, সে উপায় ছিল না। কেল্লা থেকে কামান দেগে ডুবিয়ে দেওয়া যেত। মোহনার কাছে প্রায় সমুদ্রের মতো চওড়া নদী। তিন-চারশো বছর আগে নিশ্চয় আরও চওড়া ছিল। বড়ো আকারের কামান না হলে চলবে কেন? তাছাড়া ওই কামানগুলো তো আর এদেশে তৈরি হয়নি! জাহাজে করে নিয়ে আসা হয়েছিল সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের দেশ থেকে।

এসব ছাড়া আরও অনেক কিছুই পতিত বলতে পারত ওদের। যেমন কামানের গায়ে ওই যে লেবেলটা, ওটা পর্তুগাল নামে একটা দেশের ভাষা। যে কারখানায় কামানটা ঢালাই হয়েছিল, লেবেলটা তাদের। পতিত গুনে দেখেছে মোটমাট ওইরকম সাতটা কামান ছড়িয়ে আছে কেল্লার আশেপাশে। কয়েকটার তো বেশিরভাগই তলিয়ে গেছে মাটির নীচে। কিন্তু এসব কাউকে বলে না ও। বেশ বোঝে, তার যা বয়স, বিদ্যের দৌড়, তাতে ওর মুখে এসব মানায় না। বললে বিশ্বাসও করবে না কেউ। অথচ এই পুরোনো পরিত্যক্ত কেল্লাটা নিয়ে অনেক কিছুই চিন্তা করেছে ও। ভরদুপুরে বাঁধের পাশে চালার নীচে বাঁশের তক্তপোশে শুয়ে, অথবা নিরিবিলি বিকেলে কেল্লার আশেপাশে ঘুরতে-ঘুরতে। ওর এই বারো বছরের খুদে মগজে যতটা সম্ভব ততটা। কিন্তু কিছুতেই থই পায়নি। এই কেল্লাটা যারা তৈরি করেছিল তারা ভিনদেশি। কোথায় কোন সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে এসে এই এতবড় কেল্লাটা কী করে যে তারা তৈরি করল, পতিতের কাছে সেটাই এক বিস্ময়!

জলের তোড়ে কেল্লার অনেকটাই আজ ভেঙে পড়েছে। তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাতে মূল আকৃতির অনেকটাই অনুমান করা যায়।বিরাট কেল্লার বেশিরভাগই ছিল মাটির নীচে। নদীর পার বরাবর বেশ কতকগুলো খিলান আকৃতির চওড়া দেওয়াল। ফাঁকে-ফাঁকে দরজা কাটা। উপরে ছাদ। ছাদের উপর মাটি ফেলে ঢালু করে জমির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এক নদীর দিক ছাড়া বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। ভিতরে বসে সৈন্যরা দিন-রাত নদী পাহারা দিত। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুড়ঙ্গ পথে। বেশিরভাগ সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও কয়েকটা এখনও বর্তমান। এতবড় একটা কেল্লা তৈরি করতে কতদিন লেগেছিল তাদের? এত লোক-লশকরই বা তারা পেল কোথায়? ইট, মাল-মশলা? সবই কি তারা জাহাজে করে নিজের দেশ থেকে বয়ে এনেছিল? এদেশের কেউ তাদের বাধা দিল না! দিব্যি উড়ে এসে জুড়ে বসল! সকলের নাকের ডগায় কেল্লা তৈরি করে গোটা নদীর মোহনা নিজেদের দখলে রেখে দিল বছরের পর বছর। ওদের বাধা দেবার মতো মানুষ কি সেই সময় এদেশে ছিল না?

ভাবনাগুলো পতিতের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আজ বছরখানেক ধরে। ব্যাপারটা ওর খুদে মগজে ঢোকাবার মূলে এক অপরিচিত ব্যক্তি। তার আগে কেল্লা কথাটার অর্থই জানত না। ওর ধারণা ছিল কেল্লা মানে কোনও জমিদার বাড়ির গুপ্ত কুঠুরি।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সেই মানুষটি বোধহয় কোনও স্কুলমাস্টার হবেন। বছর চল্লিশের মত বয়স। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। সঙ্গে জনাকুড়ি ছেলেমেয়ে। ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। পিকনিকের মরশুম নয়। চারপাশ বেশ ফাঁকাই। কেল্লার আশেপাশে ঘুরে-ঘুরে ছেলেদের বোঝাচ্ছিলেন তিনি। চশমার ওধারে চোখ দুটো থেকেথেকেই জ্বলে উঠছিল। ছেলেদের কানে অবশ্য তার বিশেষ কিছু ঢুকছিল না। অধিকাংশই তখন নানা দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত। দু’চারজন

যারা মাস্টারমশায়ের কাছে রয়েছে তারাও কোনওক্রমে হুঁ-হাঁ করে সময় কাটাচ্ছে। বোঝা যায়, নেহাত চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাস্টারমশায়ের সঙ্গ ছাড়তে পারছে না।

প্রায় ঘন্টাদেড়েক ছিল ওরা। পুরো সময়টা পতিত আঠার মতো লেগে ছিল মানুষটার কাছে। বলাবাহুল্য, কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। প্রতিটি কথা প্রায় গিলে খেয়েছিল। আরে বাসরে! এইটুকু জায়গায় যে এত রহস্য আর রোমাঞ্চ লুকিয়ে রয়েছে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে।

সব দেখা শেষ হলে মাস্টারমশায় যখন ছেলেদের নিয়ে রওনা দিলেন সে-ও ধাওয়া করেছিল পিছনে। একেবারে সেই বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। যদি আরও কিছু জানা যায় সেই আশায়।

বলাবাহুল্য নদী, ভগ্ন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা পরিত্যক্ত কামান, সবকিছু সেদিন থেকে এক নতুন রূপে ধরা দিয়েছে পতিতের কাছে। আগে দিনগুলো কাটতেই চাইত না, এখন কোথা দিয়ে সে সময় পেরিয়ে যায় বুঝতেই পারে না। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় কেল্লার চারপাশে। ঝোপে ঢাকা সুড়ঙ্গ মুখ নীচে নেমে যায়। মাস্টারমশায়ের বর্ণনা আর নিজের কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। আপশোস হয়, ইস যদি আর একবার সেই মানুষটাকে কাছে পাওয়া যেত তো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারত।

মাস্টারমশায় আর আসেননি, তাঁর দেখাও আর পায়নি পতিত। কিন্তু এই সময় হঠাৎ এক রাতে ম্যানুয়েল পেড্রোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুধু প্রশ্নের উত্তরগুলোই নয়, জীবনের ধারাটাই পালটে গেল পতিতের।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। তারিখটা মনে নেই। পুর্ণিমার রাত। ভরা জোয়ার চলছে। বাঁধের দরজাটা খুলে দিয়েছে পতিত। জল ঢুকছে হু-হু করে। অমাবস্যা আর পুর্ণিমার ভরা জোয়ারেই যা কিছু বেশি মাছ পাওয়া যায়। কপাল ভাল থাকলে জলের টানে ভারি মাছও দু'একটা ঢুকে পড়ে। সুতরাং এই সময় খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়। জল তোড়ে নামতে শুরু করলেই জালের দরজাটা বন্ধ করে দিতে হয়। কুঁড়ের ভিতরে শুয়ে আজ তাই পতিতের চোখে ঘুম নেই। আকাশের তারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভাটা শুরু হতে এখনও ঘন্টাখানেক বাকি আছে। বাঁশের তক্তপোশের উপর খানিক এপাশ-ওপাশ করে একসময় উঠে বসে ও। ঝাঁপ ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

জোৎস্নায় ম-ম করছে চারদিক। নদীর জলে সেই ঝিকিমিকি। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। কিন্তু দূরে নদীতে চোখ পড়তেই হঠাৎ থমকে যায় ও। নদীর মাঝে ওটা কী দাঁড়িয়ে? জাহাজ মনে হচ্ছে! চোখ দুটো কচলে নেয়। না, চোখের ভুল নয়। ফুটফুটে জোৎস্নার আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জাহাজটা। খানিক আগেও একবার বাইরে বের হয়েছিল। তখন জাহাজটা দেখেনি। সন্দেহ নেই, এই সময়ের মধ্যে এসে নোঙর করেছে। কদাচিৎ দু'একটা জাহাজ কলকাতা বন্দরে ঢুকবার মুখে এদিকে নোঙর করে বটে, কিন্তু এমন জাহাজ কোনও দিন দেখেনি পতিত। জাহাজের মাঝে একটা চিমনি থাকে। ধোঁয়া

বের হয়। এ জাহাজটার কোনও চিমনি নেই। বদলে মোটা একটা মাস্তুলের মতো খুঁটি সোজা উঠে গেছে উপর দিকে। গুচ্ছের দড়িদড়া ঝুলছে। পতিতের মনে হল, জাহাজটা বোধ হয় পালে টানা। নোঙর করা রয়েছে বলে পালগুলো নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

জাহাজটার দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিল খেয়াল নেই ওর। বোধ হয় মিনিটকয়েক হবে। ওই সময় হঠাৎ কাছেই কড়কড় আওয়াজ শুরু হতে পিছন ফিরে তাকাতে ভীষণভাবে চমকে উঠল।

এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে! চারপাশের মাঠ, ধানক্ষেত, নতুন বাঁধ, পাওয়ার লাইনের উঁচু টাওয়ার বা পুরোনো লাইটহাউসের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। চারপাশে শুধু ঝোপঝাড় আর ঘন জঙ্গল। খালটার কোনও অস্তিত্ব নেই। কেবল কেল্লার দিকেই ঝোপজঙ্গল কিছু নেই। অনেকটা জুড়ে মস্ত এক মাঠ। মাঠের এক পাশে সার-সার কতকগুলো খড়ের চালা। চাঁদের আলোয় দূর থেকে হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেক মানুষ সেখান কাজে ব্যস্ত। কড়কড় শব্দটাও ওদিক থেকে আসছে।

গোড়ায় খানিক হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিতে দেরি হয়নি পতিতের। আসলে ভয় ব্যাপারটা ওর অভিধানে নেই। থাকলে এই বিজন প্রান্তরে রাতের পর রাত একা কাটাতে পারত না। ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখার জন্য পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলে ও।

নাহ্,দেখার ভুল নয়। কেল্লার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তবে ঢালু নদীর পারে খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন। গাঁথুনির কাজ চলছে। মাথায় করে ইট, চুন-সুরকির মশলা বয়ে আনছে কুলিরা। মাটি কাটছে কেউ। তাদের বেশিরভাগই কঙ্কালসার শরীর। মনে হয় অনেক দিন পেট ভরে খেতে পায়নি। পতিত আরও লক্ষ করল, মানুষগুলোর দু'পায়ের গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরানো। বেড়ির সঙ্গে শেকল। ইচ্ছে থাকলেও কেউ জোর হাঁটতে পারছে না। অনেকে রীতিমতো খোঁড়াচ্ছে। তবু এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। নিঃশব্দে যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে।

খানিক দূরে মস্ত ইটের ভাটি। এক জোড়া তেজি বলদ জোয়াল কাঁধে অবিরাম পাক খাচ্ছে। ইট তৈরির মাটি পেষাই হচ্ছে। মজুরের দল পেষাই মাটির তাল মাথায় করে এনে ফেলেছে এক জায়গায়। পায়ে শেকল পরা কারিগরেরা ছাঁচে ফেলে ইট তৈরি করছে। সব কিছুই চলছে নিঃশব্দে। ব্যতিক্রম শুধু ওই কড়কড় আওয়াজ। শব্দটা সুরকি পেষাইয়ের। জোয়াল কাঁধে চার জোড়া তেজি বলদ ঘুরছে এক সাথে। পাথরের মস্ত চাকির ভিতর কড়কড় শব্দে ইটের টুকরো পেষাই হয়ে বেরিয়ে আসছে।

কঙ্কালসার মানুষগুলো এই রাতদুপুরে কেন যে এমন যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে, বুঝতে বিলম্ব হয় না। ভিড়ের ভিতর গোড়ায় দেখতে পায়নি, অদ্ভুত পোশাক-পরা কয়েকজন ভিনদেশি মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের ভিতর। লম্বা দৈত্যাকৃতি চেহারার মানুষগুলোর মাথায় পাখনা লাগানো বিশেষ ধরনের কাপড়ের টুপি। মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। পরনে চাপা পাজামা। গায়ে জামার উপর বুক খোলা আলখাল্লার মতো কোট। কোমরে খাপে গোঁজা তরোয়াল। হাতে চাবুক নিয়ে লোকগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে

চারপাশে। কাজে সামান্য গাফিলতি হলেই, কখনও বা বিনা কারণে সাঁই-সাঁই শব্দে চাবুক চালাচ্ছে শীর্ণ মানুষগুলোর উপর। যন্ত্রণায় শরীর কুঁকড়ে উঠলেও হাতের কাজ থামছে না।

অবাক হয়ে দেখছিল পতিত। হঠাৎ আলতো করে কাঁধের উপর হাত রাখল কেউ।

“বয়, টোমার প্রশ্নগুলির উত্তর পাইয়াছ?”

পতিত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ওর পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে এক ভিনদেশি সাহেব। সেই একই পোশাক। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফ। তবে অন্যদের মতো অবিন্যস্ত নয়। চেহারায়, পোশাকে বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ। কোমরে গোঁজা বড়োসড়ো একটা পিস্তল জাতীয় অস্ত্র।

বলাবাহুল্য, পতিত ভয় পায়নি একটুও। বরং চোখের সামনে এতক্ষণ ধরে যা দেখছে তাতে হঠাৎ এই সাহেবের উপস্থিতি কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হল না। সাহেবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, “তুমি কে সাহেব? এখানে এলে কোত্থেকে?”

সামান্য হেসে সাহেব বলল, “বয়, আমার নাম ম্যানুয়েল পেড্রো। বহুত দূর লিসবন হইতে আসিয়াছি। নদীর মোহনায় এই কিল্লা তৈয়ারি হইতেছে আমারই অধীনে। দুই বৎসর কালের ভিতর কিল্লার কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে, তাই দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।”

পতিত বলল, “এখানে কতজন কাজ করছে সাহেব?”

পেড্রো বলল, “সর্বমোট দেড় সহস্র দাস লইয়াছি। তবে এই মুহূর্তে ছয়শত দাস কার্য করিতেছে। অন্যরা বিশ্রামে আছে। ভোর হইলেই উহাদের কাজে লাগানো হইবে। তোমাদের দেশ হইতেই উহাদের লওয়া হইয়াছে। মাত্র ছয়মাসের মধ্যে কার্য অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছে। কিল্লার বনিয়াদের কাজ সম্পূর্ণ। জলে ডুবিয়া আছে, তাই দেখিতে পাইতেছে না।”

যে প্রশ্নটা পতিতের মনে অনেক দিন থেকে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, এবার সেটাই জিজ্ঞাসা করল ও, “তোমরা এখানে কত জন আছ সাহেব?”

“আমরা সর্বমোট দেড়শত ব্যক্তি আসিয়াছি। তবে মুহূর্তে উহাদের পরিচালিত করিতেছে বিশ ব্যক্তি। বাকি সকলে জাহাজে আছে।”

পেড্রো থামল একটু। পতিতের কাঁধে ছোট্ট নাড়া দিয়ে বলল, “বয়, এইবার নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছ, সপ্তসমুদ্রের ওপার হইতে আসিয়া কী প্রকারে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবার নদী মোহনা নিজেদের দখলে লইয়াছিলাম। তোমাদের দেশ হইতেই শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে কী প্রকারে এই বিশাল কিল্লা তৈয়ারি করিয়াছিলাম।”

পেড্রো থামল। পতিতের মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “খুব বুঝতে পেরেছি সাহেব। এদেশে সেইসময় মানুষ ছিল না। তাই পেরেছ। ওই যে ছয়শো মানুষ ঘাড় গুঁজে কাজ

করে চলেছে, ওরাও কেউ মানুষ নয়। হলে তোমাদের মাত্র কুড়িজন মানুষের সাধ্য ছিল না ওদের দিয়ে এভাবে পশুর মতো কাজ করাবার।”

“গুড, ভেরি গুড।” ভীষণ খুশি হয়ে ম্যানুয়েল পেড্রো পতিতের পিঠ চাপড়ে দিল, “তুমি বিলকুল যথার্থ বলিয়াছ বয়। তোমাদের দেশে তখন প্রকৃত মানুষ সংখ্যায় অধিক ছিল না। সেই কারণে এই অসাধ্যসাধন করতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু বয়, আমি বর্তমানেও এদেশে তেমন মানুষ বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না। অবশ্যই তুমি কিছু ব্যতিক্রম। আমি অনেকদিন হইতেই তোমাকে লক্ষ করিতেছি। তোমার ভিতর আগুন রহিয়াছে। বয়, আমি বলিতেছি, তুমি লেখাপড়া শিখো। পুনরায় স্কুলে যাইতে আরম্ভ কর।”

পেড্রোর কথায় এবার হেসে ফেলল পতিত। বলল, “তুমি হাসালে সাহেব। মাত্র দশটা টাকা রোজের জন্য আমার বাবাকে বারো মাইল দূরে নগাছিতে মাটি কাটার কাজে যেতে হয়েছে তা জানো? সংসার চলে না, তাইতো সামান্য কয়টা পয়সা রোজগারের জন্য আমাকে এই বিজন প্রান্তরে রাতদিন পড়ে থাকতে হয়। ইচ্ছে করলেই কি আর লেখাপড়া শেখা যায় সাহেব!”

“আমি টোমার সহিত জোক করিতেছি না বয়। সব জানিয়াই বলিতেছি।” পেড্রোর গলা এবার বেশ ভারি। পতিত দেখল সাহেবের দু’চোখের কোলে দু’ফোঁটা জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে।

“বয়, সুদূর লিসবন হইতে এই দেশে আসিয়াছিলাম। তাহার পর কতদিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, এদেশের মায়া আজও ছাড়িতে পারি নাই। আজও কিল্লার চারিপাশে একা ঘুরিয়া বেড়াই। বয়, তোমাদের এই দেশটাকে বোধ হয় আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।”

একটু থেমে পেড্রো আবার চলতে শুরু করে, “বয়, এই কিল্লার অভ্যন্তরে কিছু বাদশাহী মোহরের সন্ধান আমার জ্ঞাত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কিছু রৌপ্যমুদ্রাও আছে। ওই রৌপ্যমুদ্রাগুলির সন্ধান তোমাকে দিতেছি। উহা লইয়া তুমি লেখাপড়া আরম্ভ করিবে। স্বর্ণমুদ্রা তোমার এখনই প্রয়োজন লাগিবে না। যখন লাগিবে আমি পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এখন মনোযোগ সহকারে শুনো- - ।”

পতিতের ঘুম যখন ভাঙল তখন শেষরাত্তির। পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। চোখ কচলে ধড়মড় করে উঠে বসল ও। বাইরে এসে যা দেখল, তাতে কিছু আর করবার নেই। বাঁধের খোলা দরজা দিয়ে ভাটার জল হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। ভিতরে সামান্য জলই আর অবশিষ্ট। মাছও বেরিয়ে গেছে। হায় হায়! মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হল পতিতের। ঘুমিয়ে পড়ে কী সর্বনাশটাই না আজ হয়ে গেল! আবার কী এক আজব স্বপ্ন! সেকালের পালের জাহাজ, বোম্বেটে ম্যানুয়েল পেড্রো, মোহর, ধুৎ- -

ঘুম চোখে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেল ও। মজার স্বপ্নই বটে। স্বপ্নে গুপ্তধনের হদিশ। ম্যানুয়েল পেড্রোর শেষ দিকের কথাগুলো কিন্তু এখনও পরিষ্কার মনে রয়েছে। একবার খুঁজে দেখবে নাকি?

মুহূর্তে মনস্থির করে পতিত ছুটল একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে কেল্লার যে অংশের অনেকটাই ভেঙে পড়েছে, সেই দিকে। পেড্রো যে সুড়ঙ্গর কথা বলেছিল সেটা খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না। দ্রুত ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। সোজা নেমে ডানদিকে বাঁক। এক, দুই, তিন নম্বর থামের পিছনের দেওয়াল। শেষ রাতে পুর্ণিমার আলো নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফোকর গলে ভিতরে এসে পড়েছে। অন্ধকার তাই তেমন ঘন নয়। তবু প্রায় হাতড়েই জায়গাটা বের করতে হল। দেওয়ালের গোড়া থেকে ইট ধরে গুনতে শুরু করল, এক- দুই- তিন- চার—পাঁচ- ছয়- সাত। আধো অন্ধকারে দেওয়ালের নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁ হাতটা রেখে ডান হাতে একটা ইটের টুকরো তুলে ক'বার ঠুকল। ভিতরটা ফাঁপা।

পুরোনো নোনা- ধরা ইট। চুন- সুরকির ক্ষয়ে যাওয়া গাঁথুনি। অন্ধকারেই ঠুকে- ঠুকে গোটা কয়েক ইট বের করে ফেলল পতিত। ঝনঝন শব্দে কতকগুলো চাকতির মতো বস্তু নীচে গড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালের ভিতরে একটা কুলুঙ্গি। খুব বড়ো নয়। অন্ধকারেও পতিতের বুঝতে বাকি রইল না, কুলুঙ্গিটা কাঁচা টাকায় ঠাসা। সব রুপোর।

* * * * * * *

পতিত আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। পর- পর দু'বছর ক্লাসে প্রথম হয়েছে ও। সংসারের হালও কিছু ফিরেছে। ওর বাবা ছিদাম মন্ডল বাজারের কাছে ছোটো একটা দোকান দিয়েছে। দু'বছর পেরিয়ে গেছে, ম্যানুয়েল পেড্রোর দেখা আর পায়নি। সেজন্য অপেক্ষায় রয়েছে পতিত। দেখা হলে ভিনদেশি মানুষটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলবে, "না চাইতেই তুমি আমায় যা দিয়েছ সাহেব তাই যথেষ্ট। সোনার মোহরের দরকার নেই। আমি নিজেকে সোনা বানাতে চাই। সত্যিকারের মানুষ হতে চাই আমি।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

পিপীলিকাপুরের রানি- পিঁপড়ে

রতনতনু ঘাটী

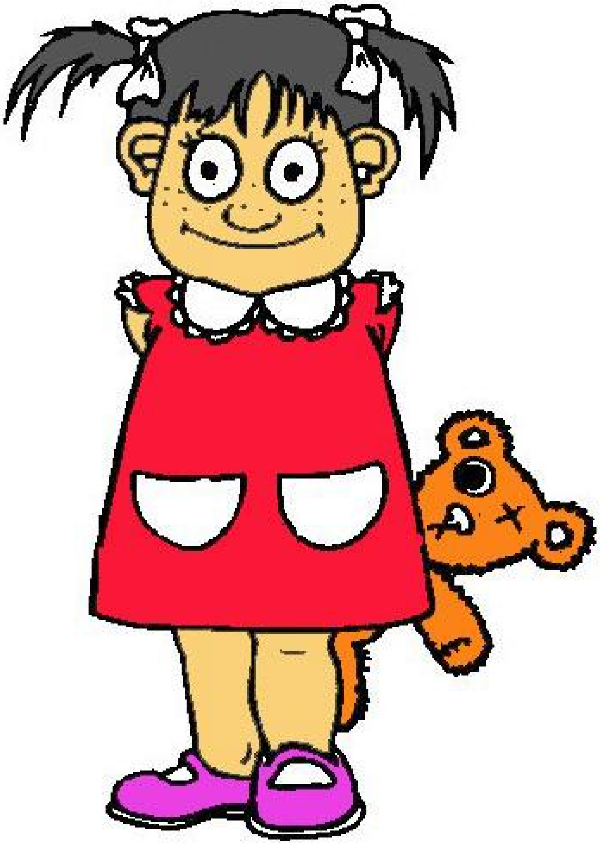

পৌরবীদের আতা বাগানের নীচে পিঁপড়েদের যে একটা নতুন রাজ্য হয়েছে, তার নাম পিপীলিকাপুর। সে রাজ্যের যে হেড, মানে সেই যে রানি- পিঁপড়ে ট্যান্টেনার আজ সকাল থেকে খুব মন খারাপ। রানি- পিঁপড়ের অমন ইংরেজি নাম কেন? কে রেখেছে?

কেন? ওই পিপীলিকাপুরের যে একটা নেতা গোছের পুরুষ- পিঁপড়ে আছে না? সে একবার গিয়েছিল পাকুড় পাতার নৌকোয় চেপে গঞ্জমতী খাল পেরিয়ে পরাগদের বাড়ি। পরাগ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে কেজি- টু ক্লাসে। পরাগদের স্কুলের নাম ‘বাডস’, মানে ‘ফুলের কুঁড়ি’! পরাগ নাকি সেদিন সকালবেলা বসে জোরে জোরে একটা ফেয়ারি টেল পড়ছিল। সেই গল্পে ‘ট্যান্টেনা’ নামটা শুনেই পুরুষ- পিঁপড়েটার খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। পিপীলিকাপুরে ফিরতে ফিরতে ভেবেছিল, “আমাদের হেড রানিপিঁপড়ের

তো কোনও নামই নেই। ফিরে গিয়ে আমি আমাদের রানিপিঁপড়ের অমন সুন্দর নামটাই রাখব।”

পিপীলিকাপুরে ওই নামটা শুনে শ্রমিক-পিঁপড়েরা তো বেজায় খুশি। তারা ভাবল, এবার থেকে অন্য রাজ্যের পিঁপড়েদের গলা তুলে বলার মতো একটা কথা পাওয়া গেল বটে! আর সব পুরুষ-পিঁপড়ে যে খুব খুশি হল, এমন বলা যায় না। তবে তারাও মুখ নেড়ে মন-রাখা ভাবে বলল, “তা বেশ! মন্দ কী? ভালোই তো নামটা!”

কিন্তু পীপিলিকাপুর রাজ্যে অনেক রানি-পিঁপড়ে থাকে তো! অন্য রানি-পিঁপড়েরা খুশি হওয়া তো দূরের কথা, হিংসেয় ক'দিন ভাল করে মুখে মুখে লাগিয়ে কথাই বলাবলি করল না নিজেদের মধ্যে। রাগে মুখ ভার করে বসে রইল চুপটি করে আতা গাছের ঝরে পড়া শুকনো পাতার নীচে। যেন একটু পরেই খুব বৃষ্টি নামবে! তাই তার আগে মাথা বাঁচাতে হবে তো, এমন একটা ভাব!

শুধু একটাই রানি-পিঁপড়ে মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, “এ আবার কী নামের ছিরি? এ কি কোনও নাম হল নাকি? ট্যান্টেনা মানেটাই বা কী?”যে নেতা মতো পুরুষ-পিঁপড়েটা অমন সুন্দর নামটা শুনে এসে হেড রানি-পিঁপড়ের ওই নামটা রেখেছিল, সে ছ'টা পায়ে এদিক ওদিক চরকির মতো কয়েকবার পাক খেয়েও এর মানে খুঁজে পেল না। তারপর একটা শুকনো শিউলি ফুলের কুঁড়িকে মাইকের মতো তুলে ধরে ঘোষনা করে দিল, “পৃথিবীতে অত যে কথার পিঠে কথা আছে, তার সব কথার কি মানে আছে নাকি? আমি সকলকে বলে দিলাম, আমাদের রানি-পিঁপড়েরও নামেরও কোনও মানে নেই।”

সে সব তো গেল রানি-পিঁপড়ের নাম নিয়ে নানা কথা। কিন্তু গোটা পিঁপড়ে-রাজ্যের সকলেই আজ খুব চিন্তিত। কেন? রানি-পিঁপড়ে ট্যান্টেনার হঠাৎ আমন মন খারাপ হল কেন?

কিন্তু রানি-পিঁপড়েকে মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করার মতো ক্ষমতা কারই বা আছে? তাই সকাল থেকে মুখ চাওয়াচাওয়ি কাণ্ড চলছিল পিপীলিকাপুর রাজ্যে। এ ওর মুখের দিকে তাকায় তো ও তার মুখের দিকে। সেদিন সকলের সব হাতের কাজ পড়ে রইল। কেউ খাবার খুঁজতে বেরোল না। কেউ বাসা মেরামত করল না। গোটা রাজ্য জুড়ে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল হেড রানি- পিঁপড়ের মন খারাপের খবরটা।

অমন সময় সকলেই দেখল, গটমট করে হেড রানি-পিঁপড়ে যেন কোথাও যাচ্ছেন। এ ওর মুখের সামনে মুখ এনে বলল, “রানিমা কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানো কি? আগেভাগে খবর পেয়েছ কিছু?”

কেউ বলল, “আমি জানি না।”

কেউ বলল, “রাজা-রানিদের সব কথায় অমন করে মন দিতে নেই!”

কথায় কথায় চোখে কয়েকটা পলক পড়েছে কি পড়েনি, সব শ্রমিক-পিঁপড়ে, সব রানি-পিঁপড়ে, রোদের তাত বাঁচাতে চোখের উপর ছাতার মতো করে হাতের পাতা মেলে ধরে সকলে দেখল, হেড রানি-পিঁপড়ে। তড়বড় করে একটা মস্ত পাহাড়ে উঠে যাচ্ছেন।

একটা পুঁচকে শ্রমিক-পিঁপড়ে। তার নাম টইটই। সে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় বলে তার অমন নাম রেখেছেন হেড রানি-পিঁপড়ে। আর একটা পুঁচকে শ্রমিক-পিঁপড়ে, তার নাম আনমনা। নামও রেখেছেন হেড রানি-পিঁপড়ে।সে সব সময় আপন মনে থাকে, ডাকলে তার সাড়া মেলে না বলে তাকে ওই নামেই সক্কলে ডাকে।

আনমনা মুখ ফসকে টইটইকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কখনও পাহাড়ে উঠিছিস রে টই?"

টইটই ঘাড় নেড়ে বলল, "না।" তারপর আনমনাকে টইটই জিজ্ঞেস করল , "তুই?"

আনমনা এক বুক শ্বাস ফেলে বলল, "নাঃ! পাহাড়ে চড়ব বললেই কি চড়া যায় নাকি? ওসব শিখতে হয়। তুই কি জানিস, ওসব শেখার জন্যে ইশকুল আছে?"

"কই, শুনিনি তো কখনও?"

আনমনা বলল, "আমাদের রানি-পিঁপড়ে ওই সব ইশকুল থেকে কবেই চার-পাঁচটা পাশ দিয়ে তবে এই পীপিলিকাপুর রাজ্যের রানি হয়ে এসেছেন! "

টইটই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তক্ষুনি ওরা দুজনে দেখল, হেড রানি-পিঁপড়ের মাথাটা প্রায় আকাশ ছুঁইছুঁই করছে।

আনমনা পিঁপড়েটা বলল, "দেখেছিস, রাজরানিরা ইচ্ছে করলে কেমন হুট করে আকাশ ছুঁতে পারেন?"

অমন সময় গোটা পিপীলিকাপুরের সব্বাই আকাশের দিকে ঘাড় উঁচু করে দেখল, হেড রানি-পিঁপড়ের মাথায় সাদা মেঘের জরির মুকুট পরা। দিনের বেলা ভুল করে আকাশে উঁকি দেওয়া একটা বিচ্ছু তারা সে মুকুটের চূড়ায় উঠে হিরের জলুস নিয়ে মিটিমিটি করে জ্বলছে আর নিভছে! রানি-পিঁপড়ের দু'কানে দুটো রামধনুর ছোট্ট টুকরো বসানো দুল। আর গায়ে নীল আকাশের ফিনফিনে একটা ওড়না জড়ানো। সে ওড়না আবার আকাশ পারের বাতাস লেগে হলমল করে উড়ছে। কী মিষ্টি দেখাচ্ছে যে রানি-পিঁপড়েকে!

তারপর যা ঘটল, তা দেখে তো সকলেই হাঁ! ও মা! যে পাহাড়টায় উঠেছিলেন রানি-পিঁপড়ে, সেই পাহাড়টাও যে এবার হেলতে দুলতে গটমট করে হাঁটতে শুরু করেছে! সব্বাই মনে মনে ভাবল, পাহাড়টাই বা কোথায় চলেছে?

একটা দেমাকি শ্রমিক পিঁপড়ে চেঁচিয়ে বলল, “আমাদের রানিমা ইচ্ছে করলে কী না পারেন? রানিমা চাইলে সমুদ্দুরের জল উপর দিকে উঠতে থাকে। রানিমার মন হলে, দিনের বেলায় মাথার উপর চাঁদ উঠে যায়। পাথরের যে অমন মস্ত পাহাড়, সেও পড়িমড়ি করে তেপান্তরের দিকে হাঁটতে শুরু করে।”

কথাটা ঠিক-ভুল বিবেচনা করার মতো সময় পেল না কেউ। রানি-পিঁপড়ে তখন মেঘলোক দিয়ে যেন উড়ে চলেছেন বলা যায়। অনেকটা পরির মতো! সেদিকে তাকিয়ে একটা শ্রমিক-পিঁপড়ে আর

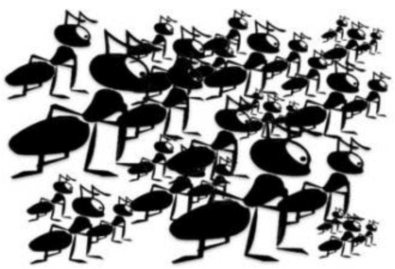

একটা শ্রমিক পিঁপড়েকে বলল, “জানিস তো, আমার মনে হয়, আমাদের রানিমা মন খারাপ করে অন্য পিপীলিকাপুরে চলে যাচ্ছেন। ওই যে আমি সেদিন ভালো করে মন দিয়ে খাবার জোগাড় করতে যাইনি! রানিমার মনে হয় অভিমান হয়েছে খুব! ”

তার কথা শুনে একটা কাজ পাগল শ্রমিক পিঁপড়ে বলল, “ধুর, রাজা রানিদের কখনও মন খারাপ হয় না, এমনকী, অভিমানও হয় না। শুধু রাগ হয় তাঁদের।”

“তা হলে কি আমার উপর রানি-পিঁপড়ের রাগ হয়েছে? তাই তিনি অমন করে চলে যাচ্ছেন?”

তার কথা কারও কানে পৌঁছল বলে মন হল না। সকলে দেখল, রানি-পিঁপড়ে পাহাড়ের পিঠে চড়ে হেলতে দুলতে কোথায় যেন চলেছেন। মুখে রাগের চিহ্ন রাত্র নেই! বরং বেশ একটা গর্বের ভাব ঝরে পড়ছে চোখ মুখ থেকে।

রানিমার গর্ব তো হওয়ারই কথা! আর কোন পিপীলিকা রাজ্যের কোন রানি-পিঁপড়ের আমন সাহস আর ভাগ্য যে, অত উঁচু দিয়ে বেড়াতে যাবেন?”

পিপীলিকাপুরের সকলের মনে হল, রানি-পিঁপড়ে সামনের দুটো পা পতাকার মতো উপরের দিকে তুলে কিছু বলছেন। অত উপর থেকে পষ্ট শোনা যাচ্ছে না।

একটা মিচকে মতো রোগা লিকপিকে পিঁপড়ে ফস করে বলে ফেলল, “রানিমা পিপীলিকাপুরের সকলকে মনে হয় গুডবাই জানাচ্ছেন। আরা দেখা হবে না তো কারও সঙ্গে?”

কেউ সেই গুডবাই শুনতে পেল না বটে, তবে সকলেরই মনে ধরল কথাটা! তখন হঠাৎ করে সকলেরই মন খারাপ হতে শুরু করল আকাশ পারে মেঘ জমে ওঠার মতো করে।মন খারাপ তো অমন জিনিস, একবার কারও মন খারাপ হলে সকলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কেউ কেউ চোখের পাতা বন্ধ করতে ভুলে গেল। কেউ আবার দু’চোখ ভাসিয়ে কাঁদতে বসে গেল শুকনো আম পাতার নীচে স্যাঁতসেঁতে কুটিরের নীচে।

কে যেন হঠাৎ শুনতে পেল হেড রানি-পিঁপড়ের কথা। সে বলল, “অ্যাই চুপ, চুপ! একটিও কথা নয়! সকলে কান পেতে শোনো, ওই তো রানিমা বলছেন, ‘তোমাদের দুঃখ যে আর দেখতে পারছি না। আমার দায়িত্ব বলে তো একটা কথা আছে, না কি? আমি তোমাদের জন্যে ভিন পিপীলিকা রাজ্য থেকে সুখ কিনতে যাচ্ছি! ’”

তারপর সে একটু চুপ করে থাকল। তারপর কী ভেবে বলল, “কী গো, তোমরা কেউ রানিমার কথাটা শুনতে পাওনি?”

সকলেই ঘাড় নাড়ল দু’দিকে।না, তারা কেউ শুনতে পায়নি! তখন হেড রানি-পিঁপড়ে দেখতে দেখতে দিগন্তপারের মেঘের কাছে কাঠি-আইসক্রিমের মতো যেন মিলিয়ে গেলেন! তারই সাদা রংটা গিয়ে লাগল দুপুরের মেঘের গায়ে।

পিপীলিকাপুরের সব পিঁপড়ের মন খারাপ হয়ে গেল! কেউ নাইতে গেল না, কেউ খেতে বসল না, কেউ এককুটি কুটোও নাড়ল না সারাদিন। মন খারাপের ঝাঁক ঝাঁক কালো মেঘ এসে কুয়াশার মতো ঘিরে ধরল গোটা পিপীলিকাপুরকে।

শুধু একটা খুব বুড়ো মতো থুত্থুড়ে শ্রমিক-পিঁপড়ে টুকুস টুকুস করে বেরিয়ে পড়ল খাবার খুঁজতে। তাকে দেখে সকলে মন খারাপে ভারী হয়ে ওঠা মাথা তুলে বলল, “তুমি আবার কোথায় বেরোলে? তোমার বেরনো যে মানা করে দিয়েছেন রানিমা?”

বুড়ো শ্রমিক-পিঁপড়ের মুখে একটা লিকপিকে চাঁদের মতো সরু হাসির রেখা চিকমিক করে উঠল। সে বলল, “তোমার বসে বসে মন খারাপ করো। আমার এখন কি আর বসে থাকলে চলে?”

তারপর নিজের মনে গজগজ করে বলল সেই শ্রমিক-পিঁপড়েটা, "আরে শোনো, শোনো! মা তাকে জন্মদিনে কিচ্ছু দিতে পারেনি বলে একটা ছোট্ট হাতি মায়ের উপর অভিমান করে বন থেকে বেরিয়ে পিপীলিকাপুরের পাশে এসে ঘুমোচ্ছিল। আর আমাদের রানিমা, আদরযত্ন ঠিকমতো হচ্ছে না বলে তাঁর খুব মন খারাপ হল সকালবেলা। পিপীলিকাপুরের সব পিঁপড়েকে ভয় দেখাতে বিবাগী হওয়ার ভান করে তিনি পাহাড় পেরিয়ে তারপর যখন রানিমার পায়ের চাপে হাতিটার পিঠে সুড়সুড়ি লাগল, তখন বাচ্চা হাতিটার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ঝটাস করে! অমনি উঠে দাঁড়াল বনে যাওয়ার জন্যে। রানিমা আর হাতির পিঠ থেকে নামতেই পারেননি! এতক্ষণে আমাদের রানিমা ছোট্ট হাতিটার পিঠে চেপে গভীর জঙ্গলে গিয়ে পিপীলিকাপুরের পথটাই হারিয়ে ফেলেছেন!"

শ্রমিক পিঁপড়েটা বুড়ো হয়েছে তো, তাই তার ঘড়ঘড়ে গলার কথা পিঁপড়ে রাজ্যের কেউ পষ্ট শুনতেও পেল না।এই সব কথা শুনতে পেল শুধু বনশিমুলের ডালে বসে থাকা একটা ছোট্ট বেনেবউ পাখি।

বেনেবউ পাখি আরও একটা কথা শুনতে পেল। বুড়ো শ্রমিক-পিঁপড়ে বলতে বলতে খাবার খুঁজতে চলে গেল, "আরে, সুখ অমন করে কোথাও কিনতে পাওয়া যায় নাকি?"

সেই থেকে প্রতিদিন বিকেলবেলা হলদে, বেগনি, লাল, নীল রং মেখে যখন মেঘেরা সাজতে বসে, আঁকনকুশি নদীর জলে যখন তাদের মিটমিটে ছায়া পড়ে, তখন গোটা পিপীলিকাপুরের সব্বাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারা এখনও বিশ্বাস করে, হেড রানি-পিঁপড়ে তাদের জন্যে সুখ কিনতে গেছেন দূর ভিন পিপীলিকা রাজ্যে! নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন! আর মনে মনে সব পিঁপড়েই নিজেকে বোঝায়, "আরে, সুখ কি আর অত সহজ জিনিস যে, হুট বললেই কিনতে পাওয়া যায়? রানিমা'র অমন একটু দেরি তো হবেই!"

বন্ধু

রুচিস্মিতা ঘোষ

মা রোজ পিকলুকে বসিয়ে দিয়ে যায় এই পার্কে। এখানে অনেক গাছ। গাছে গাছে অনেক ফুল। সব ফুলের নাম জানে না পিকলু। গোলাপ, নয়নতারা, রঙ্গন, কলাবতী আর ডালিয়া -- শুধু এই পাঁচটা ফুলই সে চিনতে পারে। সে যে গাছের তলায় বসে আছে, সেই গাছটা্র নাম কৃষ্ণচূড়া। এখন বসন্তকাল, গাছটা ফুলে ফুলে লাল হয়ে গেছে। ফুলের পাপড়ি ঝরে গাছের নীচটাও লাল। পার্কের সবুজ ঘাসে একঝাঁক রঙিন ফুল হাত পা ছুঁড়ে খেলছে। রঙ বেরঙের জামায় তাদের এক একজনকে সত্যি সত্যিই এক একটা রঙিন ফুলের মত লাগছে। বিকেল বেলার নরম রোদ সুড়সুড়ি দিচ্ছে পিকলুর সারা পিঠ জুড়ে। তার খুব ইচ্ছে করছে সেও একটা ফুল হয়ে ওই ফুলগুলোর সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু পিকলুর একটা পা পোলিওতে নষ্ট হয়ে গেছে। সে ভাল করে হাঁটতেই পারে না, দৌড়বে কী করে!

তার বয়সী বাচ্চাগুলো দোলনায় দোল খায়, সি-স চড়ে, মেরি-গো-রাউন্ডে গোল হয়ে ঘোরে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে কেমন বল খেলছে। দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি আরো কতরকমের খেলা যে খেলে ওরা! সে খেলতে পারে না। শুধু বসে বসে তাদের খেলা দ্যাখে।

পিকলুর মাঝেমাঝে তাই ভারী মনখারাপ হয়। না-হয় তার একটা পা খোঁড়া, তাই বলে কি পিকলুর সঙ্গে গল্প করতেও নেই? কাছে আসতেও নেই? মাঝেমাঝে খেলা ছেড়ে দু-একজন কি পিকলুর কাছে এসে গল্প করতে পারে না? একদিন পিকলুর যখন এমনি মনখারাপ, গাছের ডাল থেকে একটা পাখি মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল। পিকলু মাথা তুলে দেখল গাছের ডালে ভারী সুন্দর একটা পাখি বসে রয়েছে! তার সারা গায়ে কেউ যেন হলুদ মেখে দিয়েছে, গলার কাছটা নীল, চোখের তারায় লাল রঙ। এরকম অদ্ভুতপাখি সে জীবনে দ্যাখেনি। সে ভারী অবাক হয়ে যখন দেখছে পাখিটাকে, ঠিক তখনই তাকে আরো অবাক

করে দিয়ে পাখিটা মানুষের গলায় বলে উঠল, "মনখারাপ করছিস কেন পিকলু? আমি তো আছি। তোর সঙ্গে গল্প করব।"

পিকলু হেসে বলল, "পাখিরা বুঝি কথা বলে? আর তুমি গল্পই বা জানলে কী করে?"

পাখিটা তার ঠোঁট ফাঁক করে খানিকটা হেসে নিল। তারপর বলল, "আমি আজ থেকে তোর বন্ধু। আমরা পাখিরা নিজেদের ভাষায় কথা বলি ঠিকই, তবে তোরা তো আর আমাদের ভাষা বুঝিস না, তাই আমরাই মানুষের ভাষা শিখে ফেলেছি।"

পিকলু অবাক হয়ে বলল, "সত্যি বলছি, এরকম পাখি আমি জীবনে দেখিনি। তোমার নামটা বলবে?"

পাখিটা বলল, "এই পার্কে অনেক রকমের পাখি আছে। তাদের গায়ে কত যে রঙ! আমরা সকলে এ দেশ থেকে ওদেশে ঘুরে বেড়াই। আমাকে তুই হলুদ পাখি বলে ডাকতে পারিস।"

পিকলু হেসে ফেলল। বলল, "যাঃ! পাখি আবার মানুষের বন্ধু হয় নাকি?"

পাখিটাও তর্ক জুড়ে দিল, "কে বলেছে হয় না? বোকা ছেলে, এই কথাটাও জানিস না? যে কোনো প্রাণীই মানুষের বন্ধু হতে পারে। ভালবাসা থাকলেই হয়। হাথী মেরা সাথী সিনেমাটা দেখিসনি বুঝি?"

পিকলু বলল, "তোমার বুঝি একটাও পাখি- বন্ধু নেই?"

হলুদ পাখি বলল, "থাকবে না কেন? তারা তো এই পার্কেই আছে। গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে ওড়াউড়ি করছে, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আমি তোকে রোজ দেখি, একা মনমরা হয়ে বসে থাকিস। তাই ভাবলাম তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।"

হলুদ পাখির কথায় পিকলুর মনটা ভাল হয়ে গেল। না- হয় ওই বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো তার সঙ্গে ভাব করে না, তা বলে কি তার বন্ধু থাকতে নেই?আজ থেকে হলুদ পাখিই তার বন্ধু। তার সঙ্গেই সে গল্প করবে।

পিকলুর তো আর ডানা নেই যে, ইচ্ছে করলেই সে উড়ে যাবে। হলুদপাখির ডানা আছে, তবু সে উড়ে যায় না। শুধু পিকলুর জন্যই কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে বসে দোল খায়। তার জন্য অপেক্ষা করে আর পিকলু এলেই টুক করে নীচে নেমে আসে। সে তাকে অদ্ভুত সুন্দর সব গল্প শোনায়। দুষ্টু রাজার গল্প, সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্প, ব্যাঙ্গমা- ব্যাঙ্গমীর গল্প, সুখু- দুখুর গল্প, রাক্ষস- খোক্কসের গল্প। এমন গল্প পিকলুকে আজ পর্যন্ত কেউ শোনায় নি। এমন কি তার মা- ও না। হলুদপাখির থেকে সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্প শুনে পিকলুর এক একসময় মনে হয় তার মা- ই বুঝি সেই দুয়োরানি। তার মা- র যে বড় দুঃখ! সকাল থেকে বাড়ির সব কাজ সেরে, রান্নাবান্না করে পিকলুকে নাইয়ে- খাইয়ে দুপুর গড়াতে

না গড়াতেই তাকে এই পার্কে বসিয়ে সে একটা দোকানে কাজ করতে যায়। পিকলুর মনে হয় তার বাবাই কি তবে সেই দুষ্টু রাজাটা, যে তার মাকে ছেড়ে সুয়োরানির কাছে চলে গেছে? না- কি বাবা সেই রাক্ষসটা যার মনে- প্রাণে পিকলুর জন্য একটুও দয়া- মায়া নেই? পিকলু কিন্তু এসব কথা জানায় না হলুদ পাখিকে। সে শুধু তার গল্পগুলোই মন দিয়ে শোনে। পিকলুর আজকাল আর তেমন মনখারাপ করে না। তার সব মনখারাপ এখন ভাল- লাগায় বদলে গেছে।

এদিকে বসন্তকাল হাসে। পার্কের গাছেরা মাথা দোলায়। কৃষ্ণচূড়া গাছটাও ডালপালা নেড়ে বলতে চায়, দ্যাখ, পিকলু একটা বন্ধু পেয়েছে। পিকলু আর হলুদপাখির ভালবাসা পাগলা হাওয়ার মত তিরতির করে বয়ে বেড়ায় সারা পার্কে। সেই ভালবাসার হাওয়া একদিন ছুঁয়ে দেয় একটা ছেলেকে। ছেলেটা খেলতে খেলতেই সেদিন খেয়াল করে গাছের তলায় বসে থাকা খোঁড়া ছেলেটা নিজের মনে একটা হলুদ পাখির সঙ্গে কথা বলছে। ভারী কৌতূহল হয়

তার। সে চুপিচুপি এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাশ ঘেঁষে। অবাক হয়ে দ্যাখে, হলুদপাখিটা কেমন মানুষের গলায় গল্প শোনাচ্ছে, আর খোঁড়া ছেলেটাও বেশ মাথা নেড়ে নেড়ে ওর সঙ্গে কথা বলছে। এত অবাক সে কোনোদিন হয়নি। কিন্তু সে যে দৌড়ে গিয়ে অন্য বাচ্চাদের এসব কথা বলবে, তার ইচ্ছে করে না। আসলে ভালবাসার হাওয়াটা যে তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। ভালবাসার সেই আশ্চর্য টানে সে গাছের পাশ থেকে সরে এসে পিকলুর পাশে বসে পড়ে আর পিকলু চমকে ওঠে। কোনোদিন তার কাছে ওরা কেউ আসেনি। কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে দেখেছে। হলুদপাখি কিন্তু ছেলেটাকে দেখেও উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে না, বরং ভারিক্কি চালে বলে, “হাঁ করে দেখছিস কী? যা- না, যেমন খেলছিলি, তেমন খেল।”

বাচ্চা ছেলেটা তাও আব্দারের সুরে বলে, “না, আমি খেলব না। আমিও তোমার গল্প শুনব।” হলুদপাখি তখন মাথা নেড়ে বলে, “এতদিন তো এই ছেলেটাকে তোরা কাছেও ডাকিসনি। এখন কী মনে করে?”

ছেলেটা মুখ কাচুমাচু করে বলে, “ভুল হয়ে গেছে, হলুদপাখি।” তারপর পিকলুর দিকে তাকিয়ে বলে, “সরি!সরি! এই, তোর নাম কী রে?”

পিকলু একটু বিরক্তই হয়েছে, হলুদপাখি আর তার মাঝখানে ছেলেটা হঠাৎ এসে পড়েছে বলে। তবে কী- না ছেলেটা তো ভাব করতেই এসেছে আর তার ভুলও স্বীকার করে নিয়েছে, তাহলে বন্ধু হতে দোষ কী? সে তাই তার নাম জানায় ছেলেটাকে আর তারও নাম জেনে নেয়। এভাবে ছেলেটার সঙ্গে সেদিন পিকলুর ভাব হয়ে যায়।

হলুদপাখির রাগ কিন্তু তখনও যায়নি। সে গম্ভীর হয়ে বলে, “এই ছেলে, দেখতে পাস না পিকলু তোদের মত খেলতে পারে না? ওর কথা তোরা কোনোদিন ভাবিসনি কেন? আজ আমার গল্প শোনার লোভে ওর সঙ্গে ভাব করতে এসেছিস? তা বেশ! বোস। বোস। গল্প শোন।”

এইভাবে হলুদপাখির সঙ্গে গল্পে গল্পে একদিন বসন্তকালও ফুরিয়ে যায়। গরমের কাঠফাটা রোদে কৃষ্ণচূড়া আর তেমন ছায়া দিতে পারে না। লাল ফুলগুলো শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কুলকুল করে ঘেমে ওঠে পিকলু। তার গায়ের জামাটাও ভিজে গেছে। সে হলুদপাখিকে আকুল হয়ে খোঁজে আর অবাক হয়ে দ্যাখে হলুদ পাখি পিকলুকে দেখেই নীচে নেমে আসছে। সে নীচে নেমেই রোদের তাপ থেকে বাঁচাতে চায় পিকলুকে। তার হলুদ ডানা ছড়িয়ে ঢেকে দেয় পিকলুর মাথা।

পার্কের অন্য বন্ধুরা আজকাল বেশ দেরি করে আসে। রোদের তেজ কমে গেলে তারা একে একে আসবে। পিকলু তাদের জন্য অধীর অপেক্ষা করে। এখন এক এক করে পিকলুর অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। তারা পালা করে পিকলুর সঙ্গে খেলে। এমন অনেক খেলা আছে, যা বসে বসেও খেলা যায়। পিকলুর সঙ্গে তারা তেমন খেলাই খেলে। দু- একজন আবার কখনো কখনো পিকলুর হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটে। কেউ তাকে গান শোনায়, কেউ শোনায় মজার

মজার ছড়া। একটা ছেলে পিকলুকে উপহার দিয়েছে ভারী সুন্দর একটা ছবির বই। একটা বাচ্চা মেয়ে তার জন্য বাড়ি থেকে নানারকমের খাবার নিয়ে আসে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ পিকলুকে দেয় চকোলেট, কেউ দেয় ক্যাডবেরি আবার কেউ দেয় কেকের টুকরো। হলুদ পাখির মনে আনন্দ আর ধরে না। সে ভাবে, এর নামই বুঝি ভালবাসা?

এদিকে ঋতুবদলের নিয়ম অনুযায়ী বর্ষা পেরিয়ে শরৎ আসে। শরতের পর হেমন্তকাল। হেমন্তকাল আর থাকে কতক্ষণ! দেখতে দেখতে একদিন শীতও নেমে আসে পার্কে। সেই দিনটা ছিল কনকনে ঠান্ডা। পিকলুর গায়ে একটা ফুলহাতা শার্ট। ঠান্ডায় সে কাঁপছে। হলুদপাখির এখনও পর্যন্ত দেখা নেই। পিকলুর বন্ধুরা একে একে নানা রঙের সোয়েটারে সেজে পার্কে ঢুকছে। তাদের দেখে পিকলুর দু"চোখ জলে ভরে আসে। তার মা এই শীতেও তাকে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারেনি। সে হঠাৎ দেখতে পায়, একটা বাচ্চা মেয়ে তার দিকেই ছুটে আসছে। মেয়েটা নীল রঙের একটা নরম সোয়েটার পরেছে। একেবারে কাছে এলে সে মিলিকে চিনতে পারে। পিকলুকে শীতে কাঁপতে দেখে মিলি তার নীল রঙের সোয়েটারটা খুলে পিকলুকে পরিয়ে দেয়। পিকলুর চোখের জল মুছে দেয় তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে আর হেসে বলে, "ধুর বোকা কাঁদছিস কেন? আমার অনেক সোয়েটার আছে। এটা তোর জন্য।"

পিকলু লজ্জা পেয়ে বলে, "আমাকে সোয়েটারটা দিয়ে দিলে, এবার যে তোমার শীত করবে।"

মিলি হেসে বলে, "আমার গায়ে আর একটা পাতলা সোয়েটার আছে, দেখতে পাচ্ছিস না?"

লাল-নীল, হলুদ-সবুজ সোয়েটাররা এবার দৌড়ে দৌড়ে আসছে পিকলুর কাছে। পিকলুকে জিজ্ঞেস করছে, পিকলু আজ হলুদপাখিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কোথায় গেল? পিকলুও একটু অবাক হয়েই বলে, "আমি তো এসেই তাকে খুঁজেছি। সে এখনও কেন নীচে নেমে এল না?"

বাচ্চারা তখন সকলে মিলে হলুদপাখিকে ডাকাডাকি করছে, "হলুদপাখি কোথায় তুমি?"

হলুদপাখি কিন্তু কোত্থাও যায়নি। সে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে চুপটি করে বসে বাচ্চাদের কান্ডকারখানা দেখছিল। সকলের ডাক শুনে সে এবার টুক করে নেমে এল নীচে। বাচ্চাদের বলল, "ধন্যবাদ বাচ্চারা। তোমরা আজ সক্কলে পিকলুর বন্ধু হয়ে গেছ। আমি খুব খুশি"। এই কথা বলেই সে উড়ে এসে পিকলুর কাঁধে বসল, তার ঠোঁটটা পিকলুর গালে ছুঁইয়ে বলল, "মন খারাপ করিস না পিকলু। এবার আমাকে যেতে হবে যে। পার্কের অন্য পাখিরা দল বেঁধে আজ অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। আমাকেও তাদের সঙ্গে যেতে হবে। এখন তো তোর অনেক বন্ধু। আমাকে ভুলে যাস।"

হলুদপাখির কথা শুনে পিকলু দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে। পিকলুর হাত তার ছোট্ট মুঠিতে ধরে থাকে মিলি আর অন্য বাচ্চারা পিকলু আর মিলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা দেখে হলুদপাখি সত্যি সত্যিই ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাচ্ছে অন্য পাখিদের সঙ্গে। শীতের কুয়াশা ছেয়ে তখন সন্ধ্যা নামছে পার্কে। পিকলুর চোখের জল মিশে গেল সেই কুয়াশায়।

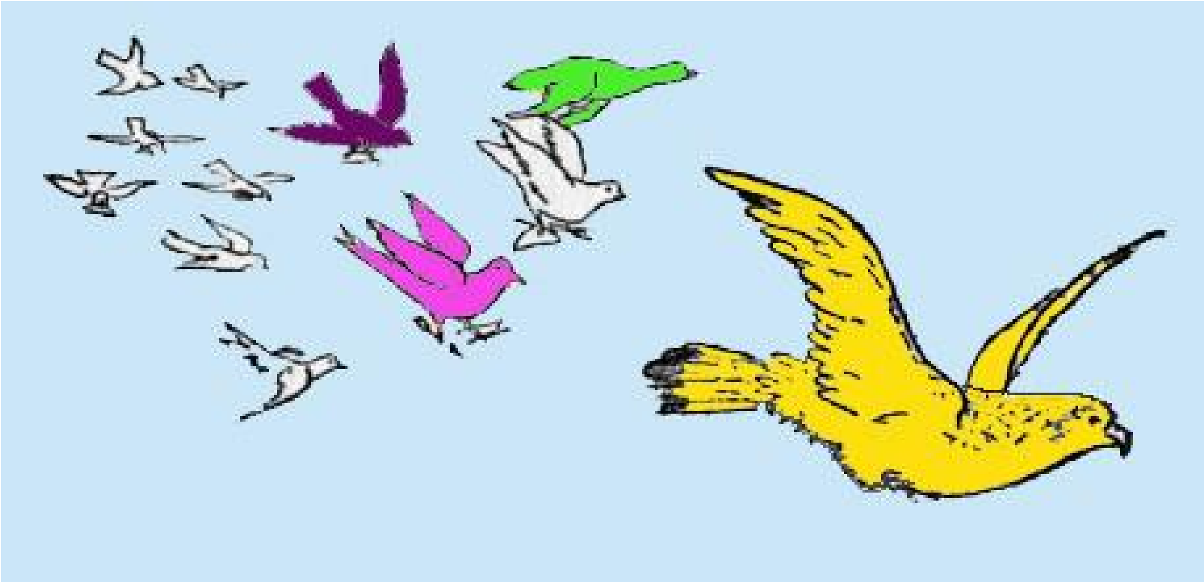

গ্রাফিকস্- ইন্দ্রশেখর

মোতিবিবির আয়না

সত্যজিৎ দাশগুপ্ত

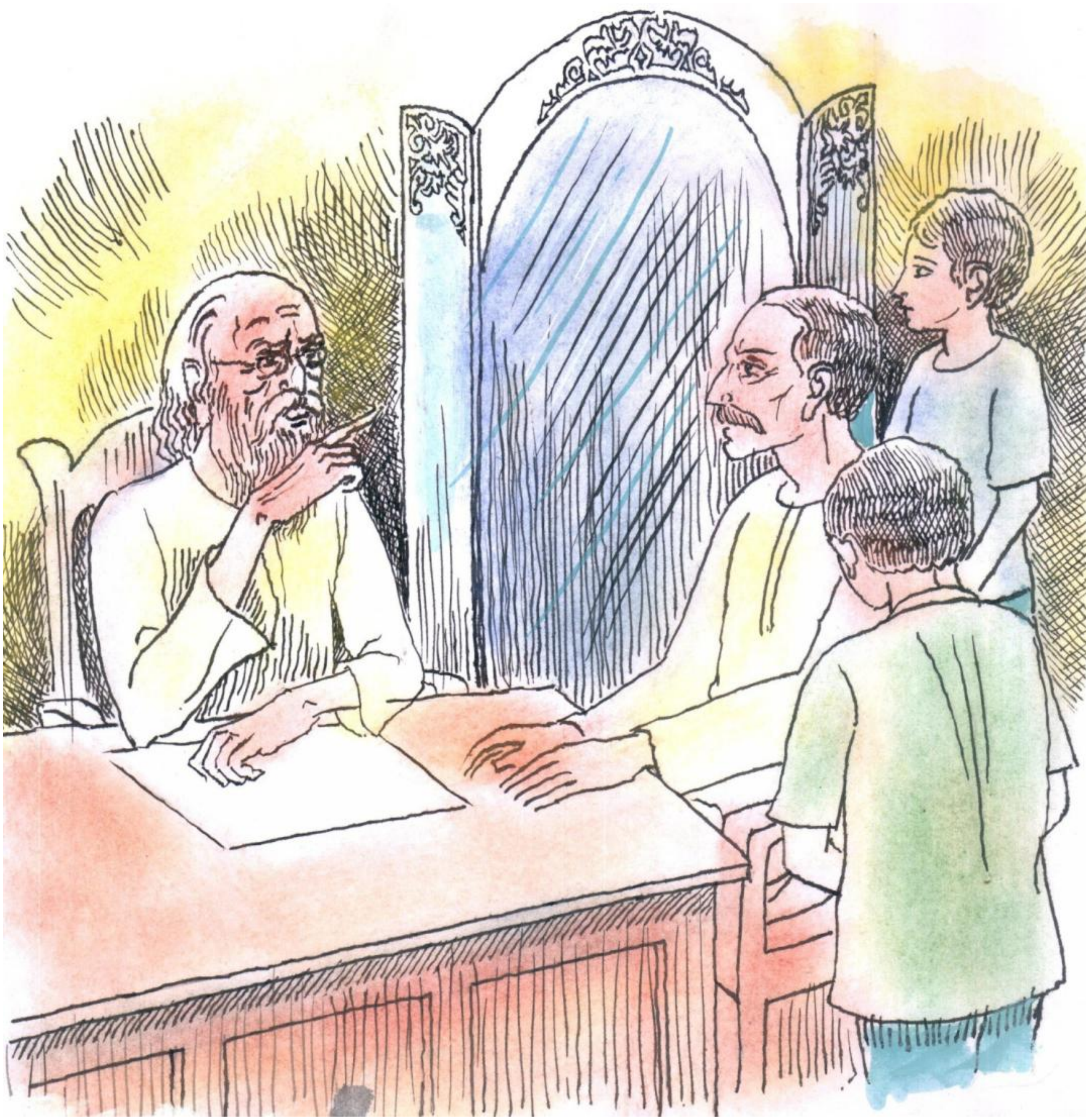

রহমতুল্লা হাকিমের ঘরে দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন ছিল কিডোর। অবশ্য ওর শুধু একার না। সাথে ছিল রিবাই, রায়ান আর দ্যুতিও। আর হ্যাঁ, লোকনাথদাদুও ছিলেন ওদের সাথে।

বয়স প্রায় পঁচানব্বই ছুঁই ছুঁই। শরীরীটা বেঁকে গিয়ে ধনুকের আকার নিয়েছে। হাত দুটো এত সরু যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন জলের পাইপ! গলার কাছের চামড়াটা ঝুলে ধুতির মালকোঁচার আকার নিয়েছে! গালের চামড়াটা বোধ হয় কিছুদিনের মধ্যেই খসে মাটিতে পড়ে যাবে। চোখের মণিজোড়াও আর কিছুদিনের মধ্যেই কোটরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। দুই ভুরুর মধ্য থেকে উঠে এসেছে টিয়াপাখির ঠোঁটের মত টিকলো একটা নাক। বলতে বাধা নেই পঁচানব্বইতেও সেটা অক্ষত এবং সুন্দর। তার সাথে আছে দশটাকার কয়েনের আকারের গোল কাচের চশমা। মনে হয় ভদ্রলোক প্রয়োজন মত কাচের ভেতর আর বাইরে, দুদিক থেকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রহমতচাচার গায়ের রং হিংসে করার মত। একেবারে যেন গোলাপি মুক্তো। মাথার কয়েক গাছা চুল দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে মিলেছে। গালে দাড়ির গোছাটা দুন্দুভির মত নীচে নেমে এসে আবার ওপর দিকে উঠে গেছে।

রহমতুল্লা হাকিমকে চেনে না এমন লোক এ চত্বরে কেউ নেই। এক সময় বিশ্বাস করা হত, রহমতুল্লা হাকিমের এক দাগ ওষুধে যমও পালিয়ে নিস্তার পেতেন। উনি লোকনাথদাদুর বহুদিনের পরিচিত। মজার ব্যাপার, রহমতুল্লা হাকিম যেমন সবার চাচা, তেমন লোকনাথদাদুরও চাচা।

বিরিয়ানি, ফিরনি, গুলাবজামুন, একর পর এক সুস্বাদু খাবারে শরীর আর মন দুইই পাগল হয়ে উঠেছিল কিডোদের। খাওয়া সেরে ওরা সবাই যখন গল্পে মশগুল, ঠিক তখন ঘরের কোণে রাখা একটা আয়নার ওপর নজর আটকে গেল লোকনাথদাদুর। সাথে সাথে কেমন একটা হয়ে গেলেন উনি। কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। বারে বারে ঢোঁক গিলছিলেন। চোখে ফুটে উঠেছিল ভয় আর উত্তেজনা। কিডো, রিবাই, রায়ান আর দ্যুতি, কারও নজর এড়াল না ব্যাপারটা।

আয়নাটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে লোকনাথদাদু রহমতুল্লা চাচাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আয়নাটা এখনও রেখে দিয়েছেন রহমতচাচা?”

এতবড় আয়না কারও বাড়িতে কখনও দেখেনি কিডো। দেড় মানুষ উঁচু লম্বা। চওড়াতে দুটো মানুষ পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। তবে এর বেশি আহামরি কিছু নেই আয়নাটাতে। তাহলে ওটা দেখে কেন মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল লোকনাথদাদুর? মাথায় ঢুকল না কিডোর।

লোকনাথদাদুর কথা শুনে দুবার খক খক করে কেশে নিয়ে রহমত চাচা বললেন, “হাঁ বেটা, ওটা ফেলে দেবার সাহস আমার হল না। তবে সেদিনের পর আর কিছু হয়নি।”

“তবু –” কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না লোকনাথদাদু।

“কোনো ভয় নাই বেটা। ওটা এখন শান্ত,” বললেন রহমতচাচা।

রহমতুল্লাচাচার কথায় লোকনাথদাদুর ভয় কাটল বলা যাবে না। তবে হাজার হাজার প্রশ্ন ইতিমধ্যেই কিডোর মনে দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল। কী আছে ওই আয়নাতে? লোকনাথদাদুর মত সাহসী লোকও কেন এত ভয় পাচ্ছেন? রহমতুল্লা চাচা বললেন, আয়নাটা এখন শান্ত। তারমানে কখনও কি কোনও ভয়াল ব্যাপার ছিল আয়নাটার মধ্যে?

প্রশ্নগুলো লোকনাথদাদুকে করলে পর উনি ফ্যাকাশে মুখে বললেন, ও গল্প না হয় নাই বা শুনলে দাদুভাইরা। কিডোরা অবশ্য ছাড়ার পাত্র নয়। গল্প লোকনাথদাদুকে বলতেই হবে। শেষে বাধ্য হয়ে গল্প বলা শুরু করলেন লোকনাথদাদু--

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। রহমতুল্লা চাচার পসার তখন তুঙ্গে। সারা কলকাতা জুড়ে ওঁর ভারী নামডাক। আগের দিন রাত থেকেই লোকে ওঁর চেম্বারের সামনে বসে থাকে রুগী নিয়ে। মাত্র পনের সেকেন্ডের ভিজিটিং টাইম। ব্যাস, তার মধ্যেই রুগীর পায়ের নখ দেখে রোগ নির্ণয় করে দেন রহমতচাচা। সাথে সাথে এক দাগ ওষুধ। ব্যাস, রুগী সুস্থ।

সেদিন ছিল রবিবার। ঘরিতে বিকেল পাঁচটা। রহমতচাচা রোজের মতই রুগী নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক এমনসময় আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা এক আগন্তুক এসে উপস্থিত হল রহমতচাচার চেম্বারে।

“কী ব্যাপার? কাকে চাই?” হয়ত আরও কয়েকটা প্রশ্ন করতেন রহমতচাচা। কিন্তু তার মধ্যেই বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাঝবয়সি একটা লোক। আর তার হাতে চকচক করছে মস্ত বড় একটা ছোরা!

“বেশি কথা বললে আল্লার কাছে পারসেল করে দেব,” হাড়হিম করা গলায় বলল লোকটা। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরে নিজেকে সামলে নিয়ে চাচা বললেন, “সে তো বুঝলাম, কিন্তু জনাব, তোমার চাহিদাটা কী?”

“আজ পর্যন্ত আমি সাতাশটা খুন করেছি। আরেকটা খুনের ফরমায়েশ পেয়েছি। কিন্তু আমার এই ডান হাতটা বেমক্কা বেইমানি শুরু করেছে। কেন জানি না, বল পাচ্ছি না হাতে। দাও দেখি এক দাগ ওষুধ।”

কথাগুলো অবলীলায় বলে গেল লোকটা! শুনে গা রি রি করে উঠল রহমতচাচার। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে দু পুরিয়া দিয়েই দিলেন লোকটাকে। অবশ্য টাকার কথা বলার সাহসও পেলেন না। বলা যায় না, নিজেই হয়ত আঠাশ নম্বর শিকার হয়ে যেতে পারেন। সেদিন মাঝরাত। সবাই ঘুমে কাদা। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল রহমতচাচার। এত রাতে কে? ঘুমের ঘোরেই বাইরে বেরিয়ে এলেন রহমতচাচা। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কাউকে পেলেন না। অবাক হয়ে চোখটা কচলে নজরটা এধার ওধার ঘুরিয়ে এবার আবিষ্কার করলেন খবরের কাগজে মোড়া কী যেন একটা দাঁড় করানো রয়েছে ওঁর দরজার পাশে। জিনিসটার আকারটাও বিশাল। খুলব কি খুলব না করে শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে কাগজের মোড়কটা খুলে সেটার মধ্যে আপাদমস্তক নিজেকে পেয়ে চমকে উঠলেন রহমতচাচা। কারণ ওঁর সামনে তখন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা আয়না! পাশে একটা চিরকুট সাঁটা। চড়াত করে কাগজটা খুলে নিয়ে আবিষ্কার করলেন তাতে লেখা রয়েছে কয়েকটা কথা। “আমি সুস্থ আছি। আঠাশ নম্বর খুনটা করেছি। উনত্রিশ নম্বরের অর্ডারটা পেয়েছি। আমার তরফ থেকে একটা ছোটো উপহার।”

চিরকুটটা পড়ে বুক কেঁপে উঠল রহমতচাচার। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা খুনিকে সাহায্য করলেন! সেদিন সারারাত আর ঘুমোতে পারলেন না রহমতচাচা। পরদিনই ছুটলেন লোকনাথদাদুর বাড়ি।

“আমি বিরাট গুনাহ করে ফেলেছি বেটা।”

“কেন? কী করলেন? একে তো অসময়ে চেম্বার ফেলে চলে এসেছেন, তার ওপর এইসব কথা বলছেন,” রহমতচাচার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন লোকনাথদাদু। তারপর সব শুনে বললেন, “কই, চলুন তো দেখি আয়নাটা।”

রহমতচাচার সাথে লোকনাথদাদু ওঁর বাড়ি এসে দুজনে মিলে ভালো করে দেখতে লাগলেন আয়নাটাকে। কাঠের ফ্রেমে কাজের কায়দা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আয়নাটা বহু পুরনো। কিন্তু কী আশ্চর্য, কাচের ওপর একটাও দাগ নেই! এবার ফ্রেমের নিচের দিকে ডানদিকে নজর আটকে গেল রহমতচাচার। উর্দুতে কিছু একটা লেখা রয়েছে। যেটার বাংলা করলে দাঁড়ায় – “মোতিবিবি, ১২১৪”।

সেটা পড়ে রহমতচাচা বললেন, “হায় আল্লা, এই আয়না তো মোতিবিবি নামে কোনও এক জনানার। আয়নাটার বয়স প্রায় আটশো বছর!”

“বলেন কী চাচা?” চোখ কপালে উঠে গেল লোকনাথদাদুর। এত পুরোনো একটা জিনিস হাতের সামনে? অবিশ্বাস্য! কিছুতেই ওটাকে ছুঁয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না দুজন। কাঁপা কাঁপা হাতে আয়নাটাকে ছুঁতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে লাগল দুজনের। মনে হচ্ছিল যেন মহম্মদ ঘোরির আমলে পৌঁছে গেছেন। মসৃণ কাচটার গায়ে হাত বোলাতে দারুণ লাগছিল। যেন ভেলভেটের আস্তরণ। মনটা হঠাৎ করে ভীষণ খুশি খুশি হয়ে উঠল ওদের। কী যে শান্তি লাগছিল বলে বোঝানো যাবে না। ঠিক এমন সময় কড়াৎ করে একটা ঝটকা। যেন হাজার ভোলটের একটা শক। সারা শরীরের শিরাউপশিরাতে ছড়িয়ে পরল রেশটা। সাথে সাথে ছিটকে সরে এলেন দুজনে। সারা শরীর কাঁপছিল ওদের। আবিষ্কার করলেন কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামও জমে গেছে।

দুজন দুজনের দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু কারও কাছেই এর কোন উত্তর নেই। হাজার কৌতূহল নিয়ে আয়নাটার দিকে চেয়ে রইলেন দুজনে।

“ওতে কারেন্ট এল কী করে?” লোকনাথদাদুর কথা শেষ হতে না হতেই বাড়ির সব কটা আলো নিভে গেল। লোডশেডিং।

“ওঃ, কলকাতা শহরে এই এক জ্বালা। যখন তখন লোডশেডিং। হায় আল্লা, কখন আলো আসে কে জানে?” রহমতচাচা মাথা দোলাচ্ছিলেন। মোমবাতি আনার জন্য পা বাড়ালেন তিনি, কিন্তু সাথেসাথেই আলো চলে এল।

“আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি?”

লোকনাথদাদুর কথা শুনে মুচকি হেসে রহমতচাচা বললেন, “ভালই তো হল হে, কিন্তু তুমি তো দেখছি তাতেও বিরক্ত।”

“না না, তা না। আসলে হঠাৎ করে কারেন্ট খেয়ে একটু ঘাবড়ে গেছিলাম,”বললেন লোকনাথদাদু।

আয়না পর্বটা এবার মন থেকে ঝেরে ফেললেন দুজনে। যে প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, তা নিয়ে জলঘোলা করে কোনও লাভ নেই।

“চল, ময়নার দোকান থেকে এক কাপ করে চা মেরে আসি।” রহমতচাচার কথায় সাথে সাথে একবারে রাজি হয়ে গেলেন লোকনাথদাদু। বিকেল থেকে মেজাজটা ঝিম মেরে ছিল। একটু আড্ডা দিলে হয়ত হালকা হয়ে যাবে।

বাইরে বেরিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক লাগছিল। আয়নার ব্যাপারটা মনে উঁকি মারছিল বটে, তবে সেটাকে তেমন আমল দিলেন না লোকনাথদাদু। দুজনে ময়নার দোকানের সামনে গিয়ে দেখলেন ময়না দোকানের শাটার তুলছে। রহমতচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, “কী জনাব, এখন সন্ধেবেলা দোকান খুলছ?”

ময়না একবার রহমতচাচার দিকে তাকাল। উনি ফের বললেন, “একটু আগেই তো দেখলাম দোকান খোলা? বন্ধ করে কোথাও গেছিলে নাকি?”

ময়না তখন বলল, “সারাদিনই তো খোলা থাকে, দুপুরেও ঘুমবো না নাকি?”

“মানে?” ময়নার কথা শুনে অবাক হয়ে লোকনাথদাদু বললেন, “তোমার দোকান তো দুপুরে খোলাই থাকে। সেই সকাল ছটা থেকে রাত দশটা।”

“আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠে ময়না বলল, সারাদিন দোকান খুলে রাখলে লোক আসবে? আর মাঝরাতে বন্ধ করে রাখলে লোকে কী খাবে? হাওয়া? কত লোক মাঝরাতে এখানে পাঁউরুটি আলুর দম খায় জানেন?”

“মাঝরাতে পাউরুটি!?” কিছুই বুঝতে পারলেন না লোকনাথদাদু। রহমতচাচা তখন ওঁকে চাপা গলায় বললেন, “চেপে যাও, মনে হয় অসময়ে পেটে কিছু পড়েছে। চল, চা খাই আর পালাই।” এবার গলা হাঁকিয়ে ময়নাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার লেবু চা হতে কতক্ষণ লাগবে?”

প্রসঙ্গ বদল হতে মনে হয় খুশি হল ময়না। হেসে বলল, “এই তো, বানান করে আপনার নাম বলার আগেই হয়ে যাবে চাচা।”

ময়নার দোকানের আট ফুট বাই এক ফুটের টেবিলটাতে জমিয়ে বসে আড্ডা শুরু হল রহমতচাচা আর লোকনাথদাদুর। সময়টা মার্চের প্রথম সপ্তাহ। গরম এখনও পড়েনি। ঠাণ্ডাটাও যায় যায়। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেবার এটা মোক্ষম সময়। দুজনে গল্পে মেতে উঠেছেন। এমন সময় একটা বিশেষ বিষয়ে লোকনাথদাদুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রহমতচাচা।

“একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছ লোকনাথ?”

“কী বলুন তো?”

“আমরা এখানে কতক্ষণ বসে?”

ঘড়ি দেখে লোকনাথদাদু বললেন, “এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে। কেন বলুন তো?”

“আমরা এখানে এসেছি ছটা নাগাদ। তখন রাস্তায় এত লোক দেখেছিলে? এখন প্রায় পৌঁনে সাতটা। এর মধ্যে রাস্তায় লোক কত বেড়ে গেছে দেখেছ?”

পথ চলতি লোকজনের দিকে তাকিয়ে লোকনাথদাদু একবার দেখে নিয়ে মাথাটা দুবার সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললেন, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন চাচা।”

রহমতচাচা তখন বললেন, "সন্ধেবেলা রাস্তায় লোকজন চলাচল করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু –"

ময়না মনে হয় ওঁদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল। বলল, "আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। লোকজনের তো কাজ আছে। সবাইকে তো কাজে বেরোতে হয়, তাই না চাচা?"

"ধুৎ!" ময়নার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে লোকনাথদাদু বললেন, "সন্ধেবেলা লোকে কাজে বেরোবে? মানুষ কি নিশাচর হয়ে গেছে?"

রহমতচাচা পাশ থেকে ময়নার চায়ের প্রশংসা করে বললেন, "যাই বল ভাই, চা'টা কিন্তু হয়েছে খাসা। এই জন্যই তোমার দোকানে আসি বেটা। তারপর লোকনাথদাদুকে বললেন, "জানো লোকনাথ, আগামী শনিবার আমার বেটাজান বোম্বাই থেকে ফিরছে।"

"তাই নাকি? এ তো দারুণ খবর। শনিবার কত তারিখ?"

"আজ বুধ, পাঁচ তারিখ। তাহলে শনিবার –"

"দু তারিখ," সাথে সাথে ময়না পাশ থেকে কড় গুনে বলে দিল।

"কী?" ময়নার কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে লোকনাথদাদু বললেন, "আজ পাঁচ তারিখ হলে সামনের শনিবার দু তারিখ হয়? ব্যাটা মর্কট কোথাকার! তখন থেকে ভুল বকছে। এবার রহমতচাচার দিকে ফিরে বললেন, আগামী শনিবার আটই মার্চ পড়ছে চাচা।"

"হ্যাঁ, আট তারিখেই আমার ছেলে ফিরবে। চিঠিতেও তাই লিখেছে।"

ময়না তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "আজ্ঞে আজ পাঁচ হলে শনিবার কী করে আট হয়? দুই'ই তো হচ্ছে?"

লোকনাথদাদু মনে হয় এবার ময়নাকে মেরেই দিতেন। রহমতচাচা ওঁকে সামলালেন। চা পর্ব শেষ করে দুজনে এবার সান্ধ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এক পা দু পা করে দুজনে কিছুটা পথ এগিয়েছেন, এমন সময় নজরে এল সাইকেল করে খবরের কাগজ দিতে বেরিয়েছে লকাই। অবাক হয়ে রহমতচাচা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কীরে, সন্ধেবেলা কাগজ দিচ্ছিস যে?"

প্রশ্নটা শুনে লকাই একটা রহস্যময় বাঁকা হাসি হেসে বলল, "তাহলে কি সকালে দেব?"

উত্তরটা হজম হতে না হতেই লোকনাথদাদুর নজর গেল রাস্তার ধারে আশেপাশের বাড়িগুলোর ওপর। ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে দু- একজন তখন হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙছে। বেশ কয়েক জন বয়স্ক লোকের মুখে রয়েছে নিমের দাঁতন। কেউ কেউ আবার রাস্তার ধারের কলগুলোতে স্নান করার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। জিনিসগুলো অদ্ভুত ঠেকল বটে, তবে এবারেও সেগুলোকে তেমন পাত্তা দিলেন না দুজনে। আরও দু পা এগিয়েছেন, এবার পাড়ার মোড়ে দেখা হল সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা হরনাথের সাথে।

"কী হে হরনাথ, কেমন আছ?" জিজ্ঞাসা করলেন লোকনাথদাদু।

হরনাথ হেসে বলল, "ভালো লোকনাথদা। চললে কোথায় এই সময়? অফিস যাবে না?"

"যাব না কী রে? আজ যাইনি। এখন আর কী যাব? আমাদের নাইট নেই রে।"

"ও, তোমাদের রোজ ডে শিফট?" চোখ বড় বড় হয়ে গেল হরনাথের।

"রোজ ডে মানে? তোর কি রোজ নাইট?"

"হ্যাঁ," লোকনাথদাদুর প্রশ্নটা শুনে কেন জানি বেশ অবাক হল হরনাথ।

"সেকী রে! এতে তো শরীর খারাপ হয়ে যাবে? রোজ রাতে না ঘুমিয়ে –"

"তা কেন? তাহলে তো দুনিয়াশুদ্ধু সবারই শরীর খারাপ হয়ে যেত। সবাই তো নাইটেই ডিউটি করে লোকনাথদা। কজন আর তোমার মত দুর্ভাগা যার কিনা রোজ ডে ডিউটি?" এবার মুখ দিয়ে চুক করে একটা শব্দ করে হরনাথ বলল, "ইসস, রোজ দুপুরে না ঘুমিয়ে কাজ করতে হয়। তোমার খুব কষ্ট তাই না?"

হরনাথের কথা শুনে রহমতচাচাও অবাক। বললেন, "কী পাগলের প্রলাপ করছ বলত?"

হরনাথ তখন বলল, "কীসের পাগলের প্রলাপ চাচা? ঠিকই তো বললাম।

লোকনাথদাদু তখন বললেন, "ছাড় ওসব কথা। তা এখন চললি কোথায়? কাজ থেকে ফিরলি?"

"আরে গেলাম কখন যে ফিরব? এই তো সবে যাচ্ছি।"

"মানে?"

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল রহমতচাচা আর লোকনাথদাদু, দুজনেই তখন গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন। প্রবল বিস্ময়ে মনের মধ্যে হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

খানিক বাদে সামলে নিয়ে বললেন, "তাহলে এই যে দেখলাম সকাল আটটার সময় অফিস যাচ্ছিলি?"

"সকাল বেলা কাজে যাব? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? সেই সময় আমি অফিস থেকে ফিরি।" বলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠল হরনাথ। এই রে, আটটা পাঁচ! আমাকে এবার যেতে হবে। সাড়ে নটার মধ্যে হাজিরা না দিতে পারলে আমার কপালে দুঃখ আছে। নতুন চাকরি। দুদিনেই "অতীত" কালে চলে যাবে।

রুদ্ধশ্বাসে পড়িমরি করে দৌড় লাগাল হরনাথ। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না লোকনাথদাদু আর রহমতচাচা।

"কী হচ্ছে বলুন দেখি?"

"কিছুই বুঝতে পারছি না লোকনাথ।"

দুজনের কপালেই তখন চিন্তার ভাঁজ। "আচ্ছা, ঘড়ি কি উল্টো চলছে?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন রহমতচাচা। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে লোকনাথদাদু বললেন, "কই না তো? এখন তো আটটা বেজে দশ।"

তাহলে? পৃথিবী কি উল্টো ঘুরছে? সময়টা শুনে যেন চিন্তাটা আরও বেড়ে গেল রহমতচাচার।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে আরও দু পা এগিয়েছেন। এমন সময় দেখা হল বারীনের সাথে। বারীন এনাদের দুজনকে খুব শ্রদ্ধা করে। ও পাড়ার মোড়ে কচুরি বিক্রি করে। ওর কচুরি ভবানীপুর অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত। একবার বিবিধ ভারতীতে ওর বানানো কচুরির কথা বলেছিল। রহমতচাচা আর লোকনাথদাদু, দুজনকে একসাথে দেখতে পেয়ে প্রণাম ঠুকে বারীন বলল, "চললেন কোথায় কত্তারা দুজনে একসাথে? তাও এই সন্ধে সন্ধে?"

বারীনের প্রশ্নটা অদ্ভুত ঠেকল লোকনাথদাদুর কানে। মনে হল সকাল সকাল কথাটাকেই বারীন নকল করে সন্ধে সন্ধে বলছে। কিন্তু কেন? তবু কৌতূহল চেপে উনি বারীনকে বললেন, “এই একটু হাঁটতে। তুমি?”

“আমি আর কোথায়? দোকান খুলব।” হেসে বলল বারীন।

“এত দেরিতে?” অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রহমতচাচা।

“হ্যাঁ। আজ সন্ধের খদ্দেরগুলো মার গেল। দেখি ভোর পাঁচটার সময় কত বিক্রি হয়?”

আবার কথার হেঁয়ালী! লোকনাথদাদু আর রহমতচাচা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বারীন এবার বলল, “আপনারা গায়ে গরম জামা গায়ে দেননি কেন? শীত কিন্তু বাড়ছে।” বারীনের কথা শুনে রহমতচাচা হেসে বললেন, “শীত আসতে এখনো এক বছর দেরি বারীন। এই তো সবে গেল।”

“গেল কী বলছেন?” রহমতচাচার কথা শুনে চোখ কপালে তুলে বারীন বলল, “আজ মাত্র মার্চের পাঁচ। এখনো ফেব্রুয়ারি, জানুয়ারি বাকি। ডিসেম্বর তো পড়েই আছে। তারপর না হয় নভেম্বরে একটু কমবে।”

“কী যা তা বকছিস?” এবার বারীনকে একটা ধমক দিয়ে রহমতচাচা বললেন, “মার্চের পর ফেব্রুয়ারি? ক্যালেন্ডার কি উল্টো চলছে? আমাদের সাথে ফিচলেমো হচ্ছে?”

“ছিঃ ছিঃ, এমন সাহস আমার?” জিভ কেটে বারীন বলল, “কিন্তু মার্চের পর ফেব্রুয়ারি না এসে কি এপ্রিল আসবে? আপনিই বলুন চাচা।”

কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পারলেন লোকনাথদাদু। আর কথা বাড়ালেন না বারীনের সাথে। ও চলে যেতে দুজনে আবার হাঁটা শুরু করলেন। কয়েক মুহূর্ত চলার পর রহমতচাচা মুখ খুললেন।

“কী হচ্ছে বলতো জনাব?”

অস্থির হয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে লোকনাথদাদু বললেন, “কিছুই বুঝতে পারছি না চাচা। ”

“সব কেমন উল্টো হচ্ছে নজর করেছ?”

“হ্যাঁ,” মাথা ঝোঁকালেন লোকনাথদাদু।

“কেন এমন হচ্ছে বল তো?”

“জানি না চাচা,” কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন লোকনাথদাদু।

“আমরা কি স্বপ্ন দেখছি?”

“না চাচা।”

“তাহলে?”

“অলৌকিক কিছু ঘটছে আমাদের সাথে।”

“সে কী!” চমকে উঠলেন রহমতচাচা। ফ্যাসফ্যাসে শোনাল ওঁর গলা। বললেন, “তাহলে উপায়?বলতে পারব না,” একটা ঢোঁক গিলে উত্তর দিলেন লোকনাথদাদু।

রহমতচাচা তখন ভয়ার্ত গলায় বললেন, “ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না বেটা। ওরা সবাই আমাদের সাথে মজাক করছে না তো?”

“সবাই এক সাথে মজা করবে কেন চাচা?”

দুজনে কথায় ব্যাস্ত, এমন সময় পাড়ার ছেলে বিভুকে দেখা গেল স্কুল ব্যাগ কাঁধে বাড়ির কাজের লোকের হাত ধরে স্কুলের দিকে চলেছে। সেটা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এক লোকনাথদাদুর মুখ থেকে।

“বিভুর চাচা পার্টির লিডার না?” জিজ্ঞাসা করলেন রহমতচাচা।

“হ্যাঁ,” বললেন লোকনাথদাদু।

“কী যেন নাম লোকটার?”

“ললিতমোহন।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ললিতমোহন। খুব হম্বিতম্বি করছিল সেদিন।”

দুজনে ললিতমোহনের কীর্তিকলাপ নিয়ে আলোচনা করতে করতে সামনের একটা সরু গলিতে ঢুকলেন। এমন সময় কোথা থেকে উদয় হলেন ললিতমোহন স্বয়ং। রাস্তার দুর্বল আলোতেও ওঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন ললিতমোহনের মুখটা। ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন। সাথে সাথে প্রসঙ্গ বদল করলেন দুজনে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল ওঁদের চোখের সামনে। ললিতমোহন আরও দু পা এগিয়েছেন, এমন সময় দুজন ষণ্ডামার্কা লোক এসে রাস্তা আটকে দাঁড়াল ওঁর। আচমকা লোকদুটোকে দেখে মুখটা পাংশু হয়ে গেল ওঁর। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই এবার লোকগুলোর মধ্যে একজন পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুড়ুম গুড়ুম করে পর পর ছটা গুলিই দেগে দিল ললিত মোহনের বুকে!

চোখের সামনে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে কল্পনাও করতে পারেন নি রহমতচাচা বা লোকনাথদাদুর মধ্যে কেউ। ললিতমোহন তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। রাস্তাটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তড়িঘড়ি ওঁর দিকে ছুটে গেলেন ওঁরা দুজনে। ষণ্ডা লোকগুলোও এর মধ্যে হাওয়া। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন দুজনে।

হঠাৎ সম্বিত ফিরল লোকনাথদাদুর, “চাচা, ললিতমোহন মার্ডার হয়েছিলেন গত মাসে! এই সময়! ঠিক এই জায়গায়!”

কথাটা শুনে রহমতচাচার শরীরটা কেঁপে উঠল। ভয়ে তখন দাঁতে দাঁত লেগে যাবার জোগাড়। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠলেন, হায় আল্লা, এও কী করে সম্ভব!”

দুজনেরই মাথা ঘুরতে শুরু করল এবার। আর বুঝতে বাকি রইল না কোন এক জটিল ভূতুরে প্যাঁচে জড়িয়ে পরেছেন দুজনেই। দরদরিয়ে তখন ঘাম ঝরছে দুজনের শরীর থেকে। আর একমুহূর্ত জায়গাটাতে থাকা নিরাপদ বোধ করলেন না ওঁরা। ডাইনে- বাঁয়ে না তাকিয়ে এবার সোজা ছুটতে শুরু করলেন দুজনে। প্রায় পনের মিনিট এক টানা ছোটার পর একটা ফার্নিচারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিলেন দুজনে। গলাও শুকিয়ে গেছে। একটু জল খাবার দরকার। সামনে এই ফার্নিচারের দোকানটা ছাড়া আর কোন দোকানও নেই আশেপাশে। অগত্যা সেটাতেই ঢুকে পড়লেন দুজন। এক অনুরধেই জল মিলল। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় লোকনাথদাদুর চোখ আটকে গেল সামনে রাখা একটা আলমারিতে লাগানো আয়নাটার ওপর।

আলমারির কাচে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন লোকনাথদাদু। কিন্তু কেমন যেন আলাদা। পুরো আকৃতিটাই যেন উল্টে গেছে। চুলের সিঁথিটা বাঁদিকে। অথচ উনি ডানদিকে সিঁথি করেন। বাঁহাতের ঘড়ি ডানহাতে চলে গেছে। জামার বুকপকেট বাঁদিকের বদলে দেখা যাচ্ছে ডানদিকে। সাথে সাথে সব কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ওঁর কাছে। আন্দাজ করতে পারলেন কেন সব কিছু উল্টো হচ্ছে। কেন হরনাথ সকালের বদলে রাতে অফিস যাচ্ছে। বুঝতে পারলেন ময়নার সারা রাত দোকান খুলে রাখার পেছনে রহস্যটা কী? অথবা রবিন কেন বলছিল মার্চের পর ফেব্রুয়ারি আসবে। আর কেনই বা বিভু সকালের বদলে রাতে স্কুল যাচ্ছিল। আর কেনই বা হয়ে যাওয়া খুনটা আবার ওনাদের চোখের সামনে ঘটল। আসলে ওনারা সময়ের উলটোদিকে চলছেন! এককথায় সময়ের বিচারে ওনারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন! আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই সব ঘটে চলেছে মোতিবিবির ওই আয়নাটার জন্যই। ওনারা অজান্তেই ঢুকে পরেছেন আয়নার জগতে যেখানে কিনা সব কিছুই বাস্তব জগতের উল্টো!

কথাটা রহমতচাচাকে জানাতে চোখ কপালে উঠে গেল ভদ্রলোকের। বললেন, “কিছু একটা করা দরকার।”

“আর অপেক্ষা নয়। এখুনি চলুন,” বললেন লোকনাথদাদু।

রহমতচাচাকে সাথে নিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চললেন লোকনাথদাদু। সোজা গিয়ে ঢুকলেন রহমতচাচার ঘরে। এগিয়ে গেলেন আয়নাটার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল দুজনের। সাহসে কুলোচ্ছিল না ওটার সামনে যাওয়ার। শেষে মনে জোর এনে আয়নাটার দিকে এগিয়ে গেলেন লোকনাথদাদু।

“যেও না বেটা, ওটা খতরনাক আছে।”

রহমতচাচার কোনও হুঁশিয়ারিই কানে নিলেন না লোকনাথদাদু। খপ করে ধরলেন রহমতচাচার হাতটা। “কী করছ বেটা?” আঁতকে উঠলেন রহমতচাচা। দাদু তাতে কান না দিয়ে হঠাৎ ওঁকে আয়নার কাচের ওপর ধাক্কা মারলেন। সাথে সাথে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন আয়নাটার ওপর। আবার একটা ঝটকা! আবার ছিটকে পরলেন দুজনে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়েছেন সবে, এমনসময় আবার লোডশেডিং। ঘন অন্ধকারের মধ্যে চোখজোড়া সইয়ে নিতে না নিতেই লাইট চলে এল।

সাথে সাথে ছুটে বাড়ির বাইরে গেলেন দুজনে। ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে দশটা। নজরে এল ময়না ওর দোকানের ঝাঁপি ফেলছে। বেশ কয়েকটা বাড়ির লাইট নিভে গেছে এর মধ্যে। রাস্তায় লোকজনও তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। এমন সময় হরনাথকে দেখা গেল সে তার ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরটাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। লোকনাথদাদুর সাথে চোখাচোখি হতে ও বলল, “সারাদিন ভীষণ খাটুনি গেছে লোকনাথদা, আর পারছি না।”

কথাটা শুনে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দুজনে।

গল্প শেষ করে বেশ কিছুক্ষন থম মেরে বসে রইলেন লোকনাথদাদু। এবার রহমতচাচার উদ্দেশ্যে বললেন, “আয়নাটা এখনো কেন ঘরে রেখেছেন চাচা?”

খক খক করে দুবার কেশে নিয়ে রহমতচাচা বললেন, "ওটা আমার জন্য খুব পয়মন্ত গো লোকনাথ। ওই দিনের পর থেকে আমার পসার দ্বিগুণ হয়েছে। আমার ছেলেও জীবনে অনেক উন্নতি করেছে। কোন বিপদ আমাকে ছুঁতে পারেনি।"

শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন লোকনাথদাদু। বললেন, "ভাল হলেই ভাল।"

রহমতচাচা এবার উঠে আয়নাটার সামনে গিয়ে বললেন, "এটার সেই ভয়ানক শক্তিটা আর নেই। বলে ডান হাতটা আয়নাটার কাচে বেশ কয়েকবার ঘষে নিয়ে বললেন, আজ আমি পচানব্বই বছরের ইনসান। আর তোমার বয়স কত?"

একটা ঢোঁক গিলে লোকনাথদাদু বললেন, "পয়ষট্টি।"

রহমতচাচা তখন হেসে বললেন, "আজ মাসের পাঁচ তারিখ। কাল নিশ্চয় ছয়?"

এবার হাসি ফুটল লোকনাথদাদুর মুখে। মুচকি হেসে মাথাটা দুবার মাথাটা সামনের দিকে ঝোঁকালেন লোকনাথদাদু।

ফেরার আগে কিডো একবার সাহস করে আয়নাটার কাচে হাত বুলিয়েছিল। তার আগে ও অবশ্য ঘড়ি আর ক্যালেন্ডার দুটোই দেখে নিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে পাড়ায় টিটুদার সাথে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করল, "কাল কত তারিখ?"

টিটুদার উত্তরটা ছিল "ছয়"। তবু স্বস্তি পায় নি ও। বাড়ি গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কি সন্ধেবেলা কেক আনতে বেরোবে? শুনে মা বললেন, "কেক তো তোমার বাবা সকালেই এনেছেন। আবার বিকেলে আনবেন কেন? কাল বরঞ্চ স্কুল যাবার আগে একটু খেয়ে যেও। আজ দুপুরে বিরিয়ানি খেয়েছ। তাই এখন আর দিলাম না। শরীর খারাপ হতে পারে।"

স্বপ্নের কাতুকুতু

উদয়ারুণ রায়

নির্জনের ভূতের গল্পে খুব ভয়। বয়স বারো কী তেরো হবে। সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। পড়াশুনোয় একদম গবেটও নয় আবার খুব যে মেধাবী তাও নয়। মোটের উপর ক্লাস টপকাতে তার খুব একটা অসুবিধে হয় না। নির্জনদের বাড়ি কলকাতা শহর ছাড়িয়ে আধাশহর মতো অঞ্চলে। কলকাতা যেতে বাসে লাগে একঘন্টা কুড়ি মিনিট, ট্রেনে ঘণ্টাখানেক। তাদের অঞ্চলে যেমন পিচের রাস্তা আছে, ঢালাই কংক্রিটের গলি আছে, তেমন ফাঁকা জমিও আছে। বড়ো-ছোটো পুকুরও আছে। এঁদো ডোবাও আছে। টিনের বা টালির চালের বাড়ি আছে, আর খুব মশাও আছে।

নেই যেটা সেটা হল ধান-জমি বা ক্ষেত-জমি। চাষবাস এ অঞ্চলে হয় না। এ অঞ্চলে মানুষজন হয় ব্যবসায়ী নয়তো চাকরি করে।

নির্জনের বাবার স্টেশন বাজারে বড়ো ও আদি বইয়ের দোকান। স্কুলের বই, কলেজার বই, গল্পের বই, খাতা, পেন, পেনসিল সব পাওয়া যায় সেই দোকানে। নির্জনের বাবা আর কাকা মিলে দোকানটা চালায়। সঙ্গে একটা অল্পবয়সী কর্মচারী। নিজেরা থাকতেও কর্মচারী আছে মানেই দোকানটা ভালোই চলে। আর ওই চালু দোকানের সূত্রেই নির্জনের যতরকম গল্পের বই পড়া।

স্কুলের পরে বাড়ি ফিরে নির্জন খুব একটা খেলাধুলো করে না। কারণ খেলাধুলো করলে সে খুব ক্লান্ত হয়ে যায়। সন্ধেবেলা পড়তে বসলে ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে পড়ে। ঘুম পেয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়লে হোমটাস্ক হয় না। হোমটাস্ক না হলে পরদিন ক্লাসে স্যারদের কাছে বকুনি খেতে হয় বা বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেটা খুবই অপমানের। তাই নির্জন না খেলে গল্পের বই পড়ে। ওর ভূতের গল্প আর গোয়েন্দা গল্প পড়তে সব থেকে বেশি ভালো লাগে কিন্তু দুটোতেই ও বেশ ভয় পায়। গা ছম ছম করে।

নির্জনদের বাড়িটা পাড়ার শেষ প্রান্তে। পেছনে একটা ছোটো মাঠ। মাঠের শেষ একটা এঁদো পুকুর। পুকুরের ধারে কিছু দুর ছাড়া ছাড়া তাল ও নারকেল গাছ। একধারে একটা কলাগাছের ঝোপও আছে। পাড়ার সবাই ওটাকে বোসেদের বাগান বলে। বোসরা এ পাড়ায় সবচেয়ে বড়োলোক। তারা কেন যে এই এঁদো জায়গাটা কিনে ফেলে রেখেছে তা নির্জনের মাথায় ঢোকে না।

নির্জনের পড়ার ঘরটা আবার দোতলায় বাড়ির পেছন দিকে। টেবিলের পাশের জানলা দিয়ে ওই এঁদো জায়গাটা দেখা যায়। কোনো ভয়ের গল্প পড়ার পর, সে ভূতেরই হোক আর খুনেরই হোক, রাতে জানালা দিয়ে ওই এঁদো জায়গাটার দিকে তাকাতেই নির্জনের বেশ ভয় করে। মনে হয় ওই অন্ধকার কলাঝোপের পেছনেই ঘটেছে খুনের ঘটনাটা বা খুনি খুন করে ওই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ভূতের গল্পের ভূতগুলো যেন তাল ও নারকেল গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। ঝুপ ঝুপ করে নামছে নিচের পচা ডোবাটায় স্নান করতে। ওই নোংরা জলে স্নান করছে আর হিঁ হিঁ করে হাসছে। আবার এক লাফে উঠে যাচ্ছে তাল, নারকেল গাছের মাথায়।

শীতকাল তবু কিছুটা বাঁচোয়া, ঠাণ্ডার জন্য রাতে ওই জানালাটা বন্ধ থাকে কিন্তু গরমকালে জানালাটা খোলা। ভয়ে যদি কোনোদিন নির্জন বন্ধ করে দেয় তবে মা খুব বকে। জানালাটা তো খুলে দেয়ই। বলে, "গরমে মানুষ সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আর তুই জানালা বন্ধ করে রেখেছিস! তোর কি গরমও লাগে না?"

নির্জন চুপ করে থাকে। লজ্জায় সে তার ভয়ের কথা মাকে বলতে পারে না। বললেই মা সাত-কান করবে আর বাড়ির কাকা-পিসিরা দাদা-দিদিরা ওকে ভীতুর ডিম বলে খেপাবে।

মাঝে মাঝে ভাবে, সে ভূতের বই আর ডিটেকটিভ বই পড়বে না। কারণ সে পড়ে ফেলে আর ভয় পায়। শুধু যে তার ওই বাড়ির পেছনের ফাঁকা এঁদো জায়গাটাতে তাকাতে ভয় তা নয়, একা বাথরুম যেতেও তার ভয় করে। দোতলার পড়ার ঘর থেকে মা বা বাবা অথবা অন্য কারুর ডাকে রাতে একা সিঁড়ি দিয়ে নিচে যেতেও তার ভয় আবার নিচ থেকে একা ওপরে পড়া বা শোবার ঘরে যেতেও তার ভয়। সে মনে মনে স্বীকার করে যে সে একটা ভীতু ছেলে। মুখে অবশ্য সে কথা কাউকে বলে না।

সূর্যের আলো ফুটলেই অবশ্য তার ভয় কোথায় ফুস করে উড়ে যায় সে বুঝতেই পারে না। সারাদিন দাপিয়ে বেড়ায় বীরের মতো। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করে একাএকাই টিউশন যায়। টিউশন থেকে এসে স্নান খাওয়া সেরে পুলকারে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে এসে হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলখাবার খেয়ে সে গল্পের বই নিয়ে ছাদে চলে যায়। প্রথম কিছুক্ষণ ছাদে ঘোরাঘুরি করে, তারপর চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসে গল্পের বই পড়ে যতক্ষণ না সূর্যের আলো নেভে। অন্ধকার হলে তাকে ভয়ও এসে ধরে।

****

এরকমই চলছিল নির্জনের। অন্ধকারের ভয় তাকে কিছুতেই ছাড়ছিল না। একবার হল কী-তখন নির্জনের স্কুল ছুটি। সদ্য দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। এরপর লক্ষ্মীপুজো আর তারপর কালীপুজো। নির্জনের অনেক নতুন জামাকাপড় হয়েছে। আবার অনেক নতুন পুজোসংখ্যা আর বইও হয়েছে। পুজোর চারদিন তার নতুন পুজোসংখ্যাগুলো ছুঁয়েও দেখা হয়নি। সারাদিন কেটেছে পাড়ার প্যাণ্ডেলে আর রাতে বাবা-মা'র সঙ্গে কোলকাতার প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঠাকুর দেখে দেখে।

সে দিনটা ছিল বিজয়া দশমীর পরের দিন। দুপুরবেলা। নির্জন স্নান খাওয়া সেরে নিজের পাড়ার ঘরে "টাপুরটুপুর" পুজোসংখ্যাটা নিয়ে বসেছে পড়বার জন্য। তার পুজোসংখ্যার গল্প পড়বার একটা কায়দা আছে। সে প্রথম বইটা নিয়ে ছড়া ও কবিতাগুলো পড়ে ফেলে। তারপর গল্প উপন্যাসের ছবিগুলো দেখতে থাকে। যে গল্প বা উপন্যাসের ছবি তার সবথেকে ভালো লাগে সেই গল্প বা উপন্যাসটা সে প্রথমে পড়তে শুরু করে।

এবার যে গল্পের ছবিটা তার সবথেকে ভালো লাগল সেটা একটা হাসির গল্প। তার ভূতের বা ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভালো লাগলেও সে হাসির গল্প দিয়েই বই পড়া শুরু করল। গল্পটার নাম "কাতুকুতু বুড়ো"।

গল্পটা বেশ মজার। নির্জন গল্পটা পড়তে পড়তে হাসতে শুরু করল। যত পড়ে তত হাসে।

হাসতে হাসতে হঠাৎ তার চোখ গেল জানালা পেরিয়ে এঁদো ডোবার পাড়ে। আনমনে দেখল একটা বুড়ো। অনেকটা কাতুকুতু বুড়োর মতো ছাঁটা গোঁফ, ড্যাবা চোখ, একমাথা টাক ও ইয়া এক জালা ভুঁড়ি নিয়ে একটা তালগাছের ছায়ায় বসে আছে।

প্রথমে নির্জন গল্পের নেশায় তেমন মন দিয়ে বুড়োটাকে খেয়াল করেনি। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, আরে! কী দেখলাম! গল্পের কাতুকুতুদাদু যেন এঁদো পুকুরের ওই পাড়ে! ঠিক দেখলাম তো!

যেই না মনে হওয়া অমনি সে বই থেকে মুখ তুলে জানালা দেখল। হ্যাঁ তো! একদম গল্পের কাতুকুতুদাদু! হুবহু মিলে যাচ্ছে! সেই জালা ভুঁড়ি, এক মাথা টাক, ড্যাবড্যাবে চোখ, ঝাঁটার মতো পাকা গোঁফ! গল্পের মানুষটা ওখানে কী করে?

আর একবার দু চোখ কচলে ভালো করে দেখল নির্জন।

হ্যাঁ, একদম এক।

তাকে জানালা দিয়ে একদৃষ্টে দেখতে দেখে লোকটা হাতের ইশারায় তাকে ডাকল। নির্জন ভাবল আরে, বুড়োটা আবার ডাকে দেখি!

সাধারণত ওই এঁদো পুকুরের ওপাড়ে তেমন কারও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু ওর মতো ছোটোছেলেরা মাঝে-সাঝে যায় কাটা ঘুড়ি ধরতে। পাড়ার দু-একটা বখে যাওয়া উঁচু ক্লাসের দাদাদের নির্জন জানালা দিয়ে দেখেছে ভরদুপুরে বা সন্ধের মুখে ওপাড়ে গিয়ে দলবেঁধে কী যেন করতে। আর ছোটকাকার মুখে শুনেছে রাত বিরেতে ওপাড়ে চোর-ছ্যাঁচ্চড়দের আড্ডা বসে।

নির্জন রাতে ভয়ের চোটে পারতপক্ষে জানালা দিয়ে ওদিকে তাকায় না সে। তবু বুড়োটার প্রতি তার একটু কৌতুহল হল। বুড়োটা যে একদম কাতুকুতু বুড়োর মতো দেখতে! আর গল্পে কাতুকুতু বুড়ো খুব মজার মানুষ। কী হাসতে পারে! তাছাড়া এখন তো দিনের বেলা। ভরদুপুর। দিনের বেলা নির্জন মোটে ভয় পায় না। রাতের অন্ধকারেই তার যত ভয়।

সে জানালা দিয়ে হাত নেড়ে বুড়োকে বসতে বলল। তারপর বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে সে রাস্তা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে গেল। তারপর পুকুরের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ঝোপঝাড় পেরিয়ে সোজা বুড়োর তালতলাতে গিয়ে হাজির।

নির্জনকে দেখে বুড়োটা ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো পিট পিট করে হাসতে লাগল।

নির্জন বলল, ”কী গো তুমি আমাকে ডাকলে কেন? তুমি থাকো কোথায়? এখানে এলে কী ভাবে? আগে কখনো তো তোমাকে দেখিনি? তোমার নাম কী?”

বুড়ো এবার একগাল হেসে তামাক খাওয়া ক্ষয়াটে দাঁত বের করে বলল, ”আমার নাম বৈকুন্ঠ মল্লিক।”

“কী? তোমার নাম বৈকুন্ঠ মল্লিক?” বিস্মিত হয়ে নির্জন জিজ্ঞাসা করল। গল্পেও তো কাতুকুতু বুড়োটার নাম বৈকুন্ঠ মল্লিক। দেখতে এক আবার নামও এক! বেশ আশ্চর্য হল সে।

তার অবাক হওয়া ভাব দেখে বুড়ো হেসে প্রশ্ন করল, ”কেন আমার নামটা তোমার সঠিক বলে মনে হল না?”

“না ঠিক তা নয়! আসলে...” মনের ভেতরের বিস্ময়টা আর প্রকাশ করল না নির্জন।

“তোমাকে জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে ডাকলাম। বই পড়ছিলে, তোমার পড়ার ক্ষতি করলাম না তো?”

“না, না, আমি তো গল্পের বই পড়ছিলাম। পড়ার বই নয়। তা তুমি আমাকে ডাকলে কেন?”

“ডাকলুম তোমার সঙ্গে একটু গল্প-গাছা করব বলে। একা একা বসে আছি। অনেকদিন তোমাদের মতো ছোটোদের সঙ্গে আড্ডা মারা হয় না। আমি ছোটোদের সঙ্গে আড্ডা দিতে খুব ভালোবাসি।”

“তা তুমি আসছ কোথা থেকে?”

“ওই ওখান থেকে-”

গল্পে আছে কাতুকুতু বুড়ো যে জায়গায় থাকে সে জায়গার নাম অচিনপুর। টক করে সে কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে নির্জন বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি যেখানে থাক সে জায়গাটার নাম কি অচিনপুর?”

হ্যাঁ, ঠিক তো। একদম ঠিক বলেছো তুমি! জানলে কীভাবে?”

“না, মানে...”

“অ্যাই ছোঁড়া, কথা ঠিক করে বল তো! প্রশ্ন করলেই তুমি খালি আমতা আমতা করছ!”

“না তেমন কিছু নয়। আচ্ছা দাদু, তুমি কি কেরামতি সরখেলকে চেন?”

“সে আবার কেডা?” অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল বুড়োটা।

“ওহ, সে একজন লেখক। ছোটোদের দারুণ গল্প লেখে।”

“না, বাবা। আমি তাকে চিনি নে। আমি তেমন লেখাপড়াই শিখিনি। গল্প পড়া আমার সাধ্যে নেই। তা হঠাৎ কেরামতি সরখেলের কথা এল কেন আমাদের মাঝখানে?” বুড়ো দাদুর গলাটা কেমন যেন গম্ভীর শোনাল।

“না, মানে আমি জানালার সামনে বসে যে গল্পটা পড়ছিলাম সেই গল্পটা কেরামতি সরখেলের লেখা। গল্পটা খুব হাসির। গল্পটার নাম কাতুকুতু বুড়ো। তোমাকে ঠিক গল্পের বুড়োটার মতো দেখতে। তোমার সঙ্গে নামেও মিল আবার তুমি যে জায়গায় থাকো বলছো সেই জায়গার নামেও মিল। তাই আমার

মনে হল কেরামতি সরখেল হয়তো তোমাকে দেখেই গল্পটা লিখেছেন। তা এমনও হতে পারে তুমি তাঁকে চেন না কিন্তু তিনি তোমাকে চেনেন!"

যেই একথা বলেছে নির্জন অমনি বুড়োটা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, "না বাপু আমি তোমার ওই কেরামতিবাবুকে চিনি না। গল্পের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দেওয়াটা তোমার লেখকের কেরামতি। তবে আমাকেও এলাকায় সবাই কাতুকুতু বুড়ো বলেই ডাকে। কারণ তোমার মতো ছোটো ছেলেদের দেখলেই আমার শুধু কাতুকুতু দিতে ইচ্ছে করে। আমি খুব মজা পাই ছোটো ছেলেদের কাতুকুতু দিয়ে।"

এ কথাগুলোও সব মিলে যাচ্ছে গল্পের সঙ্গে। কিন্তু নির্জন আরও বিস্মিত হতে পারল না। "এই কী করছো, কী করছো-" বলে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল। কারণ ততক্ষণে কাতুকুতু বুড়ো উঠে নির্জনকে কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে।

হাত পা ছুঁড়েটুরে যখন নির্জন বুঝল কাতুকুতু বুড়ো তাকে ছাড়বেই না তখন সে কাঁকড়াবিছর মতো ছটফট করতে করতে কাতুকুতুবুড়োর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এঁদো পুকুরের দিকে ছুটতে শুরু করল।

ঠিক এমন সময় মা-র ঠেলায় তার ঘুম ভেঙে গেল। মা বললেন, "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাত পা ছুঁড়ছিস কেন? তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে ভালো জামা প্যান্ট পরে নে। মামাবাড়ি যাবি না? দাদু-দিদুনকে বিজয়ার প্রণাম করতে হবে তো!"

নির্জন চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথায় কী? কোথায় জানালার পাশে পড়ার টেবিল আর কোথায় বাড়ির পেছনের এঁদো পুকুর। "টাপুর টুপুর" পুজোসংখ্যা নিয়ে সে মা-র পাশে শোবার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। স্বপ্নের কাতুকুতু বুড়োটা একদম গল্পের কাতুকুতু বুড়োটার মতো নয়। কী জোর কাতুকুতু দিচ্ছিল! মা সময়মত ডেকে না দিলে নির্ঘাৎ কাতুকুতুর ঠেলায় সে এঁদো পুকুরে পড়ে যেত। স্বপ্নটা একদম পচা। এর থেকে ঢের ভালো মার সঙ্গে মামা বাড়ি গিয়ে-দাদু দিদুন, মামা-মামিকে প্রণাম করে ভালো ভালো মণ্ডা-মিঠাই খাওয়া।

ছবিঃ তন্ময় বিশ্বাস

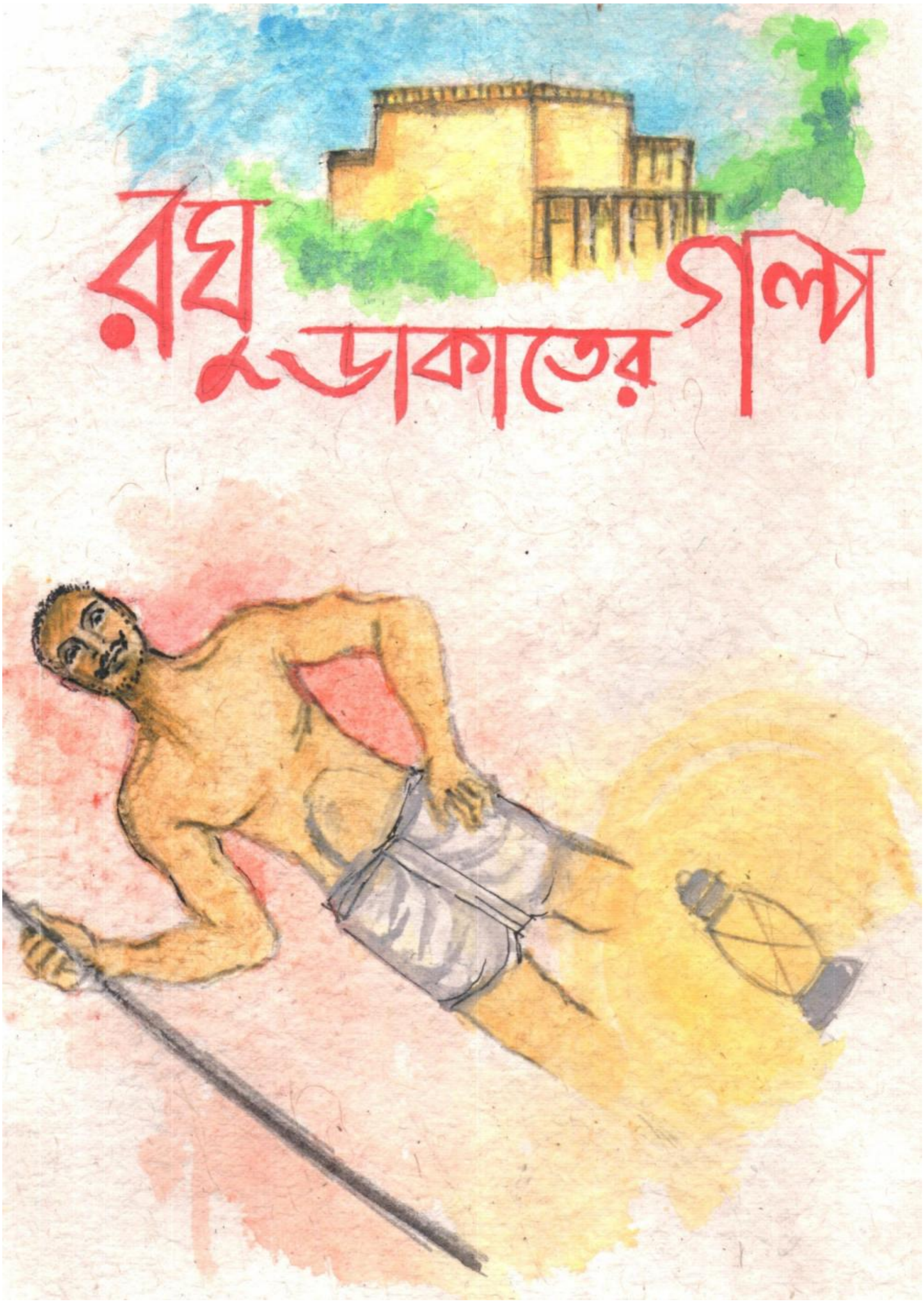

তরুণকুমার সরখেল

ঋক তার ঠাকুমা আর বাবার কাছে দেশের বাড়ির অনেক গল্প শুনেছে। তাদের দেশের দোতালা বাড়িটা বাবার ঠাকুরদা স্বর্গীয় রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বানিয়েছিলেন। ঋক কখনো এরকম বাড়িতে থাকেনি। ঘরের দেওয়ালগুলো খুব চওড়া বলে বাইরের তাপ ভেতরে ঢুকতে পারেনা। তবে একটা অসুবিধে হল ঘরে কোন জানালা নেই। ঋক শুনেছে আগেকার দিনে গ্রামের বাড়িগুলো এরকমই হত। চোরেদের ভয়ে ঘরে জানালাই থাকত না। শুধু একটা মাত্র প্রধান দরজা থাকত, তাও আবার বেশ ভারী আর শক্ত কাঠে তৈরি।

চওড়া দেওয়ালের পুরনো দিনের ঘরগুলোতে ধুলো জমেছে প্রচুর। সনাতনদা গতকাল থেকেই ঝাড়পোছের কাজে লেগে পড়েছে। উপরের দুটো ঘর এখনো বন্ধ হয়েই পড়ে আছে।

বেশ মজবুত। তালাটাও অন্য ঋক ঠাকুমাকে গিয়ে বলল, "উপরের দুটি ঘরই তো তালা বন্ধ। চাবি কোথায়?"

ঠাকুমা বলল, "চাবি আছে নীচের ঘরের আলমারিতে। "

ঋক এক ছুটে আলমারি থেকে চাবির গোছা নিয়ে এল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর একটা ঘরের তালা খুলতে পারল। এ ঘরটাতেও প্রচুর ধুলো- ময়লা- ঝুল জমেছে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় খাট পাতা। একদিকে জলচৌকি আর একটা কাঠের চেয়ার পাতা রয়েছে। দেওয়ালের পলেস্তারা দু'এক জায়গায় খসে পড়েছে। মনে হয় অনেকদিন ব্যবহার হয়নি এই ঘরটা।

সনাতনদা বলল, "তুমি পাশের ঘরটা খোল দেখি। আমি ততক্ষণে এই ঘরের ঝুলটুল গুলো ঝেড়ে ফেলি। "

ঋক চাবি নিয়ে পাশের ঘরটায় চলে এল। এই ঘরের দরজাটা ধরণের। ঋক এরকম তালা আগে দেখেনি। সে একটার পর একটা চাবি লাগিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু না, কিছুতেই খুলতে পারল না। সনাতনদা পাশের ঘর থেকে একবার ডাক পড়ল, "কই খোকাবাবু দরজা খোলার শব্দ পেলাম না তো। তালায় জং ধরেছে মনে হচ্ছে। একটু তেল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। "

ঋক কী যেন একটা ভাবল। তারপর তালাটার মধ্যে গোপন কোন ফুটো আছে কি না দেখতে লাগল। সত্যিই তাই। তালাটার ডানপাশে ছোট্ট একটি ঢাকনা খুঁজে পেল সে। ঢাকনাটা আঙুল দিয়ে টেনে তুলতেই চাবি ঢোকানোর জায়গাটা পেয়ে গেল।

এই ঘরটা ছিল ঠাকুরদার পড়ার ঘর। ঘরের তিনটে দেওয়ালেই বইয়ের আলমারি। প্রচুর সংগ্রহ ছিল ঠাকুরদার। প্রতিটি আলমারির গায়ে সাদা রং দিয়ে আলমারিতে কি ধরণের বই ও কোন কোন লেখকের বই আছে তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে। বনৌষধি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতগোবিন্দ, ভারতের

সাধক, বিদেশি অনুবাদ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্র- মানিক- তারাশঙ্কর- বিভূতিভূষণ কে নেই এই ঘরে। তবে সবকিছুর মধ্যেই পাতলা ধুলোর আস্তরণ।

ঋক সকাল থেকে পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখল। ঘুরতে ঘুরতে নীচের একটা ঘরে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরটি খুবই সাধারণ কিন্তু ঋক দেখল পশ্চিম দেওয়ালের উপর ছোট্ট একটি দরজা।

"এই দরজা দিয়ে কি বাইরে যাওয়া যায়?" ঋক ঠাম্মার কাছে জানতে চাইল।

"না, এটা চোরকুঠুরি। আসলে ছাদে ওঠার সিঁড়ির নীচে আগেকার দিনে এরকম একটা চরকুঠুরি তৈরি করা হত। চোরদের নজর এড়ানোর জন্য চোকুঠুরিতে কাঁসা- পেতলের জিনিসপত্র, সোনা- রুপোর গয়না রেখে দেওয়া হত, " ঠাম্মা হেসে বলল, "এই চোরকুঠুরিটার মধ্যেও সেরকম কোন গুপ্তধন লুকানো থাকতে পারে।"

ঋক বলল, "একবার দরজাটা খুলে দেখব?"

ঠাম্মা বলল, "ভেতরটা অন্ধকার। তাছাড়া ভেন্টিলেটার দিয়ে যত রাজ্যের চামচিকে ঢুকে এই চোরকুঠুরিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভেতরটা ভ্যাপসা গন্ধে ভরে আছে। ঢোকাই দায়।"

ঋক তার বাবার কাছে গ্রামের বাড়ির অনেক গল্প শুনেছে কিন্তু এই চোরকুঠুরির গল্প কোনদিন শোনেনি। আসলে ঋক কিছুদিন আগে একটা গল্প পড়েছিল। সেখানে ঘর লাগোয়া এরকম একটি ছোট্ট দরজা দিয়ে একটি সুড়ঙ্গপথে ঢোকা যেত। তাতেই তার এত আগ্রহ।

ঋক সে আগ্রহ মেটাতে একটি ছোট্ট টর্চলাইট এনে চোরকুঠুরির দরজা খুলে বাইরে থেকে উঁকি মারল। প্রথমেই তার নজর পড়ল তিনচারটে চামচিকে ঘরের সিলিং ধরে উলটো হয়ে ঝুলে আছে। ভ্যাপসা গন্ধ তার নাকে ঢুকছিল। ঘরের মেঝেতে ধুলো জমে রয়েছে। দেওয়াল জুড়ে মাকড়সার জাল। দেওয়ালের এক কোণায় একটি মরচে পড়া বল্লম ছাড়া ঘরে আর তেমন কিছু নেই।

ঋকের স্কুলে এখন গরমের ছুটি। সে ও ঠাম্মা আগেই গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছে। মা আর বাবা আসবে আরো দু'দিন পর। চোরকুঠুরি লাগোয়া ঘরে একটা বুকশেল্‌ফ থাকায় ঋকের এই ঘরটাই খুব পছন্দ হয়ে গেল।

ঘুমটা সবে একটু ধরেছিল এমন সময় কে যেন ডাকল, "খোকাবাবু, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

ঋক একবার ডাক শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। সে কি তবে স্বপ্ন দেখছিল!

তার মনের কথা বুঝতে পেরেই কে যেন আবার বলল, "না খোকাবাবু, স্বপ্ন নয়। আমি রঘু। আমিই তো তোমায় ডাকছিলাম। "

ঋক ভালো করে তাকিয়ে দেখল তবু কাউকেই দেখতে পেল না। একটু দূরে ঠাম্মা একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখেছিল। ঋক খাট থেকে হ্যারিকেনের

আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল। আর তখনই সে দেখতে পেল একজন দশাসই লোক তার খাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির গায়ে চাদর। হাঁটুর উপরে ধুতি। খালি পা। মাথায় কদমছাঁট চুল। হাতে একটা মরচে পড়া বল্লম। লোকটা ঋকের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে।

"তুমি কে?"

"ওই যে বললাম খোকাবাবু, আমি রঘু। রঘু ডাকাত! তবে সত্যিকার নয়। রঘু ডাকাতের অরিজিনাল ভূত। আসলে আমার সময়ে অনেক নকল রঘু ডাকাতও ছিল কি-না, তাই।"

"তা তুমি এতদিন পরে এখানে কেন? আমরা তো আজকেই এখানে এসে পৌঁছেছি। সে সংবাদ তুমি পেলে কেমন করে?"

রঘু এবার তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত চালিয়ে বলল, "সে অনেক কথা। সেই গল্প শোনাব বলেই তো মাঝরাত্রে তোমার কাছে আসা। তবে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। যা কিছু বলব সংক্ষেপেই বলব। ওই যে চোরকুঠুরিটা দেখছো আমি এখন ওখানেই থাকি। অবশ্য যখন বেঁচে ছিলাম তখনও টানা তিন-দিন ওই চোরকুঠুরিতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাদের কত্তা মানে তোমার বাবার ঠাকুরদা আমায় এখানে থাকতে দিয়েছিলেন। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো? না হবারই কথা। তখন ইংরেজদের শাসন চলছিল এদেশে। এই গ্রামের লোকেদের উপরও টেলার চার্চার ও তার বাহিনী একবার হামলা করেছিল। গ্রামের গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমি থাকতাম কুস্তোড় পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গলে। টেলার চার্চার সাহেবের বাহিনীর হামলা আটকাতে আমি তোমাদের এই গ্রামে এসে কত্তাবাবুর সাথে যুক্ত হই। ডাকাতি করে যে সব সোনা-দানা পেয়েছিলাম সে সব কত্তাবাবুর হাতে তুলে দিই। তিনি সেই টাকা দেশের কাজে লাগালেন। পরে ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাকে ধরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলে আমি এই চোরকুঠুরিতে আত্মগোপন করেছিলাম। তারপর পালিয়ে মোহনপুরা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি।"

ঋক বলল, "এসব ঘটনা আমাকে তো কেউ কোনদিন শোনায়নি!"

রঘু অনেকক্ষণ ধরে বল্লমটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে ছিল। এবার সেটা ডানহাতে নিয়ে বলল, "শোনায় নি তো কী হয়েছে? আমি তো শোনালাম। এই রে, গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল দেখছি! এ বার তুমি ঘুমিয়ে পড়, কেমন?"

ঋক বলল, "বল্লমটায় মরচে পড়ে গেছে যে। এই বল্লমে কোন কাজ হয়?"

"কাজ না হলেও এটা আমাকে হাতে রাখতে হয়, আমি যে রঘু ডাকাত খোকাবাবু সেটা ভুলে গেলে চলবে?"

হঠাৎ সাত আটটা চামচিকে এসে মাথার উপর ফরর্ ফরর্ করে উড়তে লাগল। তাদের ডানা ঝাপটানির চোটে রঘু বিরক্ত হয়ে সুড়ুৎ করে চোরকুঠুরিতে ঢুকে পড়ল।

“এত বড়ো দশশাই চেহারার লোকটা ঐ ছোট্ট দরজা দিয়ে এত সহজে ঢুকল কী ভাবে?” ভাবল ঋক।

চামচিকেগুলো এবার ঋকের মাথার কাছে পাক খেতে লাগল। দু’একবার তার মাথার চুলও ছুঁয়ে গেল। ঋক হুশ-হাশ শব্দ করে হাত দিয়ে সেগুলোকে তাড়াতে লাগল।

ঠিক তখনই ঠাম্মা পাশের ঘর থেকে এসে বলল, “ভয় পাস না ঋকসোনা, ওগুলো ভোরবেলায় এভাবেই ফর্ ফর্ করে উড়তে থাকে। তুই চোরকুঠুরির দরজা খুলে রেখেছিস বলেই ওগুলো ঘরে ঢুকে গেছে।”

ঠামার কথায় ঋকের চোখ থেকে ঘুমটা ভালো করে কেটে গেল। বিছানায় বসে ঋক চোরকুঠুরির দিকে তাকিয়ে রইল। সে সারারাত ধরে কি স্বপ্নই না দেখেছে! রঘু ডাকাত! টর্চার সাহেব!

আসলে রাত্রিবেলায় ‘বাংলার ডাকাত” বইটা পড়তে পড়তে সে ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। আর ঘুমের মধ্যে চোরকুঠুরিতে দেখা মরচে পড়া বল্লমটা হাতে নিয়ে রঘু ডাকাত অবলীলায় তার স্বপ্নে এসে হাজির। আবার মজার কথা স্বপ্নটা আবার পুরো স্বপ্নও নয়। ভোরবেলায় ঘর জুড়ে চামচিকেরা সত্যিসত্যিই ঘোরাফেরা করছিল। সব মিলিয়ে ঋকের স্বপ্নটা বেশ জমজমাট। এমনকি যে রঘু ডাকাতের ছবিটা সে বইয়ের পাতায় দেখেছে, স্বপ্নের রঘুও অবিকল সেরকমই। ঋক খোলা বইটা বন্ধ করে শেলফে রেখে দিল।

কৌতূহল মেটাতে স্নানের আগে ঋকি একবার চোরকুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। সিলিং থেকে অনেকগুলো চামচিকে ঝুলে আছে। মেঝেতে প্রচুর ধুলোবালি। ঘরের ডানদিকে ছোট্টো একটি সুড়ুঙ্গ। ঋক সেখানে টর্চের আলো ফেলে একটা টিনের বাক্স আবিষ্কার করল। বাক্সে কি গুপ্তধন রয়েছে?

বাক্স খুলে ঋক যা পেল তা গুপ্তধনের চেয়ে কম কিছু নয়! একটা আতসকাচ, বেশ কিছু পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজ। সে ধুলো ঝেড়ে খবরের কাগজটার নাম পড়ে দেখল, “তরুণশক্তি”। আরো দু’একটি হাবিজাবি জিনিসের পরে সে খুঁজে পেল আসল গুপ্তধন। কাচ দিয়ে বাঁধানো একটা মানপত্র। মানপত্রটি শ্রীযুক্ত রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মানে রঘু আঙ্কেলের কত্তাকে দিয়েছিলেন “তরুণশক্তি” পত্রিকার সম্পাদক, আর তাতে প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং। বাঁদিকে তারিখ দেওয়া আছে ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৯২৮।

ঋক মানপত্রটি খুব সাবধানে টিনের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর দেওয়ালে ঠেস দেওয়া মরচে পড়া বল্লমটায় হাত রেখে বলল, “রঘু আংকল, আমি কিন্তু বাক্সটা বাইরে নিয়ে চললাম।” ঋকের কথা শেষ হতেই দেওয়াল থেকে একটা চামচিকে উড়ে এসে আলতো করে তার চুল ছুঁয়ে আবার ঘরের ছাদে উলটো হয়ে ঝুলে পড়ল।

ছবিঃ মৌসুমী

অপর্ণা গাঙ্গুলী

ঘুরঘুট্টি আঁধার রাত। এমন রাতে ভূতের মায়ের ভিরকুট্টি পর্য্যন্ত দেখা যায় না আর এই রাতে কিনা আমার একটা বদখেয়াল চাপল! সত্যি বলছি, এইসব বদখেয়াল-টেয়াল চাপলে আমি বড্ডো কেমন ইয়ে হয়ে যাই। সেই সময়টা আমি আর নিজেকে রুখতে পারি না বাপু। ঘড়িতে দেখলুম রাত দুটো আর বাড়ির পাশের ঝোপেঝাড়ে অনেক জোনাকি ঝিকমিক করছে। ইচ্ছে হল, জোনাকি ধরব।

যেই না ভাবা, একটা বোতল নিয়ে বের হয়ে গেলুম বাইরে। জোনাকপোকা ধরে বোতলে রেখে আবার কিছুক্ষণ বাদে ওদের ছেড়ে দিলেই হল। বেশ লাগে দেখতে ওদের ঝিকমিক চিকমিক।

ঝিঁঝির ডাক, জোনাকির ঝিকমিক, আর আকাশে একটা ঘুম ঘুম ভূতুড়ে চাঁদ আর

মিটমিটে তারা। মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। একটা গান গেয়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, ও বাবা, জোনাকির বদলে এটা কী ধরলুম! একখানা মিচকে মতন জিনিস বোতলের মধ্যে হাত পা ছুঁড়ছে।

প্রথমে ভাবলাম ব্যাঙাচি, বলে যেই ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, দেখলুম ভেতরের ব্যাপারটা চিৎকার- মিৎকার করে একশা করছে। আমাকে গালও দিচ্ছে বলে মনে হল। আগেই বলেছি আমার বদখেয়ালের কথা। ব্যাস, খেয়াল চাপল একে ছাড়ব না। যেই না ভাবা, বোতলের মুখ বন্ধ করে তাকে তো নিয়ে এলুম ঘরে। ইলেকট্রিকের আলোয় দেখি এইটুকুনি বাচ্চা মত একটা ভূত ধরেছি শেষে। আর সেও বেজায় হাত পা ছুঁড়ে আমাকে

গালাগালি লাগিয়েছে দেশোয়ালি ভাষায়। বলছে “এ কঁহা সে আয়া রে, হামকো ভূত বোলকে চিল্লাতা হ্যায়, ম্যায় ভূত থোড়ি না হুঁ, ভূতুয়া বোলো ইয়া পিরেত, মগর ভূত কভ্‌ভি নহিঁ।”

“ইঃ! ভূতুয়া বলতে হবে ওনাকে! ওরে আমার ভূতুয়া রে, দাঁড়াও, হচ্ছে তোমার। কাল যদি না ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে তোমার বারোটা বাজাই আমি!”

ভূতুয়াটা কী বুঝলো জানি না, সারারাত ওইভাবে চেঁচিয়ে- মেচিয়ে একশা করল আর আমার ঘুম উঠল শিকেয়। ভোর রাতে দেখলুম, সে ক্লান্ত হয়ে একটুকু ঘুমিয়েছে। দেখে ভারী মায়া হল। খুলে দিলুম বোতলের ছিপি আর অমনি তড়াক করে বেরিয়ে আমার কাঁধে চেপে বসল সেই বোতলের ভূতুয়াখানা। আমি তার সাহস দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি হলুম গে প্রফেসর খিটকেল চট্ট। আমার কাঁধে ভূত? লোকে শুনলে ছ্যাছ্যাকার করবে যে! এত সাহস বঙ্কু বিল্লিরও তো কখনো হয়নি। আমি বললাম, “ও ভাই ভূতুয়া, নামো দিকিন ঘাড় থেকে।”

ভূত বলতেই ইচ্ছে করেছিল কিন্তু বেকার ঝামেলিতে গেলুম না আর কি! ভূতুয়া নামবে কী, সে তখন আমার কাঁধ বেয়ে তড়বড় করে চকচকে টাকের উপর উঠে বসেছে। উঠতে গিয়ে দু’বার সিলিপ খাওয়া সত্ত্বেও উঠে বসে দু’পা ঝুলিয়ে দিয়েছে আমার মাথার উপর।

এসব আমার বরাবর সয় না। ভারী বিশ্রী লাগে এসব আহ্লাদ। তাছাড়া আজ অবধি কেউ আমাকে এইভাবে রাগায়নি। ভূতুয়া বললে, “অব ক্যায়সে মজাক বাবুয়া, অর জাওগে ভূতুয়া পাকড়নে? একে কী বলে জানো? বলে ভূতে ধরা। এখন তুমি কী করবে?” সব কথা অবশ্য তার দেশোয়ালি হিন্দিতেই সে চালিয়েছিল।

“তবে রে, আমি কিনা বৈজ্ঞানিক! ইয়া ইয়া বই পড়ি আর এটা ওটা আবিষ্কার করে ফেলি ফস করে, আমার ঘাড়ে কিনা ভূত? মামদোবাজি নাকি?”

ভূত বোধহয় শেষের কথাগুলি শুনে ফেলেছিল। বললে, “মামদো নই আমি, আমি হলেম গিয়ে কেশো ভূতুয়া।” বলে খুক খুক করে একটু কাশি দিল।

আমার টাক সুড়সুড় করছে। ভয়ে বেশি কিছু বলতেও পারছি না, যদি ঘাড়ের কাছে নেমে এসে মটকে দেয়?

বললুম, “ভাই ভূতুয়া, তুমি নেমে যাও বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসছি।” সে ব্যাটা বললে, ও করলে তার নাকি ভারী নিন্দে হবে, একবার মানুষের ঘাড়ে উঠলে তেনারা নাকি এক ঘটি জল মুখে করে নিয়ে না গিয়ে নামেন না।

সর্বনাশ, তবে কি ওঝা, ঝাড়ফুঁক এইসবের কথা বলছে? সেরেছে, এ তো ভূতে ধরার আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদেছে দেখছি! যত্তোসব কুসংস্কার। ভূত বড়জোর মানুষের সাথে থাকতে পারে, তাকে কিছু সাহায্য করতে পারে কাজেকর্মে, কিন্তু ঘাড়ে চাপা? কক্ষনো না। মনে মনে সাহস আনলুম বেশ করে। কিন্তু কা কস্য . . . কিছুতেই সে নামে না।

আমার যে কী নিন্দে হতে পারে এসবে এই ভেবে আমি কেঁদে উঠলুম ডুকরে, আর না পেরে। আর দেখলুম ভূতটা শুট করে নেমে এসে আমার নাকে ঠান্ডা হাত বুলুচ্ছে। ওফ কী সাহস! চোখ খুললুম ধীরে ধীরে। কিন্তু না, এ যে বঙ্কু বেড়াল! কোথায় ভূত? ওই তো সকাল হয়েছে। বঙ্কু আমাকে ডাকতে এসেছে রোজের মত। সারা ঘরে ভূতুয়ার টিকিটি নেই, শুধু বোতলের মধ্যে ওটা কী? একটুখানি? এট্টুখানি চিরকুটে লেখা, “বুদ্ধু কাহিঁকা!” ক্যালেন্ডার এ চোখ পড়তেই দেখি, সর্বনাশ, আজ পয়লা এপ্রিল!

তবুও জানো, আজও তারা উঠলে, জোনাকি আলো জ্বাললে, বোতলের ভূতুয়ার কথা মনে পড়ে যায় আর প্রাণটা কেমন এলোঝেলো হয়ে যায় যেন।

ছবি মৌসুমী

জন্মান্তর রহস্য

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

নিজের পূর্ব জীবন সম্পর্কে জানতে ভীষণ আগ্রহী নরেনবাবু। জন্মান্তর নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করে ফেলেছেন কিন্তু তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি চাইছেন নিজের পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে আসুক।

গিন্নী অনেক বুঝিয়েছেন , দেখো এসব খেয়াল ছেড়ে দাও। লাখে একজন মানুষ হয়ত জাতিস্মর হয়। পূর্বজন্মের কথা যাদের মনে থাকে তাদের ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু নরেনবাবু নিজের জেদে অটল। যে করেই হোক নিজের পূর্বজন্ম সম্পর্কে জানতেই হবে।

অফিস কলিগ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই তাঁর এই বিচিত্র খেয়ালের কথা জানে। আড়ালে হাসিঠাট্টাও করে। কেউ কেউ সামনেও করে। নরেনবাবু অনেক সাধু সন্ন্যাসী , তান্ত্রিকদের ধরেছেন কিন্তু কেউই তাঁকে পূর্বজন্ম দেখাতে পারেননি । একবার এক বয়স্ক সাধু বলেছিলেন, কী হবে ওসব জেনে? যে জীবন তুমি ফেলে এসেছ তার ব্যাপারে আর জানতে চাওয়া উচিৎ নয়। এতে ঈশ্বরের নিয়মের বিরোধিতা করা হয়।

কিন্তু নরেনবাবু জানতে চান তাঁর যে হাতের ব্যাথাটা হয় সেটা কি আগের জন্মেও হত? কপালে যে ছোট্ট জড়ুলটা আছে তা নিশ্চয় আসলে গুলির দাগ। আগের জন্মে নিশ্চয়ই তাঁর কপালে গুলি লেগেছিল আর তাতেই তিনি মারা যান । এই জন্মে সেই গুলির দাগ জরুল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এসব আছে নইলে এ নিয়ে এতগুলো সিনেমা হত না।

জন্মান্তর সম্পর্কে তিনি অনেক বইপত্র পড়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও পড়েছেন। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা খুব মন দিয়ে পড়েছেন, রীতিমত আশ্চর্য বোধ করেছেন।

পাস্ট লাইফ কাউন্সিলিং। বিদেশে কিছু সাইকোলজিস্ট আছেন যারা রোগীকে কিছুক্ষণের জন্য তাদের পাস্ট লাইফ অর্থাৎ পূর্বজন্মে নিয়ে যান । রোগী নিজের পূর্বজন্মের সব বিবরণ দেয়। নিজের মৃত্যু কী করে হয়েছিল সেটাও বলে দেয়। এই পূর্বজন্ম দেখার পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় । এই জন্মের শারীরিক কোনো কষ্ট, মানসিক কোনো ভয় বা উদ্বেগ তারা এই পূর্বজন্মে গিয়ে কাটিয়ে ওঠে। ভয় বা অবসাদ বা শারীরিক কোনো সমস্যার সূত্রপাত তাদের পূর্বজন্মে, দুর্ভাগ্যবশত এই জন্মেও তারা সেই একই কষ্ট ভোগ করছে।

তবে এইধরনের চিকিৎসার খরচ বিশাল। আর একধরনের সাইকোলজিস্ট এদের ভণ্ড বা প্রতারক বলে প্রচার করছেন। পূর্বজন্ম নিয়ে যারা এই ধরনের গবেষণা বা রোগ নির্ণয় করছেন তারা আসলে প্যারাসাইকোলজিস্ট। সাধারণ সাইকোলজিস্টদের সঙ্গে তাদের কিছু তফাৎ আছে। এরা মানুষের মনের ধোঁয়াটে দিকগুলো নিয়ে চর্চা করেন। নরেনবাবু এই প্রবন্ধ পড়ে বেশ উত্তেজিত। তবে এই সুযোগ এখানে কোথায় পাবেন? পঞ্চাশের কাছে বয়স হয়ে গেল কিন্তু এখনও পূর্বজন্ম সম্পর্কে জানা গেল না। সরকারি অফিসে চাকরি করেন নরেনবাবু। মাইনের বেশির ভাগটাই যায় নানারকম বই কিনতে।

অবশেষে নরেনবাবুর মনস্কামনা পূর্ণ হল একদিন। এক রবিবার বিকেলে তিনি আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে। ফেসবুকের কল্যানে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ভালোই আছে। মাঝে মধ্যেই এক একজনের বাড়িতে জমায়েত হন সবাই। এরকমই একটা জমায়েত ছিল সেদিন। বন্ধুটির নাম ছিল অজয়। সেই জমায়েতে একজন অচেনা মানুষও উপস্থিত ছিল। অজয় বলল, “আজ আমাদের মধ্যে এমন একজন উপস্থিত আছে যাকে কেউ চিনিস না, আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই ডেকেছি , বিশেষ করে নরেনের খুব ভালো লাগবে।”

নরেনবাবুর চোখে জিজ্ঞাসা। অজয় বলল, “আর সাসপেন্স রাখব না। এ হল আমার শ্যালক আবীর। হি ইজ আ প্যারাসাইকোলজিস্ট এন্ড আ পাস্ট লাইফ রিগ্রেসর। লন্ডনে থাকে এখানে এসেছে কিছুদিনের জন্য। ”

আবীরকে বেশ সুন্দর দেখতে। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। নিজেই নরেনবাবুর সাথে আলাপ করল। নিজের কর্মজীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলল। শুনতে শুনতে নরেনবাবুর মনে হল এরকমই কাউকে তিনি খুঁজে চলেছেন এতকাল ধরে।

নরেনবাবু আবীরকে এক ফাঁকে বললেন, “আপনার মতই কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম । আমি নিজের গতজন্মের কথা জানতে চাই। এই জন্মে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। খুব ছোটোবেলায় নিজের বাবা মাকে হারিয়েছি। কাকার আশ্রয়ে বড়ো হয়েছি। আমার কোনো সন্তান নেই। আগের জন্মে নিশ্চয় কোনো গুরুতর অপরাধ করেছি তাই এই জন্মে এত শাস্তি পাচ্ছি।”

“আমাকে আপনি বলবেন না দয়া করে। আপনার ব্যাপারটা দেখছি । পৃথিবীতে জন্মালে দুঃখ কষ্ট পেতেই হবে। আপনি একদিন আমার বাড়ি চলে আসুন এর মধ্যে। আমি কিছুদিন এখানেই আছি। এই নিন আমার কার্ড।” আবীরের হাত থেকে কার্ডটা নিলেন নরেনবাবু। একমাত্র আবীরই পারবে তাঁর সমস্যার সমাধান করতে।

সেদিন অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর নরেনবাবু বাড়ি ফিরলেন বেশ খোশমেজাজে। বাড়ি ফিরেই ঠাকুর ঘরে ঢুকে গোপালকে একটা প্রণাম ঠুকলেন । গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার? এত রাতে ঠাকুরঘরে কেন?"

"যা চাইছিলাম তা পেয়ে গেছি সবিতা।"

"কী চাইছিলে? প্রোমোশন ? পেয়েছ বুঝি? অভিনন্দন!"

"আরে না না! প্রোমোশন নয়, আমি এবার নিজের পূর্বজন্ম দেখতে পাবো।"

সবিতা বিরক্তির সঙ্গে তাকালেন। মুখে কিছু বললেন না। নরেনবাবু সবিতার এই দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত। তিনিও আর কথা বাড়ালেন না। পরের দিন অফিস করেই হাজির হলেন আবীরের বাড়ি। ফোনালাপটা অবশ্য আগেই সেরে নিয়েছেন। শ্যামনগরে গঙ্গার ধারে আবীরদের বেশ পুরানো আমলের বাড়ি। আগেকার দিনের জমিদারবাড়ির মত দেখতে। সামনে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাগান। আবীর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। নরেনবাবু বিগলিত হয়ে বললেন, "তুমি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছো ? সত্যি তোমাকে খুব বিরক্ত করছি!"

"আরে এতে বিরক্ত হবার কী আছে? আমার কাজই তো এই," আবীর হেসে বলল।

"আচ্ছা তোমার ফিজ কত? এ ব্যাপারে তো কথাই হয়নি।"

"আমি আপনার থেকে এক টাকাও নেব না। দয়া করে টাকার কথা তুলবেন না।"

"না না! সে কি হয়! তুমি এত পরিশ্রম করবে!"

"আপনি বরং আমাকে একদিন ডিনারের নেমন্তন্ন করবেন তাহলেই হবে," আবীর আবার হাসল।

কথা বলতে বলতে ওঁরা ড্রয়িং রুমে চলে এসেছেন। ঘরদোর পুরানো আমলের হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাচের শো কেস ভর্তি অ্যান্টিক এর জিনিস। বুকশেলফ ভর্তি বই। বাহারি ঝাড় লন্ঠন , অয়েল পেইন্টিং, ওয়াল ম্যাট। নরেনবাবু একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বাড়ির লোকদের তো দেখছি না?"

"বাবা, মা দার্জিলিং গেছেন। আমিও কিছুদিন পর যাচ্ছি।"

একজন লোক দু গ্লাস শরবত দিয়ে গেল ট্রে তে করে। আবীর একটা হাতে নিয়ে আরেকটা গ্লাস নরেনবাবুকে ধরিয়ে দিল। তাঁর প্রিয় গোলাপ ফুলের শরবত। এক গ্লাস শেষ করতে সময় লাগল না। আবীরের গ্লাস তখনও শেষ হয়নি।

ঠাণ্ডা শরবতটা খাওয়ার পর নরেনবাবুর শরীরটাও জুড়িয়ে গেল। আবীর নিজের গ্লাস শেষ করে ফেলল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বলল, "আর তো দেরি করার কারণ দেখছি না! চলুন।"

কথাগুলো বলেই ও উঠে পড়ল । নরেনবাবু আবীরকে অনুসরণ করলেন। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওরা দোতলায় উঠে এলেন। আবীর একটা ঘরের ভেতর তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই গা- টা কেমন শিরশির করে উঠল তাঁর।

"ভয় পাবেন না," আবীরের গলা শোনা গেলো। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। একটা টেবিল, চেয়ার আর সোফা ছাড়া আর কিছু নেই। টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাসে কিছু গোলাপ ফুল শোভা পাচ্ছে।

তাঁকে সোফায় বসতে বলে আবীর নিজে চেয়ারে গিয়ে বসল। টিউবলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে একটা নাইটল্যাম্প জ্বেলে নিয়েছে। ঘরের পরিবেশ এখন আধা ভৌতিক।

"জোরে জোরে শ্বাস নিন। মনটাকে একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করুন," বলতে বলতে আবীর উঠে এল নরেনবাবুর কাছে। আলতো করে নরেনবাবুকে সোফায় শুইয়ে দিল।

"ভাবুন, ভাবতে থাকুন। আপনি কে? কোথায় ছিলেন? অন্য কোনো চিন্তা আনবেন না। একদম রিলাক্স করুন।"

ঘরের ভেতর মিষ্টি গোলাপের গন্ধ, কোথাও কোনো শব্দ নেই। এসি চলছে ফুল স্পিডে। মাঝে মাঝে আবীরের গলা। নরেনবাবু আর পারলেন না, চেতনা লোপ পেল তাঁর--

-- একটা কাঠের দোতলা বাড়ি। প্রচুর বরফের কুচি উড়ছে। ভীষণ শীত করছে নরেনবাবুর। এটা ভারত নয়, মনে হয় ইউরোপের কোনো গ্রাম। ওক, পাইন, ফার, স্প্রুস , চেরি ইত্যাদি গাছের ছায়ায় ঘেরা বাড়িটা। দূরে পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। নরেনবাবু বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন বারকয়েক। দরজা খুলে গেল। ভেতরে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে আগুন পোয়াচ্ছেন একজন বয়স্ক সাহেব আর মেম।

নরেনবাবুর মনে হল এদের তিনি বহু যুগ ধরে চেনেন। সাহেব আর মেম তাঁকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। দেওয়ালে ঝুলছে একটা অল্পবয়সী ছেলের ছবি। ছবির ব্যাপারে মেমসাহেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই তিনি এক অদ্ভুত কান্ড করলেন। একটা ছোটো আয়না নিয়ে এসে নরেনবাবুর হাতে দিলেন। আয়নায় চোখ পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্ব নেই। তার বদলে অল্পবয়সী এক ইংরেজ তরুণের মুখ দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালে যে ছবি হয়ে ঝুলছে তারই মুখ আয়নায় দেখতে পেলেন। নরেনবাবু কেঁদে ফেললেন। যুদ্ধে গিয়ে তিনি আর ফিরে আসেননি মায়ের কোলে। স্পষ্ট সব মনে পড়ে গেল। এদের ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।

ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই দেখতে পেলেন সামনে আবীর বসে আছে একটা খাতা আর কলম নিয়ে। খাতায় মন দিয়ে কিছু লিখছে। আবীর টিউব জ্বেলে দিল। বলল, "আরও কয়েকবার আসতে হবে আপনাকে। ঘুমের মধ্যে যা যা বলেছেন সবই নোট করে নিয়েছি।"

নরেনবাবু সেটা দেখতে চাইলেন কিন্তু আবীর বলল, "আমি শর্টহ্যান্ডে লিখেছি। আপনি বুঝবেন না। প্রথম দিন কেমন লাগল?"

নরেনবাবু নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে গেলেন, আবীর মাথা দোলাতে থাকল। সঙ্গেসঙ্গে ডায়েরিতে নোটও নিচ্ছিল। তারপর বলল, "আপনার মনে পড়ে গেছে যে আপনি আগের জন্মে কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন আর কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল! আর দুবার আসতে হবে আপনাকে। অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। এখানেই ডিনারের ব্যাবস্থা করেছি। চলুন আগে আমরা সেই কাজটা সেরে ফেলি।"

নরেনবাবুর আপত্তি ধোপে টিকল না। কাজের লোকটির রান্না বেশ ভালো। খাবার পর আবীর নিজের গাড়িতে করে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

পরের দিন সকাল হতেই মেজাজটা খিঁচরে গেল নরেনবাবুর। গতকাল অফিস থেকে ফেরার পথে মাইনে তুলেছিলেন অথচ আজ সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না। আর বাঁ হাতের অনামিকায় যে হীরের আংটিটা পরতেন সেটিও নেই। বিয়ের আংটি। নিজের মাথায় আকাশ

ভেঙে পড়লেও এতটা বিচলিত হতেন না তিনি। গতকাল অফিস থেকে ফেরার পথে এ টি এম এ টাকা তুলেছেন। তারপর ট্যাক্সি নিয়েছিলেন সুতরাং পকেটমারির সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু সরাসরি আবীরকে চোর ভাবা খুব শক্ত তাঁর পক্ষে। ক্ষতিটা মুখ বুজে হজম করা ছাড়া কিছু করার নেই। সারাদিন অনেক চিন্তা করলেন। আবীরকে ফোন করলেন কিন্তু ফোন নট রিচেবেল বলছে। সন্দেহ হতে অজয়কে ফোন করে শুনলেন আবীর সেদিন ভোরেই দার্জিলিং চলে গেছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন নরেনবাবু। নিজের উপরই তাঁর রাগ হতে লাগল খুব। সবিতার সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। পুরো ঘটনাটা সবিতা জানতে পারলে নরেনবাবুকেই অনেক কথা শুনতে হবে।

দু দিন পর আবীর হঠাত হাজির নরেনবাবুর বাড়ি। কিছুক্ষন গল্প করার পর আবীর নিজের পকেট থেকে একটা খাম আর সেই হীরের আংটি বার করল। বলল, নিজের জিনিসগুলো বুঝে নিন। নরেনবাবু হতবাক, "এগুলো-- তোমার কাছে—"

"আমি চুরি করেছি। আপনাকে সেদিন শরবতের মধ্যে একটা ঘুমের বড়ি ফেলে দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কাজ করেছে আপনার মনের কল্পনা আর আমার রচিত পরিবেশ। আমি সাইকোলজিস্ট। আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু পূর্বজন্মের অলীক কল্পনা করে আপনি এই জীবনের সুন্দর দিনগুলো নষ্ট করে ফেলছেন। জীবন মানুষ একবারই পায়। এই নিয়ে সিনেমা দেখুন বই পড়ুন কিন্তু নিজের বাস্তব জীবনের সাথে মেলাতে যাবেন না দয়া করে।"

নরেনবাবুর চোখে মুখে বিস্ময় এখনও। আবীর হাসল, "আমি চাই না আপনি কোনো প্রতারকের পাল্লায় পড়ুন। আপনাকে একটু বোঝাতে চেয়েছিলাম যে এইভাবে আপনি কখনও প্রতারকের পাল্লায় পড়তে পারেন। তাই টাকা আর আংটি সরিয়ে রেখেছিলাম।"

নরেনবাবুর এতক্ষণে সব পরিষ্কার হল। বললেন, "আচ্ছা! সব বুঝলাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ! সত্যি হয়ত এই ভাবে আমি কোনো ঠকবাজ লোকের পাল্লায় পড়তাম। এবার থেকে আমি আর বিগত জীবন নিয়ে কখন ও মাথা ঘামাবো না। সবিতাকে নিয়ে দেরাদুন ঘুরে আসব। ও বহুদিন ধরে কোথাও যাবার জন্য বায়না করছে। "

আবীর বলল, "অবশ্যই। তবে, আমি একা কিছু করিনি কিন্তু। জামাইবাবুও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।"

"কে? অজয়? " চোখ কপালে তুলে বললেন নরেনবাবু।

"আমার বাড়ির কাজের লোকটাকে চিনতে পারেননি সেদিন?"

"অজয় নাকি? তাই চেনা চেনা মনে হয়েছিল। দারুন মেক আপ নিয়েছিল তো!"

"হ্যাঁ । জামাইবাবুই ছিল সেদিন চাকরের ছদ্মবেশে। তবে প্ল্যানটা আমারই। জন্মান্তর রহস্যের সমাধান হল তাহলে?" আবীর হেসে ফেলল।

"হল। তুমি কিন্তু এখান থেকে খেয়ে বেরুবে আজ," খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন নরেনবাবু।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

ভোররাতে আবার স্বপ্নটা দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েও খেলাম না। মাথাটা ভার হয়ে আছে। ইদানীং লক্ষ করেছি যখনই স্বপ্নটা দেখি এই মাথাব্যথাটা শুরু হয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ ঠায় বিছানার উপর বসে থেকে আমি গায়ের থেকে চাদর সরিয়ে ফেললাম। যত দিন যাচ্ছে এই একটা স্বপ্নই যেন বারবার ফিরে আসছে আমার ঘুমের মধ্যে। আগে মাসে একবার, ইদানীং সপ্তাহে একবার করে আমি একই স্বপ্ন দেখি। কিছু যেন বলতে চায় স্বপ্নটা। একটা ঘটে যাওয়া ইতিহাস। যতবারই দেখি মনটা খারাপ হয়ে যায়।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙলাম। একটু আগে বোধ হয় একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাইরে গাছের মাথাগুলোতে গাঢ় সবুজ রঙ ধরেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। সায়ন্তন এখুনি এসে পড়বে।

রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করলাম। শুধু ঘুমের মধ্যেই না, সারাদিনের কাজের মধ্যেও ঘুরেফিরে আসে দৃশ্যগুলো। কতগুলো ছেঁড়াছেঁড়া ছবি। অর্থহীন কয়েকটা শব্দ। তাও সবকিছুর

মধ্যে কীসের যেন একটা যোগসূত্র আছে। লোকে বলে ভোররাতের স্বপ্ন সত্যি হয়। আমার কিন্তু মনে হয় স্বপ্নটা ভবিষ্যতের নয়, অতীতের। যেন আমার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। কথাগুলো আমার মনে পড়া খুব জরুরি। কিন্তু এতবার দেখেও আমি বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। কাঠের উপর নখের আঁচড়ের শব্দ, একগোছা হাতে লেখা কাগজ, একটা দোতলা পুরনো ধাঁচের বাড়ি। এসব ঘুরে ফিরে আসে স্বপ্নটায়। কোনটা আগে কোনটা পরে তা আমার ঠিক মনে পড়ে না। শুধু সবশেষে ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা শীর্ণ ক্ষতবিক্ষত হাত খোলা আঙুলগুলোকে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমার অবচেতন মনে বারবার মনে হয় কোন একটা ভুল, একটা মারাত্মক ভুল করেছি আমি, কিন্তু সেটা কী তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমাকে যেন গ্রাস করছে স্বপ্নটা। বুঝতে পারছি ওই হাতের আঙুলগুলো আমার স্বাভাবিক জীবনের শান্তি ভেঙে খানখান করে দিছে।

দরজায় খটখট আওয়াজ হতে আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সায়ন্তন একগাল হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, " তোর প্রবলেম সল্ভড।" আমি চেয়ারটা টেনে তাকে বসতে নির্দেশ করে বললাম," প্রবলেম বলতে?"

" ওই যে স্বপ্নের ব্যাপারটা, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল..."

আমি তাকে মাঝপথে থামিয়ে বললাম," তোদের ওই সাইকোঅ্যানালিসিসের থিওরি তোদের কাছেই রেখে দে। চা খাবি?"

সে হাসতে হাসতে রোল করা একটা কাগজ আমার সামনে বিছিয়ে দিল," দেখ তো, চিনতে পারিস কিনা।"

আমি নিচু হয়ে কাগজটা হাতে তুলতেই চমকে গেলাম। কাগজটায় একটা বাড়ির ছবি কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা আছে। অবিকল আমার স্বপ্নে দেখা বাড়িটার মত, না মত নয়। একদম সেই বাড়িটাই। যেন আমার স্বপ্নটাকে কম্পিউটারে ফেলে প্রিন্ট করেছে কেউ। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম," এটা ক্যামেরায় তোলা?"

"নাহ, ইন্টারনেট এ পুরনো একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, স্কেচ আর্টিস্টকে দিয়ে তোর স্বপ্নে দেখা বাড়িটার যে স্কেচটা বানিয়েছিলাম না, সেটা রাখা ছিল সামনেই। হঠাৎ দেখলাম ঠিক ওরকমই একটা বাড়ি, হুবহু, কোথাও একটুও ফারাক নেই। ব্যাস! বুঝলাম-- কই চা নিয়ে আয়।"

ছবিটার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় বাড়িটা?”

“ঠিকানা রেডি আছে। কালই রওনা দেব।”

সায়ন্তন ঘোষ পেশায় মনস্তত্ত্ববিদ। উত্তর কলকাতার কোথায় একটা চেম্বারও আছে। স্কুলজীবনটা দুজনে একসাথেই পড়াশোনা করেছি। তারপর বছরপাঁচেক আর যোগাযোগ নেই। মাসদুয়েক আগে শেয়ালদায় দেখা। একরকম টেনেহিঁচড়েই নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে।

স্কুলে পড়ার সময় ভদ্র ও শান্ত বলে ওর একটা কুখ্যাতি ছিল। এখন সে ভাব খানিকটা কমেছে। সে মনস্তত্ত্বে হাত পাকিয়েছে শুনে খুশি হয়েছিলাম। আমার স্বপ্নের কথাটা বলতেই দেখলাম তার চোখে মুখে ডাক্তারসুলভ বিজ্ঞ ভাব ফুটে উঠল। তখন থেকেই বোধ হয় সে আমাকে পুরনো বন্ধুর বদলে রোগি হিসেবে দেখছে। অনেক ফ্রয়েডট্রয়েড আউরে জ্ঞান দেওয়ার পর বলল, “আমার কী মনে হয় জানিস?”

“কী?” আমি তাপ-উত্তাপ দেখালাম না। সে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বলল “ ব্যাপারটা তোর ছোটবেলার কোন মানসিক চোট থেকে হতে পারে। মানে তোর ছোটবেলার দেখা কোন স্মৃতি তুই ভুলে গেছিস অথচ তোর সাবকনশাস মাইন্ডে সেটা থেকে থেকে অন্য রূপে হানা দিচ্ছে।”

অনেক কাল আগে এরকম একটা বই পড়েছিলাম। আগাথা ক্রিস্টির স্লিপ মার্ডার। সেখানেও ঠিক এরকমই একটা ঘটনা ঘটত। প্রথমটা মনে হবে ভৌতিক উপন্যাস পড়ছি, পরে দেখা যাবে... যাকগে সেকথা, সায়ন্তন ভাবনাচিন্তা করে বলল, “একবার আমার চেম্বারে আসিস তো, এরকম কেস বড় একটা পাওয়া যায় না।”

তার চেম্বারে আমি যাইনি। উলটে সে-ই থেকে থেকে আমার ফ্ল্যাটে হানা দেয়। এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। নোট নেয়। মাঝে মধ্যে হিপনোসিস করার চেষ্টাও করে। তাতে কিছুই লাভ হয় না। আমার স্বপ্নের অত্যাচার দিনদিন বাড়তে থাকে। সাথে পাল্লা দিয়ে মাথা যন্ত্রণা। এককে সময় বিছানায় শুয়ে কাতরাই। কাল সন্ধেয় সে বলল আশ্চর্য একটা খবর আছে। সকালে যেন আমি বাড়িতেই থাকি। অতঃপর আজ সাত সকালে তার এই আবির্ভাব।

****

বাড়িটার নাম ম্যান্টন হাউস । হুগলী জেলার এক ধার ঘেসে ছোট্ট গ্রাম মিনামুখি,সেখানে একমাত্র পাকা বাড়ি এই ম্যান্টন হাউস। শোনা যায় সেটা নাকি সাহেবি আমলে তৈরি। কুড়ির দশকে বিপ্লবী আন্দোলনে তাড়া খেয়ে এসে হেনরিক ম্যান্টন বলে এক সাহেব নাকি বানিয়েছিলেন বাড়িটা। অবশ্য সে বাড়িতে তিনি বেশিদিন থাকেননি। এখানকার পাত্তাড়ি

গুটিয়ে বিলেত যাত্রা করেন। তার আগে বাড়িটা বেচে দিয়ে যান রবার্ট হিল নামে আরেক সাহেবকে। এই রবার্ট হিল নাকি পেশায় ছিলেন বিজ্ঞানী। এখানকার লোকেরা তাকে বব সাহেব বলে ডাকত। লোকটার ব্যবহার খারাপ ছিল না, তবে ওই একটু পাগলাটে গোছের। বন্যার সময় দু- একজন গ্রামবাসীকে বাড়িতে থাকতেও দিতেন।

ম্যান্টন হাউস ছিল দোতলা,একতলায় তিনি নিজে থাকতেন আর দোতলায় তাঁর গবেষণা চলত। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ষাটের দশকে গোড়ার দিকে একদিন হঠাৎ করে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেপাত্তা হয়ে গেলেন। বয়স হয়েছিল ভালই। লোকেরা ভেবেছিল মাঠে ঘাটে মরে পড়ে আছেন। কিন্তু না,সেখানেও কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

তারপর থেকে খুব বেশি লোক সেখানে থাকেনি। গ্রামবাসীরা বাড়িটার যত্ন নেয়। বেশি জিনিসপত্র বাড়িতে নেই। কিছু পুরনো আসবাব আর সাহেবের বইটই কিছু থাকতে পারে।

আমরা ম্যান্টন হাউসের সামনে যখন পৌছলাম তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। আমরা বলতে আমরা আর সায়ন্তনের বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা হলু। আসার পথেই সে জানিয়ে দিয়েছে তার আসল নাম হলধর, তবে এইখানে কেউ তাকে ওই নামে চেনে না। হলু বললে এক ডাকে চিনবে। মোটা টাকা বখশিস দিতে হয়েছে তাকে, তবে লোকটা খারাপ না। আমাদের আনতে স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম,“এইখানে থাকা যাবে তো?” সে মাথা নাড়ল, “আমি তো থাকি। আপনারা কলকাতার লোক, একটু অসুবিধে হবে। তবে শীতকাল কিনা, তেমন কষ্ট হবেনা। আসুন এদিকে।”

এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি বাড়িটা কিন্তু মোটেও ভূতের বাড়ির মত দেখতে নয়। চারপাশ মোটেও ভেঙে পড়েনি, তবে জায়গাটা অপরিষ্কার, দু একটা ঝোপঝাড় বাড়িটার চারপাশ ঘিরে রয়েছে, সেটুকু থাকাই ভাল। বেশ একটা ইতিহাসের গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা যে এই বাড়িটায় দু- একদিন থাকতে চাই সেটা শুনে হলধর প্রথমে বেশ বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। এখানে দেখার মত কিছু নেই। তায় বাড়িটার কেবল হানাবাড়ি বলে কুখ্যাতিই নয়, থাকাখাওয়ারও এখানে বড্ডো অসুবিধে। তবে তার কথায় জানতে পারলাম এখানে নাকি একটা সাহেব আমলের পুরনো কবরস্থান আছে। আগে যখন এখানে সাহেব কলোনি ছিল তখন তাদের সমাধি হত সেখানে, কবরের সংখ্যা সব মিলিয়ে পচিঁসের বেশী নয়, আমরা যদি দেখতে চাই সে নিয়ে যেতে পারে।

বাড়িতে ঢুকে সায়ন্তন আমায় জিজ্ঞেস করল- “কীরে কিছু মনে পড়ছে নাকি? আগে এসেছিস এখানে?”

আমি চারপাশটা দেখতে দেখতে বললাম, “না ,কিন্তু বাড়িটা হুবহু এক।”

“হুম! থাক কটা দিন, দেখ কিছু রিলেট করতে পারিস কি না! না পারলেও মন্দ নয়, কলকাতার ধুলো- ময়লা- চিৎকার থেকে দুরে শান্তিতে ক'টা দিন কাটালে তোর স্বপ্নবাবাজি এমনিতেই পলায়ন করবে।”

প্রথম দিনটা আমরা বাড়িতেই কাটালাম, দোতলাটা তুলনায় খানিকটা পরিষ্কার, বব সাহেবের বইয়ের ঘরটাও দেখলাম। বেশিরভাগই গবেষণাসংক্রান্ত বই। তবে সংখ্যায় বেশি না। গোটা আটেকের মত। একটা জার্নালও আছে, তাতে সাহেব কী নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেটা লেখা থাকতে পারে। তবে এখন ক্ষীণ আলোয় সেটা পড়ার ইচ্ছা হল না আমাদের।

সন্ধে আরও ঘন হয়ে আসতে হলধর দুটো হ্যারিকেন জ্বেলে দিল, তারপর আমরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে তার মুখে গ্রামের ইতিহাস শুনতে লাগলাম। ইতিহাস অবশ্য বেশি কিছু না, তাতে আমার কিছুই চেনা লাগলো না, এক বাড়িটা ছাড়া।

কথা বলতে বলতে সায়ন্তন হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা এখানে কোনো খুন হয়েছে কখনও?” আমি মনে মনে হাসলাম,এখানে আসার আগে তাকে স্লিপিং মার্ডারটা পড়তে দিয়েছিলাম, সেটার রেশ বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হলধর একগাল হেসে বলল, “না না খুন টুন এখানে কিচ্ছু হয়নি, তবে ববসাহেব যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তার আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। সেটাকে যদি খুন বলেন-- ”

“হুম!আচ্ছা সাহেবকে তুমি দেখেছিলে?”

“না,আমি জন্ম থেকেই দেখছি বাড়ি ফাঁকা,খানিকটা লেখাপড়া শিখেছি বলে মাসমাইনেতে এখানে কেয়ার টেকার থাকি। তা না হলে বাড়িটা তো মদোমাতালের আড্ডা হয়ে যাবে।”

আমি হ্যারিকেনের কাঁপা কাঁপা আলোর দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “বব সাহেব কী নিয়ে গবেষণা করছিল সে বিষয়ে কিছু জান?”

“না,দাদাভাই,গ্রামের লোকজনের কি পেটে অত বিদ্যে থাকে যে অত কথা জানবে? তবে শুনেছি তার কিছু বন্ধু ছিল ওই সাহেব কলোনি থেকেই, তাদের সাথেই সেসব নিয়ে আলোচনা হত। সে যাই হক্, খুনখারাপি হত না, গ্রামের লোকেদেরও অনিষ্ট হয়নি কোনোদিন।”

রাত্রি বেলা চিঁড়েগুড় খেয়ে নিলাম। মেঝেতে বিছানা। এ বাড়িতে খাটের ব্যবস্থা নেই। মশার উৎপাত নেই বলে আমরা ওডমস্ মাখলাম না। আমি শুয়ে পড়লাম। সায়ন্তন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। আমি বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না। সারাদিনের ট্রেনজার্নিতে শরীর ক্লান্ত ছিল। পাশ ফিরে চোখ বুঁজলাম।

মেঝের উপর কান রাখতেই মনে হল কোথা থেকে যেন একটা ক্ষীণ চিৎকার আসছে। খুব খুব ক্ষীণ, তবু শোনা যায়। মনে হল একজন নয়, অনেক মানুষ যেন একসাথে গোঙাচ্ছে, খাটের উপর আছড়ানোর শব্দ, সেই কাগজের একটা নোটপেপার, রাতের ঝলমলে আকাশে ফুটে উঠছে কয়েকটা বিন্দু, একটু একটু করে বেড়ে উঠছে সেগুলো, সেই শীর্ণ শুকিয়ে যাওয়া হাতটা আঙুল তুলছে আমার দিকে, যেন কী একটা মারাত্মক কাজ করেছি আমি—

আমি চিৎকার করে উঠতে গেলাম কিন্তু শব্দ গলাতেই আটকে গেল। সেই হাতটা ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, না আমি এগিয়ে যাচ্ছি তার দিকে-- একটু একটু করে কাছে...আরও কাছে...

সকালে আমরা গ্রাম দেখতে বেরোলাম। সাথে কবরস্থানটাও। গ্রামটা বেশি বড়ো নয়। তার একটা কারণ এখানে আসাযাওয়ার একটু অসুবিধা আছে। জল পেরিয়ে নৌকা করে আসতে হয়। চারিদিকে অগোছালো গাছপালার জঙ্গল।

আসাযাওয়ার পথে দু'একজন গ্রামবাসীকে দেখা গেল। আমাদেরকে এখানে উঠতে দেখে তাদের চোখেমুখে কৌতূহল। দু'একজনের সাথে কথাও বলল হলধর। আমরা ঠিক কী কারণে এখানে এসেছি তা অবশ্য সে বলতে পারল না।

গোটা গ্রামটায় গাছপালা আর হালকা জঙ্গল ছাড়া দেখার মত কিছু নেই। এমনকি পাশেই যে সাহেব কলোনি এক সময় ছিল, সেটারও বিশেষ কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

আমার যে এখানে এসে নতুন কিছুই মনে পড়েনি তাতে বেশ নিরাশ হয়েছে সায়ন্তন। আমার ছোটবেলায় তেমন বড় কোন মানসিক চোট গেছে কিনা সেটা জানতে সে আমার দেশের বাড়ি পর্যন্ত খবর নিয়েছে। কিন্তু শেওড়াগাছের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে ভূতের ভয় দেখিয়ে এক বন্ধুকে অজ্ঞান করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে নির্বিঘ্নেই কেটেছে আমার শৈশব। অতএব ফ্রয়েড সাহেব কিছু সাহায্য করতে পারেননি।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা কবরস্থানটার সামনে এসে পড়লাম। ঢোকবার মুখটায় ভাঙা ভাঙা পাথরের একটা স্তূপ। তার উপর আগাছার জঙ্গল ঝুঁকে এসেছে, তারই ফাঁক দিয়ে সরু একফালি পায়ে চলার রাস্তা। বাইরে থেকে ভিতরের বেশ খানিকটা দেখা যায়। রাস্তার দু'পাশ জুড়ে উঁচু পাথরের বেদি। বাইরের ভাঙা দেয়ালের উপর একটা এলিজি লেখা আছে।

আমরা তিনজনে ভিতরে ঢুকে এলাম। পাথরের দেওয়ালটা পেরোতেই কিন্তু আমি ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠলাম। তীব্র যন্ত্রণাটা হঠাৎ করে মাথার প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেন একটা আস্ত মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছে কেউ। আমি সায়ন্তন এর কাঁধ চেপে ধরলাম। সে আমার দিকে

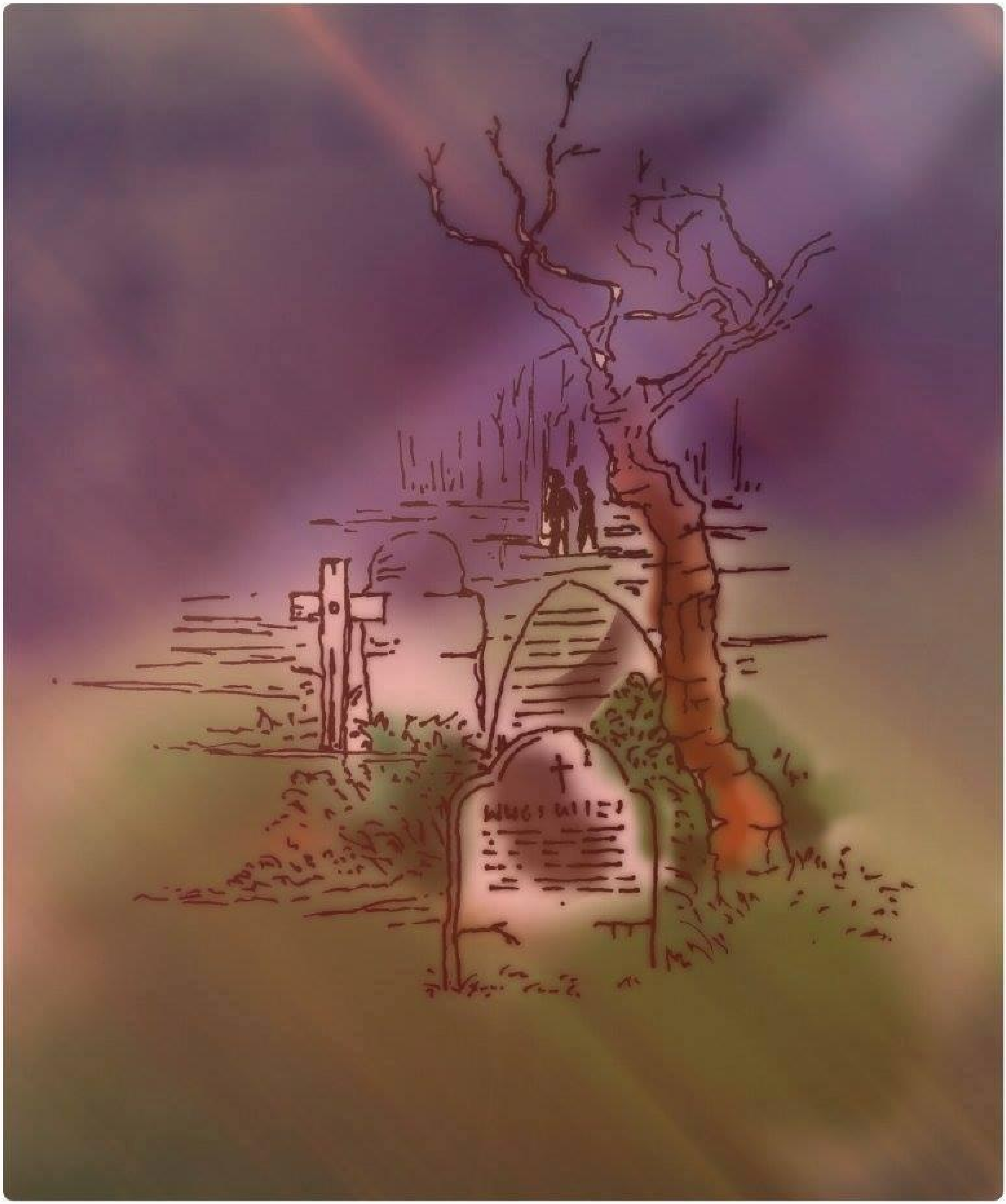

ফিরে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল। আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। কেমন যেন একটা স্থির বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল আমার—এই কবরখানার ভেতরেই কিছু একটা আছে। হয়ত আমার প্রশ্নের উত্তর। যেভাবেই হোক আমায় ভেতরে যেতেই হবে। মুখে বললাম, “ কিছু হয়নি, চল।”

চারপাশে কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্বভাবতই সেগুলো বেশ পুরনো। পাথরের ফলকের উপরে শ্যাওলা আর আগাছা জন্মেছে। সবকটা পড়াও যায় না। কয়েকটার ওপর সিমেন্টর বেশ বড়ো স্তম্ভ। গাছের ওপর দিকে কয়েকটা বাদুড় উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। মাটিতে শুকনো পাতার উপর পা পড়ে খসখস আওয়াজ হচ্ছে। হলধর মাঝে মধ্যে এটা সেটা দেখিয়ে পুরনো দু'একটা গল্প বলছে। সেগুলো কতটা সত্যি আর কতটা জল মেশানো তা আমি বলতে পারি না। বোধ হয় বেশি বকশিশ পাওয়ার লোভে তার কল্পনাশক্তির ঝাঁপি উজাড় করে দিচ্ছে।

আমার মন কিন্তু তখন সেদিকে নেই। কিছু একটা আছে, হ্যাঁ আমি নিশ্চিত এই কবরগুলোর মধ্যেই নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। আমার স্বপ্নের অবচেতন থেকে কে যেন বলে চলেছে, আমি ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি। খানিকটা দূর গিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। সেখান থেকে আবার কবরের সারি। হলধর হঠাৎ একদিকে দেখিয়ে বলল, “ওই কবরটা দেখছেন?”

আমরা সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটা কবরের ভাঙা পাথরের একটা অংশ। যেন কিছু একটা এসে পড়ায় পাথরটা ভেঙে ছিটকে গেছে। সায়ন্তন বলল “কী ওটা?”

“ওটার উপর একটা উল্কা এসে পড়েছিল।”

“উল্কা!” আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, “এত বড় উল্কা পড়েছে! কবে?”

“তা প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে। এ গ্রামে তার আগে কেউ উল্কা পড়তে দেখেনি। ববসাহেবের মুখেই সবাই জানল ওটাকে উল্কা বলে।”

আমার বেশ মজা লাগল। বললাম, “তোমাদের এই ববসাহেব লোকটা লালমোহনবাবুর ভাষায় যাকে বলে হাইলি সাসপিশাস। উল্কা থেকে এলিয়েন টেলিয়েন খুঁজে মহাকাশে পাড়ি দেননি তো?” হলধর কিছুই না বুঝে হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়ল।

গ্রাম দেখা শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। এখানকার মানুষজন বেশ ভালো। তবে একটু মুখচোরা গোছের। হলধর বলল মোটামুটি শ পাঁচেক টাকা খরচ করতে পারলে পরের দুটো দিন আমাদের রান্নাবান্নার চিন্তা আর করতে হবে না। তারাই এসে খাবার দিয়ে যাবে।

সেইমতই ব্যবস্থা হল। আমরা এবারে ম্যানটান হাউসে ফেরার পথ ধরলাম। হলধর বলল সে একটু পরে আসতে চায়। হ্যারিকেনের তেল নিতে হবে। তাছাড়া তারও গ্রামে সংসারধর্ম আছে। আপত্তি করলাম না। রাস্তা তো সোজাই। আমাদের চিনতে অসুবিধে হবে না।

রাস্তা সোজা হলেও ম্যানটন হাউস অন্তত আধঘণ্টার হাঁটা পথ। আমরা কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে ধীরেসুস্থে চলতে লাগলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন।

হঠাৎ সায়ন্তন আমার হাত চেপে ধরে ওপর দিকে তাকিয়ে বলল "ওপরে দেখ- "

তাকিয়ে দেখলাম রাতের কালো আকাশের গায়ে প্রচুর জ্বলন্ত বিন্দু যেন একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে। ঠিক তারার মতই। কিন্তু তারা তো অত বড়ো হয় না। তাহলে কি আজও উল্কাপাত হবে এখানে? আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। মাথার ঠিক ওপরেই কালপুরুষ হাতে তিরধনুক নিয়ে আকাশের গায়ে শুয়ে আছে। তার চারপাশ ঘিরে ঝলমল করছে অগুণতি তারার ঝাঁক। হঠাৎ আমার মনে হল আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ওই আকাশের গায়েই আছে। ওই খসে পড়া উল্কাগুলোর মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম "উল্কা কেন পড়ে বলতে পারবি?"

সায়ন্তন আকাশ থেকে চোখ না ফিরিয়ে বলল, "নাহ, এ ব্যাপারে আমার পেটে বিদ্যা নেই।"

আমি বললাম, "বিস্ফোরণে ছিটকে আসা গ্রহ বা নক্ষত্রের টুকরোগুলো মহাকাশে বিক্ষিপ্ত ভাসতে থাকে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে কোন সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়লে পৃথিবীর টানে মাটির উপর এসে নামে। বায়ুমণ্ডলে এসেই ওরা জ্বলে যায়। কী আশ্চর্য! ভেবে দেখ যদি ওদের প্রাণ থাকত? মৃত্যুর পরেও ওদের শান্তি নেই। ধ্বস হবার কি অমোঘ বাসনা। জ্বলন্ত শরীর নিয়ে যতক্ষণ না পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে শেষ হচ্ছে ওদের ভৌতিক জীবন থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

সায়ন্তন মুখ নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেই উল্কা পড়ে ভেঙে যাওয়া কবরটা দেখে তোর কী কিছু মনে পড়েছে?"

আমি ঘাড় নাড়লাম, "না, তবে এই রাতের আকাশটা আমি আগেও দেখেছি, বহু বছর আগে।"

"রাতের আকাশ আগে সবাই দেখেছে, এতে নতুন কি আছে?"

"এ আকাশ আজকের পৃথিবীর মানুষ দেখেনি, নর্থ পোল ফনিস ১২ ডিগ্রি সরে আছে। সাজিটরিয়াস এর পোলার মুভমেন্ট ছিয়াশি ডিগ্রি, ৮৬-র হ্যালির ধুমকেতু আমরা এখনও দেখিনি। সেটা হতে আরও ছাব্বিশ বছর দেরি আছে। আকাশের তারারা মিথ্যে বলেনা। এটা আজকের না, আজ থেকে ৫০ বছর আগের আকাশ।"

"কী পাগলের মত বকছিস! কী করে বলছিস তুই এসব?" প্রায় চিৎকার করে উঠল সায়ন্তন।

আমি মাথা নামিয়ে নিলাম, তার একটা হাত রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম,

“বলছি, কারণ আমিই ডঃ রবার্ট হিল।”

বাকি রাস্তা দুজনে কথা বললাম না, আমাদের কারোই কথা বলার অবস্থা নেই, যত ম্যানটান হাউসের দিকে এগোচ্ছি তত আমার ভিতরে একটা একটা করে সব প্রশ্নের উত্তর ফুটে উঠছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল আমার। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম হলধর আমাদের আগেই পৌঁছেছে। সায়ন্তন তাকে দু’কাপ চা পাঠাতে বলল। আমরা ওপরের ঘরে চলে এলাম। টেবিলের একপাশে চেয়ারে বসলাম আমি আর একপাশে সায়ন্তন। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। খানিক বাদে আমি অল্প হেসে বললাম “একটা কথা বললে বিশ্বাস করবি?”

“কী?” সে যতটা সম্ভব নিরুত্তাপ গলায় প্রশ্ন করল। আমি মাথা নামিয়ে নিচু গলায় বললাম, “যদি বলি এ শতাব্দির সব থেকে বড় শয়তানি, সব থেকে বড়ো পাপটা করেছিল রবার্ট হিল,আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, এই গ্রামের এই ছোট্ট বাড়িতে বসে?”

“করব,কিন্তু আগে বল তুই সেসব জানলি কী করে?”

“সেটা জানিনা, এমন কি রবার্ট হিলের শেষ পরিণতিও আমি জানিনা, হয়ত আর জানা সম্ভবও না।”

“তুই বলছিস রবার্ট হিল তোর পূর্বজন্ম?”

“তাও বলছি না।”

আমি চেয়ার থেকে উঠে একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনের জানলাটা খোলা ছিল। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, “আচ্ছা, এ শতাব্দির সব থেকে বড় পাপটা কী? খুন, অন্তর্ঘাত, গণহত্যা, নাকি ৪৫ এ জাপানে আণবিক বোমা ফাটানো, কিংবা ৯/ ১১?”

“এগুলো সবই- ”

“না। আরো একটা আছে। যদিও এটার কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানেনা। জানতে পারবেও না।”

সায়ন্তন আর কিছু বলল না। আমি জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে বলে চললাম, “জার্নালগুলো পড়লে জানতে পারবি হিল সাহেবের গবেষণার বিষয় ছিল ৪২ প্লেপিডিয়াম বলে একটা যৌগ আবিষ্কার করা। এই যৌগের কাজ হল জীবদেহে হৃৎপিন্ড ও অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা স্বাভাবিকের থেকে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া। কাজে বেশ কিছুদূর এগিয়েছিলেন তিনি, হঠাৎ মাথায় অন্য এক ভূত চাপে তাঁর। কৃত্রিম উপায়ে মানুষের জীবনকাল বাড়িয়ে তোলার গবেষণা।

দীর্ঘদিন চেষ্টাতেও লাভ হল না তাতে। উপরওয়ালা মানুষের হাতে এই ম্যাজিকটা দিতে কিছুতেই রাজি নন। সাহেব প্রায় হাল ছাড়ার মুখে, এমনসময় একটা ঘটনা ঘটল। একটা উল্কা এসে পড়ল এই গ্রামেই। বেশ বড়োসড়ো। সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েই প্রবীণ বিজ্ঞানীর চোখ কপালে উঠল। উল্কার গায়ে এমন কিছু মৌলের চিহ্ন আছে যা পৃথিবীতে মেলে না। এই সমস্ত মৌলের নমুনা আর লেপিডিয়াম নিয়ে ভদ্রলোক একটা ওষুধ তৈরি করলেন, ধরে নে একটা ভাইরাস, যেটা কৃত্রিম উপায়ে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে। আর সেটাই হল পাপ, সব থেকে বড়ো পাপ।”

সায়ন্তন এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল। এবার আমি থামতে মুখে একটু হাসি এনে বলল, “সে ওষুধ এখন কোথায়?”

আমি জানলার গ্রিলে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বললাম "এয়ারবোর্ন ড্রপলেট ভাইরাস। তার মধ্যে দিয়েই ছড়িয়ে দেয়া হয় এ ওষুধ। মাঝখানে কেটে গেছে ৫০ বছর, সে ভাইরাস এখন তোর আর আমার শরীরে!"

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সায়ন্তন। আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "থামা পাগলের প্রলাপ। কাল সকালেই কলকাতায় ফিরব আমরা। তোর চিকিৎসা দরকার।"

"গিনিপিগের উপর সে ভাইরাস কাজ করেনি দেখে খুব হতাশ হয়েছিলাম বুঝলি? কিছুদিন পরে সেটা এমনি মরে গেল। আমার চমক অপেক্ষা করছিল তার পরে। জীবিত অবস্থায় এ ভাইরাস কাজ করে না। মৃত্যুর কয়েকবছর পর থেকে ভাইরাস কাজ করা শুরু করে শরীরে। একটু একটু করে প্রাণ সঞ্চার করে, শুকিয়ে যাওয়া শরীরে মাংস ফিরে আসে। হৃৎস্পন্দন শূন্য থেকে বাড়তে শুরু করে, নার্ভগুলো সচল হয়, মৃত মানুষ আবার চোখ খোলে। কিন্তু ততদিনে তাকে কফিন বন্দি করে চাপা দেয়া হয়েছে মাটির নিচে। সে চোখ খোলে মাটির দেড় মিটার নিচে। তার চিৎকার কেউ শুনতে পায়না। সে কাঠের কফিন আছড়ায়। পাগলের মত ধাক্কা মারতে থাকে। কিন্তু কেউ খোলে না। গোটা পৃথিবীবাসীর কাছে সে মৃত। আর কোনদিন তার প্রাণ ফেরার আশা নেই—শুধু আমি- আমি নিজেকে কবরে যেতে দিইনি—আমি- " আমি আরেকবার টান মারলাম গ্রিল ধরে।

সায়ন্তন হিংস্র শ্বাপদের মত এগিয়ে এল আমার দিকে, "তুই পাগল হয়েছিস। সরে আয় ওখান থেকে...হলধর...হলধর...শিগগির একবার এদিকে-- "

"এশিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা-- কোথায় ছড়ায়নি আমার ভাইরাস? গোটা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মাটির তলায় শুয়ে ছটফট করছে। আহ্, আমার এই দুহাতে কত বড় শাস্তি গোটা পৃথিবীকে দিয়ে যাচ্ছি আমি। আচ্ছা এ ভাইরাসের কী নাম দেওয়া যায় বলতো?"

সায়ন্তন ঝাঁপিয়ে এসে আমার শার্ট খামচে ধরতে গেল। আমি আরেকবার টান মেরে জানলার গ্রিলটা খুলে ফেললাম। তার ছুঁচলো ভাঙা দিকটা সজোরে বসিয়ে দিলাম তার বুকের ভিতরে। দুবার কঁকিয়ে উঠে সে মাটিতে পড়ে গেল। যাক গে। আবার ফিরে আসবে। নতুন স্মৃতিতে, নতুন নামে—

-- আমি তার মুখের ভিতর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম " কী জানিস? একটা নাম আমি ভেবে রেখেছি। যুগযুগান্ত ধরে যে মানুষটা নিঃসঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে আকাশের গায়, তার নামে ওর নাম দেব—ওরিয়ন—কালপুরুষ-- "

চেয়ারের উপর আমি বসে থাকলাম যতক্ষণ না তার শরীরটা নিথর হয়ে যায়,তারপর নীচে নেমে এসে, হলধরের রেখে যাওয়া দু'কাপ চা এক নিঃশ্বাসে গলায় ঢেলে বেরিয়ে এলাম বাইরের খোলা মাঠে, চারপাশটা কুয়াশায় ঢেকে আছে। কালো আকাশের মাঝে ধনুর্ধারী কালপুরুষের প্রতিটা তারা ঝলমল করছে...

ছবিঃ শ্রীশাম্ব

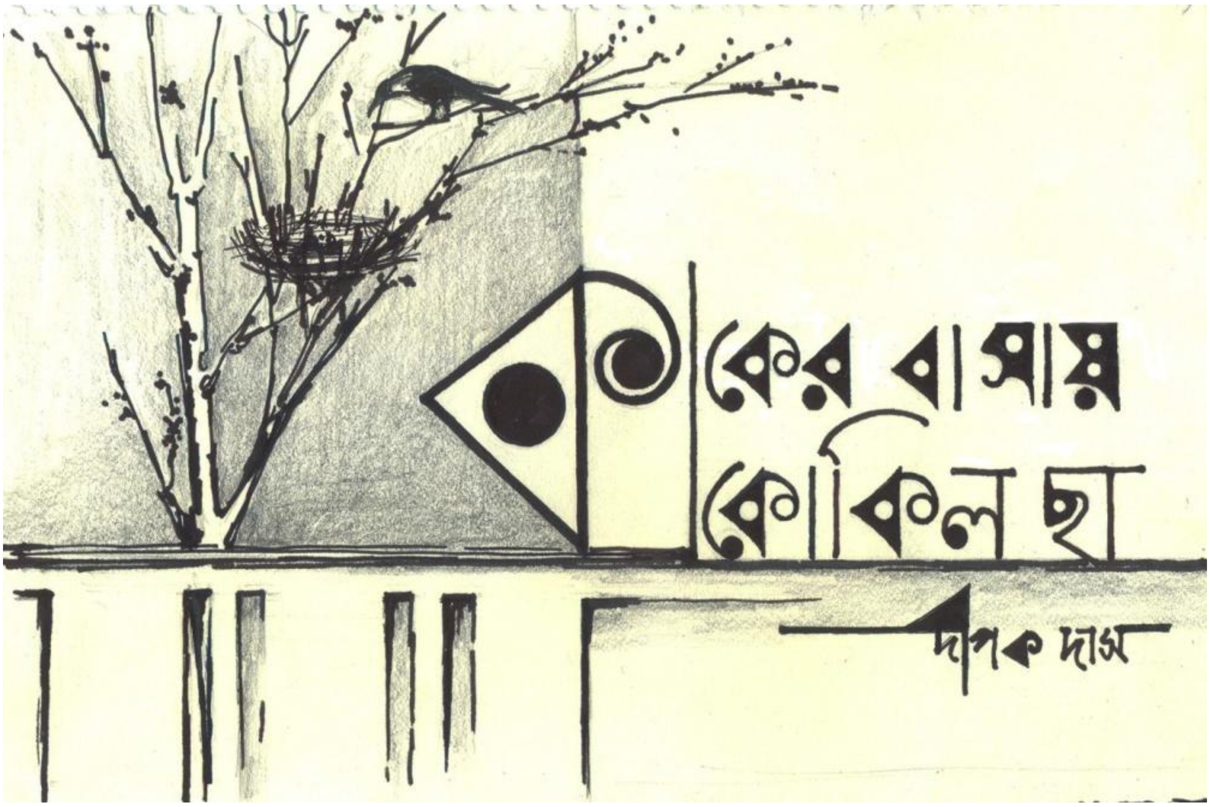

"মামা, মামা দেখো, আমি কী পেয়েছি!"

লেখার টেবিলে মাথা রেখে প্রাণপণে ভাবছিলুম তখন। সেই বছর দুয়েক আগে একটা গল্প বেরিয়েছিল নামী পত্রিকায়। কিছু টাকাও পেয়েছিলুম। কিন্তু বন্ধুদের খাওয়াতে খাওয়াতে সে টাকা শেষ কবেই। শেষ বন্ধুকে খাইয়েছিলুম ওর কাছ থেকেই টাকা ধার করে। বন্ধু ক'দিন থেকে টাকাটার জন্য তাগাদা দিচ্ছে— হয় নতুন গল্প লেখ, নয়তো টাকা শোধ কর। শাসিয়ে রেখেছে, যদি ছ মাসের মধ্যে যদি গল্প প্রকাশ করতে না পারি তাহলে ও ফেসবুকে আমার পুরনো গল্পটা স্ক্যান করে পোস্ট করে দেবে। তাতে লিখে দেবে, এই গল্পটি আমার লেখা নয়। সমনামী কারও লেখা চালিয়াতি করে নিজের নামে চালিয়েছি।

কম্পিউটার, ফেসবুকে আমি তেমন সড়গড় নই। চোর বদনাম দেওয়া ফেসবুকের সেই লাইক- কমেন্ট- শেয়ারের ধাক্কা সামলাতে পারব না। তাই তিনদিন ধরে প্রাণপণে ভাবছি। মাত্র পাতা- দেড়েক লিখতে পেরেছি।

এমন সময় ভাগ্নেবাবু আমার ভাবনার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলেন। মাথা তুলে দেখলুম, দু'হাতের মুঠোয় কী সব ধরা আছে। মুখে খুশি খুশি ভাব। আমার বিরক্ত চোখের সামনে মুঠো মেলে বলল, "দেখো মামা, কোকিলের দুটো ডিম পেয়েছি।"

"কোকিলের ডিম! কোথা থেকে পেলি?"

"চিলেকোঠার ছাদ থেকে।"

"চিলেকোঠার ছাদ থেকে! এই বাঁদর! ওটা তো কাকের বাসা। তুই কাকের বাসায় হাত দিয়েছিলি? তাই বলি কাকগুলো কেন এত চেঁচাচ্ছে! ফ্যাল ফ্যাল, ফেলে দে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি হাত আলগা করে দিলেন। দুটো ডিমই ফটাস। আমার গল্প কুসুমে মাখামাখি হয়ে গল্পের কবিরাজি কাটলেট হওয়ার অপেক্ষায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলুম, "খাতার ওপরে ডিম ফেললি কেন?"

"বা রে! তুমিই তো বললে?"

"আমি তোকে টেবিলের ওপরে ডিম ফেলতে বলেছিলুম? হতভাগা, মর্কট! "

সামলাতে না পেরে লাগিয়ে দিলুম ঠাস করে এক চড়। হাঙরের মতো হাঁ করে ভাগ্নে চেঁচাতে শুরু করল। চিৎকারের চোটে মা আর দিদি দু'জনেই উপস্থিত। ওরা কিন্তু ভাগ্নের এতটুকু দোষ দেখতে পেল না। মা তো রেগে গিয়ে আমার ওপরেই একচোট নিল, "ভাগ্নে মারলে হাত কাঁপে জানিস?" বললুম, "আমার তো মারার আগে থেকেই কাঁপছিল, রাগে।"

দিদি বোধহয় আমার রাগের কারণ বুঝতে পারছিল। ও বলল, "টেবিলে দুটো ডিম ফেলেছে বলে আমার ছেলেকে মারলি! মনে আছে, কী করেছিলি আমার ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতায়? লতাপাতা এঁকে খাতাটা নষ্ট করেছিল কে? পরীক্ষার তিনদিন আগে রাত জেগে খাতা তৈরি করতে হয়েছিল। এক ঘা- ও মেরেছিলুম তোকে?"

আমি সাফাই দিয়ে বললুম, "তুই তো মাকে বলছিলি, খাতায় সুন্দর করে ছবি এঁকে দিতে। আমি ভেবেছিলুম, মা এত কাজ করে কখন আবার তোর খাতায় আঁকবে? তাই সাহায্য করেছিলুম। তোর পছন্দ না হলে আমি কী করব। এখন দোষটা তো তোর। তুই কেন ছেলেকে শিখিয়েছিস, কাকের বাসায় কোকিলের ডিম থাকে?"

দিদি বলল, "আমি শিখেছিলুম বলে শিখিয়েছি।" বলে আরও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগে ভাগ্নেই বলে উঠল, "মা জান তো আমি মামাকে ওটাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলুম। মামা ডিম ফেলে দিতে বলল বলে আমি ফেলে দিলুম। মামা আমাকে মারল। ওমা, মা, বল না, কোকিল কেন কাকের বাসায় ডিম পারে?"

"এই দীপু, বল ভাগ্নেকে। খুব তো গল্প লিখিস! দিদির এখন সময় নেই। ও আমার সঙ্গে রান্নাঘরে যাবে।" মা আমাকে রেগেমেগে নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে শাসিয়ে যায়, "আর এক ঘা- ও যদি মেরেছ ওকে তাহলে ভাপা ইলিশ থেকে তুমি বাদ।"

দু'জনে গটগট করে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে দিদি হাত নেড়ে, মুখ ভেংচে অঙ্গভঙ্গি করে, যার মানে, ঠিক হয়েছে। আমার ছেলেকে মারা! এখন কেমন মজা দেখ।

মজাটা যে বেড়ে তা গল্প শুরুর আগেই টের পেলুম। কোকিল কেন কাকের বাসায় ডিম পারে? আমি কী করে জানব! ডারউইন কি কিছু বলে গিয়েছেন? পক্ষীবিদ অজয় হোম কিছু বলেছেন? তবে কি মৎস্যপুরাণের মতো আমাকে এখন মুখে মুখে বায়সপুরাণ বানাতে হবে? ঠিক হ্যায়, পুরাণ কথা দিয়েই কাজ হাসিল করে দেব। "জ্যাক অ্যান্ড জিল" পড়া বাচ্চা তো! ঠিক ঘায়েল হয়ে যাবে।

"বুঝলি, সে অনেকদিন আগের কথা।"

"কতদিন আগের মামা? একশো বছর?"

বুঝলুম বাচ্চা ছেলে তো, তাই ওর কল্পনাশক্তি একশোর সীমানা পার করতে পারছে না। বললুম, "সে অ- নে- ক বছর। কোটি কোটি বছর। তখন পৃথিবী সবেমাত্র তৈরি হয়েছে।"

"কে তৈরি করল?"

“ব্রহ্মা রে ব্রহ্মা।”

“ব্রহ্মার কি কারখানা ছিল?”

বেসিক প্রশ্ন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপাদন হতো কীসে? কারখানায় না জমিতে? জানি না তো! কারখানা- জমির টানাপড়েন সাংঘাতিক। তাই সেদিকে না গিয়ে মোলায়েম সুরে বললুম, “ব্রহ্মার কারখানা ছিল কি না সেটা তো বইতে লেখেনি। কিন্তু তুই বেশি কথা বলিসনি। তাহলে আমি কিন্তু ভুলে যাব। শোন, পৃথিবী তো তৈরি হল। এবার সমস্যায় পড়লেন ব্রহ্মা। গাছপালা, পশুদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওরা ঠিক সংখ্যায় বাড়বে। কিন্তু পাখিদের কী হবে? ওরা তো সবসময় ওড়াওড়ি করবে। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মিলে ঠিক করলেন, পাখিরা ডিম পাড়বে। কিন্তু পাড়বে কোথায়? তার জন্য তো একটা সুরক্ষিত জায়গা চাই। ব্রহ্মার চিন্তা দূর করতে বিষ্ণু বললেন, ‘প্রজাপালন তো আমার বিভাগ। আমি জানি, কীভাবে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন করতে হয়। আপনি শুধু দেবরাজ ইন্দ্রকে বলে দিন, সরস্বতী যেন ওর কারিগরি শিক্ষাবিভাগ থেকে বিশ্বকর্মাকে কিছুদিনের জন্য প্রাণিসম্পদ বিভাগে বদলি করে। বিশ্বকর্মা নীড় রচনা শেখাবেন পাখিদের।’ বিষ্ণুর কথা শুনে ব্রহ্মা চারগালে হাত দিয়ে বসে রইলেন। নীড় আবার কী?”

ভাগ্নে জানতে চাইল, “চার গালে কেন মামা?”

আমি বললুম, “ব্রহ্মার চারটে মুখ, চারটে হাত। তাই উনি যখন ভাবেন তখন চারগালে হাত দিয়েই ভাবেন। তা বুঝলি, ব্রহ্মাকে চিন্তিত দেখে বিষ্ণু বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তিনি বললেন, ‘হে চতুরানন, আপনি বৃথাই চিন্তা করছেন। ও কাজ বিশ্বকর্মার ওপরে ছেড়ে দিন। বিশ্বকর্মা শিক্ষালয় স্থাপন করে পাখিদের শিখিয়ে দেবেন কীভাবে নীড় রচনা করতে হয়।’

“বিষ্ণুর পরামর্শমত সব পাখিদের জোড়াকে বিশ্বকর্মার ইস্কুলে ভর্তি করা হল। তখন সবরকম পাখিই ছিল দুটো করে। দুটো শালিখ, দুটো চড়াই, দুটো প্যাঁচা— সব দুটো করে।

“স্কুলে ভর্তি হতে হবে শুনেই হাঁসদুটো মানস সরোবরের জলে ঝাঁপ দিল। ওরা পড়াশোনা করতে চায় না। ঘুরতে চায়। ব্রহ্মা বললেন, ‘নীড় রচনা ওদের শিখতেই হবে। পালিয়ে পার পাবে না। আমি ইস্কুলছুটদের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ করব। বাকিরা বিশ্বকর্মার ক্লাসে চলে যাক।’

“বুঝলি, বাকিরা ক্লাসে গেল আর সেই হাঁস দুটোর জন্য ব্রহ্মা ময়দানবকে মাস্টার রাখলেন। ময়দানব কে জানিস তো? বিশ্বকর্মা যেমন দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার ময়দানব তেমনি দৈত্যদের ইঞ্জিনিয়ার। বেশ রাগী মাস্টার। ময়দানব সরোবরের পাড়ে গিয়ে হাঁস দুটোকে চইচই করে ডাকলেন। কিন্তু ওরা এল না। ময়দানব চেঁচিয়ে বললেন, ‘তাড়াতাড়ি চলে আয়। দেরি করার উপায় নেই। বিকেলে দৈত্যরাজ বলির বাড়িতে টিউশন আছে। ওঁর ছেলেকে আমি বজ্র তৈরি করা শেখাচ্ছি। এমন বজ্র তৈরি করব দেখবি। ইন্দ্রর থেকেও হেভি হবে। তোদের বাসাটাও ফ্যান্টাস্টিক হবে। চলে আয়, চইচই।’

“হাঁসগুলো আসবে কী, ময়দানবের গম্ভীর গলা আর বিকট চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে গেল। ওরা সরোবর ছেড়ে উড়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। ওদের আর বাসা তৈরি শেখা হল না। তখন ক্লাসে ফাঁকি দিয়েছিল বলেই হাঁসেরা এখনও বাসা বাঁধতে পারে না। জলাশয়ের পাড়ের ঝোপে ডিম পারে।

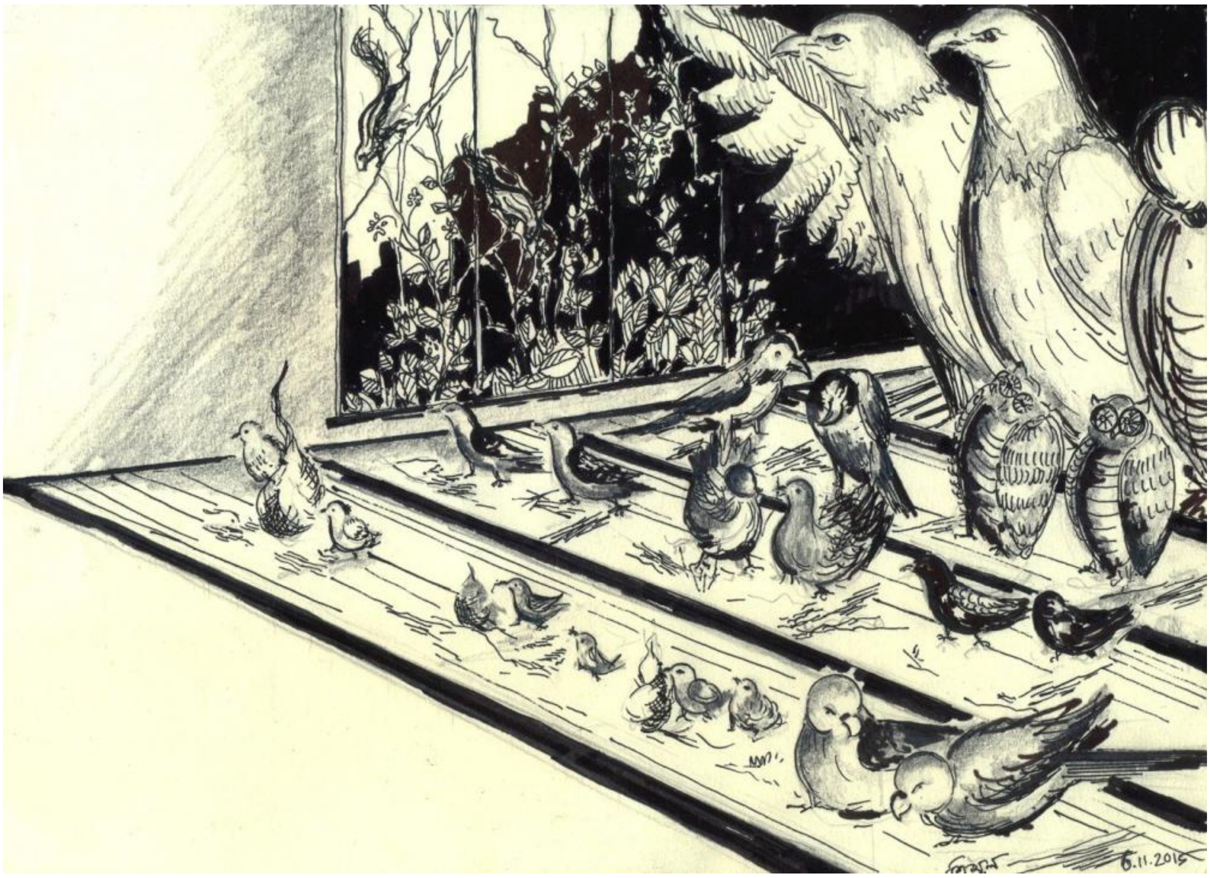

"জানি। ডিসকভারি চ্যানেলে দেখেছি।"

"বাহ্‌, খুব ভাল। তারপর শোন, ইস্কুল- ছুট হাঁসগুলো কিছু না শিখলেও ময়দানব মাসে মাসে মাইনে পেতেন। রোজ ক্লাসের সময়ে একবার করে সরোবরের পাড়ে গিয়ে চেঁচান। ওঁর চিৎকার শুনে হাঁসগুলো ঝটপট বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। ময়দানব চলে যান। ওইসময় তিনি নতুন টিউশনি নিয়েছেন। দেবসেনাপতি কার্তিককে নতুন অস্ত্র তৈরি শেখাচ্ছেন। ময়দানবের অস্ত্রব্যাবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দেবতা আর দৈত্য দুদিক থেকেই লাভ। ওদিকে, বিশ্বকর্মার ক্লাস রমরম করে চলছে। দারুণ উন্নতি করছে টুনটুনি আর বাবুই। বিশ্বকর্মা যতবার ক্লাস টেস্ট নিয়েছেন, ততবারই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে বাবুই আর টুনটুনি জোড়ার মধ্যে। একবার ওরা ফার্স্ট তো একবার এরা।"

"মামা, আমাদের ক্লাসের রাকেশ আর রাহুলের মধ্যে এরকম কম্পিটিশন হয়।"

"তা তো হবেই। মানুষ, না- মানুষ সবই তো ব্রহ্মার সৃষ্টি। তারপর শোন, ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিশ্বকর্মার কোনও সমস্যা ছিল না। সমস্যা হল গবেটগুলোকে নিয়ে। শকুনি আর ঈগল ভীষণ মাথামোটা। বিশ্বকর্মা এতরকম মডেল করে দেখালেন। কিন্তু কোনওটাই ওরা শিখতে পারল না। শিখবে কী করে? শকুনিরা তো সারাক্ষণ ক্লাসে ঝিমোয় আর ঈগল-জোড়া ক্লাসরুমের পাশে পারিজাত ফুল গাছে লাফিয়ে বেড়ানো কাঠবেড়ালিগুলোকে ধরার জন্য চংবং করে।"

"মামা সুমিত না ঈগলের মতো। ও জানলা দিয়ে শিউলালের ভেলপুরির দোকানের দিকে চেয়ে থাকে। কত মার খায় সে জন্য।"

বুঝলুম, গল্প ভালই এগোচ্ছে। এবার তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। না হলে ব্যাটাকে নীচে পাঠানো যাবে না। বললুম, "শুধু ওরা নয়, পায়রাজোড়াও সমস্যা করে। দুজনেই সারাক্ষণ ডানার পালক সাফ করতে ব্যস্ত। চড়ুইজোড়া ভীষণ চঞ্চল। ছটফট করে আর পাশে বসা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাবের প্যাঁচা- প্যাঁচানির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। প্যাঁচারা রেগে গিয়ে চড়ুইদের আস্তে করে ধমক দেওয়ার চেষ্টা করলেও ক্লাস গমগম করে ওঠে। বিশ্বকর্মা রোজই প্যাঁচাদের ডানার ওপরে দাঁড় করিয়ে দেন।

"একদিন প্যাঁচা করেছে কী, বিশ্বকর্মা অন্যদিকে ফিরতেই চড়ুইকে দিয়েছে ডানার এক ঝাপটা। চড়ুই ছিটকে গিয়ে পড়েছে দু বেঞ্চ আগে বসা টিয়াজোড়ার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে টিয়াদের ক্যাঁচক্যাঁচ আর এদিকে চড়ুইয়ের চ্যাঁচানি। বিশ্বকর্মা প্যাঁচা- চড়ুই সবাইকে বাইরে বের করে দিলেন।"

"মামা, আমাদের ক্লাসের দীপ্তকে রোজ ওইরকম বাইরে করে দেন বেশিরভাগ স্যার।"

মনে মনে বললুম, তা তো হবেই। আমি তো তোর- আমার ছোটবেলা থেকে চুরি করে গল্পটা বানাচ্ছি। মুখে বললুম, "তুই আবার কথা বলছিস? এবার কিন্তু গল্প বলা বন্ধ হয়ে যাবে।"

"না, না। আর একটা কথা বলে চুপ করে থাকব। মামা কাক- কোকিল কোথায় গেল? ওরা ক্লাসে নেই?"

"আছে, আছে। সবাই আছে। ওদের কথা এখন বলছি না। বলতে শুরু করলে আর কারও কথা বলা যাবে না। বুঝলি, বদমাশ আর গবেট পড়ুয়াদের কী হবে সেটা জানতে বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন তো ওঁরই ডিপার্টমেন্ট। বিশ্বকর্মার মুখ থেকে ফাঁকিবাজ আর মাথামোটা ছাত্র- ছাত্রীদের ফিরিস্তি শুনে বিষ্ণু বললেন, 'তুমি তো ভারি বোকা হে বিশু!' "

"বিশু কে মামা?"

"বিশু মানে বিশ্বকর্মা। বিষ্ণু তো তিন প্রধান দেবতাদের একজন, তাই উনি কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের ডাকনাম ধরে ডাকেন। বিষ্ণু বললেন, 'তোমার মতো গবেট মাস্টার তো দুটি নেই দেখছি! বেতনটি ঠিকঠাক পাচ্ছ তো হে? কে তোমাকে শিল্পকলা- চারুকলা ফলিয়ে বিদ্যার মান উন্নত করতে বলেছে? তুমি শুধু কোনমতে একটা বাসা খাড়া করা শিখিয়ে দাও। যাতে ডিমগুলো গড়িয়ে না পড়ে। আমি সরস্বতীর দফতরে রিপোর্ট করে দেব, সব পাশ। কেউ ফেল করার মতো নেই। মনে রাখবে, যারা ভাল ফল করার তারা এমনিতেই করবে। তাড়াতাড়ি মিশন- নীড় শেষ করো বিশু। আমাদের কাছে খবর আছে, যুদ্ধ লাগল বলে। তোমার মেধাশ্রম অস্ত্র তৈরিতে খরচ করো। যাতে দৈত্যরা ভয় পায়।'

" 'হে নারায়ণ, শকুনি আর ঈগল তো বাসার নামে একটা করে বিশাল ঝোপঝাড় তৈরি করছে।'

" 'তাই করতে দাও না। শুধু বলে দেবে, মাঝে যেন ডিম রাখার আর তা দেওয়ার মতো ফাঁক রাখে।'

" 'অন্যদের কী হবে?'

" 'অন্যদের? পায়রা যেমন অলস বলছ তাতে ওদের মানুষের দালান-কোঠায় বাসা করাই ভাল। চড়ুইকে বাড়ির ঘুলঘুলিতে ঢুকিয়ে দাও। যেহেতু প্যাঁচা কারও সঙ্গে মিশতে পারে না তাই ওরা গাছের কোটরে থাকুক। টিয়াদের খুব কাটাকাটির স্বভাব তো? ওরা গাছের কাণ্ড কেটে বাসা তৈরি করুক না। সমস্যা শেষ। এবার আমি আসি?'

"'না, নাহ্। যাবেন না প্রভু। এখনও আসল সমস্যা বলা হয়নি। কাক আর কোকিল জোড়াদের নিয়ে কী করি? ওরা এত জ্বালাতন করে যে ইচ্ছে করে দু'চারটে থাপ্পড় লাগিয়ে দিই।'

" 'খবরদার ওই কাজটি করো না, বিশু। গণেশের চ্যালা গণদেবতাদের জান তো? ওরা সব হাফ-দেবতা। ফুল দেবতা হওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজছে। তুমি মারলেই তা নিয়ে আন্দোলন শুরু করবে। সেই সুযোগে ব্রহ্মার কাছ থেকে নম্বর বাগিয়ে ফুল দেবতা হয়ে যাবে।'

" 'তা বলে জ্বালাতন করলেও মারা যাবে না?'

" 'না হে, সে সুখ নেই। কাক-কোকিলকে সহিংস বা অহিংস যে পদ্ধতিতেই শেখাও না কেন, শোধরাবে না। ওদের সৃষ্টির সময়ে পিতামহ ব্রহ্মার মতিভ্রম ঘটেছিল। তাই এই অবস্থা। শোনো বিশু, তুমি শুধু চোখ-কান বুজে তোমার সময়টা কাটিয়ে দাও।' "

"মামা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সবটা বোঝার দরকার নেই। গল্পে কাক-কোকিল ঢুকে পড়েছে, এটা বুঝতে পারছিস তো? ব্যাস! এবার শোন। বিষ্ণুর সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পরে কাক-কোকিলের অত্যাচার যেন শতগুণে বেড়ে গেল। কাক-জোড়া সহপাঠীদের জিনিস চুরি করে। কোকিলেরা অন্যদের ভ্যাঙায়। এমনকী বিশ্বকর্মাকেও নকল করে। বিশ্বকর্মার রাগ হয়। কিন্তু কিছুই করতে পারেন না। বুঝলি, একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে তিনি তেড়ে গেলেন কাক-কোকিলের দিকে। দেবেন আজ তুলে এক আছাড়। কাকের ডানা পাকড়াবেন বলে যেই হাত বাড়িয়েছেন ওমনি কোকিলটা চেঁচিয়ে উঠল, 'মারবেন না, মহাশয়। আমরা ব্রহ্মার কাছে নালিশ করব।' বিশ্বকর্মা বুঝলেন, বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর কথা সব এরা শুনেছে। তাই এত বাড়বাড়ন্ত। মুখে বললেন, 'চাকরি যায় যাবে, তোদের চারটেকে আজ ক্লাসের বাইরে ছুড়ে ফেলে দেব।' তিনি সবকটাকে বাইরে বের করে দিলেন।"

"ঠিক হয়েছে বের করে দিয়েছে। আমাদের ক্লাসের সঞ্জয় আর পার্থকেও বের করে দেন স্যারেরা, তবে আমরা পড়া শুনতে পাই।"

শুনে ভাল লাগল। তাহলে দুষ্টু ছেলেদের শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে। মুখে বললুম, "একবার শাস্তি দেওয়ার পরে বিশ্বকর্মার সাহস বেড়ে গেল। উনি দেখলেন, তেমন কোনও বিপদ ঘটছে না। কাক-কোকিল একটু ট্যাঁ-ফো করলেই ক্লাসের বাইরে। ওরাও কি কম বদমাশ! একদিন বাইরে গেল। দু'দিন গেল। তিনদিনের দিন থেকে বদমায়েশি শুরু করল। একদিন ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ যাচ্ছিলেন। কাক আর কাকিনী সোজা গিয়ে ওঁর শিংয়ে বসে দু'কানে দুই ঠোক্কর। যেরকম করে কাকেরা গরুর কানের পোকা বাছে। জানিস তো দক্ষের মাথাটা ছাগলের? ব্রহ্মার জন্য ফল নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠোক্করের চোটে দক্ষের হাত থেকে ফলগুলো ছিটকে পড়ে গেল। কোকিল সঙ্গে সঙ্গে ফল ঠুকরে খেতে শুরু করল। বিশ্বকর্মা ছুটে এসে কোনওমতে দক্ষকে ঠান্ডা করেন।

"তারপর একদিন ঘটে গেল সেই অঘটন। সেদিনও ওরা বাইরে। ক্লাসের বাইরে স্বর্গের ফুল পারিজাত গাছের নীচে বিশ্বকর্মার হাতিটা দাঁড়িয়ে থাকে। কাক- কোকিল ফিসফিসিয়ে কীসব বলল। তারপর চারজনেই উড়ে পারিজাতের ডালে গিয়ে বসল। কোকিল মিঠে স্বরে বলতে শুরু করল, 'জানিস, ওইদিকে একটা কলাবাগান আছে। কাঁদি কাঁদি সোনালি, মিষ্টি কলা ঝুলছে।'

" 'জানিনি আবার! কত খেইচি।'

"শুনেই বিশ্বকর্মার হাতি শুঁড় তুলে দুবার ঝোল টানার মতো করে শুঁকে নিল। ওরা বুঝল হাতির লোভ লেগেছে। কাক একেবারে নীচের ডালে এসে হাতিকে বলল, 'যাবে নাকি গো হাতিদাদা? কলাগাছগুলোও হেব্বি। থামের মতো বিশাল বিশাল।'

"হাতি হ্যাঁ- না করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না গো, এক্ষুণি প্রভুর ছুটি হবে। আমাকে দেখতে না পেলে বকবে।' কাকিনী বলল, 'আরে দূর! এই তো সবে সবাইকে কুটি ধরা শেখাচ্ছে। ওরা কুটি তুলবে, বাসা বাঁধবে। বিশ্বকর্মাকে দেখাবে। তবে তো ছুটি!'

"হাতির ইচ্ছা থাকলেও বকুনি খাওয়ার ভয়ে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। তাছাড়া এরা কেন বাইরে সেটাও জানতে হয়। হাতি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কেন বাইরে গো?'

"কাক বলল, 'আমরা সবচেয়ে ভালো বাসা বুনতে শিখেছি বলে কেলাসের অন্য পাখিরা খুব হিংসে করে। সে জন্য মাস্টার বলল, যা তোদের ক্লাসে থাকার দরকার নেই। তা কী ঠিক করলে?' হাতি জানতে চাইল, 'বেশি দেরি হবে না তো?' কাক অভয় দিয়ে বলল, 'আরে না, না। এই তো যাব আর আসব।'

"কলাবাগানটা আসলে ছিল দৈত্যরাজ বলীর। হাতি বাগানে ঢুকে যেই কলাগাছের দিকে এগিয়েছে কোকিল বলল, 'এদিকে নয়, ওদিকে।' হাতি সেদিকে ঘুরতেই কাক আর কাকিনী দু'দিক থেকে আক্রমণ করল হাতির চোখে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে ছুটতে গিয়ে হাতিটা ধাক্কা মারল একটা কলাঝাড়ে। ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে শয়ে শয়ে ভীমরুল হুল ফোটাতে শুরু করল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে হাতি ছুটতে শুরু করল। ঠোক্করের চোটে চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলাবাগান তছনছ।"

একবার তাকিয়ে দেখলুম ভাগ্নেবাবুর দিকে। উনি চোখ গোলগোল করে গল্প শুনছেন। আবার শুরু করলুম। "বুঝলি, বাগানে একটা গোপন ঘর ছিল। সেখানে ময়দানব বলীর ছেলেকে অস্ত্র তৈরি শেখাতেন। হাতির প্রচণ্ড হাঁকডাক শুনে বেরিয়ে এসে ময়দানব দেখেন, বিশ্বকর্মার হাতি ছোটাছুটি করছে। হাতিটাকে প্রহরী দিয়ে ধরার ব্যবস্থা করে তিনি বলীকে খবর পাঠালেন। এদিকে বিশ্বকর্মাও ইস্কুল ছুটির পরে হাতি খুঁজছেন। এমন সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এসে হাজির। ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে! তোমার হাতির জন্য বলী দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমার রাজ্যপাট গেল।' বিশ্বকর্মা অবাক। ব্রহ্মা বললেন, 'ময়দানব বলীকে বুঝিয়েছে, ও বলীর পুত্রকে সাংঘাতিক মারণাস্ত্র তৈরি এবং ব্যবহার শেখাচ্ছিল। দেবতারা না কি কায়দা করে তোমার হাতি পাঠিয়ে ওদের মারণাস্ত্রের গোপন কারখানা ভাঙতে পাঠিয়েছিল।'

"বিশ্বকর্মা বললেন, 'হে চতুরানন, আপনি যত শীঘ্র সম্ভব দেবর্ষি নারদকে দূত হিসাবে পাঠান। দেবর্ষি যেন অনুরোধ করেন, আমাকে হাতির কাছে নিয়ে যেতে। তাহলেই সত্য জানা যাবে।' বুঝলি, নারদের সব জায়াগাতেই ভাল যাতায়াত। তাঁর কথায় বিশ্বকর্মাকে হাতির

কাছে যেতে দেওয়া হল। হাতি তখন খুব কাঁদছে। সব সত্য জানা গেল। বলীও দেখলেন, হাতির দু'চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সারা গায়ে ফোলা ফোলা। বাগানে ভীমরুলের ভাঙা চাকটিও মিলল। তিনি লিখিত ক্ষমা চেয়ে হাতি ফেরত দিলেন। আশ্বাস দিলেন, ভুল বুঝিয়ে দেবাসুরে যুদ্ধ লাগানোর চেষ্টার অপরাধে ময়দানবকে বরখাস্ত করে তদন্ত চালানো হবে।

"বিশ্বকর্মা হাতি নিয়ে ফেরত আসছেন। একটা গাছ থেকে কাক- কোকিলেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ওদের আনন্দ দেখে বিশ্বকর্মা রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন, 'তোদের জন্যই আমার হাতির এই অবস্থা। অভিশাপ দিলাম, তোদের ওই বন্ধুত্ব থাকবে না। কোকিল, তোরা কোনওদিন বাসা বাঁধতে শিখবি না। কাকের ডিম ফেলে ওদের বাসাতেই ডিম পাড়বি। তাহলেই তোদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।' বুঝলি, সেই থেকে কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে।"

"আচ্ছা মামা, কাকের ডিম যদি ফেলেই দেয় তাহলে কাক কেন এত বেশি? কোকিল কেন এত কম? আমাদের ওখানে তো কোকিল দেখাই যায় না।"

"এ তো আমি জানি না বাবা। এসবই সালিম আলি জানেন।"

"সালিম আলি কে মামা?"

"একজন পক্ষীবিশারদ।"

"পক্ষীবিশারদ কী মামা?"

ওরে বাবা! এ যে প্রশ্নের মালট্রেন। এ তো শেষ হওয়ার নয়। পক্ষীবিশারদ কী জানার পরে প্রশ্ন করবে তাঁরা কী করেন? কেন করেন? কোথায় এত পাখি দেখতে যান? আজ আর গল্প লেখা হবে না। প্রশ্নের গাড়ি গুনতে গুনতে কখন রাগের মাথায় ঠাস করে আবার চড় লাগিয়ে দেব। আমার ইলিশ ভাপা বন্ধ হয়ে যাবে। তার থেকে পালাই বাবা। দুপুরবেলা খাবার সময় বাড়ি ঢুকব। মা- দিদি কি না দিয়ে থাকতে পারবে?

মনে হতেই তড়াক করে লাফিয়ে ছুট লাগালুম। আমাকে পালাতে দেখে ভাগ্নেও চ্যাঁচাতে শুরু করল, "ও মামা, পালাচ্ছ কেন? ও মা, ও দিদুন, দেখ না মামা গল্প না বলে পালাচ্ছে। ও মা, ম্যাঁ- অ্যাঁ- অ্যাঁ..."

আমি তখন রাস্তায়। প্রাণপণে ছুটছি।

ছবিঃ শিমুল

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

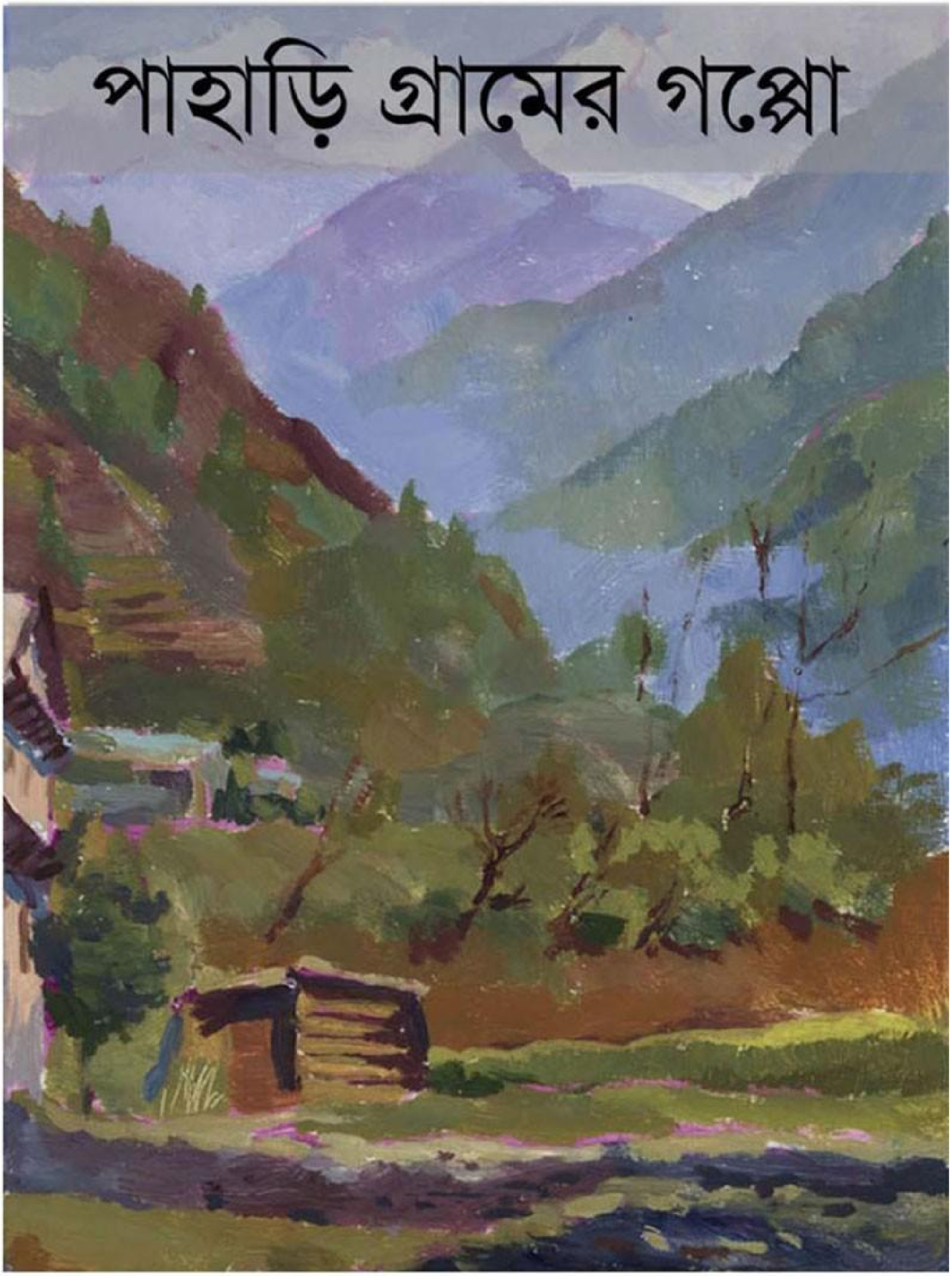

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর......"

ডুমক

ইন্দর সিং ভান্ডারির বাড়ির ছাতটা ভারি মনোরম। উত্তর পূবে পাহাড়ের ঢাল আর দক্ষিণ পশ্চিমে রুদ্রগঙ্গা। মাঝে অনেকটা ছড়ানো উপত্যকার ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গ্রাম। গ্রামের ধারে রাস্তার পাশেই লম্বা টানা ঘরের ওপরে এই ছাত। বিকেলের আলোয় ফুরফুরে শীত শীত হাওয়ায় চাদর গায়ে বসে চা খেতে খেতে এমন গ্রাম দেখার কী যে সুখ তা কী আর বলব! ইন্দরজি অবশ্য ছাতে উঠতে পারেননি তখন, যখন আমরা ওখানে বসে চা খাচ্ছিলাম। ওঁর পা ভেঙে গিয়েছিল। নীচে ঘরের সামনে একটা নীচু খাটিয়ায় পা মেলে বসেছিলেন ভদ্রলোক। দিন দু চার আগে রাস্তা ধরে আসার সময় বাধানো রাস্তার ধারে বেকায়দায় পা হড়কে এই বিপত্তি। কোনো মানে হয়!

ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যাওয়ায় তাদের সঙ্গে তক্ষুণি তক্ষুণি আলাপ হল না। ছাতে বসে থাকতে আমাদের এত মজা লাগছিল যে শীত করলেও কেউই নেমে ঘরে চলে যাবার কথা মুখেও আনছিল না। বরং গায়ের চাদরটাকেই বেশ করে জড়িয়ে গুটিশুটি মেরে বসে বলাবলি করছিল যদি আরেক পেয়ালা করে চা পাওয়া যেত! যাহা বলা, এরই মধ্যে ইন্দরজির ছোটো ভাইপো কেটলি হাতে সিঁড়ি বেয়ে হাজির, “আপকে চায়ে।”

সকাল সকাল কল্পেশ্বর লাগোয়া গ্রাম দেবগ্রাম থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের পথ বেয়ে উরগাও উপত্যকার শেষ গ্রাম বাসা ছাড়িয়ে পিতরা ধার পার হয়ে, কালগোটে গ্রাম পেড়িয়ে দুপুর দুপুর নাগাদ ডুমক গ্রামে পৌঁছে আমাদের ভারী ভালো লেগেছিল। এখানে অবশ্য অন্যপথে গোপেশ্বর থেকে পায়ে হেঁটেও সরাসরি চলে আসা যায়। গ্রামের লোকেরা সে পথ চেনে, যায়ও। গোপেশ্বর চামোলি জেলার সদরঘাঁটি।

একঝলক দেখেই বোঝা গেল বেশ পরিচ্ছন্ন গ্রাম। বাঁধানো রাস্তা। দু'দুটো স্কুল। একটা স্কুল তো একেবারে ইন্দরজির বাড়িতে ঢোকার মুখেই, রাস্তার উল্টোদিকে। থাকা হবে কোথায় এটা জানার জন্য সে বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন ভদ্রলোক, "আরে আমার বাড়িতেই তো ট্রেকারদের জন্য বন্দোবস্ত মজুদ। কোথাও যাবার দরকারটা কী?"

অনায়াসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা জুটে তো গেলই, একটা গোটা রান্নাঘরও মিলে গেল রান্না করার জন্য। গল্পও করতে করতে এইবারে সন্ধ্যা নেমে এল। একটা দুটো তারা ফুটে উঠল আকাশে। আমার বন্ধু রাজা তারা চিনতে পারে ভালো। তাকে বললাম, "এবারে আমাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ চিনিয়ে দিবি ঠিক। কলকাতায় গিয়ে শীতের দিনে সাতটা সাড়ে সাতটার সময় মাথার ওপর পাশাপাশি ভীড় করে থাকা ওই তারাদের ঠিক চিনে নিতে পারব তাহলে।"

“আর কালপুরুষ ?”, বন্ধু জিজ্ঞেস করে।

“ওটা চিনে নিতে পারব। লুব্ধক আছে না !”

“সপ্তর্ষি মণ্ডল অবশ্য ওই শীতের সময় একটু গভীর রাতে দেখা যায়। রাতে কি উঠেছ কখোনো? দেখতে?”

“না ভাই।”

“এবারে একবার উঠে দেখো। আর অগস্ত্য?”

“সে কোথায়?”

“উত্তর আকাশে যেমন ধ্রুবতারা, ঠিক তার বিপরীতে দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্য। একবার আমাদের প্রকৃতিপাঠ শিবিরে যেও, আরো ভালো করে এইসব চিনে নিতে পারবে।”

রাতে ইন্দরজির স্ত্রীই আমাদের রুটি বানিয়ে দিলেন। বেশ ফুলকো ফুলকো গরম রুটি উনুন থেকে সরাসরি আমাদের পাতে। খেতে খেতেই স্কুলের গল্প করলেন ইন্দর সিং। দুটো স্কুলের একখানা সরকারি। প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যটা গ্রামের লোকেদের মিলে বানানো। সেবারেই কেন্দ্রীয় স্কুল বোর্ডের মান্যতাও পেয়েছে পাঁচ বছর চালানোর পর। আর্থিক অনুদানও। ফলে চিন্তা দূর হয়েছে অনেকটা। এই স্কুল দশ ক্লাস অবধি। ইন্দর বল্লেন এটাই বেশি ভালো। গ্রামের লোকেরা একযোগে অনেক কষ্ট করে এই স্কুল বানিয়েছেন। এটা তাঁদের সন্তানের মতো। আরও একটা দারুণ খবর জানা গেল। পুরোনো ছাত্ররা যারা এই স্কুল থেকে পাশ করে শহরে কলেজে পড়তে যায়, ফিরে এসে অন্তত একবছর তাদের এখানে শিক্ষকতা করতে হয়। চাকরি পেয়ে বা অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা ও রোজগার শুরু হলে আর্থিক সাহায্যও করে সকলে। তবে গ্রামে ফিরে এসে পড়ানোটা বাধ্যতামূলক। আর ছেলেমেয়েরা সানন্দে তা করেও।

সকালে দেখা হল ইন্দরজির ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। সকাল সকাল সবার পরণে স্কুলের পোশাক। বাড়িতে আরও বাচ্চারা আছে। ইন্দরজির ভাই দাদা অন্য আত্মীয়স্বজন। কোলের বাচ্চা আর একেবারে এক দু বছরের গোটা তিনেক শিশু বাদ দিয়ে সকলেই তৈরি, স্নান করে স্কুল পোশাকে, ব্যাগ নিয়ে। এই বাড়ি থেকেই স্কুলে যায় নয় নয় করে সাতটি বিভিন্ন বয়েসের ছেলেমেয়েরা। সকলেই নমস্তে করে চলে যাবার সময় বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে পিছু পিছু বাইরের রাস্তায় এসে দেখি গোটা গ্রাম থেকে গাঢ় নীল প্যান্ট আর আকাশি নীল জামায় ছেলেমেয়েরা চলেছে ছোট্ট স্কুলের দিকে। পুবদিক থেকে রোদ এসে পড়েছে স্কুলবাড়ির বারান্দায়। গোটা গ্রাম যেন হাসছে সেই আলোয়। অপূর্ব সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে লেগে আছে। ডুমক গ্রামে থাকার সময়কাল খুবই কম হলেও তাকে মনে রাখবার মূল কারণ এই স্কুল। পাহাড়ের এই অসাধারণ সুন্দর গ্রামটিতে বাড়তি সৌন্দর্য যেন যোগ করেছে এই অসামান্য বিদ্যালয়।

গ্রাম থেকে বেড়িয়ে কালাপানি নদী পেরোলেই আবার জঙ্গল। জঙ্গলের রাস্তায় বিস্তর পাখি। হিমালয়ের নানান প্রজাতির পাখি। পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হল বাসা

গ্রামের কুঁয়ার সিং নেগীর সঙ্গে। সে পায়ে হেঁটে গোপেশ্বর যাচ্ছিল। খানিকটা পথ আমাদের সঙ্গে যাওয়া যাবে বলে একসাথে চলল। খুব হাসিখুশি ছোট্টোখাট্টো মানুষ সে। আমরা ইতিউতি পাখি দেখছি বলে সে- ও বিপুল উৎসাহে আমাদের দেখাতে শুরু করল। একটা কালো ল্যাজ কালো মাথা সবুজ রঙের পাখি দেখিয়ে বলল ওটার নাম কী জানো? নেউলি। হলদে ঠোঁটের চড়াইয়ের মতো পাখিটা তখন পোকা খেতে ব্যস্ত। আবার কাকের মতো একখানা কুচকুচে গা হলদে ঠোঁটের পাখি দেখিয়ে বলল এটার নাম কালচিনি। আরও আরও অনেকগুলো পাখির নাম সে বলেছিল বটে কিন্তু আমি ভুলে গেছি। তবে একখানা পাখির মজার নাম ভুলিনি। চিরিবিরি। শুনেই আমায় ছড়ায় পেল। জঙ্গলের ছায়ায় বসে আমার বন্ধুরা যখন কাঠকুটো জোগাড় করে চা করতে ব্যস্ত তখন আমি টপ করে ছড়াটা লিখে ফেল্লাম। এই যে সেটা।

চিরিবিরি পাখিটা
মিশকালো ঠোঁটে
জঙ্গলে সারাদিন
শুধু পোকা খোঁটে।
বাদামি ও লালে মেশা
ল্যাজ খালি নাড়ে
আরো গাঢ় লাল রঙ
পেটের দুধারে।

ডুমক গিয়েছিলাম, বহু বছর কেটে গেছে তারপর। কদিন আগে আমার এক বন্ধু ওপথে যাবে শুনে একখানা ছবি দিয়ে বললাম এই ছবিখানা ইন্দরজির বাড়িতে দিয়ে দিও। এটা ওর ছেলেমেয়েদের ছবি। সে ফিরে এসে আমায় বললে, ইন্দরজির সাথে তার দেখা হয়েছিল। তিনি একইরকম আছেন। শুধু ছবির ছেলেমেদের পাওয়া যায়নি।

আমি আঁতকে ওঠায় সে তাড়াতাড়ি আমায় আশ্বস্ত করে বললে, “আররে তারা কি আর সেই ছোটোটি আছে? সব যে বড়ো হয়ে গেছে! কত বছর হল সে খেয়াল আছে? তবে তারা দিব্যি মনে করতে পারল ছবি তোলার কথা। কতোদিন বাদে আবার ছেলেবেলা ফেরত এল যে তাদের কাছে!

রাখী নাথ কর্মকার

পেডিস্ট্যল থেকে বেরিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ফোর্টউড লেভেলের একটা কোণায় এসে ঠুমরি ঠেসে দাঁড়াল -- ওর চারিদিকের সমস্ত কিছুই এক নিমেষে কেমন যেন বদলে গেছে। চেনা পরিবেশটা কোন জাদুবলে হঠাৎ ভ্যানিশ! সকালের রোদ ঝলমলে দিনটাও কেমন এক মুহূর্তে বদলে গিয়ে বিচ্ছিরি একটা গোমড়ামুখো, স্যাঁতস্যাঁতে দিনের চেহারা নিয়েছে।

ঝাপসা কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারপাশে কোন কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না! তার মধ্যে বিচ্ছিরি ঝিরিঝিরি বৃষ্টির তান্ডব! বুকের মাঝে কেমন যেন ধুকপুক করতে শুরু করল ওর- মা, বাবা, রজতকাকু-- কেউ কোত্থাও নেই-- চারিদিকে এত লোকের ভিড়ে কাউকে চেনে না ও! তবে ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না, কেমন যেন হাওয়ার মত ভেসে আছে ও, শরীরে কোন ভার নেই, ভর নেই-- !

বেডলোজ্ আইল্যান্ডে যারা রয়েছে তাঁরা ফরাসি বা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যক্তি বলেই মনে হল ঠুমরির। বেডলোজ্ আইল্যান্ডের চারপাশে বহু ছোট বড় নানা সাইজের নৌকা। “প্লেজার বোট” ভর্তি লোকজন হামলে পড়েছে এই মহান উৎসবের সাক্ষী হতে। এদিকওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ঠুমরি, ওর কাছেই জমাট বেঁধে থাকা স্টিমশিপ আর টাগবোটগুলোর (বন্দর এলাকায় বড় বড় জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তিশালী ছোটো বোট) মধ্যে থেকে ভিড়টা হঠাৎ প্রবল উৎসাহে চিৎকার করে উঠতে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, এক গুরুগম্ভীর ভদ্রলোক আরো অনেকের সাথে একটা ইয়টে করে এসে নামলেন এই বেডলোজ্ আইল্যান্ডে।

সকলের উচ্ছ্বসিত চিৎকার শুনে ঠুমরি বুঝল, ইনিই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড! আইল্যান্ডের একপাশে নোঙর করা লাল রঙের একটা বার্জ, যার গায়ে বড়োবড়ো করে লেখা - "ইট, ড্রিঙ্ক এন্ড বি মেরি"।

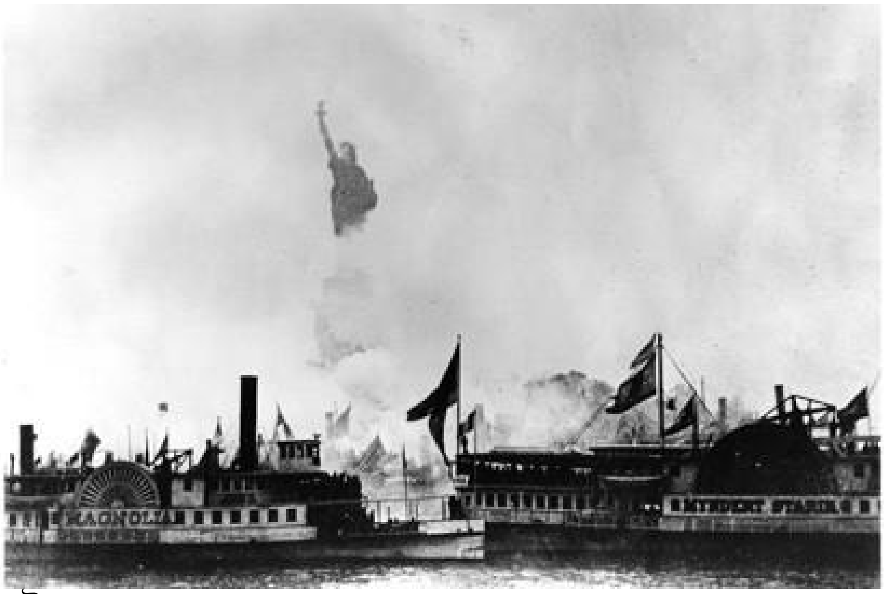

সেই বার্জ উপচে পড়া লোকেদের কথাবার্তায় কান পাতল ঠুমরি—

"আরে আজকের দিনটায় পুরো আমেরিকাই ভেঙে পড়েছে এই নিউ ইয়র্ক শহরে, ভর্তি ভর্তি ট্রেন উপচে লোক এসে হাজির হয়েছে এখানে! শহরের একটা হোটেলও খালি নেই..."

"হ্যাঁ। কত লোক কাল রাতে এসে কোন হোটেলে জায়গা না পেয়ে এখানে ওখানে রাত কাটিয়েছে!

"তবে যাই বলুন, আজ এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ার মাঝে, এই কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে, এমন পিটপিটে বৃষ্টি আর প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়ার ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে আমাদের আর এই বেডলোজ্ আইল্যান্ডের কাছে এসে এই মহিমান্বিত অনুষ্ঠানটা দেখার সুযোগই হত না যদি না এই বার্জ- এ আগে থেকে আমাদের সিট বুক করা না থাকত!

"সে আর বলতে! আজ সকাল থেকেই নিউ ইয়র্ক শহরে প্যারেড শুরু হয়ে গেছে - ম্যানহাটান, ব্যাটারি পার্ক, ম্যাডিসন স্কোয়ার, ফিফথ অ্যাভেন্যু উপচে পড়েছে ভিড়ে ঐ প্যারেড দেখবে বলে।"

চারপদিকে উৎসবের মেজাজ তখন। প্রতিটি বাড়ির জানালায় ফরাসী তিনরঙা পতাকার পাশাপাশি উড়ছিল আমেরিকার পতাকা! প্রায় চোদ্দশ পুলিশ নিযুক্ত হয়েছে প্যারেড আর এই উৎসর্গ উৎসবের দর্শনার্থীর ভিড় সামলানোর জন্যে ।

লোকজনেরকথাবার্তা শুনতে শুনতেই ঠুমরি দেখল, প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ হওয়ার পর প্রথমে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন ফরাসী প্রতিনিধিদের প্রধান এবং বিখ্যাত ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার, কাউন্ট ফার্দিনান্ড দ্য লেসেপ্স । তারপর নিউ ইয়র্ক কমিটির চেয়ার‍্যান মিস্টার এভার্ট (পুরো নামটা দূর থেকে শুনে ভালো বুঝতে পারল না ঠুমরি) এই মহান উপহার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে শুরু করলেন ।

ঠিক সেইসময় একটা গন্ডগোল ঘটে যেতে দেখল ঠুমরি, মিস্টার এভার্টের বক্তব্য চলাকালীনই লিবার্টির মশালের টঙে দাঁড়িয়ে থাকা বারথোল্ডির কাছে বোধহয় কোন ভুলভাল সংকেত চলে গেছিল, স্ট্যাচুর মশালের সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে দড়ির এক হ্যাঁচকা টানে ফ্রান্সের তিনরঙা পতাকায় মোড়া দেবী লিবার্টির মুখের আচ্ছাদন উন্মোচন করে দিলেন

বারথোল্ডি, ঠিক যেমন বোধনের দিন কোলকাতায় ওদের পাড়ার দুর্গাপ্রতিমার মুখের আবরণ উদঘাটন করা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে মানুষজনের কানফাটানো উল্লসিত চিৎকার, শিঙ্গার তীক্ষ্ণ আওয়াজ, অসংখ্য কামান থেকে তোপ দাগার ভয়ঙ্কর আওয়াজে চাপা পড়ে গেল মিস্টার এভার্টের গলার স্বর, লোকজন বুঝতেই পারল না মিস্টার এভার্টের বক্তব্য তখনও শেষ হয় নি, তারা ছন্নছাড়া হয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী ইভেন্টের। কেউ কেউ আবার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে ভেবে ফিরে যাবার জন্য বোটে হল্লাও জুড়ে দিল।

এই চূড়ান্ত বিশৃংখলার মাঝে মিস্টার এভার্ট হতভম্ব হয়ে গিয়ে স্বস্থানে বসে থাকা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ডের দিকে ঘুরে তাকালেন, তারপর হতাশ হয়ে নিজের অতি যত্ন করে প্রস্তুত করে রাখা দীর্ঘ ভাষণ অসমাপ্ত রেখেই ধপ করে বসে পড়লেন!

ঠুমরির ভয়ানক হাসি পেল। গতবছর, ওদের স্কুলে অ্যানুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে ক্লাস এইটের মেয়েরা মিলে লক্ষণের শক্তিশেল নাটকটা মঞ্চস্থ করেছিল। তখনও ঠিক এমনই একটা গোলমেলে কান্ড ঘটেছিল। একটা সিন শেষ হয়েছে, পরবর্তী সিনের জন্য রামের কোলে শুয়ে পড়ে থাকা লক্ষণের মৃতদেহ হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে, অথচ পর্দা ফেলার ভার যার ছিল সেই রঘুদা নাকে এক টিপ নস্যি নিয়ে স্টেজের দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘড়ঘড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে কী কান্ড ! উফফফ--- শেষে গেমটিচার দীপিকা ম্যাম দৌড়ে গিয়ে পর্দাটা ফেলেন। ততক্ষণে যা লোক হাসানোর তা হয়ে গেছে !

গমগমে গলার আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখল ঠুমরি, ইতিমধ্যে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড তাঁর ভাষণ দিতে শুরু করেছেন, "We will not forget that Liberty has

here made her home; nor shall her chosen altar be neglected" ...। নিউ ইয়র্ক হার্বারে একটানা তোপধ্বনির আওয়াজ শেষ হলে শুরু হয়ে গেল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ! আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড স্ট্যাচুর উপহার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আবার শুরু হল- ন্যাশনাল স্যাল্যুট- বন্দরের বহু কামানের সামরিক অভিবাদনের অঙ্গস্বরূপ একসাথে গোলাবর্ষণ!

এর মাঝেই একটা বোট থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল...আশে পাশে ভিড় করে থাকা লোকজনের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল ঠুমরি, ঐ বোটটা প্রতিবাদী মহিলাদের -- ' সাফ্রেজিস্ট' নামের একটি গ্রুপের একটি বোট আইল্যান্ডের কাছাকাছি এসে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

কীসের প্রতিবাদ? অবাক হয়ে ঠুমরি জানতে পারল, আজকের এই মহান দিনে, এক উজ্জ্বল দীপ্তিশীল দেবীমূর্তির উৎসর্গ অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র বারথোল্ডির স্ত্রী এবং লেসপসের নাতনি ছাড়া আর কোন মহিলাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি! সেই চরম অবহেলার প্রতিবাদ করে ' সাফ্রেজিস্ট' দের দল তাঁদের বোটটি ভিউইং স্ট্যান্ডের কাছে নোঙর ফেলে প্রচার করছে। তুলে ধরার চেষ্টা করছে এক অদ্ভুত বিদ্রূপকে - এক গৌরবান্বিত নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনুষ্ঠানে নারীরাই বাদ!

ভোটাধিকারের দাবিও করছে তারা, খেয়াল করল ঠুমরি, তারিখটা মনে করার চেষ্টা করল ও। হ্যাঁ, ঠিকই তো, ওদের এলিমেন্টারি স্কুলের স্যোশাল স্টাডিজের টিচার, মিস ইবার্ট বলেছিলেন- ১৯২০ সালে আমেরিকায় মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছিল!

প্রচন্ড ভিড়ে উপচে পড়া দুএকটি বোট ইতিমধ্যেই ব্যাটারি পার্কের দিকে ফিরে যেতে শুরু করেছে।আজ এই দূর্যোগপূর্ণ দিনে লিবার্টির মশাল আলোকিত করার প্ল্যান বাতিল করা হয়েছে। একটা রাজকীয় আতসবাজির প্রদর্শনও হওয়ার কথা ছিল আজ, কিন্তু এই জঘন্য আবহাওয়ার জন্য সেটা পিছিয়ে পয়লা নভেম্বর হবে বলে ঠিক করা হয়েছে বলে শুনতে পেল ঠুমরি। ইশ্‌শ্‌!! আতসবাজির খেলাটা মিস হয়ে গেল ওর! ও শুনেছিল, এইসব বড়ো বড়ো উৎসবে আতসবাজির খেলা হয় দেখার মত। চোখ ঝলসে দেয় আলোর ফুলকি! ওটা দেখতে পেলে আজ ওর ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যেত!

এবার কী করবে ঠুমরি ভাবতে গিয়েই ওর খেয়াল হল - আরে...আধঘন্টা বোধহয় হয়ে যাবে আর খানিকক্ষণের মধ্যেই!

ভাবতে না ভাবতেই ঠুমরির চোখের ওপর ভেসে উঠল আওয়ার গ্লাসটা। সেটার ওপরের চেম্বারটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এবার ফিরতে হবে তাহলে। কিন্তু, কিন্তু –

ঠিক তক্ষুণি একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেল ঠুমরি- সামনেই একটা বড়োমাপের পালতোলা বোট ঘুরে ফিরে যাচ্ছিল, কোনভাবে একটি বাচ্চা ছেলে, ঠুমরির থেকেও অনেক ছোটো হবে - হাডসন নদীর জলে পড়ে গেছে । উঁহু- হঠাৎ পড়ে যায়নি তো! পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওর থেকে বড়ো একটি ছেলে ধাক্কা মেরে বাচ্চা ছেলেটাকে জলে ফেলে দিল!

চাপাচাপি ভিড়ের মধ্যে কেউই খেয়াল করেনি ব্যাপারটা! বড়ো ছেলেটা ভাজা মাছটি

উলতে খেতে জানেনা এমন ভাব করে বোটের ভিড়ের ভিতরে ঠেসেঠুসে ঢুকে একটু দূরে এক ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে কিছু একটা প্রশ্ন করলেন। ছেলেটি ঠোঁট উলটে দুদিকে জোরেজোরে মাথা নাড়াল। বোধহয় বোঝাতে চাইল ও কিছু জানে না। ভদ্রলোক উদ্বিগ্নভাবে ভিড়ের মধ্যে এদিকওদিক তাকিয়ে বাচ্চা ছেলেটির নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছেন-- "জোনাথন-- জোনাথন—"

কোথায় জোনাথন? বোটটা ততক্ষণে ঘুরে গিয়েছে কিছুটা। আর জোনাথন জলে খাবি খেয়ে চলেছে-- কুয়াশা আর বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন চারিদিক, কারোরই চোখে পড়েনি ঘটনাটা।

অক্টোবরের হাড় কনকনে ঠান্ডায় ছোট ছেলেটা জলের মধ্যে নাকানিচোবানি খেতে খেতে প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে অথচ ব্যাটারি পার্কের তোপের আওয়াজ শিঙার আওয়াজ, চারিদিকে অজস্র বোটের তীক্ষ্ণ, খ্যানখ্যানে আওয়াজে সে চিৎকার ফিকে হয়ে গেছে, তার ওপর চারিদিকে এমন ভয়ানক কুয়াশা যে একহাত দূরের কোন জিনিসও ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না !

প্রমাদ গুনল ঠুমরি। কী করবে ও বুঝে উঠতে পারল না, ওর কিছুই করার ক্ষমতা নেই সেটা ও বিলক্ষণ জানে। ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কেউ ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। কাউকে ও ছুঁতে পারছে না। পুরোপুরি হাওয়ায় মত ভেসে রয়েছে ও - ঠিক যেন ভূতের গল্পে পড়া বাতাসে ভেসে থাকা আত্মাদের মত!

কিন্তু এইভাবে চোখের সামনে একটি অসহায় বাচ্চা ছেলেকে ডুবে যেতে দেখবে- সেটাও তো মন মেনে নিতে চাইছে না। ঠুমরির মনে পড়ে গেল, মিস্টার এহসান সুলেমান শাহের কথাগুলো, "তোমার কিন্তু তেমন কিচ্ছু করার থাকবে না, শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া !"

হঠাৎ এলিমেন্টারি স্কুলে শোনা বাইবেলের অ্যাক্ট অফ কাইন্ডনেসের ওপরে লেখা লাইনগুলো ওর মাথার মধ্যে গিজগিজ করে উঠল- "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law." অর্থাৎ ' fruit of the Spirit' হল এই নয়টি বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ যা একান্ত ভালো মানুষের মধ্যে থাকে, এই নয়টি গুণের বিরুদ্ধে কোন আইনই বা নিয়মই খাটে না ! শুধু তাই নয়, দিদুনের কাছে থেকে মহাভারতের গল্পচ্ছলে শোনা গীতার কয়েকটি কথাও ওর মনে পড়ে গেল --- "যে কোন ভালো কাজ করে তার কখনো খারাপ পরিণতি হয় না।" নিজেকে শুধু একটা প্রশ্নই করল ঠুমরি, হয়তো ও কিছুই করে উঠতে পারবে না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কোথায়?

যা করার খুব তাড়াতাড়ি, এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই করে ফেলতে হবে ঠুমরিকে, ও এটুকু বুঝতে পারছে। বাতাসের ক্ষমতাই এখন ওর ক্ষমতা। বাতাসের শক্তিটাকেই ওকে কাজে লাগাতে হবে! যা থাকে কপালে ভেবে পালতোলা বোটটার ফোরক্যাসল হেড ডেকে এসে উপস্থিত হল ঠুমরি। একটা জিনিস ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে সময়ের যে জায়গায় এসে ও পৌঁছবে, সে জায়গায় ওর অবাধ গতি। নৌকার তিনকোণা ফোরক্যাসল হেড ডেকে নৌকার কর্মীরা সমস্বরে ' দম লাগাকে - হেঁইয়ো' বলে চাকার মত ভারি ক্যাপ্সটানটাকে ঘুরিয়ে যাচ্ছে সবকটা পাল তুলে দেওয়ার জন্য। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে মেন ডেক- এর দিকে আর একটু এগিয়ে দেখল ঠুমরি ওখানে শিক্ষানবিশদের কেবিনে উপচে পড়েছে গিজগিজে লোকের কালো কালো

মাথা। ঠিক সেখানেই কেবিনের সামনেই ঝুলে থাকা একটা ফুটবলের মত সাইজের মত ঘন্টা চোখে পড়ল ওর। ভাবার আর সময় নেই। ঘন্টাটার খুব কাছে গিয়ে প্রচন্ডবেগে পাক খেতে থাকল ঠুমরি। আরে এইতো! হাওয়ার বেগে ঘন্টাটা দুলতে শুরু করেছে! ঠুমরি আরো জোরে পাক খেতে লাগল। ঘন্টাটা দুলছে- দুলছে- দুলছে - এই তো বাজতে শুরু করেছে--- ঢং ঢং ঢং!

যে কর্মীরা জোর লাগাকে পালগুলোকে তোলার জন্য ক্যাপ্সটানের চাকা ঘুরিয়ে চলছিল তারা থমকে থেমে গেল। নৌকোর ভিড়ের বকবকানি, গজগজানি এক দমকেই নেমে গেল। সবার মনে একটাই প্রশ্ন। কী করে, কোনও তীব্র ঝোড়ো হাওয়া ছাড়াই ঘন্টাটা বাজতে শুরু করেছে নিজে নিজে? সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করে দিয়েছে, এর মাঝেই কানে ভেসে আসতে শুরু করেছে হারিয়ে যাওয়া একটি ছেলেকে খুঁজে পেতে মরিয়া এক ভদ্রলোকের আর্ত চিৎকার- "জোনাথন, জোনাথন! হ্যোয়ার আর ইউ?"

নৌকোর ভিড়ে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে- সবাই এদিকওদিক ঝুঁকে পড়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে, কী ঘটেছে।

কাজ হয়েছে- কাজ হয়েছে ! ঠুমরি এত পাক খেয়েও কেন হাঁপিয়ে পড়ল না বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেল কয়েকজন ঝুঁকে পড়েছে ডেক থেকে। ওই তো, ওই তো- জোনাথনের কালো মাথাটা - আছাড়িবিছাড়ি খেতে থাকা দুটো হাত- দেখতে পেয়েছে একজন ! দূরবীন চোখে লাগিয়ে কালো মতন, বেঁটে মতন একটা লোক দেখতে পেয়েছে জোনাথনকে-- গায়ের মোটা রেনকোটটা খুলে রেখে লোকটা নিমেষের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে ঠান্ডা হাডসনের জলে--- কাকে যেন বলতে শুনল ঠুমরি- "জোনাথনের কাকা নিশ্চয়ই ছেলেটার অত খেয়াল রাখে নি, বাপমা মরা ছেলেটার কপালে এই ছিল- "

ঠুমরির হাতে আর সময় নেই-- একি ! মাথাটা এরকম ঝিমঝিম করছে কেন? এটা কি ওকে মনে করিয়ে দেবার সংকেত যে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে-- এর মধ্যে ফিরে যেতে না পারলে— না। তাহ্লে কী হবে তা ঠুমরির জানা নেই। সে আওয়ার গ্লাসটাকে মনে করার চেষ্টা করল একবার। রেস্ট রুমে পড়ে থাকা একবিংশ শতাব্দীর ঠুমরির চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করল। চারপাশে সব আবছা হয়ে আসছে কেন? দিনের আলোমাখা ঝলমলে জামাটা সমেত সুয্যিমামা টুপ করে নীলসায়রে ডুব দিলে সব যেমন চারিদিক ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে আসে ঠিক তেমনই-

-- "ঠুমরি ! ঠুমরি-- "

রেস্টরুমের দরজায় দুমদাম ধাক্কা ! মায়ের উদ্বিগ্ন গলার স্বর ভেসে আসছে দরজার ওপার থেকে। ঠুমরি ঘোলাটে চোখে তাকাল হাতের আওয়ার গ্লাসটার দিকে। ওপরের চেম্বারটা পুরোপুরি খালি হয়ে গেছে। আওয়ার গ্লাসের মাঝের প্যাসেজটাও কে যেন আবার লক করে দিয়েছে। ঘুম ঘুম চোখে সেটাকে জিনসের পকেটটায় চালান করে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে তুলে রেস্টরুমের দরজাটা খুলল ঠুমরি। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন- "একী রে ! প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেছে- তোর কোন পাত্তা নেই- শরীর ঠিক আছে তো?"

হঠাৎ যেন নিজেকে কী ভীষণ ফ্রেশ লাগছে! ঠুমরি ঝিলমিলিয়ে হেসে উঠল, "হ্যাঁ মা, এই একটু পেটটা ব্যথা করছিল। কিন্তু তুমি চিন্তা কোরো না, আমি এখন একদম ঠিক আছি।"

মায়ের চিন্তাগ্রস্ত, অবাক চোখের চাউনি ছাপিয়ে ঠুমরির দুচোখের পাতায় সেইমুহূর্তে ভেসে উঠেছে হাডসনের ঠান্ডা জলে ভেসে ওঠা উনিশ শতকের একটি ছোট্ট ছেলে জোনাথনের হাসিমুখখানি !

উনিশ শতকের এক মেঘে ঢাকা, কুয়াশার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, একঘেঁয়ে অথচ জমজমাট, স্মরণীয়, উত্তেজনাপূর্ণ বিকেলকে পিছনে ফেলে রেখে ঠুমরির সামনে এখন হাতছানি দিচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর রোদ ঝলমলে এক উজ্জ্বল বিকেল!

আজ এই দিনটা ঠুমরির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন! এক অদ্ভুত বিশ্বাস, অবলম্বনের আশ্বাস, নিরাপত্তার অনুভূতি এইমুহূর্তে শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায় অনুভব করতে পারছে ও - কারোর জন্য কিছু করতে পারলে যে এমন এক অসাধারণ ভালো লাগায় ভরে যায় মনপ্রাণ, নিজেকে এমন পরিপূর্ণ লাগে -- ওর দশ বছরের ছোট্টো জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারল ঠুমরি ! এই প্রথম উপলব্ধি করল কারোর উপকারে লাগতে পারার শিহরণ বা রোমাঞ্চ যে উদ্যমের প্লাবন আনে - তার সাথে কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না, হতে পারে না !

পূর্বপ্রকাশিতের পর

মারিয়ন ক্রফোর্ড
অনুবাদঃমহাশ্বেতা, ইন্দ্রশেখর

ও যখন পড়ে গেছিল, বা ওকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—সে যাই ঘটে থাকুক- বাক্সটা বালিতে পড়ল, ঢাকনাটা খুলে এল, আর জিনিসটা বেরিয়ে এল, তারপরে তো তার গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে তা যায়নি। সেটা তার মাথার একদম ধারে প্রায় ছুঁয়েই বসে ছিল লক্ষ্মী হয়ে, মুখটা তার দিকেই ঘোরানো ছিল। লোকটার মুখে শুনে ব্যাপারটা আমার বিশেষ অদ্ভুত ঠেকেনি; কিন্তু আমি সেটা নিয়ে চিন্তা না করে আর পারলাম না, বারবার ভাবতে লাগলাম। শেষে চোখ বুজলেই গোটা দৃশ্যটা ভেসে উঠত আমার সামনে। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা

করতে লাগলাম আপদটা নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার বদলে উপর দিকে উঠে কেন এসেছিল? আর অন্য কোথাও থামার বদলে ঠিক লিউকের মাথার ধারেই কেন বসেছিল এসে?

আপনি নিশ্চয়ই জানতে চান শেষমেষ এই ব্যাপারে কী উত্তর পেলাম আমি। গড়িয়ে যাওয়াটার কোনই ব্যাখ্যা পাইনি, মশাই। কিন্তু এই সময় আমার মাথায় আরেকটা চিন্তা বাসা বাঁধল, আর এতে আমার অশ্বস্তি বাড়ল বৈ কমল না। না, না, অলৌকিক কিছু নয়! ভুত থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যদি থেকে থাকে তাহলে আমি মনে করি না যে সে কোনভাবেই জ্যান্ত মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে, শুধু একটু আধটু ভয় দেখানো বাদে। আর আমার ব্যক্তিগত মতামত এই যে সমুদ্রের গভীরে ঘন কুয়াশার বদলে আমি যেকোন ধরণের ভুতের সাক্ষাৎ করতে রাজি। না, আমার মনে খচখচানিটা ঘটাচ্ছিল একটা হাস্যকর চিন্তা, আর আমি জানিনা সেটা কীভাবে শুরু হয়েছিল, আর কীভাবেই বা নিজের মত বেড়ে উঠে সেটা একরকম ধ্রুবসত্যে পরিণত হল, তা আমি সত্যিই জানি না।

এক সন্ধ্যেবেলা আমি লিউক ও তার বেচারি বউয়ের কথা ভাবছিলাম পাইপ টানতে টানতে, হাতে একটা একঘেঁয়ে বইও ছিল। হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা খুলিটা তো লিউকের বউয়েরই হতে পারে, আর তারপর থেকে এই চিন্তাটার হাত থেকে নিস্তার পাইনি আমি। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে চিন্তাটার মাথামুন্ডু নেই কোন, মিসেস প্র্যাটকে যে কোন ক্রিশ্চানের মতই কবরখানায় কবর দেওয়া হয়েছে। আর তার বর কিনা তার মুন্ডুটা শোয়ার ঘরের আলমারিতে একটা বাক্সে ভরে রেখেছে! এই ভাবনাটাই তো ভয়ানক! কিন্তু সে যাই হোক, অনেক ভেবে, যুক্তি, সাধারণ বুদ্ধি ও সম্ভাব্যতার মুখোমুখি হয়ে আমি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঠিক এইটাই করেছিল। অবশ্য ডাক্তাররা তো কতই এরকম অদ্ভুতুরে কাজ করে টরে থাকে, তাতে আমার আপনার মত মানুষের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়।
তাহলে—বুঝতে পারছেন তো, খুলিটা যদি তার বউয়েরই হয় তাহলে সেটা লিউকের আলমারিতে আসবার একটাই উপায়- লিউকের তার বউটাকে খুন করেছিল, ঠিক যেভাবে আমার গল্পের বউটা খুন করেছিল তার স্বামীকে। আর খুনটা করে সে নিশ্চয় ভয় পেয়েছিল যে হয়ত একদিন ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত হবে, আর তাতে তার ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। তাই মাথাটাকে—

মজা হল, এই কথাটাও আমি লিউককে বলেই এসেছিলাম। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে, সেই মহিলার ঘটনাটা প্রকাশ্যে আসবার পর তার স্বামীদের কবর খুঁড়ে তিনটে করোটিও তুলে আনে পুলিশ। তাদের প্রত্যেকটার ভেতরে একটা করে সিসের ছোট্ট দলা টকাটক শব্দ করছিল। ওইতেই তো মহিলার ফাঁসি হল! কথাটা লিউক মনে রেখেছিল নিশ্চয়। বউয়ের কানে সিসে ঢালবার পর এই কথাটা যখন তার মনে পড়ল তখন সে কী করেছিল? না মশায়। অত নারকীয় একটা দৃশ্য কল্পনা করতেও আমার রুচিতে বাধবে। আপনারাও নিশ্চয় ওসব দৃশ্যের কথা শোনবার জন্য গল্পটা পড়ছেন না? নাকি- চাইছেন? চাইলে পড়ে গল্পের এইখানটাতে নিজেই লিখে নিন না, সে দৃশ্যটা ঠিক কেমন ছিল? নিশ্চয় খুব ভয়ংকর দৃশ্য ভাবছেন, তাই না? ঠিক তাই। কেন যে আমি ছবির মত সবকিছু দেখতে পাই ব্যাপারটার কে জানে? কাজটা লিউক করেছিল তার বউকে কবর দেবার আগের রাত্তিরে। কফিনের ডালা তখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, বাড়ির কাজের মেয়েটাও ঘুমিয়ে, ঠিক তখন—

আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মুণ্ডুটা কেটে নেবার পর তার জায়গায় লিউক একটা কিছু রেখে দিয়েছিল যাতে বোঝা না যায় মুন্ডুটা নেই। কী দিয়ে থাকতে পারে?

আমায় পাগল ভাবছেন? তাতে আপনাদের দোষ নেই। নিজেই প্রথমে বললাম ওসব ভয়ানক দৃশ্য লেখবার রুচি আমার নেই। তারপর এমনভাবে বর্ণনাটা দিয়ে যাচ্ছি যেন সেখানে ঘটনার সময় আমি সশরীরে হাজির ছিলাম। যেমন ধরুন, বউয়ের মাথার জায়গায় লিউক কী দিয়েছিল সেটা আমি বলে দিতে পারি। দিয়েছিল মেয়েটার সেলাইয়ের ব্যাগটা। ব্যাগটা আমার পরিষ্কার মনে আছে, কারণ প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলাই ব্যাগটা তার সঙ্গে থাকত। মখমল কাপড়ে তৈরি, ঠেসে জিনিসপত্র ভরলে সেটাকে দেখতে অনেকটা- বুঝতেই পারছেন। ঐ যে। আবার ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। হাসুন, হাসুন, আপনি তো আর লিউককে গলানো সিসের গল্পটা শোনাননি, আর যে বাড়িটায় কাজতা করা হয়েছিল সেখানে আমার মত একলা একলা থাকেনও না। আমি নার্ভাস মানুষ নই। তবে মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি কেন কোন কোন মানুষ এত নার্ভাস হয়। একা একা রাতে বসে এই সমস্ত কথা আমি ভাবতে থাকি, স্বপ্নও দেখে ফেলি মাঝেমধ্যে। আর, বস্তুটা যখন চিল্লায়, তখন তো—যাক গে!

কিন্তু আমার তো নার্ভাস হওয়া উচিত নয়। আমি একবার একটা ভূতুড়ে জাহাজে সওয়ারিও করেছি। জাহাজাটার মাস্তুলে একটা মানুষ দেখা দিয়েছিল, আর নাবিকদের বেশির ভাগই তারপর বন্দরে পৌঁছোবার দশদিনের মধ্যেই জ্বর হয়ে মারা পড়ে। কিন্তু আমার কিচ্ছুটি হয়নি সেবারে। আপনাদের মত আমিও কিছু কিছু ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি জীবনে, যেমন সকলেই দেখে। কিন্তু তার কোনটাই এই খুলিটার মতন আমাকে চমকে দিতে পারেনি। অনেকবার—বুঝলেন, অনেকবার জিনিসটাকে বিদেয় করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেটা তা মোটেই পছন্দ করে না। যেখানটায় সে আছে সেইখানটাতেই বসে থাকতে চায়। সেরা বেডরুমটাতে কাবার্ডের ভেতর মিসেস প্র্যাটের বাক্সটার মাথায়। অন্য কোথাও গিয়ে তার সুখ নেই। কেমন করে জানলাম? কারণ, আমি সে চেষ্টা করে দেখেছি। ভাবলেন কী করে যে আমি ওটাকে সরাবার চেষ্টা করিনি? ওখানে যদ্দিন ধরে ওটা আছে, মাঝেমাঝেই হঠাৎ হঠাৎ চিল্লিয়ে ওঠে, বিশেষ করে বছরের এই সময়টায়। কিন্তু জায়গা থেকে সরালে সে একটানা চিৎকার করে চলবে। চাকরবাকর কাজ ছেড়ে পালায় মশায়। একা হাতে ওই চিৎকার সয়ে দশ পনেরোদিন সব সামলাতে হয় তখন আমাকে। গ্রামের একটা লোক ও বাড়ির ছাদের নীচে এক রাতও কাটাতে চায় না এখন। বিক্রি করা বা

ভাড়া দেয়া তো কল্পনারও অতীত। গ্রামের লোকজনের বক্তব্য ওখানে থাকলে আমার পরিণতিও খুব খারাপ হবে একসময়।

আমি অবশ্য তাতে ভয় পাই না। যত্তসব ননসেন্স। খালি একটা শব্দ। ও নিয়ে অত ভাববার কী আছে? চেয়ারের পাশে ভূত তো এসে দাঁড়াচ্ছে না আর ঘাড় মটকাবার জন্য! তাছাড়া খুলিটার ব্যাপারে আমি যেসব কথা ভাবছি সে সবই যে একেবারে ঠিক তাই বা কে বলল? মনে হয় ভুলই ভাবি, তাই না? হয়ত লিউক অনেক দিন আগে কোনোখান থেকে একটা সুন্দর নমুনা হিসেবে ওটা জোগাড় করে নিয়ে এসেছিল। আর ওটাকে নাড়ালে ভেতরে যে ঠকঠক করে শব্দ হয় সেটা একটা মাটির ড্যালা—হতেই পারে। অনেকদিন মাটির তলায় থাকা খুলির মধ্যে ওরকম মাটি বা পাথরের নুড়ি তো ঢুকে যায়ই, তাই না? উঁহু। জিনিসটা আমি কখনো বের করে দেখবার চেষ্টা করিনি। কারণ ওটা যে ঠিক কী সেটা আমি জানতে সাহস পাই না। যদি ওটা সিসে হয় তাহলে তো আমিই ওর খুনটা করিয়েছি। তার সঙ্গে নিজে হাতে মারবার আর কী তফাৎ? তাই যতক্ষণ খুলিটার মধ্যে ঠিক কী রয়েছে সেটা না জানছি ততক্ষণ আমি আমার সন্দেহটাকে একটা ফালতু বাতিক বলেই চালিয়ে দিতে পারি নিজের কাছে। ভেবেই নিতে পারি যে মিসেস প্র্যাটের মৃত্যু একেবারেই স্বাভাবিক কোন কারণে ঘটেছিল আর লিউক যখন লন্ডনে ডাক্তারি পড়ছে তখন থেকেই খুলিটা ওর সঙ্গে ছিল, এইটেও ভেবে নিতে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু—আমি সে ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত নই।

সে যাই হোক, সবচেয়ে ভালো বেডরুমটাতে আরাম করে শোবার চেষ্টা আমাকে ছাড়তে হয়েছে। হ্যাঁ। আপনি বলতেই পারেন জ্বালানিপোড়ানিটাকে একটা পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চোকে। বলতেই পারেন! বলুন। কিন্তু প্লিজ ওই জ্বালানিপোড়ানি গালাগালটা দেবেন না। ও গালাগাল একদম সইতে পারে না।

ওই যে ফের শুরু হল। ভগবান! কী বিশ্রি আওয়াজ! বলেছিলাম আপনাকে, গাল দেবেন না! হল তো? নিন, পাইপে তামাক ঠাসুন দেখি ভালো করে! আর চেয়ারটা আগুনের কাছে ঠেলে নিন আরেকটু। কিছু পান করবেন নাকি? বাইরে আজ রাতটা বেজায় ভেজা আর ঠান্ডা তো, তাই বলছিলাম আর কি! বাতাস কেমন গোঁ গোঁ করছে শুনতে পাচ্ছেন?

ক্রমশ

কুলধারা

আজ থেকে ৫ শতাব্দি আগে জয়শলমির শহরের ১৭ কিলোমিটার পশ্চিমে কুলধারা নামে একটা গ্রাম ছিল। সমৃদ্ধ গ্রাম। প্রায় দেড় হাজার লোক থাকত সেখানে। তারা মূলত পালিওয়াল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের জমিদারের মেয়েটি ছিল ভারী সুন্দর। তার দিকে চোখ গেল জয়শলমিরের বদমাশ মন্ত্রী সালিম সিং- এর।খবর পাঠালেন সে মেয়েকে তিনি জোর করে বিয়ে করে নিয়ে যাবেন। তা না হলে জ্বালিয়ে দেয়া হবে গোটা গ্রাম।

পালিওয়ালরা এমন আদেশ মানতে রাজি হল না। সবাই মিলে একত্র হয়ে একটা সভা করল তারা। তারপর কী যে হল, এক রাত্রে হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল গোটা গ্রামের সব লোকজন। আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না তাদের। একফোঁটা রক্তের দাগ, একটা মৃতদেহ, কিচ্ছু নেই সেখানে। ঘরগুলো ফাঁকা, তার ভেতরের সোনাদানা গয়নাগাঁটি, গোহালে গরু, ক্ষেতে ঝলমলে ফসল সব যেমন কে তেমনই রয়ে গেছে, শুধু মানুষগুলোই নেই। যাবার আগে তারা সে গ্রামের ওপর রেখে গেল এক ভয়ানক অভিশাপ।

ব্যাপারটা রহস্যময় কিন্তু লোভি মানুষদের কাছে এ ছিল মস্ত এক সুযোগ। কদিন বাদেই দখা গেল গুটি গুটি তেমন মানুষজন এসে ঢুকছে ফাঁকা গ্রামের চত্বরে। ফেলে যাওয়া বাড়ি, জমিজিরেত, পশুপক্ষীদের দখল নেবে তারা এমনটা তাদের মতলব।

দিনের বেলা কয়েকটা তেমন লোক এসে ঢুকেছিল গ্রামে। তাদের কোমরে তলোয়ার, পিঠে ধনুর্বাণ, হাতে বর্শা। ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল তারা। কেউ তাদের বাধা দেয়নি।

কুলধারা গ্রামে ঢুকে ভালো ভালো ঘরগুলো বেছে নিল তারা। চলল খানাপিনা উৎসব। এমনি করে রাত হল। চাঁদ উঠল। আশপাশের অন্য গ্রামের মানুষেরা শুতে গেল। কুলধারা গ্রামের মাঝখানের চত্বরে তখনও দখলদার দুঃসাহসীদের হুল্লোড়ের শব্দ উঠছে।

মাঝরাতের পর হঠাৎ করেই গ্রামের ভেতর থেকে ভেসে এল রক্ত জল করা ভয়ংকর আর্তনাদ। প্রথমে একটা, তার পর একটার পর একতা সেই শব্দ উঠছিল সেখান থেকে। আর, সেইসঙ্গে কারা যেন হাসছিল, আনন্দ করছিল। কিন্তু তাদের গলা এই পৃথিবীর মত নয়। হাড়ে কাঁপুনি ধরায় তা।

সকালবেলা আশপাশের গ্রামের লোকজন গিয়ে দেখল, গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে দখলদারদের দেহ। ভয়ংকরভাবে খুন হয়েছে তারা। কিন্তু খুনি বা খুনের অস্ত্রের চিহ্নও নেই কোনখানে।

এর পর থেকে সহজে কেউ সেই অভিশপ্ত গ্রামে রাত কাটাতে সাহস করত না। মাঝেমধ্যে পঞ্চাশ একশো বছরে কোন দুঃসাহসী যদি সেখানে ঢুকে রাত কাটাতে গেছে, সে আর জীবন্ত ফিরে আসেনি।

এখনও গ্রামটা সেই পাঁচ শতাব্দি আগের মতই অবিকৃত আছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ তার দেখভাল করে। তবে হ্যাঁ, সেখানে তাদের কোন কর্মচারীও রাত কাটায় না।

২০১৩ সালে দিল্লি প্যারানর্মাল সোসাইটির আঠারো সদস্যের একটা দল সে গ্রামে রাত কাটাতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ভূতটুত কিছু নয়, নেহাতই মনের ভুল সে সব সেই কথাটা যন্ত্রপাতি আর নিজেদের সাহস দিয়ে প্রমাণ করে দেয়া। এর আগে ভারতবর্ষের বহু ভূতুড়ে বাড়ির ভূতুড়ে তকমা ঘুচেছে তাঁদের হাতে।

পরীক্ষার জন্য দলটার নেতা গৌরব তিওয়ারি বেছে নেন একটা শনিবারের রাত। সে রাতে ১৮ জন দিল্লি থেকে আসা অভিযাত্রীর সঙ্গে যোগ দিলেন ১২ জন স্থানীয়। তাঁদের সঙ্গে ছিল-

১। ঘোস্ট বক্স (একধরণের রেডিও। চালিয়ে রাখলে এটা ক্রমাগত কিছু এলোমেলো শব্দের টুকরো আর নানা রেডিও স্টেশনের ব্রডকাস্টের টুকরোটাকরা শব্দ স্পিকারে দিতে থাকে। ভূতেরা সেগুলোকে সাজিয়ে নিজেদের কথাবার্তা তৈরি করে লোকেদের শোনায়।)

২। কে- ২ মিটার ডিভাইস (এটি ক্রমাগত চারপাশের তাপমাত্রা বাড়াকমার পরিমাপ করতে থাকে)

৩। কমশক্তির লেজার আলো।

সারারাত ধরে সেই গ্রামে তাদের বেজায় উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। যেমন ধর, লেজারের আলো এখানে সেখানে ছড়াতে তাতে ধরা পড়েছে বিচিত্র সব চলমান ছায়া, তাদের গাড়ির কাচে নিজেনিজেই ফুটে উঠেছে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের হাতের ছাপ, যেন অদৃশ্য বাচ্চারা কৌতুহলী হয়ে গাড়ির কাচে হাত রেখেছে। কে- ২ ডিভাইসে ধরা পড়েছে পাঁচ হাত দূরের দুটো স্পটে তাপমাত্রার বিরাট তফাৎ। ঘোস্ট বক্সে থেকেথেকেই ভেসে এসেছে অজানা বিকট গলায় বলা কিছু নাম। একজনকে তো দুই কাঁধে ধরে কে যেন এক রামঝাঁকুনিও দিয়ে ফেলেছিল হঠাৎ। সে ঘুরে অবশ্য কিছু দেখতে পায়নি।

সোসাইটির লোকজন এখন অবধি ভারতের পাঁচশো ভূতবাড়িতে রাত কাটিয়েছেন।, কিন্তু এই প্রথম এতবড়ো দলটা বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে কুলধারা থেকে পরদিন সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়েছেন। কুলধারার রহস্য সমাধান হয়নি।

বেঘোভূত আর মাইলিং

সংহিতা

দুনিয়াটা ঘুরতে ঘুরতে তার উত্তরভাগটুকুকে আবার হাজির করেছে অন্ধকারতর দিনগুলোতে। সেপ্টেম্বরের ২৩শে জলবিষুব গেছে, মানে প্রতিবছর যে দিনে পৃথিবীতে দিন আর রাত্রি সমান সমান মাপের হয় আর তারপর উত্তর গোলার্ধে দিন ছোটো হতে থাকে ক্রমশ। এই সময়টাই আবার ফসল তোলার সময়ও বটে। বিশেষতঃ যেসব দেশে ঘোর শীতে জমি বরফে ঢেকে যায় সেসব দেশে অক্টোবরের ৩১ তারিখ হলো ফসল তোলার সময়সীমা। ঐদিনটা আবার ভূতেদের মনে করার দিনও বটে। একেক দেশে তাদের নাম একেক রকম। তবে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে চাষের বিরতি আর রাত লম্বা হয়ে যাওয়াটা উদযাপণ করা হয় ভূতেদের কথা ভেবেই।

জল জঙ্গলের দেশ সুন্দরবনে ভূতের উপদ্রবের একটা আবার বেঘোভূত। বেঘোভূত হলো মানুষের হাতে মারা পড়া বাঘের ভূত। বনের ভেতর মধু আর জ্বালানির খোঁজে যায় মানুষ। বেঘোভূত তাদের ভয় দেখায়। তারপর পথ ভুলিয়ে দেয়। শেষে হাজির করে ক্ষুধার্ত জ্যান্ত বাঘের মুখে। তাতে মানুষটা মারা পড়ে বাঘের পেটে গেলে নাকি বেঘোভূতের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়। তবে স্টিমার বোটে চেপে ঘুরতে যাওয়া মানুষদের বেঘোভূতে ধরেছে বলে এখনও শোনা যায় নি।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার উপকথায় শোনা যায় মাইলিং- দের কথা। এদেরকে কোনো কোনো জায়গায় উটবুর্ড বলে। আর ফিনল্যান্ডে এদের নাম ইহ্তিরিএক্কো। নামটা এমন তিরিক্ষি হলেও এদের দশা বেশ করুণ। শোনা যায় যে ধর্মদিক্ষা পাওয়ার আগেই যেসব শিশু মারা যায়, তারা মাইলিং হয়ে যায়। তারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে থাকে যতক্ষণ না তাদের ধর্মের নিয়মমাফিক গোর দেওয়া হয় ততক্ষণ। বলার প্রয়োজন নেই, এই যথাবিধি কবরে যাওয়ার জন্য এরা ঝঞ্ঝাট পাকাতেও পারে। যেমন শোনা যায় যে রাতে একলা পথচারী পেলে এরা তাদের পিঠে চড়ে বসে। তারপর চেষ্টা করে পথচারীকে কোনো ভাবে গোরস্থানে নিয়ে যেতে। মানে পথচারীর পিঠে চেপে গোরস্থানে পৌঁছোতে। সেখানে পবিত্র ভূমিতে যথাবিধি কবরে ঠাঁই পেলে, মাইলিং মুক্তি পায় । আর উপদ্রব করে না। যাদের পিঠে এরা চেপেছে, তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে মাইলিং শিশুর ভূত হলেও এরা বিশাল হয়, আর বাহক যত গোরস্থানের কাছে পৌঁছোয় ততো এদের ভার বাড়তে থাকে। তার কারণ এই যে মাইলিং- এর ভারে তার বাহক মানুষটাবা মানুষগুলো যেন নরম মাটিতে ডুবে যায়। বাহক মাটিতে ডুবে গেলে তবেই না মাইলিং মাটির ভেতরে ঠাঁই পাবে! কেউ গোরস্থান অবধি পৌঁছতে না পারলে, রাগের চোটে মাইলিং তাকে নাকি রাস্তাতেই মেরে ফেলে। এই জন্যই এদের কীর্তিকলাপকে উপদ্রব ভাবা হয়। গোরস্থাণে পৌঁছে এদের ইচ্ছেপূরণ করলেও মৃত্যু. না করতে পারলেও মৃত্যু... বোঝো কান্ড! কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এভাবে ভার বাড়ার কথাটা তাহলে জানা গেলো কীকরে? ......

বোম ফেলেছে জাপানি

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ৫

আগের পর্বে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এক, দুই, তিন, চার শেখালুম, সেসব নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের? আচ্ছা একটা পরীক্ষা নেওয়া যাক। বলোতো আমি ক্লাসে প্রথম হয়েছি, এই বাক্যে 'প্রথম' এর জায়গায় কোন জাপানি শব্দ বসবে? কী? কী বললে? ইচি? হয়নি, হয়নি ফেল!হ্যাঁ, হ্যাঁ ইচি মানে যে এক সেটা আমি শিখিয়েছিলুম। কিন্তু শেষে এটাও বলেছিলুম যে এক আর প্রথম, বাংলায় যেমন আলাদা জাপানিতেও তাই। হুঁ, হুঁ বাবা, জাপানিরা ভারি সেয়ানা। তাই আর বেশি দেরি না করে ওগুলোও সোনামুখ করে শিখে নাও দেখি। প্রথম, দ্বিতীয় ও

তৃতীয়র ক্ষেত্রে বলবে দাই- ইচি (1st), দাই- নি(2nd) এবং দাই- সান (3rd)। এইভাবে চার, পাঁচ, ছয়ের আগেও দাই কথাটা বসবে। এবার আসি অন্য কথায়। আজ মাসের পয়লা তারিখ, একথা তো তোমরা আকছার শোনও বড়দের কাছ থেকে, তাই না? তা সেকথা আবার জাপানিতে বলতে গিয়ে জ্যাঠামি করে দাই- ইচি বলে বসোনা খবরদার। ঠিক ধরেছো। এক্ষেত্রেও নিয়ম- কানুন এক্কেবারে আলাদা। মাসের এক থেকে একত্রিশ পর্যন্ত জাপানি শব্দগুলো তাড়াতাড়ি শিখে নাও দেখি এবারে।

1st – সুইতাচি	2nd – ফুতসুকা	3rd – মিক্কা
4th – ইয়োক্কা	5th – ইতসুকা	6th – মুইকা
7th – নানোকা	8 th – ইয়োওকা	9 th – কোকোনোকা
10 th – তোওকা	11 th - জুউ- ইচি- নিচি	12 th - জুউ- নি- নিচি
13 th - জুউ- সান- নিচি	14 th - জুউ ইয়োক্কা	15 th - জুউ- গো- নিচি
16 th - জুউ- রোকু- নিচি	17 th - জুউ- নানা- নিচি	18 th - জুউ- হাচি- নিচি
19 th - জুউ- কু- নিচি	20 th - হাতসুকা	21st নি- জুউ- ইচি- নিচি
22nd নি- জুউ- নি- নিচি	23rd নি- জুউ- সান- নিচি	24th নি- জুউ- ইয়োক্কা
25 th নি- জুউ- গো- নিচি	26 th - নি- জুউ- রোকু- নিচি	27 th নি- জুউ- নানা- নিচি
28 th নি- জুউ- নানা- নিচি	29 th নি- জুউ- কু- নিচি	30 th সান- জুউ- নিচি
31st সান- জুউ- ইচি- নিচি		

এবারে আর ভুল হবে না আশা করি? এর পরের পর্বে আমরা শিখবো জাপানি ভাষায় সাত দিনের নাম আর বিভিন্ন জিনিস কিভাবে গুনতে হয় তার মন্তর! তৈরি থেকো কিন্তু। এখন আসি, সায়োনারা।

ইতালির ইলিবিলি(৪)

রিনটিন বারবার ঘড়ি দেখছিল। রুণামাসি কখন যে আসবেন। অ্যালবাম থেকে ছবি কেটে কেটে কার্ট্রিজ পেপারের ওপর বসিয়ে কী সুন্দর একটা ফ্যামিলি ট্রি তৈরি হয়েছে! পাশে পাশে সব সম্পর্কগুলো ইতালিয়ানোতে লেখা। নিজের কাজ দেখে নিজেরই ভালো লাগছিল রিনটিনের। কিন্তু দেখাবে যাকে তারই দেখা নেই। আবার দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল রিনটিন।

- কী রে, ঘড়ি দেখছিস কেন?

ওই তো মাসি এসে গেছেন।

- এত দেরি করলে কেন মাসি? কটা বাজে দেখেছ?

- তুই- ই বল না কটা।

- সাড়ে চারটে বেজে গেল।

- উঁহু, বাংলায় না, ইতালিয়ানোতে বল।

- অ্যাঁ? রিনটিন মাথা চুলকোয়।–ইয়ে, মানে চারটে তো কোয়াত্রো, কিন্তু সাড়ে কী করে বলব মাসি?

মাসি গুছিয়ে বসেছেন ততক্ষণে।

- আচ্ছা, আজ তবে সময় বলতেই শিখি আমরা, কী বলিস?

মনে রাখিস, ইতালিয়ানোতে কটা বাজে, এই প্রশ্নটা দু ভাবে করা যায়।

কে ওরা এঃ? (Che ora è?)

আর

কে ওরে সোনো? (Che ore sono?)

- এঃ আর সোনো মানে কি একই?

- উঁহু, এক হতে যাবে কেন। এঃ ব্যবহার হয় সিঙ্গুলার বোঝাতে, আর সোনো বসে প্লুরালের আগে। দেখছিস না ওরা যেই সোনোর আগে বসল অমনি ওরে হয়ে গেল। শব্দ আ দিয়ে শেষ হলে ফেমিনিন সিংগুলার, এ প্লুরাল, মনে আছে তো।

রিনটিন মাথা নাড়ে। - মনে আছে। ওরা মানে কি কটা?

- না, ওরা মানে সময়। ঘণ্টাও বলতে পারিস। ইংরেজি আওয়ার মনে কর।

- ও, আচ্ছা।

- ইংরেজি ই অক্ষরের ওপর এই টিকি থাকলে উচ্চারণ হবে এঃ, নাহলে এমনি এ। দুটোর মানেও আলাদা, মাথায় রাখিস। শুধু এ মানে অ্যাণ্ড, আর এঃ হল ভার্ব, যেমন ইংরেজির ইজ।

- বুঝেছি, তারপর বল।

- এঃ ব্যবহার হয় শুধু তিনটে সময় বলতে- একটা, দুপুর বারোটা আর মাঝরাত। বাকি সব সোনো। তাহলে তোর ফর্মুলাটা কী হবে সময় বলার? এই দ্যাখ:

এঃ+মেৎসোজোর্নো(মধ্যদিন), মেৎসানোত্তে(মধ্যরাত্রি),লুনা(একটা)

È + mezzogiorno (noon), mezzanotte (midnight),l'una (one o'clock)

আর

সোনো লে+যত ঘণ্টা হয়েছে

Sono le + number of the hour

- এগজাম্পল, এগজাম্পল! রিনটিন ছটফটিয়ে ওঠে।

- আরে সোজা তো। ধর আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি, চাও রিনটিন, কে ওরে সোনো? তুই কী বলবি তাহলে?

রিনটিন ঘড়ির দিকে তাকায় একবার, মনে মনে হিসেব করে।–সোনো লে চিংকুয়ে?

- হয়েছে, কিন্তু হয়নি।

- কেন? পাঁচটাই তো বেজেছে।

- তা বেজেছে, কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশের মত ইতালিতেও চব্বিশ ঘণ্টা হিসেবে সময় গোনা হয়। তাই চিংকুয়ে বললে সকাল পাঁচটা বোঝাবে, বিকেল নয়।

- বিকেল পাঁচটা মানে তাহলে বারো আর পাঁচে সতেরোটা, তাই তো? ও মাসি, দশের পরে তো আর গুনতে শিখি নি।

- বেশ তো, আজ শিখে নিবি। এখন শুধু জেনে রাখ, সতেরোটা হল দিচিয়াসেত্তে। তাহলে?

- সোনো লে দিচিয়াসেত্তে?

- দশ মিনিট পেরিয়ে গেল তো।

- উফ, সেটা আবার কী করে বলে?

- বুদ্ধি খাটালেই পারা যায়। সোজা করে দিচ্ছি, নে। ফর্মুলা হচ্ছে এ+ মিনিটের সংখ্যা। এ মানে অ্যাণ্ড, আগেই বলেছি। কী বলবি তাহলে?

- সোনো লে দিচিয়াসেত্তে এ দিয়েচি।

- পেরফেক্তো। মাসি হাততালি দেন। রিনটিন একটু লজ্জা পায়। কিন্তু তার মনে আরো অনেক প্রশ্ন গজগজ করছে।

- পৌনে পাঁচটা, সওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, পাঁচটা বাজতে দশ, এগুলো সব ওই + করেই হবে? কিন্তু বাজতে দশে + কী করে হবে?

- সাড়ে পাঁচটা দু ভাবে বলতে পারিস, যেমন বাংলায় বলি। বিকেল পাঁচটা তিরিশ, সোনো লে দিচিয়াসেত্তে এ ত্রেন্তা, আবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা সোনো লে দিচিয়াসেত্তে এ মেৎসো। সওয়া বলতে পনেরোও বলা যায়- এ কুইন্দিচি, বা এ উন কোয়াত্রো।

- পৌনে?

- হ্যাঁ, পৌনে আবার একটু অন্য রকম। এতে দুটো ফর্মুলা হয়, প্লাস আর মাইনাস। যটা বেজেছে তার সঙ্গে প্লাস পঁয়তাল্লিশ, অথবা যটা বাজবে তার থেকে মাইনাস উন কোয়াত্রো। মেনো উন কোয়াত্রো। সোনো লে দিচিয়াসেত্তে এ কারান্তাচিংকুয়ে, অথবা সোনো লে দিচিয়োত্তো মেনো উন কোয়াত্রো।

- উফ বাবা, কী কঠিন কঠিন শব্দ।

- কিচ্ছু কঠিন না। অচেনা তাই অমন লাগছে। একবার চেনা হয়ে গেলেই আর কঠিন লাগবে না।

- তাহলে ছটা বাজতে দশ হবে সোনো লে দিচিয়োত্তো মেনো দিয়েচি?

- বাঃ, এই তো। আচ্ছা শোন, যদি নিতান্তই ওরকম তেরো চোদ্দ করে গুনতে অসুবিধে হয়, তাহলে একটা দুটো করেও বলতে পারিস, তবে সেখানে তার পরে সকাল না বিকেল সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। কী করে বোঝাবি বল তো? সকাল হলে সময়ের পরে বলবি দি মাতিনা। এঃ চিংকুয়ে দি মাতিনা। সকাল পাঁচটা। সন্ধে হলে দি সেরা। এঃ সেই দি সেরা। সন্ধে ছটা। পাঁচটার পর থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত দি সেরা।

- রাত দুটো?

- এঃ দুয়ে দি মাতিনা, ভোর দুটো অথবা এঃ দুয়ে দি নোত্তে, রাত দুটো। দুরকমই চলবে। আর আরো একটা জিনিস মনে রাখিস, লেখার সময় ইংরেজির মত কোলন দিয়ে লেখা চলবে না কিন্তু।

- মানে?

- আমরা ইংরেজিতে বা বাংলায় সাড়ে ছটা কীভাবে লিখি, ৬: ৩০, তাই তো. ইতালির নিয়মে লিখতে হবে কমা দিয়ে, মানে ৬,৩০। বুঝলি কিছু.

- বুঝলাম তো একটু একটু, কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে মনে হচ্ছে।

- সে তো করতেই হবে কারা ব্যাম্বিনা। এই চার্টটা দেখ। এটা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করলেই সব ঠিকঠাক পারবি।

মাসি ঝোলা থেকে একখানা গোটানো কাগজ বার করে টেবিলে পাতেন। রিনটিন ঝুঁকে পড়ে কাগজটার ওপর। এই যে, তোমরাও দেখ না।

কটা বেজেছে? - Che Ore sono?(Che ora è?)

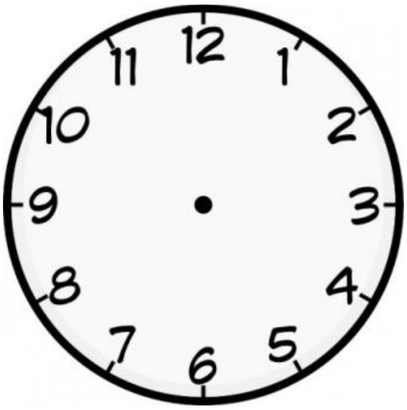

12 = ওরে 3= কোয়াত্রো

6=মেৎসো 9= কোয়াত্রো

ঘড়ির বাঁ দিক 31” – 59” (মিনিট)	ঘড়ির ডান দিক 1” – 30” (মিনিট)
ফর্মুলা: সোনো লে + মিনিট (যতগুলো বাকি আছে) + মেনো + সময়	ফর্মুলা: সোনো লে + মিনিট (যতগুলো বেজেছে) + এ + সময়

(যতটা বাজবে)	(যতটা বেজেছে)

12: 00 A. M - 11: 59 A. M = দি মাতিনা

12: 00 P. M - 17: 59 P. M = দেল পোমেরিজ্জিও

18: 00 - 20: 59 = দি সেরা

21: 00 - 23: 59= দি নোত্তে

12: 00 A. M 24: 00 0: 00 মেৎসোনোত্তে	12: 00 P. M মেৎসোজোর্নো

- এবার কটা প্র্যাকটিসের কাজ দিই। রুণা মাসি আজকের মত পাট গোটানোর তোড়জোড় শুরু করেন।

- দাঁড়াও দাঁড়াও, ও মাসি, ঘড়িকে কী বলে তাই তো বললে না।

- বলি নি বুঝি? আচ্ছা, এই ছবিগুলো দেখে দেখে তুই নিজে নিজেই শিখে নে।

Orologio digitale

Orologio analogico

Orologio da polso

- ও আচ্ছা, ওরোলোজিও। বেশ, দাও এবার কী প্র্যাকটিস দেবে।

- দিচ্ছি। সেই সঙ্গে দশের পরের সংখ্যাগুলোও দিচ্ছি, দেখে রাখিস, কেমন।

A. এগুলো ইতালিয়ানোতে লেখ।

1. 7: 21 A. M
2. 9: 10 A. M
3. 4: 24 P. M
4. 8: 30 P. M
5. 3: 45 A. M
6. 9: 00 P. M
7. 1: 15 A. M
8. 1: 15 P. M

B. এগুলোকে সংখ্যায় লেখ।

le sei e un quarto di sera

le undici meno un quarto di sera

le otto meno cinque di mattina

l'una di notte

le tre meno un quarto del pomeriggio

le sette di sera

le cinque e venti di sera

le tre e diciassette di mattina

C. এখানে যে ভাবে সময় দেওয়া আছে তার থেকে অন্যভাবে লেখ। মানে যেন পালটে না যায়।
উদাহরণ: **Sono le quattro e cinquanta.—Sono le cinque meno dieci.**

Sono le tre e quindici.

Sono le otto e quaranta.

È l'una e trenta.

Sono le undici e quarantacinque.

Sono le sette e cinquantanove.

Sono le nove e quarantatré

উত্তর পরের এপিসোডে।

এবার সংখ্যা। এক থেকে দশ আগে শেখা হয়েছে। এবার এগারো থেকেঃ

11	**undici**	উন- দিচি(একের পিঠে দশ)
12	**dodici**	দো- দিচি
13	**tredici**	ত্রে- দিচি
14	**quattordici**	কোয়াত্তর- দিচি
15	**quindici**	কুইন- দিচি
16	**sedici**	সে- দিচি
17	**diciassette**	দিচিয়া- সেত্তে(দশ আগে চলে গেল, তার পরে সাত)
18	**diciotto**	দিচি- অত্তো(এবার ও ভাবেই চলবে)
19	**diciannove**	দিচিয়া- নোভে
20	**venti**	(ভেন্- তি)
21	**ventuno**	(ভেন্ত- উনো)
22	**ventidue**	ভেন্তি- দুয়ে
23	**ventitré**	ভেন্তি- ত্রেঃ
24	**ventiquattro**	ভেন্তি- কোয়াত্রো
25	**venticinque**	ভেন্তি- চিংকুয়ে
26	**ventisei**	ভেন্তি- সেই
27	**ventisette**	ভেন্তি- সেত্তে
28	**ventotto**	ভেন্ত- অত্তো
29	**ventinove**	ভেন্তি- নোভে
30	**trenta**	ত্রেন্- তা(এবার উনো, দুয়ে করে যোগ করে যাও)
40	**quaranta**	কোয়ারান্- তা(ওই একই রকমে চলবে)

50 **cinquanta** চিংকোয়ান্- তা

60 **sessanta** সেস্- সান্তা

70 **settanta** সেত্- তান্তা

80 **ottanta** ওত্- তান্তা

90 **novanta** নোভান্- তা

100 **cento** চেন্- তো

মনে থাকে যেন, **venti, trenta, quaranta, cinquanta, আর তার পরের ওই রকম সংখ্যাগুলোতে uno আর otto যোগ হলে শেষের ভাওয়েলটা মুছে যায়। তখন হবে ventuno, novantotto,** *এই রকম।*

আজ তবে এই পর্যন্তই। বাস্তা পেরোজ্জি। আ প্রেস্তো। (Basta per oggi - Enough for today; A presto- See you soon.)

....

আগের এপিসোডের উত্তরঃ

Quaderno কোয়াদের্নো(খাতা)------ (খাতাগুলো)Quaderni

Penna পেন্না(পেন)------- ----- (পেনগুলো)Penne

Padre পাদ্রে(বাবা)------------ (বাবারা)Padri

Ragazza রাগাৎসা(মেয়ে)-------- (মেয়েরা)Ragazze

Casa কাসা(বাড়ি)------------- (বাড়িগুলো)Case

Zia জি.য়া(মাসি)--------- ---- (মাসিরা)Zi

রুকু ও দৈত্য

শাশ্বতী ব্যানার্জি

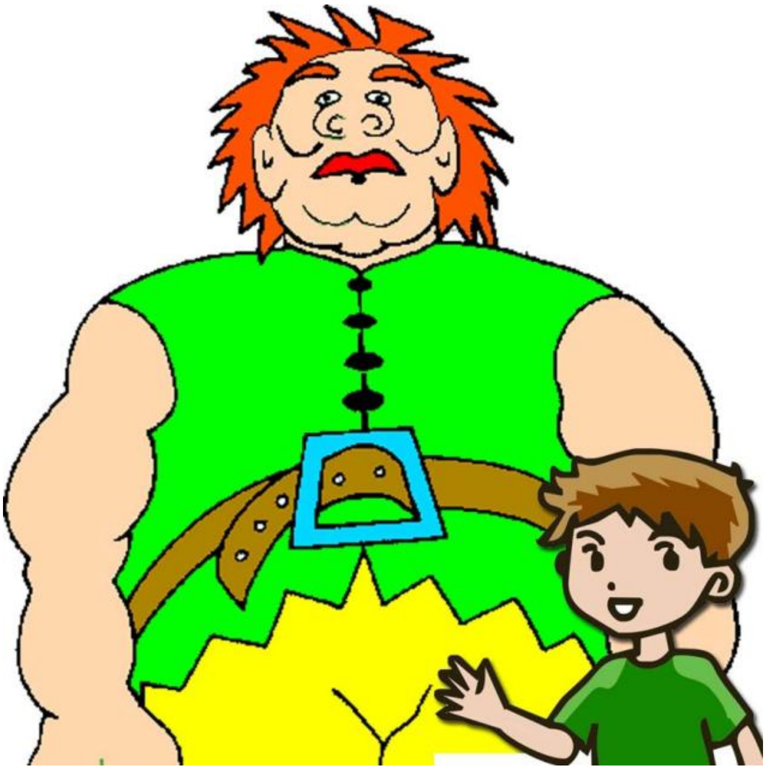

আহা কী আনন্দ! আজ রুকুর আমি ভোম্বলের নেমন্তন্ন রুকুর বাড়িতে। ভোম্বল কে বল তো? মনে আছে তো? ভোম্বল রুকুর সেই জেয়াঁনামি যার লম্বা নে আর বিশাল চেহারা।

টিংটং !!!

দরজায় ঘণ্টি বাজছে। রুকুর পোষ্য শিয়াঁ ভুলু ঘেউ ঘেউ ডাকছে। সঙ্গে রুকুর ছোট্ট শা লালুটাও মিয়াঁও মিয়াঁও ডাক ছেড়েছে। রুকুর ম্যার আজ রান্নায় ব্যস্ত। আজ সক্কাল সক্কাল রুকুর প্যার মারশে থেকে কত কী এনেছে- ভিয়ান্দ, পোয়াসঁ , লেগুম, পুলে আর তার সঙ্গে আছে বঁবঁ , গ্লাস। কী? জিভে জল আসছে? আরে, এখনও তো রান্নাই হয়নি। দেজ্যনেতে তো আজ এলাহি ব্যাপার। রুকু বার দুয়েক কুইজিন ঘুরে এসেছে।

টিং টং!!!

রুকু দৌড়ে দরজা খুলতে এল। আরে ভোম্বল এসে গেছে। আজ আর জেয়াঁকে দেখে রুকুর ভয় করছে না। এখন তো ভোম্বল রুকুর আমি হয়ে গেছে। ভোম্বল এসেই হেঁড়ে গলায় বলল “বঁজুর রুকু , জ্য ভ্য ভোয়ার ভত্র্ জারদাঁ। রুকু তো মহা খুশি। ভোম্বল তার প্রিয় বাগান দেখতে চেয়েছে। মহানন্দে রুকু তাদের বাগানের গাছপালা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভোম্বলের তো রুকুর জারদাঁ, ফ্ল্যর দেখে খুব মজা !!

কত নানান রঙের ফ্ল্যর। রুকু তার বন্ধুকে সব ফুলের নাম বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পরল। ঐ জন ফ্ল্যর হল গাঁদা, ঐ ব্ল্য ফুলগুলো হল অপরাজিতা, ঐ রুজ ফ্ল্যর হল পমপম আর ভিওলে রঙের ফুলগুলো যে দেখছ, ওটা গ্ল্যাডিওলাস। এই দেখ, এই সাজানো ভ্যার গাছটা হল ক্রিসমাস ট্রি, এই গাছটা আমরা ক্রিসমাসের সময় আলো দিয়ে সাজাই। কেমন, সুন্দর না ? উই মঁনামি, ইল এ ত্র্যা বো।

এবারে রুকু ভোম্বলকে ঘুরে ঘুরে তার মেজঁ দেখাতে লাগল। এই দেখ, এটা আমাদের শাম্ব্র্ আ কুশে, এর পাশেই আমাদের শাম্ব্র্ দামি, তুমি এখানে থাকতে পার। আমাদের দুটো শোবার ঘর, দুটো সাল দ্যব্যাঁ। একটা বাথরুম শাম্ব্র্ আ কুশের সঙ্গে লাগোয়া, আর একটা শাম্ব্র্

দামির লাগোয়া। এটা সাল্ আ মাঁজে , এখানেই আমরা দুপুরে খাব। আর ওই ঘরটা হল আমাদের পুঁটিমাসির। ও হো, তুমি তো পুঁটিমাসিকে এখনো চেন না। খাবার সময় দেখতে পাবে। পুঁটিমাসি আমাকে একল- এ নিয়ে যায়, একল- এ যাবার জন্য রেডি করে দেয়। বিকেলে আমাকে খেলার মাঠে নিয়ে যায়। আর মাকেও রান্নায় সাহায্য করে। জানো, পুঁটিমাসি খুব ভালো রান্না করে। কত কী আমাদের করে খাওয়ায়- ডিমের বড়া, লুচি, হালুয়া, ছোলার ডাল, আরো কত কী।

"রুকু, দ্যজ্যনে এ স্যারভি। তোমার বন্ধুকে নিয়ে খেতে এসো।"

"এই রে মার গলা। চলো ভোম্বল, খাবে চলো।"

নতুন নতুন শব্দ

Sl no	French word	Pronunciation	Bengali word
1	ami	আমি	বন্ধু
2	geant	জেয়াঁ	দৈত্য
3	chien	শিয়াঁ	কুকুর
4	chat	শা	বিড়াল
5	Pere	প্যার	বাবা
6	mere	ম্যার	মা
7	marche	মারশে	বাজার
8	viande	ভিয়াঁদ	মাংস
9	poisson	পোয়াসঁ	মাছ
10	legume	লেগুম	সবজি
11	bonbon	বঁবঁ	মিস্টি
12	Glace	গ্লাস	আইসক্রীম
13	dejeuner	দেজ্যনে	দুপুরের খাবার
14	cuisine	কুইজিন	রান্নাঘর
15	Bonjour mon ami	বঁজুর, মনামি	সুপ্রভাত আমার বন্ধু
16	Je veux voir votre jardin	জ্য ভ্য ভোয়ার ভতর জার	আমি তোমার বাগান দেখতে চাই
17	jardin	জারদঁআ	বাগান
18	jaune	জন্	হলুদ
19	fleur	ফ্ল্যর	ফুল
20	bleu	ব্ল্য	নীল
21	rouge	রুজ	লাল
22	violet	ভিওলে	বেগুনি
23	maison	মেজঁ	বাড়ি

24	chambre a coucher	শাম্ব্র আ কুশে	শোবার ঘর
25	salle de bains	সাল দ্য বঁ	স্নানেরঘর
26	chambre d'amis	শাম্ব্র্ দামি	অতিথির ঘর
27	ecole	একল্	স্কুল
28	Il est tres beau	ইল এ ত্র্য বো	এটা খুব সুন্দর
29	poulet	পুলে	ছোটো মুরগী
30	vert	ভ্যার	সবুজ

আরো একটা কথা বলি তোমাদের। ফরাসি ভাষায় উচ্চারণ কিন্তু একটু অন্যধরণের। ওপরের টেবিলের শব্দগুলো কেমন করে উচ্চারণ করতে হবে সেইটে কানে শোনা বেজায় জরুরি। সঙ্গে একটা ওয়েবসাইটের খবর দেয়া রইল। http://forvo.com/languages/fr/
সেইখানে গেলে এইরকমের একটা পাতা খুলবেঃ

এখানে লাল তীরচিহ্ন দেয়া জায়গায় ইংরিজি হরফে শব্দটা টাইপ করে নীল তীরের ট্যাবটাকে টিপলেই দেখবে তার ফরাসি উচ্চারণ শুনিয়ে দেবার পাতা খুলে যাবে।

ক্রমশ

ıe race for life at Mossdale

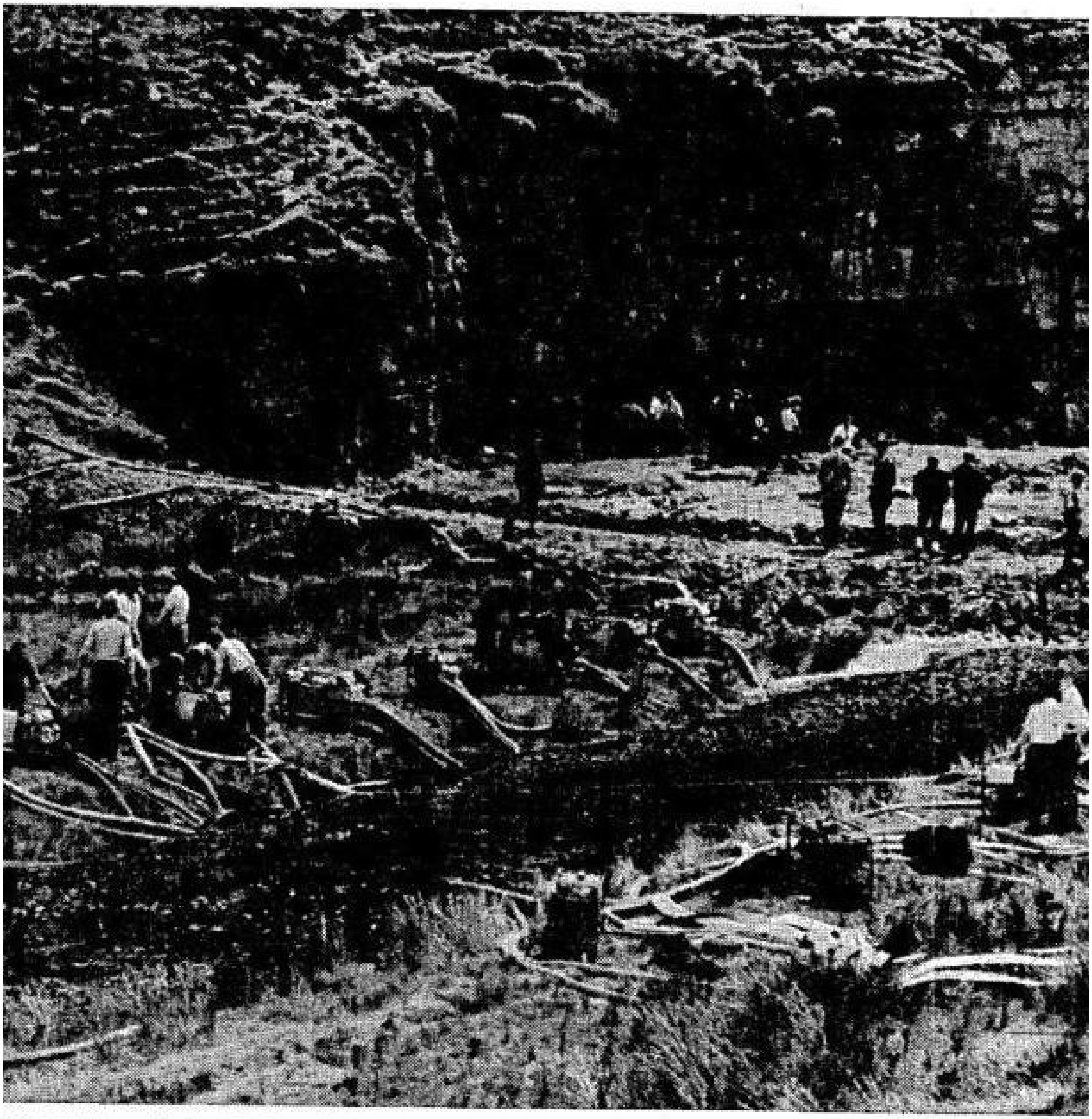

ıps never stop as the hunt for the potholer who may still be alive continues at Mossdale caverns, near Grassington. The di
s some idea of the complexity of the tunnel system, from which the bodies of the five other potholers still have to be ...

"উফ্‌। কানটা এখনো ঝনঝন করছে রে ! যা শব্দটা হল!" জিওফ হামাগুড়ি দিতে দিতে বলে উঠল হঠাৎ।

"ওই শব্দটা হল বলেই কিন্তু মিনিকাউ প্যাসেজ দিয়ে আমরা ঢুকতে পেরেছি। বিস্ফোরক দিয়ে ফাটিয়ে পথ না বানিয়ে নিলে আসতে পারতি নাকি ওখান দিয়ে? তুই বা আমি, আমরা কেউই তো আর বব লিকি নই যে কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই সাপের মতন এঁকেবেঁকে ওরকম সরু গর্ত দিয়ে ঢুকে অ্যাদ্দূর চলে আসতে পারব!" দলনেতা ডেভ আগে আগে এগিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় মন্তব্য করল।

"তা বটে। সাধে লিকিকে গুহা অভিযাত্রীরা আয়রন ম্যান বলে?"

আবার খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। ৯০০ ফিট লম্বা এই সুড়ঙ্গটা মাত্র দু ফিট চওড়া আর ১০ ইঞ্চি উঁচু। তার মধ্যে দিয়ে একটা জলধারা বয়ে চলেছে সামনের অন্ধকারের দিকে। জলধারার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দলটা।

"শ- স- স- " হঠাৎ পেছন থেকে দলের একজনের গলা ভেসে এল, "গুরগুর করে একটা শব্দ হচ্ছে না?"

গ্রেট ব্রিটেনের কনিস্টোন মুর অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা চুণাপাথরের একটা পাহাড়ের গায়ে এই মোজদাল গুহা। তার মুখে এসে মোজদাল বেক নামের সরু একটা নদী গুহার ভেতর সেঁধিয়ে যায়। পাঁচ মাইল দূরে ৯০০ ফিট নীচে ব্ল্যাক কেল্ড নামে একটা জলাশয়ের কাছে এসে তা ফের বের হয়ে আসে গুহার অন্ধকার ছেড়ে। তার সেই সরু ধারাটাই এখন বয়ে চলেছে 'ম্যারাথন ক্রল' নামের এই সুড়ঙ্গটার মধ্যে দিয়ে।

"ধুস। যতোসব বাজে কথা। ভয় দেখাচ্ছিস নাকি আমাদের?" সাহসভরা গলায় কথাগুলো বললেও জিওফের বুকটা কেঁপে উঠল একবার। উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থাতেই মাথা ঘুরিয়ে একবার ওপরদিকে আলো ফেলল সে। মাথার ওপরে সুড়ঙ্গের ছাদটা মাত্রই ইঞ্চিদুয়েক ওপরে।

গুরগুর, গুমগুম শব্দটা তক্ষুণি ফের ভেসে এল পেছনদিক থেকে। ডেভ একবার চমকে উঠল যেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই গুহা অভিযানে বিরাট নামডাক হয়েছে তার। মোজদাল গুহার ভেতরে এর আগেও বেশ কয়েকটা অভিযান চালিয়েছে সে। লোকে বলে বব লিকির চেয়েও এ গুহার ব্যাপারে তার নাকি জানাশোনা অনেক বেশি।

স্থির হয়ে আওয়াজটা একবার শুনে নিল সে। শরীরের নীচে বয়ে চলা জলধারাটার শক্তি বাড়ছে একটু একটু করে। টান টের পাওয়া যাচ্ছে তার। আলোটা নিচু করে ধরে সামান্য উঁচু হয়ে ওঠা ধারাটার দিকে একবার দেখে নিল সে। তারপর চাপা গলায় বলল, "জল বাড়ছে। তাড়াতাড়ি চল, সুড়ঙ্গটা শেষ হলে একটা উঁচু জায়গা খুঁজে নিয়ে—"

কিন্তু তার গলায় আর সে জোর ছিল না। সে বুঝতে পারছিল, মাথার ওপর সামান্য দু ইঞ্চি খোলা জায়গা নিয়ে বেড়ে ওঠা জলের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মোজদাল অবশেষে তার শিকার ধরেছে— তবু—ক্ষীণ একটা আশায় বুক বেঁধে প্রাণপণে সামনের দিকে এগিয়ে চলছিল সেই ছজন তরুণ, বিশ্বসেরা গুহা অভিযাত্রী। আর তাদের শরীরের নীচে জলের ধারাটা ক্রমশই একটু একটু করে উঠে আসছিল তাদের মাথার দিকে----

****

সাধারণত ইয়োরডেলের অগভীর চুণাপাথরের স্তরে এত গভীর গুহা থাকবার কথা নয়। কিন্তু তবু তার বুকে কেমন করে যে মোজদালের এই সুদীর্ঘ গুহাপথ তৈরি হল সে একটা রহস্য। পাঁচ মাইল লম্বা এই গুহাপথ চলেছে মোজদাল বেক নামের গুহানদীটির ধারা ধরে ধরে। পথে প্রকৃতি তৈরি করে রেখেছেন অকল্পনীয় সব বাধা। এখনো পর্যন্ত কোন অভিযাত্রীদলই সে পথ পুরোটা অতিক্রম করতে পারে নি। পথের সেইসব বাধাদের যে নামগুলো রাখা হয়েছে তার থেকেই তাদের চরিত্র বুঝতে বাকি থাকেনা। রয়েছে 'ড্রাউন অর গ্লোরি' নামের জলে ডোবা সুড়ঙ্গ,

‘হাঁটুভাঙা গলি’, দশ ইঞ্চিমাত্র উঁচু নশো ফিটের ‘ম্যারাথন ক্রল’ কিংবা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক জলে ডোবা পাথুরে পথ উমাগোলি- র মতন সব দুর্গম বাধা।

এতসব বাধাবিপত্তি সবার প্রথম মন টেনেছিল বব লিকির। মানুষটার জীবনে প্রধান সমস্যা ছিল আবদ্ধ জায়গায় থাকবার ভয় বা ক্লস্ট্রোফোবিয়া। সেটাকে কাটাবার জন্য লিকি বেছে নেন এই মোজদাল গুহাকে।

সেটা ১৯৪১ সাল। পেশায় এরোপ্লেন ডিজাইনার লিকিকে যুদ্ধে যেতে হয় নি বটে কিন্তু মোজদাল অভিযানের জন্য সঙ্গী বিশেষ জুটত না তাঁর। কারণ গুহা অভিযানের অধিকাংশ লোকজন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত। গুহা অভিযানের প্রযুক্তিও তখন একেবারে শিশুস্তরে রয়ে গিয়েছে। সহায়ক হিসেবে মাঝেমধ্যে এরোপ্লেন কারখানার দু একটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন বটে, তবে একবার গেলে দ্বিতীয়বার সেই ভয়ানক গুহার দিকে পা বাড়াতে চাইত না তাদের কেউ। অতএব একলাএকলাই, মোমবাতি বা সাইকেলের ল্যাম্প সঙ্গে নিয়ে চলত তাঁর মোজদাল অভিযান। পাহাড়ের পেটের ভেতর এ সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। অভিযানের সাজসজ্জা বলতে একটা বয়লার স্যুট।

আর এমনি করেই আস্তে আস্তে গুহার ভেতরে কোথায় কী রহস্য আছে, কোনখানেই বা নদীর জল বেড়ে উঠলে খানিকক্ষণ নিরাপদ আশ্রয় জুটতে পারে তার একটা মানচিত্রমতনও গড়ে উঠেছিল তাঁর হাতে। তবে শতচেষ্টাতেও গুহাপথকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে তার অন্যমুখের ব্ল্যাক কেল্ড হ্রদ অবধি পৌঁছোন হয়ে ওঠেনি তাঁর। বারংবার তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে মোজদাল। শেষ অবধি পৌঁছোবার পথ খুঁজে পান নি তার ভয়ংকর সব গলিপথ আর জলে ডোবা সুড়ঙ্গদের গোলকধাঁধায়।

ভয়ংকরের সঙ্গে বারংবার এমন মোকাবিলা করতে ছুটে যাওয়া মানুষটাকে কেউ বলত পাগল, আবার কেউ বলত লৌহমানব। অনেকেই সন্দেহ করত বব লিকি মিথ্যে বলছেন। ওই

ভয়াল মৃত্যুফাঁদের মধ্যে বারেবারে ঢুকে ফের ফিরে আসা মানুষের সাধ্য নয়। তবে, লিকি মিথ্যে বলছেন কিনা তা প্রমাণ করবার জন্য গুহার ভেতরে ঢুকে তাঁর কথা যাচাই করে নেবার সাহসও ছিল না কারো।

বেশ কয়েক খেপ মোজদালের ভেতরে ঘোরাঘুরি করবার পর লিকি ক্ষান্ত দিলেন। তদ্দিনে তাঁর ক্লস্ট্রোফোবিয়ার রোগ একেবারে সারিয়ে দিয়েছে সেই ভয়াল গুহার অন্ধকার।

বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় কুড়ি বছর আর কেউ ও গুহামুখো হয় নি। সাধ করে কে মরতে যাবে। পদেপদে মৃত্যুভয়, জলে ডোবা সুড়ঙ্গ, দশ ইঞ্চি উঁচু দীর্ঘ পাথুরে গলি এইসব ছাড়া ওতে আছেটাই বা কী? অন্য অন্য গুহার মতন স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইটের চোখ জুড়োনো প্রাকৃতিক ভাস্কর্যটাস্কর্যের চিহ্ন মেলে না সেই মরণগুহায়। গুহা অভিযানের আর এক প্রবাদপুরুষ জিম আয়ার নিজেও কখনো মোজদালে ঢোকবার অভিযান করেন নি। বলতেন, ওই ওঁত পেতে থাকা মরণফাঁদে আমি জন্মে পা দিচ্ছি নে। ভাগ্যের এমন পরিহাস, ১৯৬৭ সালের চব্বিশে জুন তারিখে যখন ডেভ- এর নেতৃত্বে সেই ছয় অভিযাত্রীর ভয়াবহ দুর্ঘটনাটা ঘটল মোজদালে তখন উদ্ধারকারী দলের প্রধান হিসেবে এই জিম আয়ারকেই নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল।

ষাটের দশকের শুরুতে এসে গুহা অভিযানের নতুন যন্ত্রপাতি, পোশাক আশাক বাজারে আসতে ফের একটু আধটু উৎসাহী লোকজনের দেখা মিলতে লাগল মোজদালের গুহামুখে। লিকির বয়েস তখন পঞ্চাশের কোঠায়। মাইক বুন আর পিট লিভেসে নামে দুই শক্তপোক্ত ছোকরাকে নিয়ে ফের একবার লাগলেন মোজদালের রহস্যের সন্ধানে। ১৯৬৩ সালে এক অভিযানে তাঁর দুই শিষ্য ফের তিনি যত অবধি পৌঁছোতে পেরেছিলেন সেই অবধি পৌঁছে গেল। গুহাপথের কোন সঠিক মানচিত্র না থাকায় কেবল লিকির আন্দাজে আঁকা কিছু ভুলে ভরা মানচিত্রের ওপর ভরসা করে সে কাজ করে ওঠাটাও একটা বিরাট কৃতিত্বের ব্যাপার ছিল বইকি!

এর কিছুদিন পরে ফের একদল তরুণ অভিযাত্রী এসে রিকির দরজায় কড়া নাড়ল। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গুহা অভিযান সঙ্ঘের এই সদস্যরা মোজদাল গুহার ভেতর দিয়ে মোজদাল বেক এর গোটা পথটাই খুঁজে বের করতে চায়। লিকি যতটুকু জানতে পেরেছেন তারও পরে বাকি থেকে যাওয়া জল কাদা আর বোল্ডারে ভরা অজানা গুহাপথটুকুতে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তা তারা জানতে চায়। তৈরি করতে চায় গোটা গুহাটার একটা নিখুঁত মানচিত্র। কাজটা প্রায় অসম্ভব। পদে পদে অজানা বিপদের আশংকা, কিন্তু করতে পারলে তার মতন গৌরব আর কোন দুঃসাহসী অভিযানের কপালে জুটবে না। আমাদের কাহিনীর দলনেতা ডেভ বা ডেভিড অ্যাডামসন ছিলেন সেই ক্লাবেরই সদস্য।

দাবানলের মতন খবর ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। বৃটেনজোড়া গুহা অভিযাত্রী ক্লাবগুলোর তরুণ তুর্কি সদস্যরা সবাই যেতে চায় ডেভের সঙ্গে মোজদাল অভিযানে। ইতিমধ্যেই তারা অনেকেই সে গুহার মুখের দিক থেকে একটু আধটু ভেতরের দিকে ঘুরে এসেছে। তাতে গুহা নিয়ে প্রবাদপ্রতীম ভয়টাও কেটে গেছে অনেকের। সবাই ভাবছিল, মোজদাল বুঝি দেখতেই কঠিন। আসলে হয়ত বা সে তত বিপজ্জনক নয়। তাছাড়া প্রায়শই তো গুহা অভিযানে নানান বিপত্তি ঘটে। তখন বাঘা বাঘা গুহা অভিযাত্রীরা এসে উদ্ধারও করে ফেলেন বিপদে পড়া যাত্রীদের। তবে আর চিন্তা কী?

কিন্তু , মোজদালকে পদানত করবার স্বপ্নে বিভোর সেইসব তরুণেরা তখনও জানত না, অন্ধকার সেই গুহা কী ভয়াল পরিকল্পনাই না করে রেখেছে তাদের জন্য।

১৯৬৭ সালের ২৪ জুন তারিখটা ছিল শনিবার। কনিস্টোন গ্রামে আগের রাত কাটিয়ে দশজন অভিযাত্রী পায়ে পায়ে উঠে এল 'মোজদাল স্কার' নামে কুখ্যাত সেই গুহামুখের সামনে। ছাব্বিশ বছুরে ডেভ অ্যাডামসন তাদের নেতা। ডেভ ও তার বন্ধু জিওফ বয়ব্ল্য দুজনেই লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গুহা অভিযান সঙ্ঘের সদস্য। সঙ্গে জুটেছে ওগডেন, ক্যানিংহ্যাম, আর শেপার্ড নামে বোল্টনের হ্যাপি ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের তিন সদস্য। তাদের সঙ্গে এসেছে কলেট লর্ড নামে একটা মেয়ে। এসেছে ব্র্যাডফোর্ড পটহোল ক্লাবের সদস্য, দুই পাকা গুহা অভিযাত্রী ১৯ বছুরে কলিন ভিকার্স, বিল ফ্রেকস আর তাদের চ্যালা ১৭ বছরের মাইকেল রায়ান। আর এসেছে ডেভিড অ্যাডামসনের বাগদত্তা কনে ২২ বছরের মোরাগ ফোর্বস। পরের মাসেই তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

ডেভ আর জিওফের পরিকল্পনা ছিল—গুহামুখে ঢোকবার পর খানিক ভেতরে গিয়ে যে মিনিকাউ প্যাসেজ নামে সরু গলিটা রয়েছে সেইটেকে বিস্ফোরক দিয়ে ফাটিয়ে প্রথমে একটু চওড়া একটা রাস্তা বের করে নেয়া। বাকিরা চলবে তাদের পেছনপেছন। হাওয়া অফিস জানিয়েছিল, সেদিন ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

গুহামুখে এসে তার চেহারা আর আকাশের রকমসকম দেখে কলেট আর মোরাগের ধাত ছেড়ে যাবার দশা। তারা তো ভেবে এসেছিল বেশ একটা সুন্দর গুহাটুহার মধ্যে ঢুকে একটু বেড়িয়েটেড়িয়ে ফিরবে। কিন্তু এ যে ভয়ংকর মৃত্যুফাঁদ। অতএব তারা দুজন মানে মানে পিছু হটল। বাইরের জগতের রোদবৃষ্টিই তাদের ভালো।

ওদিকে কানিংহ্যাম আর শেপার্ডও তখন ভয় পেয়ে গেছে খানিক। প্রথমে ডেভ তাদের অনেক আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ঠান্ডা করেছিল কোনমতে, কিন্তু মেয়েদুজন পিছিয়ে যেতে তারা একটা সুযোগ পেয়ে গেল। ইতস্তত করে বলল, "মানে যেতে তো আমরাও চাই, কিন্তু মেয়েদুটোকে এইভাবে

একলা ছেড়ে দিয়ে—না হে ডেভ। তুমি অনুমতি দিলে আমরাও বাইরেই থেকে যাই বরং। মেয়েগুলোকে পৌঁছেটোঁছে—”

তাদের দিকে তাকিয়ে ডেভ মৃদু হেসে সম্মতি দিয়ে দিল। ভিতুদের দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। তখন বোধ হয় তার চোখের আড়ালে তেমনই হাসি হেসেছিল মোজদালের মৃত্যুগুহাও। ক্যানিংহ্যাম আর শেপার্ড আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন পরবর্তীকালের বহু গুহা অভিযানের নায়ক হয়ে। বেঁচে আছেন কলেট আর মোরাগও। শুধু ডেভ ও তার পাঁচ সঙ্গী—

–কিন্তু যাক সে কথা। অভিযানের গল্পে ফিরে আসি। গোটা দলটা এবারে দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ডেভের নেতৃত্বে মূল অভিযাত্রী ছজন চলল আগে আগে। আর পেছন পেছন রইল মেয়েরা, কানিংহ্যাম আর শেপার্ড। তারা মিনিকাউ অবধি গিয়ে ফিরে আসবে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ মিনিকাউ- এর মুখ থেকে ফিরে বাইরে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় দলের চারজন। হিসেব অনুযায়ী মূল দলটার অভিযান সেরে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। পাহাড়ের মাথায় খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করাটা কোন কাজের কথা নয়। কাছেই ইঙ্গলটন শহর। ঠিক হল সেইখানে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করবে সবাই।

মোরাগ কিন্তু বেঁকে বসল। সংকীর্ণ সেই সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে সে তো দেখেছে কেমন করে ডেভ আর তার দলবল হারিয়ে গেল সেই সুড়ঙ্গের অন্ধকার মুখের মধ্যে। কাজেই যতক্ষণ না তারা ফেরে, গুহামুখ ছেড়ে মোরাগ নড়তে রাজি নয়। অতএব বাকিদের বিদায় দিয়ে কিছু দূরে দাঁড়ানো একটা পরিত্যক্ত খড় রাখবার ঘরে সে আশ্রয় নিল। এখান থেকেই অভিযাত্রীরা ফেরা অবধি তার নজরদারি চলবে গুহামুখের ওপরে।

সন্ধে গভীর হতে বৃষ্টিটা ঝেঁপে এল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝমঝম করে বৃষ্টি চলেছে। মোরাগের বুকের ভেতর একটা অজানা ভয় দানা বেঁধে উঠছিল। মোজদাল বেক নামে যে নদীটা গিয়ে ওই গুহামুখে ঢুকেছে, বৃষ্টিতে তার জল বেড়ে উঠে যদি—

তাড়াতাড়ি বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এসে টর্চ জ্বেলে নদীর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল তার। ফুলে ফেঁপে উঠেছে সরু নদীটা। গুহার মুখে অনেকটা এলাকা জুড়ে অতিকায় একটা পুকুরের মতন জল জমে উঠেছে। হু হু করে সেই জল ঢুকে চলেছে গুহামুখ দিয়ে। ওর ভেতরে যে সরু সরু বিপজ্জনক সুড়ঙ্গগুলো দিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে ডেভের দলবল, এই জল তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয় যদি!

এক মুহূর্ত দেরি করল না আর মোরাগ। তীব্র বৃষ্টির ঝাপটাকে উপেক্ষা করে পিছল পাহাড় বেয়ে ছুটতে শুরু করল সে। একজন কাউকে খবরটা দেয়া দরকার। এক্ষুণি।

মাইলদুয়েক দূরে ইয়ার্নবেরি ফার্ম হাউসের বাসিন্দা কৃষক মিঃ রিলে রাত নটার সময় বৃষ্টির মধ্যে ছুটে আসা মেয়েটাকে দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলেন। তারপর তার মুখে সংক্ষেপে বিষয়টা শুনেই এক মুহূর্ত দেরি করলেন না তিনি। পুলিশ স্টেশনে ফোন করলেন সঙ্গে সঙ্গে। তার সামান্য সময়ের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল উদ্ধার অভিযান। রাত তখন রাত এগারোটা দশ।

স্থানীয় আপার হোয়ার্ফডেলের উদ্ধারকারী দলের কাছে গুহা অভিযানে বিপদে পড়া লোকজনের উদ্ধারকর্ম একটা নিয়মিত কাজ। কিন্তু মোজদালের ব্যাপার আলাদা। ও গুহাপথের কোন বিশ্বাসযোগ্য মানচিত্রই যে নেই কারো কাছে। অতএব বিপদ গুণে সেখানকার দুই উদ্ধারকারী লেন হাফ আর দে বার্চ খবর পাঠালেন "কেভ রেসকিউ অর্গানাইজেশান" নামের এক বড়োসড়ো উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠানে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলাকার সমস্ত গুহা অভিযাত্রী লোকজনের বাড়িতে বাড়িতে, আর সেখানকার সমস্ত রেস্তোরাঁগুলোতে ফোন বাজতে শুরু করে দিল। সংস্থার তরফে উদ্ধার অভিযানে সামিল হবার জন্য আবেদন তখন টেলিফোনের তার বেয়ে ছুটে চলেছে ইঙ্গলটন, ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার ডার্বিশায়ার, চেশাসয়ারের দিকে দিকেও।

এমনই একটা ফোন বেজে উঠেছিল ইঙ্গলটনের কাছে মার্টন আর্মস নামের একটা রেস্তোরাঁতেও। সেখানে কানিংহ্যাম আর শেপার্ড তখন রাতের খাওয়াদাওয়া সারছে। মোজদালের ঝড়বৃষ্টির ব্যাপারে কিছুই জানে না তখনও তারা। ফোনটা আসবার সঙ্গেসঙ্গে অভিযানের থলেটলে সঙ্গে করে তারা ফের ছুটল মোজদালের দিকে। বৃষ্টি আর থকথকে কাদার বাধা অতিক্রম করে তখন সমস্ত জায়গা থেকে মোজদালের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছেন অসংখ্য অভিজ্ঞ গুহা অভিযাত্রী।

মোজদালে পৌঁছে একটা ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়ল সবার। গুহামুখটা একেবারে তলিয়ে গেছে জলের তলায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমে থাকা জলের মধ্যে একটা জায়গায় ঘূর্ণী তুলে হুড়মুড় করে জল ঢুকে যাচ্ছে অদৃশ্য গুহামুখ দিয়ে।

প্রথমটা কিংকর্তব্যংবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। কিন্তু একটু পরেই বেশ কিছু দমকলের ইঞ্জিন, বুলডোজার আর ট্র্যাক্টর এসে হাজির হতে কাজ শুরু হতে দেরি হল না। ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। মোজদালের গুহামুখ রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে একেবারে। শয়ে শয়ে মানুষ কোদাল, শাবল নিয়ে কিংবা খালি হাতেই মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জলে ডোবা গুহামুখে গড়ে তুলছিল একটা অস্থায়ী বাঁধ। সত্তর গজ লম্বা , দশ ফুট উঁচু আর পনেরো ফুট মোটা সেই মাটির বাঁধের গা ঘেঁষে খোঁড়া ছ ফুট চওড়া, দশ ফুট গভীর একটা একশ গজ খাল দিয়ে ১৯ টা পাম্পের সাহায্যে জমা জল বের করে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে অন্য দিকে।

কিন্তু তবু, ট্রাক্টরে করে টেনে আনা দশ হাজার বালির বস্তা ফেলে মজবুত করে তোলা বাঁধটা সেই বিপুল জমা জলের চাপ সইতে না পেরে এখানওখান দিয়ে বারংবার ফুটো হয়ে যাচ্ছিল আর সঙ্গেসঙ্গে কয়েকশো হাত মাটি আর বালি ফেলে বন্ধ করে দিচ্ছিল তার ফাটল। আর সেই সঙ্গেসঙ্গে চলছিল অজস্র মানুষের প্রার্থনা-- খাল দিয়ে জমা জল বের হয়ে গুহামুখ ভেসে ওঠা অবধি অস্থায়ী বাঁধ জলের চাপ যেন সয়ে নিতে পারে। কিন্তু, যদি তা ঘটেও, তার পর?

জিম আয়ারের বয়স তখন একচল্লিশ। বৃটেনের গুহা অভিযানের প্রবাদপুরুষ। মাত্রই এক সপ্তাহ আগে ডেভ তাঁকে বলেছিল এ অভিযানে সামিল হতে। প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মোজদালকে তিনি সশংক শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু সেই অভিশপ্ত সকালে শত শত মানুষের সঙ্গে গুহামুখে জল সরবার জন্য অপেক্ষা করতেকরতেই তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভয়কে জয় করে উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন।

দুপুরের দিকে জল কমতে আরম্ভ করল গুহামুখে। তখনও তার মুখে খানিক জল রয়ে গিয়েছে। কিন্তু আর দেরি না করে আয়ার উদ্ধারকারী দলবল নিয়ে বুড়বুড়ি কাটতে থাকা গুহামুখ দিয়ে নেমে পড়লেন পাতালের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে চলল হ্যাপি ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের জন রাশটন,

বিপদগ্রস্ত অভিযাত্রীদলের সদস্য ওগডেনের বাল্যবন্ধু ফ্র্যাংক বার্নস আর ক্যানিংহ্যাম ও শেপার্ড। গুহার মুখে তখন ওগডেনের বাবা উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করে চলেছেন ছেলের খবর পাবার জন্য।

সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল আয়ারের দলবল। সঙ্গে আলো রয়েছে। আর রয়েছে একটা টেলিফোন হ্যান্ডসেট ও তার। খানিক বাদে 'রাফ চেম্বার' নামে খানিক উঁচু একটা গহ্বরের মধ্যে পৌঁছে সামনের দিকে তাকিয়ে তাঁদের মেরুদণ্ডে কাঁপুনি ধরল। গহ্বরের অন্যপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে ম্যারাথন ক্রল নামে সুড়ঙ্গটার ছোট্ট মুখ। তাতে ভরে থাকা জল তখন আস্তে আস্তে কমে আসছে। জল সরিয়ে ভেতর থেকে উঠে আসা বড়ো বড়ো হাওয়ার বুদবুদগুলোর শব্দ সেই নির্জন অন্ধকার গুহার ভেতরে যেন কোন হিংস্র জন্তুর ভয়াল ডাকের মতন শোনাচ্ছিল।

উদ্ধারকারীদের মনের মধ্যে বারংবার তখন ভেসে উঠছে, অনেক ওপরে গুহার মুখে সেই অস্থায়ী বাঁধটার ছবি। সাক্ষাত মৃত্যুর মত বিপুল জলরাশি আটকে রয়েছে তার অন্যপারে। কিন্তু যদি আর বেশিক্ষণ তা টিকে না থাকে!? ওদিকে মরণগুহার নৈঃশব্দ আর আলোছায়াও তখন তাদের স্নায়ুকে নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। গোটা দলটারই এই প্রথম মোজদালের ভেতরে আসা। তাদের কেউ হঠাৎ করে শুনতে পাচ্ছিল যেন দূর থেকে ভেসে আসা কারো পদধ্বনি, সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কারো কানে ভেসে আসছিল পরিচিত কোন গলার আওয়াজ, কেউ যেন বা সেখান থেকে জলের মধ্যে ছপ ছপ করে পা ফেলে উঠে আসতে চাইছে তাদের দিকে—

খানিক বাদে জল আরও একটু কমতে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন লন্ডন থেকে আসা টোনি ওয়ালথাম। সামনের সুড়ঙ্গের মুখ থেকেও জল সরে গেছে তখন। এইবার শুরু হল উদ্ধার অভিযানের কঠিনতম পর্ব- ম্যারাথন ক্রল অভিযান।

ম্যারাথন ক্রল সুড়ঙ্গের ভেতরটা তখনও ভেজা, স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। একটা গা শিরশির করা নৈঃশব্দ ছড়িয়ে ছিল সেখানে। বহু গুহা অভিযানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আয়ারের কানে সে নৈঃশব্দ কবরের নিস্তব্ধতার মতন ঠেকছিল। মনের গভীরে তিনি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন, আশা নেই কোন আর।

হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দলটা। সবার আগে রইলেন ওয়ালথাম। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা দুটো কাদামাখা দেহ। মৃত শরীরদুটোর ওপরে বেশি জায়গা ছিল না। সেইটুকু জায়গা দিয়ে ঘষটে ঘষটে কোনমতে আরো একটু এগোতেই আরো তিনটে শরীর নজরে এল। বাকি রইল আর একজন। তার তখনও কোন চিহ্ন নেই। গোটা উদ্ধারকারী দলটাই তখন এগিয়ে এসেছে কাছে। মোজদালের শিকার তরতাজা মানুষগুলির দেহগুলোকে ঘিরে চোখের জল ফেলছিল তারা নিঃশব্দে।

খানিক বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়লথাম বুলেন, "চলো ফেরা যাক জিম। এরা আর কেউ বেঁচে নেই।"

জিম আয়ার সঙ্গে আনা টেলিফোন সেটটা থেকে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। তারপর ফোনটা রেখে দিয়ে হঠাৎ আতংকিত মুখে বলে উঠলেন, "সবাই এক্ষুণি বাইরের দিকে রওনা হও। বাঁধ ভাংছে-- "

সেদিন গোটা রাতটা যুদ্ধ চলল। জলের চাপে থরথর করে কাঁপছিল বাঁধটা। দুবার তা ভেঙে পড়েছিল। দুবারই শত শত হাত একসঙ্গে কাজ করে তাকে প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই সারিয়ে তুলেছিল। তার কারণ একটাই। অভিযাত্রীদের মধ্যে একজন, ওগডেন, তার তখনো খোঁজ মেলে নি। কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গে ঢুকে গিয়ে যদি সে বেঁচে গিয়ে থাকে? যদি কোন অন্ধকার কোণে এখনো পড়ে থাকে তার অজ্ঞান শরীর! ছবিটা চোখের ওপর ভাসতেই তৎপর হয়ে উঠছিল অসংখ্য হাত। এ বাঁধকে ভাঙতে দেয়া চলবে না যতক্ষণ না ওগডেনের সন্ধান মিলছে।

কিন্তু সে অনুসন্ধানের জন্য দরকার মোজদালকে হাড়ে হাড়ে চেনে এমন কোন অভিযাত্রীর। এইবার ফের খবর গেল বব লিকির কাছে। ছাব্বিশ বছর বাদে, তিপ্পান্ন বছরের লিকি ফের একবার মোজদালের মোকাবিলায় নামলেন। সঙ্গে পেলেন পুরোন শাগরেদ ফ্রাংক বার্নসকে। দুজন মিলে পাঁচটি মৃতদেহকে অতিক্রম করে ঢুকে গেলেন গুহার আরো বহু গভীরে। পুরোনো স্মৃতিকে ঘেঁটে ঘেঁটে তুলে এনে ওগডেনকে খুঁজতে থাকলেন গুহার সেইসব গোপন কন্দরে, যার সন্ধান জানেন শুধু তিনি নিজে।

কিন্তু তারপর ফের একবার বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হতে খালি হাতে ফিরে আসতে হল তাঁকেও। সেই ছিল লিকির শেষ গুহা অভিযান। সোমবার আর মঙ্গলবার জুড়ে ফের একবার চিরুণি তল্লাশি চালানো হল গুহার ভেতরে। কিন্তু ওগডেনের সন্ধান মিলল না। সবাই যখন হাল ছেড়ে দিতে বসেছে, তখন ওগডেনের পুরোনো বন্ধু ব্রায়ান বোর্ডম্যান একটা শেষ চেষ্টা করবার জন্য গুহায় নামলেন পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে।

এইবার ভাগ্য প্রসন্ন হল। পাঁচটি মৃতদেহ পেরিয়ে খানিক এগিয়ে তিনি দেখেন কাদার মধ্যে কিছু একটা চকচক করছে। তুলে দেখা গেল সেটা ওগডেনের আংটি। সঙ্গেসঙ্গেই সেইখানে স্থির হয়ে গেলেন ব্রায়ান। উঠে দাঁড়াবার জায়গা বলাবাহুল্য সেখানে নেই। শুয়েশুয়েই এদিক ওদিক চোখ চালাতে চালাতে নজরে এল, সুড়ঙ্গের ওপর দিকে তাঁর মাথার কাছে একটা ফাটলের মধ্যে থেকে একটা বুটপরা পা বের হয়ে আছে। ফাটলটা ভীষণ সরু। একটা হাত তার মধ্যে গলে

কিনা সন্দেহ। বাঁচবার আকুল আশায় তার মধ্যেই নিজের গোটা শরীরটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওগডেন। বাতাসের শেষতম বিন্দুটুকুকে শুষে নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য কী নিদারুণ যন্ত্রণাই সে সহ্য করেছিল ওই ফাটলটুকুর মধ্যে অতবড়ো শরীরটাকে গুঁজে দিতে গিয়ে!

****

শরীরগুলো অত সংকীর্ণ জায়গা থেকে বের করে আনবার কোন উপায় ছিল না। ব্রায়ানরা বের হয়ে আসতে তার মুখ দেখেই বাইরে দাঁড়ানো ওগডেনের বাবা বুঝে গেলেন ছেলের পরিণতি কী হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দুঃসাহসী ছয় জোয়ানের একজনকেও রেহাই দেয়নি রাক্ষুসে মোজদাল।

বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার পরের দিনও। মৃতদেহদের বের করে আনবার উপায় না থাকায় মৃতদের পরিবার পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও অন্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে করোনার আদেশ দিলেন মোজদালের গুহাকে একটি সমাধিক্ষেত্রে হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, আর চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে তার মুখ।

দুর্ঘটনার চারদিন পরে পুলিশের রিপোর্টের শেষ লাইনে লেখা রইল, "নিশ্চিত ব্যর্থতার কথা জেনেবুঝেও এত মানুষ কোনদিন এত নিঃস্বার্থভাবে কাউকে উদ্ধার করবার কাজ করেন নি।"

মোরাগ ফোর্বস সারাটা জীবন সেই রাতটাকে ভুলতে পারেন নি। আজও তা দুঃস্বপ্নের মত তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ওগডেনের বাবা মা, ছেলের শেষ আশ্রয়ের কথা মাথায় রেখে তাঁদের বাড়ির নাম বদলে রেখেছেন 'মোজদাল।' আজও প্রতিই বছর ফ্র্যাংক বার্নস সেই দিনটিতে মোজদালের সামনে এসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে যান বন্ধুদের প্রতি।

এ ঘটনার চল্লিশতম বর্ষপূর্তির দিন মোজদালের মরণগুহার মুখে একটি ফুলের তোড়া রেখে গিয়েছিলেন এক প্রৌঢ়া। তাতে লেখা ছিল, "প্রিয় জিওফ বয়ব্ল্যু, গত চল্লিশটা বছর ধরে তুমি আমার মনের মধ্যে বেঁচে আছ। ভালো থেকো।" তিনি জুডিথ, জিওফের স্ত্রী। বিয়ের এক বছরের মাথায় তাঁর দুঃসাহসী জিওফ হারিয়ে গিয়েছিলেন মোজদালের করাল গ্রাসে।

১৯৭০ সালে ডেভদের বন্ধুরা সরকারী অনুমতি নিয়ে ফের একবার মোজদালের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। দীর্ঘ এক কষ্টকর অভিযান করে বন্ধুদের দেহাবশেষ তুলে নিয়ে রেখে এসেছিলেন একটা উঁচু গহ্বরের ভেতরে, যাতে আর কখনও কোন বন্যার জল তাঁদের স্পর্শ করতে না পারে। সে গহ্বরের নাম রাখা হয়েছে "শেষ আশ্রয়"।

মোজদালের বন্ধ গুহা, এক ভয়াল কবরখানার মত আজও একা একা শুয়ে আছে তার অপরাজিত সুড়ঙ্গকে বুকে ধরে। মানুষ চাঁদের বুকে পা রেখেছে, কিন্তু মোজদাল আজও অপরাজিত।

বিদেশি গল্প

সমুদ্রের জলে লুকিয়ে আছে বহু রহস্য, আশ্চর্য দৃশ্য, শব্দ আর বিপদ। সে কারণেই সমুদ্র সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহল এবং রোমাঞ্চ সুবিদিত। বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান রাজপথও ঐ সমুদ্রের জল। ব্রিটিশ সম্রাজ্যের সীমান্ত প্রসারিত হয়েছে চতুর্দিকে। বহু প্রাণের বিনিময়ে, অবশ্যই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রসদ হিসেবে বহু তরুণ প্রাণ চলে গেছে পেশোয়ারে, আম্বালায়, কোর্তিতে, পিয়ারসন দুর্গে, তাদের সমাধির স্মৃতি ফলকগুলোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করছে।

জল যখন সারা বিশ্বের সঙ্গে ব্রিটেনের যোগসূত্র স্থাপন করে, তখনই আমাদের মনে নানারকম রোমাঞ্চকর কল্পনার সৃষ্টি হয়। যখনই কারো প্রিয়জন সমুদ্রযাত্রা করে, পাহাড়ে পাহাড়িয়াদের বুলেটের নাগালে ঘোরাফেরা করে, জলাভূমিতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, যেখানে মৃত্যু আসে চকিতে, নিঃশব্দে তখনই আমাদের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে, নানারকম উদ্ভট কল্পনার জন্ম হয়, যেখানে মা দেখে ছেলে মৃত্যশয্যায়। শোকের প্রথম ধাক্কাটা কাটানোর আগেই আসল খবর চলে আসে এবং দেখা যায় হাজার হাজার মাইল দূরের কোন এক ঘটনার সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য ছাড়া এর সঙ্গে আর কোন মিলই নেই। আমি অন্তত একটি ঘটনার কথা বলতে পারি, ঘটনা পরম্পরায় যা অলৌকিক বলে মনে হলেও যার পেছনে প্রকৃতিক সমস্ত নিয়মই কাজ করেছিল।

সিংহল দ্বীপের কফি রপ্তানিকারক সংস্থা হাডসন অ্যান্ড ভ্যানাসিটার্ট এর তরুণ পার্টনার ছিল জন ভ্যানসিটার্ট। ডাচ রক্ত শরীরে থাকলেও চললেবলনে খাঁটি ইংরেজ। বহু বছর ধরে আমি লণ্ডনে তার এজেন্ট ছিলাম। ১৮৭২ সালে সে যখন লন্ডনে আসে মাসতিনেকের ছুটি কাটাতে, তখন সে আমাকে বলে ইংল্যাণ্ডের শহর আর গ্রামের সঙ্গে পরিচয় করাতে। তাকে গোটা সাতেক চিঠি লিখে দিলাম যেগুলো নিয়ে সে আমার অফিস ছাড়ে এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন চিরকুট পেতে লাগলাম যাতে বোঝা গেল যে আমার বন্ধুবান্ধবরা তাকে বেশ পছন্দই করেছে। তারপর খবর এল হিয়ারফোর্ড লসন বংশের এমিলি লসনের সঙ্গে তার বেশ জমে উঠেছে এবং গুজব টুজবের পালা চুকিয়ে শেষ পর্যন্ত পাকা খবর এল যে তারা বিয়ে করেছে। এদিকে তার ছুটিও ফুরিয়ে আসছিল। কাজের জায়গায় ফিরতে হবে। তারা কলম্বোয় ফিরবে কোম্পানির নিজস্ব একহাজার টনের ছোট পালতোলা জাহাজে এবং তাদের মধুচন্দ্রিমাটাও হবে সেখানেই।

সিংহলে কফিচাষের সে এক স্বর্ণযুগ ছিল। একটি মাত্র মরশুমে এক মারাত্মক ছত্রাকের আক্রমণে কফিচাষের পুরো ব্যাবসা ধ্বসে গিয়ে সেটা একটা গোটা জাতিকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। তবে এটাও ঠিক যে একটি ব্যাবসা মার খেলেও অন্য আরেকটি চাষের সে জায়গাটা নিতে দেরি হয়নি। সিংহলে চা-শিল্প গর্ব করে বলার মতই বিষয়। ওয়াটারলু যুদ্ধের সেই সিংহের প্রতীকের মতই বিষয়। সেই সিংহের প্রতীকের মতই সিংহলের চা-শিল্পও মানুষের সাহস ও চ্যালেঞ্জ নেওয়ার পরিচয়।

তবে সেই '৭২ সালে আকাশে কোণে কোন দূর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসেনি এবং ব্যবসায়ীরাও এই শিল্পের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। ভ্যানসিটার্ট লন্ডনে ফিরল, সঙ্গে তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। আমার সঙ্গে পরিচয় তাদের সঙ্গে ডিনার সারলাম আর এটাও ঠিক হল যে আমি তাদের সঙ্গেই ইস্টার্ন স্টার জাহাজে চেপে সিংহল যাব। জাহাজ ছাড়বে সামনের সোমবার।

রোববার বিকেলে আবার আমার সঙ্গে দেখা হল ভ্যানসিটার্টের। রাত্তিরে নটা নাগাদ সে আমার ঘরে এল কেমন উদভ্রান্তের মত। করমর্দনের সময় দেখলাম হাতটা খরখরে আর গরম। "অ্যাটকিনসন", বলল সে, "একটু লেবুর রস খাওয়াতে পারবে? গলা শুকিয়ে গেছে এমন যে খালি খালি লেবুর রস খেয়েও আশ মিটিছে না।"

আমি বেয়ারাকে ডেকে লেবুর রসের অর্ডার দিয়ে বললাম, "কী ব্যাপার? তোমার মুখ লালচে হয়ে গেছে। তোমাকে তো এরকম লাগে না! কিছু হয়েছে নাকি?"

"হয়েছে মানে, মুখ শুকিয়ে গেছে, কোমর ব্যথা করছে আর কোন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। লন্ডনে এসেই এই কান্ডটা হল মনে হয়। এমনকি এখানকার দূষিত হাওয়ায় শ্বাস নিতেও অসুবিধে হচ্ছে," দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে, মনে হল সত্যিই ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

"সমুদ্রের হাওয়া খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

“ঠিক বলেছ। কোন ডাক্তারের দরকার নেই। কাল সকালে সমুদ্দুরে গিয়ে পড়তে পারলেই আমি ফিট হয়ে যাব। আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। একগ্লাস লেবুর রস খেয়ে দুহাত মুঠো করে আঙুলের গাঁটগুলো জোড়া করে কোমরের কাছটায় রাখল সে, বলল, “এবার একটু আরাম লাগছে।”

তারপর আমার দিকে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “তোমার সাহায্য চাই, অ্যাটকিনসন, আমার কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।”

“কী ব্যাপার?”

“আমার স্ত্রীর মা অসুস্থ, তার করেছিল। ওকে যেতে বলেছে। আমি যেতে পারিনি, হাজারটা ঝঞ্ঝাট চারিদিকে। বউ একাই গেছে। এখন ব্যাপার হল, আমি আরেকটা তার পেলাম যে ও কাল আসছে না, তবে বুধবার ফলমাউথ থেকে জাহাজ ধরবে। আমরা তো ওখান দিয়েই যাব, যদিও ব্যাপারটা সোজা নয়, আর অ্যাটকিনসন, তুমি তো জান যে কোন মানুষ রহস্যে বিশ্বাস না করলেই অভিশাপ কুড়োয়। হ্যাঁ, অভিশাপ।” সে সামনে ঝুঁকে প্রায় কান্নার মত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

সেই সময়েই, প্রথমবার আমার মনে হল, এটা বোধহয় অতিরিক্ত ব্র্যান্ডি খাওয়ার ফল। অতিরিক্ত ব্র্যান্ডি খেলে মানুষ এরকম অসংলগ্ন বকে, হাত খরখরে হয়ে যায়, চোখ চকচক করে, মুখ লালচে হয়ে যায়। এরকম একটা ভাল ছেলে শেষ অবধি নেশায় খপ্পরে পড়েছে দেখে খারাপ লাগল।

“তোমার একটু শোয়া দরকার,”আমি একটু কড়া গলাতেই বললাম।

সে চোখের এমন একটা ভঙ্গি করল যেন প্রাণপণে চেষ্টা করছে ঘুম থেকে জেগে ওঠার।

“শোব, শোব, ” বলল সে, “একটু আগে আমার একটু ঘোর ঘোর লাগছিল বটে, তবে এখন ঠিক আছি। কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ, আমার বউ। হ্যাঁ, সে জাহাজ ধরবে ফলমাউথে। এখন, আমি তো ওখানে যাব জলপথে, না হলে আমার শরীর সারবে না। পরিষ্কার সমুদ্রের বাতাস পেলেই আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠব। তাই বলছিলাম তুমি রেলপথে ফলমাউথ যাও, কারণ যদি ওখানে জাহাজ পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়, তাহলে তুমি অন্তত আমার বউয়ের কাছে থাকতে পারবে। আমি ওকে তার করে দিচ্ছি যে তুমি রয়্যাল হোটেলে থাকবে। ওর সঙ্গে ওর বোন থাকবে।”

“আমার কোন অসুবিধে নেই”, আমি বললাম, “সত্যি বলতে কি, আমি রেলেই যাব ভাবছিলাম। কারণ কলম্বো যাওয়া পর্যন্ত বাকি সময়টা তো সমুদ্রেই থাকব। আমারও মনে হয়, তোমার একটা চেঞ্জ দরকার। আর আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে এক্ষুণি ঘুমোতে যেতাম।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব। আজ সারারাত ঘুমোব। জান তো-” তার চোখের দৃষ্টি আবার সেই রকম ঘোলাটে হয়ে এল, “গত বেশ কয়েকটা রাত ঘুমোতে পারিনি। একটু ঝামেলা

ছিলাম থিয়োললজ - কী বলে- থিয়োললজিক্যাল- দুত্তোর, " বেশ চেষ্টা করে বলল সে, "ভগবানের চিন্তায়। ভাবছিলাম, ইশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করলেন, কেন তিনি আমাদের মাথা ঝিমঝিম করান, কেন আমাদের পিঠে ব্যথা দেন। আজ রাতটা বোধহয় ভাল থাকব, " চেয়ারের পাশটা ধরে সে কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াল।

"শোন ভ্যানসিটার্ট, " আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে বললাম, "আমি বরং এখানে যাহোক করে তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার শরীর ঠিক নেই। তোমার নেশা হয়ে গেছে। "

"নেশা! " সে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, নেশা। তোমার কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গেছে দেখছো না?"

"শোন অ্যাটকিনসন, গত দু'দিন ধরে আমি একটি ফোঁটাও খাইনি। এটা নেশার ব্যাপার নয়। এটা যে কী কে জানে! তোমার যদিও মনে হচ্ছে এটা নেশা। " সে আমার হাত ধরে তার কপালে ছুঁইয়ে দিল।

"আরিব্বাস! " আমি বলে উঠলাম।

হাত ছুঁইয়ে মনে হল তার চামড়া জুড়ে একটা মখমলের মত আস্তরণ পড়েছে, যাতে ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি দানা ভারতি। মসৃণ মনে হলেও আঙুল দিলে বোঝা যাচ্ছে এগুলো খসখসে।

"ও কিছু না, " আমার চমকানো মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ঘামাচি হয়েছে। বিচ্ছিরি ঘামাচি। "

"কক্ষনো এগুলো ঘামাচি নয়। "

"নিশ্চয় ঘামাচি। লন্ডনের এই দূষিত হাওয়াতেই এগুলো হয়েছে। কাছাকাছি এক সার্জেন আছে। তাকে একটু দেখিয়ে নিলে কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখন যাই। "

"না, তুমি যাবে না, " তাকে একটা চেয়ারে ঠেলে বসিয়ে দিয়ে বললাম, "এটা মজার ব্যাপার নয়। তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না। আগে একজন ডাক্তার তোমাকে দেখুক। এখন চুপ করে ওখানে বসে থাকো। "

মাথায় টুপিটা চাপিয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাছাকাছি এক ডাক্তার থাকেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখলাম ঘর ফাঁকা, ভ্যানসিটার্ট নেই। বেল বাজাতে বেয়ারা এসে বলল যে আমি বেরোন মাত্র ভদ্রলোক তাকে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে তাতে উঠে চলে গেছেন। ভদ্রলোক গাড়োয়ানকে ডকের দিকে চালাতে বলেছেন।

"ভদ্রলোককে কি অসুস্থ লাগছিল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অসুস্থ! "বেয়ারা হেসে ফেলল, "সারাক্ষণ বিকট চেঁচিয়ে গান করছিলেন, স্যার। "

যদিও বেয়ারার কাছ থেকে এত চমৎকার তথ্য পেয়েও আমি স্বস্তি পেলাম না, তবে আমার মনে হল ও সোজা ইস্টার্ন স্টারে গিয়ে পৌঁছেছে। জাহাজে একজন ডাক্তার থাকবেই। কাজেই এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তবে সারাক্ষণই আমার মনে হচ্ছিল ওর সাংঘাতিক তেষ্টার কথা, উত্তপ্ত হাতের কথা, ঘোলাটে চোখ, অসংলগ্ন কথাবার্তা আর ওর কপালের দানাগুলোর কথা। এসব ভাবতে ভাবতেই শুতে গেলাম।

পরদিন এগারোটা নাগাদ আমি ডকে গেলাম, কিন্তু ইস্টার্ন স্টার ততক্ষণে ছেড়ে দিয়ে প্রায় গ্রেভসেন্ড-এ পৌঁছে গেছে। ট্রেনে করে গ্রেভসেন্ড-এ গিয়েও তাকে ধরতে পারলাম না, শুধু দেখলাম জাহাজের মাস্তুলটা, আর চিমনি থেকে ছাড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তার মানে ফলমাউথে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার বন্ধুর আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। অফিসে ফিরে দেখলাম একটা টেলিগ্রাম এসেছে মিসেস ভ্যানসিটার্টের কাছ থেকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। পরের দিন সন্ধেয় আমি ফলমাউথের রয়্যাল হোটেলে গেলাম, যেখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ইস্টার্ন স্টারের জন্য। দশদিনের মধ্যেও ইস্টার্ন স্টারের কোন খবর পেলাম না।

সেই দশদিনের কথা আমি বোধহয় কখনো ভুলতে পারবো না। যেদিন ইস্টার্ন স্টার টেমস থেকে রওনা দেয়, সেই দিনই পুবদিক থেকে বয়ে আসে এক মারাত্মক ঝোড়ো হাওয়া এবং পরের এক সপ্তাহ ধরে তার শান্ত হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। দক্ষিণ উপকূলে এরকম ভয়ংকর ঝড়ের কথা এর আগে কখনো শোনা যায় নি। আমাদের হোটেলের জানালা থেকে ঝাপসা হয়ে দেখা যাচ্ছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের দল অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে তীরে ভেঙে পড়ছে। ঝড়ের দাপট এতটাই ছিল যে ঢেউ ফুলতে পর্যন্ত পারছিলনা। ঢেউয়ের চূড়াগুলো ভেঙে গিয়ে আছড়ে পড়ছিল তীরে। মেঘ, ঝড়, সমুদ্র সব যেন পশ্চিমের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল, আর সেখানে, এই ভয়াবহ আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন আমি অপেক্ষা করছিলাম, যেখানে আমার সঙ্গী এক ফ্যাকাশে, মৌন মহিলা যিনি আতঙ্কভরা চোখে, কপাল জানলার কাচে ঠেকিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ধূসর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, যদি কোন জাহাজের দেখা পাওয়া যায়। কিছু না বললেও তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে থাকত ভয়।

পাঁচ দিনের দিন আমি এক পুরোন নাবিককে ধরলাম। ভেবেছিলাম একটু আড়ালে কথা বলব, কিন্তু চোখে পড়ে গেল মিসেস ভ্যানসিটার্টের, আর যে মুহূর্তে চোখে পড়ে গেল, তিনি ব্যাকুল মুখে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"লন্ডন থেকে সাতদিন আগে বেরিয়েছে," বলল সেই নাবিক, "ঝড়ই তো হচ্ছে পাঁচদিন ধরে। এই ঝড়ে তো চ্যানেলে কিছু থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনটে জিনিস হতে পারে। ঐ জাহাজ হয়তো ফ্রান্সের দিকের কোন বন্দরে ভিড়ছে। সেটার সম্ভাবনাই বেশি।"

"কিন্তু- কিন্তু উনি তো জানেন, আমরা এখানে। তাহলে কি উনি টেলিগ্রাম করতেন না?"

“হ্যাঁ, তা করতেন। তাহলে, হয়তো উনি আসছেন, হয়তো উনি এখন মাডেইরার কাছাকাছি চলে এসেছেন। আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, ম্যাডাম।”

“আর না হলে? আপনি বললেন যে আরেকটা সম্ভাবনা আছে?”

“বলেছিলাম নাকি? না না ম্যাডাম, আমি এই দুটোর কথাই বলেছিলাম। হয়ত ওই জাহাজটা ঝড়ের ধাক্কায় আটলান্টিকের গভীরে চলে গেছে। তবে এখন আবহাওয়া ভাল হচ্ছে তো, আপনারা এইবারে খবর পেয়ে যাবেন। চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। কাল সকালেই দেখবেন আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে।”

বৃদ্ধ নাবিকের অনুমানই সত্যি হল। পরের দিনটা অনেক শান্ত আর ঝকঝকে, শুধু আকাশের পশ্চিমদিকে ছেঁড়া ছেঁড়া নিচু মেঘ আগের দিনগুলোর ভয়াবহ আবহাওয়ার কথা জানান দিচ্ছিল। কিন্তু জাহাজের কোন খবর এল না। আরো তিনটে দুঃসহ দিন কাটল। তিনদিনের দিন একটা লোক হোটেলে এল একটা চিঠি নিয়ে। সেটা দেখেই আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। চিঠিটা এসেছে ইস্টার্ন স্টারের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে। প্রথম লাইনটা পড়েই আমি চিঠিটা ঢেকে ফেলেছিলাম হাত দিয়ে, কিন্তু তার আগেই মিসেস ভ্যানসিটার্ট হাত দিয়ে আমার হাতটা সরিয়ে দিয়েছেন, “আমি দেখেছি,” তিনি বললেন শান্ত, ঠান্ডা গলায়, “আমি পুরোটাই পড়তে চাই।”

চিঠিতে লেখা আছে-

প্রিয় মহাশয়,

মিঃ ভ্যানসিটার্ট গুরুতর অসুস্থ। তাঁর গুটিবসন্ত হয়েছে। তিনি কিছু বলার মত অবস্থায় নেই। আমরা ঝড়ের ধাক্কায় অনেক দূর চলে এসেছি। সম্ভবত আমরা এখন ফানকাল থেকে তিনশো মাইল দূরে আছি। তাই মনে হচ্ছে যে আমাদের এখন ফানকালে গিয়ে মিঃ ভ্যানসিটার্টকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা সেখানে অপেক্ষা করব। আমি যতদূর জানি, ফলমাউথ থেকে একটা স্টিমার ছাড়বে কয়েকদিনের মধ্যেই ফানকালে আসার জন্য। এই চিঠিটা ফলমাউথের মারিয়ন স্টিমারে পাঠানো হচ্ছে, পত্রবাহককে পাঁচ পাউন্ড দিতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত
জে এন ও হাইনস

সদ্য স্কুল পাশ করা এত কমবয়সী মানুষ হয়েও স্নায়ুর ওপর আশ্চর্য দখল দেখলাম মহিলার। এতবড়ো একটা খবর পেয়েও তিনি শক্তসমর্থ পুরুষের মতই শান্ত রইলেন। কিচ্ছু বললেন না, শুধু ঠোঁটদুটো শক্ত করে চেপে মাথাটা ওড়নায় ঢেকে নিলেন।

“আমি বেরোচ্ছেন নাকি?” আমি বললাম।

“হ্যাঁ।”

“আমি যাব?”

“না, আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।”

“ডাক্তারের কাছে?”

“হ্যাঁ, গুটি বসন্তের রোগীকে কিভাবে পরিচর্যা করতে হয়, সেটা জানতে যাচ্ছি।”

সারা বিকেলটা তিনি ব্যস্ত রইলেন। পরদিন সকালে রোজ অফ শ্যারন নামের একটা ছোট পালতোলা জাহাজে চড়ে আমরা চললাম মাডেইরার দিকে। হাওয়া দিচ্ছিল ঘন্টায় দশ নট গতিতে। প্রথম পাঁচদিন জাহাজ চলল চমৎকার, এবং আমরা যখন দ্বীপের কাছাকাছি চলে গেছি তখন ষষ্ঠ দিনের মাথায় হাওয়া একদম পড়ে গেল এবং আমাদের যাত্রাও গেল বন্ধ হয়ে। আমরা আর এক ফুটও এগোতে পারলাম না।

সেদিন রাত দশটা নাগাদ, এমিলি ভ্যানসিটার্ট এবং আমি জাহাজের স্টারবোর্ডের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, আমাদের পেছনে আলো দিচ্ছিল পূর্ণচন্দ্র। ঝকঝকে জলে পড়েছিল জাহাজের ছায়া, সেইসঙ্গে আমাদের দুজনেরও।

ছায়ার ওপর থেকে চাঁদের আলো পড়ে একটা আলোকিত পথ তৈরি করেছিল দিগন্তরেখা পর্যন্ত, জলের হালকা ঢেউয়ে নাচছিল সেটা। আমরা চারদিকের নিস্তব্ধতা, হাওয়ার সম্ভাবনা, আকাশের অবস্থা এই সব নিয়ে কথা বলছিলাম, আচমকা জলে একটা শব্দ হল, যেন স্যামন মাছে ঘাই মেরেছে, আর তারপর, পরিষ্কার আলোয় আমরা দেখতে পেলাম, জন ভ্যানসিটার্ট ভেসে উঠল জলের ভেতর থেকে, তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

ওকে যত পরিষ্কারভাবে দেখলাম, এত পরিষ্কার আমি জীবনে কোন কিছু দেখিনি। ঝকঝকে চাঁদের আলো পড়েছিল ওর শরীরে। তখন ও আমাদের থেকে বড়োজোর দু তিন বৈঠার তফাতে রয়েছে। শেষ যেমন দেখেছিলাম, ওর মুখ তার থেকেও ফোলা, মুখের বিভিন্ন জায়গায় কালো কালো ছোপ, চোখে খোলা, মুখ হাঁ করা, যেন কোনকিছুতে চরম বিস্মিত হয়েছে। ঘাড়ের কাছে সাদা মত কী একটা, একটা হাত কানের কাছে তোলা, আরেকটা হাত বুকের ওপর রাখা। আমি দেখলাম সে জলের থেকে লাফিয়ে বাতাসে ভেসে উঠল, আর সেই চরম নৈঃশব্দের ভেতর জলের ঢেউ এসে আঘাত করল জাহাজের দেয়ালে। তারপর আবার সে ডুবে গেল জলের ভেতর, আর ঠিক সেই সময় আমি শুনলাম একটা কড়কড় আওয়াজ, যেন শীতের রাত্রে আগুনে শুকনো ডালপালা দেওয়া হয়েছে। আবার যখন আমি তাকালাম, তখন সে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু শান্ত সমুদ্রের ঐ জায়গাটাতে জলের আলোড়ন বুঝিয়ে দিচ্ছিল ওখানে সে এইমাত্র ছিল। আমি যে কতক্ষণ ওখানে ছিলাম, শিহরণ জাগানো শরীরে, একহাতে জাহাজের রেলিং ধরে, অন্যহাতে এক অচেতন মহিলাকে সামলে, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। লোকে বলে আমার নাকি আবেগ বা উত্তেজনা নেই, কিন্তু সেদিন আমার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। বেশ কয়েকবার ডেকে পা ঠুকে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে আমি ঠিক আছি না পাগল হয়ে গেছি। যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি, কম্পিত কলেবরে, তখন চেতনা ফিরে এল মহিলার, হাঁ করে দম নিচ্ছিলেন তিনি, তারপর দুহাতে রেলিং- এ

ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। চাঁদের আলোয় মনে হল, কয়েক মুহুর্তেই তাঁর বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

"আপনি ওকে দেখলেন?" অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি।

"কিছু একটা দেখলাম।"

"এটা ও! এটা জন ছিল! ও মরে গেছে!"

আমি নিচু স্বরে সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

"কোন সন্দেহ নেই। ও মারা গেছে! এখনই!" ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন তিনি, "মাডেইরার হাসপাতালে, আমি জানি। আমি এরকম ঘটনা অনেক পড়েছি। ও আমার কথা ভাবছিল। তাই ও আমায় দেখা দিল। ওঃ জন, জন! হায়, জন!"

আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। আমি তাঁকে তাঁর কেবিনে রেখে এলাম। ওঁর এখন একা থাকা দরকার। সেই রাত্তিরে পূর্বদিক থেকে একটা হালকা হাওয়া বইতে শুরু করল এবং পরদিন বিকেলের দিকে লস ডেসার্টোস দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে সূর্যাস্তের সময় ফানকালে নোঙর করলাম। ইস্টার্ন স্টার একটু দূরে ভেসে আছে, মাস্তুল থেকে উড়ছে কোয়ারান্টাইন পতাকা এবং জাতীয় পতাকা রয়েছে অর্ধনমিত।

"দেখছেন তো!" সঙ্গে সঙ্গেই বললেন মিসেস ভ্যানসিটার্ট। তাঁর চোখে এখন আর জল নেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কী হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি নিয়ে সেই রাত্রেই আমরা আমাদের জলযান ভেড়ালাম ইস্টার্ন স্টারের গায়ে। ক্যাপ্টেন হাইনস ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন দুঃখিত মুখে এবং তিনি যখন কথা হাতড়াচ্ছেন, তার আগেই মিসেস ভ্যানসিটার্ট মুখ খুললেন, "আমি জানি আমার স্বামী মারা গেছেন," তিনি বললেন, "তিনি গতকাল রাত দশটা নাগাদ হাসপাতালেই মারা গেছেন, তাই না?"

ক্যাপ্টেন অবাক, বিড়ম্বিত মুখে তাকালেন, "না, ম্যাডাম, তিনি মারা গেছেন আট দিন আগে, সমুদ্রে থাকতেই। আমরা ওখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করি- ইয়ে- সমুদ্রে ফেলে দিই। কারণ হাওয়া না থাকায় আমরা তখন আটকে গেছিলাম, কখন ডাঙায় আসব ঠিক ছিল না।"

এই হল জন ভ্যানসিটার্টের মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রধান ঘটনা এবং ওর স্ত্রী যেখানে ওকে দেখেছিলেন, তার অবস্থান ল্যাটিচিউড ৩৫ ডিগ্রি নর্থ এবং লঙ্গিচিউড ১৫ ডিগ্রি ওয়েস্ট। নানাভাবেই এ ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। সে ভৌতিক দৃষ্টান্ত হিসেবেই হোক বা একেবারে আধুনিক থিয়োরি অনুযায়ী টেলিপ্যাথিই হোক। তবে ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা বলতে পারি, আমরা জন ভ্যানসিটার্টের ভূত দেখিনি, বরং সেই রাত্রে স্বয়ং জন ভ্যানসিটার্টকেই চাঁদের আলোয় আটলান্টিকের অতল থেকে উঠে আসতে দেখেছিলাম। আমার বিশ্বাস, নিতান্ত ঘটনাচক্রেই- এমন ঘটনা আক্ষরিক অর্থেই কদাচিৎ ঘটে— আমাদের জাহাজ সেই বিশেষ জায়গায় গিয়ে নিবাত অবস্থায় পড়েছিল, যেখানে এক

সপ্তাহ আগেই জনকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। জাহাজের ডাক্তারের মুখে শুনেছি, তার সঙ্গে যে ওজন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, সেটা খুব শক্ত করে বাঁধা ছিল না। সে কারণেই, হয়তো পরের সাতদিনে সেটা আলগা হয়ে গেছিল। তার ফলে সেটা যথেষ্ট গতিবেগ পেয়েই জলের ওপরে ভেসে উঠেছিল। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা এটাই এবং যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন তারপর দেহটার কী হল, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব সেই কড়কড় আওয়াজ আর আলোড়নটার কথা। হাঙরেরা জলের ওপরতল থেকেই খাবার সংগ্রহ করে এবং সমুদ্রের ঐ অংশে প্রচুর হাঙর দেখা যায়।

[আর্থার কোনান ডয়েল রচিত “ডি প্রোফানডিস” অবলম্বনে।]

ইয়েডোর ওটোকোডেটের একটি গল্প

:

<u>গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট</u>

ষষ্ঠ পর্ব

সংহিতা

পূর্বপ্রকাশিতের পর

এক মুহূর্তের জন্য বানজায়েমন থতমত খেয়ে গেলেন।কিন্তু চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আরে! সানজা মশাই যে, তুমি আমার ওপর চটে আছ নিশ্চয়ই, কিন্তু যবে থেকে আমি মুরামাসা তলোয়ার চুরি করে ইয়েডো ছেড়ে পালিয়েছি, আমার মনে কোনো শান্তি নেই। সেই পাপের অনুশোচনায় ভুগে চলেছি, আমি তোমার প্রতিশোধে বাধা দেব না। যা ভালো বোঝো তুমি তাই কর আমার সাথে।কিংবা আমাকে মেরেই ফেল। এই বিবাদের অবসান হোক।"

"না, না", উত্তরে সানজা বললেন, "নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত মানুষকে মারাটা খুব খেলো কাজ আর বীরধর্মের অনুকূলও নয়। আমার প্রভু ভরসা করে আমাকে যে মুরামাসা তলোয়ারখানা রাখতে দিয়েছিলেন সেটা তুমি চুরি করায় আমার সম্মানহানি হয়েছে, আমি শেষ হয়ে গেছি। তলোয়ারটা আমাকে ফেরত দাও, আমি সেটা আবার প্রভুকে ফিরিয়ে দেব আর তুমিও প্রাণে বাঁচবে। আমি খামখা কোনো মানুষকে হত্যা করি না।"

"সানজা মশাই, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এই ক্ষমার জন্য। আমার কাছে এখনই অবশ্য তলোয়ারটা নেই। কিন্তু তুমি যদি ঐ চা- ঘরে একটু অপেক্ষা করো তো আমি তলোয়ারটা তোমার হাতে এনে দিতে পারি।"

বানজায়েমনের প্রস্তাবে সানজা রাজি হলেন আর দুজনে চা- ঘরে ঢুকলেন।সেখানে তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন বানজায়েমনের দুই শাগরেদ।কিন্তু নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে বানজায়েমন বেশ হীনমন্য হয়ে পড়েছিলেন। তাই ভান করতে লাগলেন যেন তিনি সানজাকে চেনেনই না।

আর তাই শাগরেদ দুজনের সাথে সানজার পরিচয় করালেন এই বলে, “আসুন, সামুরাই মশাই এইখানে। আমাদের সাথে আপনার যে এই দেখা হলো, সেই উপলক্ষে আপনাকে এক পাত্র সুরা নিবেদন করি।”

বানজায়েমন আর তার দুই শাগরেদ প্রচুর সমাদরে বার বার এত সুরাপাত্র এগিয়ে দিলেন যে শিগগির সুরার ঘোর চড়ে গেল সানজার মাথায়, আর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাই দেখে শাগরেদ দুজন গেলেন বাইরে থেকে ঘুরে আসতে। ঘুমন্ত সানজার সাথে রইলেন একলা বানজায়েমন, আর বুনতে লাগলেন নতুন ছক। হঠাৎ করেই তার মাথায় একটা ফন্দি এলো। তিনি নিঃশব্দে সানজার তলোয়ারটা তুলে নিয়ে নীচে চললেন। সানজা ঘরটাতে ঢুকে তলোয়ারটা রেখে দিয়েছিলেন একপাশে। নিচে এসে পিছনের উঠোনে গেলেন। আর সেখানে পাথরের ঘা মেরে মেরে ভোঁতা করে দিলেন তলোয়ারটার ফলা। তারপর আবার সেটা পুরে দিলেন খাপের মধ্যে। তারপর সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিলেন সানজাকে একটুও বিরক্ত না করে। আর সানজাও কোনো ষড়যন্ত্রের আভাসমাত্র না পেয়ে নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে রইলেন। অবশেষে জেগে উঠে তিনি যারপরনাই লজ্জা পেলেন সুরার নেশায় কাবু হয়ে পড়ার জন্য। তবু সে সব কাটিয়ে বানজায়েমনকে বললেন, “এসো হে বানজায়েমন, আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি। এবার মুরামাসা তলোয়ারখানা দিয়ে দাও, আর যেতে দাও আমাকে।”

“নিশ্চয়ই,” বিদ্রুপে বিষিয়ে উঠল বানজায়েমনের স্বর,“আমি তো তলোয়ারটা তোমাকে দেব বলেই বসে আছি। কিন্তু দুঃখের কথা হলো এই যে আমার চরম দারিদ্র্যের দিনে তলোয়ারটা আমি বাঁধা দিয়েছিলাম। ছাড়াতে গেলে রুপো লাগবে একশ ছটাক মতো। তোমার কাছে যদি সমমূল্যের টাকা থাকে তো সেটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে তোমার তলোয়ার ফেরত দিয়ে দিচ্ছি।”

“তবে রে হতচ্ছাড়া!” চিৎকার করে উঠলেন সানজা, বানজায়েমন তাঁকে বোকা বানাতে চাইছে দেখে বলে ফেললেন, “তোর জঘন্য ছলের কিছু দেখতে কী আমার আর বাকি আছে? যাই হোক তলোয়ার না পেলে আমার প্রভুর পায়ে আমি তোর মুণ্ডু অর্পণ করব। আয় তবে - ” অধৈর্য পদক্ষেপে এগোতে এগোতে তিনি বললেন, “বাঁচা নিজেকে।”

“সর্বান্তঃকরণে তাই চাই। কিন্তু চা- ঘরে নয়। চলো, ঢিপির ওপর যাই। আর লড়ে দেখি।”

তাই তাঁরা গেলেন ঢিপির ওপর। তলোয়ার বার করে দুজনে শুরু করলেন এক ভয়ানক লড়াই। ক্রমে ক্রমে খবর ছড়িয়ে গেল ইয়োসিওয়ারার পথে পথে যে ঢিবির ওপর এক দ্বৈরথ

চলছে। তাই দেখতে অনেক লোকের ভিড় জমে গেল। সেই ভিড়ে ছিল টোকেন গোম্বেই আর সিরোবেই, বানজায়েমনের দুই সঙ্গী। তাঁরা যখন বুঝলেন যে যোদ্ধা দুজন আর কেউ নন, তাঁদের বন্ধু বানজায়েমন আর সেই অপরিচিত সামুরাই তাঁরা চেষ্টা করলেন যাতে যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে দ্বৈরথ থামাতে পারেন। কিন্তু ভিড় ঠেলে যোদ্ধাদের কাছাকাছি পৌঁছোতেই পারলেন না তাঁরা। তাঁদের দর্শক হয়েই থাকতে হলো। পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড রাগে যোদ্ধা দুজনেই হিংস্র হয়ে লড়ছিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে সানজা বহুগুণ বেশি দক্ষ তলোয়ারবাজ হওয়ায় একবার, দুবার, বহুবার বানজায়েমনকে এমন আঘাত করলেন যে তার চোটে বানজায়েমন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও ঝরল না। তাতে অবাক হয়ে নিজের সমস্ত শক্তি আর কৌশল উজাড় করে দিয়ে সানজা এমন লড়াই লড়লেন যে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকরা করতালিতে ফেটে পড়ল। আবার বানজায়েমন যদিও জানতেন যে তাঁর প্রতিপক্ষের তলোয়ার ভোঁতা, তবুও সানজার বীরত্বে ভয় পেয়ে তিনি বার বার হোঁচট খেয়ে উল্টে উল্টে পড়তে লাগলেন।

বীর সৈনিক সানজা অবজ্ঞার সাথে ধরাশায়ী প্রতিপক্ষকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকলেন, প্রত্যেক পতনের পর তাকে উত্থানের সুযোগ দিলেন, তারপর আবার লড়াই শুরু করলেন।সানজা বরাবরই এগিয়ে থাকছিলেন লড়াইতে। কিন্তু এমন সময়ও এলো যখন তিনি পিছলে পড়ে গেলেন। আর সেই সুযোগে বানজায়েমন নিজে যে ক্ষমা পেয়েছেন, সে সবের কথা ভুলে,রক্তপিপাসু দুই চোখে জয়ের ঝলক নিয়ে,পড়ে থাকা সানজার দিকে তেড়ে গেলেন আর তাঁর শরীরের একপাশে বিঁধিয়ে দিলেন তলোয়ার। অচৈতন্যপ্রায় সানজা নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাতটাও তুলতে পারলেন না। তাঁর লালসাতাড়িত প্রতিপক্ষ আবারও তাঁকে আঘাত করতে এগিয়ে গেলেন যদিও তখন চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকরা বানজায়েমনকে চিৎকার করে ধিক্কার জানাচ্ছিলেন তাঁর শঠতার জন্য।

তারই মধ্যে থেকে গলা তুলে গোম্বেই আর সিরোবেই বলে উঠলেন, “থামো কাপুরুষ! ভুলে গেলে এক মূহুর্তের মধ্যে কেমন করে তোমার প্রাণ বারবার রক্ষা পেয়েছে এই অসম লড়াইতে? সামুরাই- এর অধম, এতক্ষণ আমাদের বন্ধুতা দেখেছ। এবার দেখ এই মহাবীরের প্রতিহিংসা কেমন করে চরিতার্থ করি।”

আর অমনি তাঁরা ছোরা বাগিয়ে এগিয়ে গেলেন বানজায়েমনের দিকে। দর্শকরাও পিছু হঠে পথ করে দিল তাঁদের। তাঁদের কথা শুনে আর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে বানজায়েমন সন্ত্রস্ত হয়ে পালালেন, ভুলে গেলেন সানজার ওপর মরণাঘাত হানতে।

দুজনে চেষ্টা করলেন বানজায়েমনকে তাড়া করে ধরতে। কিন্তু বানজায়েমন পালাতে ওস্তাদ। তাই তাঁরা ফিরে এলেন আহত সানজার কাছে। তাঁদের সেবায় সানজা যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তখন তাঁরা সানজাকে সান্ত্বনা দিলেন আর জানতে চাইলেন কোন প্রদেশে তাঁর বাস যাতে তাঁরা সানজার বন্ধুদের জানাতে পারেন যে কিভাবে সানজা পরাস্ত হয়েছেন। যন্ত্রণায় কাতর, রক্তপাতে দুর্বল সানজা ক্ষীণস্বরে তাঁর নাম আর তলোয়ার চুরির কথা এবং তার থেকে তাঁর সাথে বানজায়েমনের শত্রুতার কথা বললেন গোম্বেই আর সিরোবেইকে।

“কিন্তু”, বললেন সানজা, “যখন বানজায়েমনের সাথে লড়ছিলাম, তখন আমি বেশ কয়েকবার ওকে ঘা মেরেছি। তাতে কোনো ফল হল না, কেন বলুন তো?”

তখন টোকেন আর সিরোবেই সানজার তলোয়ারটা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। সেটা তাঁর পাশেই পড়েছিল। ওটার ধারটা ভাঙা হয়েছে যে তা তাঁরা দেখতে পেলেন। তাঁরা আগের থেকেও বেশি খেপে গেলেন বানজায়েমনের শঠতার ওপর। সানজার প্রতি তাঁদের দয়া আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু তাঁদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, ঘা থেকে ক্রমাগত রক্ত পড়তে থাকায় সানজা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। শেষে একসময় তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তাই তাঁরা নিকটবর্তী এক মন্দিরে যথামর্যাদায় সানজাকে গোর দিলেন। তারপর পত্র মারফত সানজার স্ত্রী ও পুত্রকে জানালেন সানজার মৃত্যু সংবাদ। সঙ্গেএও জানালেন যে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সানজার স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে উৎকন্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে সানজা ফিরবেন। পত্র পেয়ে, সেটা পড়ে তিনি আর তাঁর পুত্র কোসানজা গভীর দুঃখে শোকযাপন করলেন। কোসানজার তখন চোদ্দ বছর বয়স। তিনি তাঁর মাকে বললেন, "এবার শান্ত হও, মা। আমি যাব ইয়েডোতে। খুঁজে বের করব বাবার হত্যাকারী বানজায়েমনকে। আর নিশ্চয়ই শোধ নেব পিতৃহত্যার। সুতরাং এই যাত্রার জন্য যে ভাবে তৈরি হতে হবে তার জোগাড় করি চল।"

তাঁরা যখন প্রতিহিংসার পরিকল্পনা করছিলেন, তখন তাঁদের বাড়িতে হাজির হলেন উমানোসুকে, উমানোজোর পুত্র, যে উমানোজোকে সানজা হত্যা করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন সানজার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। কিন্তু মনে কোনো শত্রুতা নিয়ে তিনি আসেন নি। তিনি মনে করেছিলেন যে সানজা তাঁর পিতৃহন্তা হলেও সানজার বিধবা বা অনাথপুত্রের কোনো দোষ নেই। তিনি প্রিয়জন বিয়োগে কাতর মা- পুত্রের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করলেন না। বরং উল্টে তাঁর মনে হতে লাগল যে বানজায়েমন তাঁদের দুজনেরই শত্রু। বানজায়রমনের জন্যই গন্ডগোল। আর তার জন্যই উমানোসুকেও পিতৃহন্তার প্রতিহিংসা পূরণে অক্ষম। এই সব ভাবতেভাবতেই তিনি বললেন, "কোসানজা মশাই, আমি শুনলাম ইয়েডোতে আপনার বাবাকে নাকি বানজায়েমন নৃশংসভাবে খুন করেছে। আমি জানি যোদ্ধার যোগ্য সন্তান হিসেবে আপনি এই হত্যার শোধ নেবেন, যদি সে বাবদে আপনি এই অক্ষমের সাহায্য স্বীকার করেন, আমি আপনার সহযোগী হতে পারি আর আপনাকে আমার ক্ষমতায় যতটা কুলোবে ততটা সাহায্য করতে পারি। বানজায়েমন আমারও শত্রু, যেমন সে আপনার শত্রু।"

"না উমানোসুকে মশাই, যদিও আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তবুও আমি আপনার এই মহানুভবতা গ্রহণ করতে পারব না। আমার বাবা সানজাও আপনার বাবাকে খুন করেছিলেন। কিন্তু আপনি এইভাবে সেই দুর্ভাগ্যকে কাটিয়ে উঠে আমার সাহায্যে এসেছেন তাই অনেক। আমি ভাবতেই পারছি না যে আপনি আমার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করবেন।"

"আমার কথা শোনো", হাসি মুখে বললেন উমানোসুকে, "তাহলে বুঝবে কেন আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি। গত বছরে সমুদ্রের ধারে আমার বাবার রক্তাক্ত মৃতদেহ ফেলে রেখে যাওয়ার সময় তোমার বাবা আমার সাথে চুক্তি করেছিলেন যে চুরি যাওয়া তলোয়ারটা পাওয়া গেলেই তিনি আমাকে আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চরিতার্থ করার সুযোগ দেবেন। ইয়োসিওয়ারার ঢিবিতে বানজায়েমন তাঁকে খুন করে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। এখন বানজায়েমন ছাড়া আর কার ওপর আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব, তার শঠতাই তো এর কারণ? সুতরাং তোমার সাথে ইয়েডো যাওয়ার ব্যাপারে আমি স্থির প্রতিজ্ঞ আর আমাদের দুজনেরই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদের দেশে ফিরছি না।"

চলবে

নেসবিটের ইংরিজি অনুবাদ থেকে
ভাষান্তরঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

অনেক, অনেক দূরে, সমুদ্র পেরিয়ে, আগুন পাহাড়ের গর্ত পেরিয়ে, নির্জন সব দেশ পেরিয়ে ছিল ভারী সুন্দর এক মাঠ। তার মাঝখানে ছিল এক চমৎকার শহর। সেই শহরে তাঁর রানিকে নিয়ে রাজত্ব করতেন জার উমনায়া গোলোভা। সেখানে অনেক দিন রাজত্ব করবার পর তাঁদের এক টুকটুকে মেয়ে হল। তার নাম রাখা হল নিওসিয়েনা। পরের বছর তাদের আরেকটা মেয়ে জন্মাল। তার নাম রাখা হল বেতসিয়েনা। আনন্দে রাজ্যজুড়ে উৎসব হল, খানাপিনা করে সবার প্রাণ জুড়োল।

তারপর তো জারের মাথায় বেজায় চিন্তা , মেয়েদের খাইয়ে, পড়িয়ে কীভাবে মানুষ করা যায়। মেয়েরা সোনার চামচে খায়, রাজহাঁসের পালকের বিছানায় ঘুমোয়, আর দাসীরা তাদের হাওয়া করে ঘুমের সময় , গায়ে যাতে মশামাছি না বসতে পায় একখানাও। জারের কড়া হুকুম, রোদের কড়া আলো যেন মেয়েদের গায়ে না লাগে। শীতের হিমকুয়াশা যেন তাদের ছুঁতে না পায়, ঝোড়ো হাওয়ার দল যেন তাদের খবর জানতে না পারে। সেইসব দেখভাল করবার জন্য পণ্ডিতদের কথা মেনে জার রাখলেন সাতাত্তরজন দাসী আর সাতাত্তরজন গার্জেন।

এমনিভাবে মহা আদরযত্নে মেয়েরা তো বড়ো হয়ে উঠছে। দেশে দেশে তাদের রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। দূরদূরান্ত থেকে তাদের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে জারের সভায় রাজপুত্রদের

ভিড় জমে রোজ। জার কিন্তু সব সম্বন্ধই ফিরিয়ে দেন। মনে মনে ভাবেন সময় এলে ঠিক বরটি আপনি খুঁজে পাওয়া যাবে।

এমনি একদিন রাজা বসে বসে মেয়েদের নিয়ে ভাবছেন, তখন বাইরে ভারী শোরগোল উঠল। উঠোন জুড়ে লোকজনের ছোটাছুটির শব্দ ভেসে আসছিল। দাসীরা কান্নাকাটি জুড়েছে। গার্জেনদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে কান পাতা দায়। সেইসব শুনে জার তো এক ছুটে বাইরে বের হয়ে এসেছেন। অমনি সাতাত্তর দাসী আর সাতাত্তর গার্জেন এসে জারের পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলে, "সব আমাদের দোষ। দুই রাজকন্যাকে একটা ঘূর্ণিঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল আমরা কিচ্ছু করতে পারলাম না।"

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল রাজকন্যারা নাকি বাগানে ফুল তুলতে গেছিলেন। এমনিসময় হঠাৎ, কোত্থেকে কে জানে, একটা কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল, আর দাসী আর গার্জেনদের চোখে মুখে একগাদা জল ছিটিয়ে দিল। চোখটোখ মুছে তারা দেখে রাজকন্যাদের চিহ্ন নেই বাগানে।

শুনে জার তো রেগে আগুন। বলেন, "তোদের মরাই ভালো। কী কাণ্ড! সাতাত্তরটা দাসী আর সাতাত্তরটা গার্জেন মিলে দুটো রাজকন্যার দেখভালও করতে পারিস না। এখন জেলে গিয়ে পচে মর তোরা।"

তারপর তো জারের ভারী দুঃখ। তার প্রাসাদে আর গানবাজনা খানাপিনা হয় না। কেবল দুঃখ আর দুঃখ। কিন্তু দুঃখও বা আর কতদ্দিন থাকে! আস্তে আস্তে জারের চোখের জল শুকোল, প্রাসাদে ফের আলো জ্বলল, আর তারপর অনেকদিন কেটে যেতে জারের ফের একটা সুন্দর ছেলে হল। জারের মুখে ফের হাসি ফুটল এতদিনে। ছেলের নাম সে রাখল ইভান আর তার জন্য দাসদাসী, ডাক্তার, মাস্টার, পাহারাদার রেখে দিল অনেকজন।

ইভান তো বড়ো হয়। রূপ ফেটে পড়ে। গুণের কথা ছড়ায় সাত সমুদ্র পাড় হয়ে। বুদ্ধির জোরে কেউ তার ধারেকাছে আসে না। শুধু জারের একটাই দুঃখ। ইভান বীর ছেলে নয় মোটেই। তলোয়ার নিয়ে খেলতে তার ভালো লাগে না। যুদ্ধে যেতে ভারী অনিচ্ছে। সে ভালোবাসে শুধু বীণা বাজাতে। সে সুর যেন এ পৃথিবীর নয়। বীণার তারে হাত ছোঁয়ালেই সাত সুর জেগে ওঠে তার থেকে সাতরঙা রামধনুর মতন।

শেষমেষ একদিন জার ছেলেকে ডেকে বললেন, "তুমি ভালো ছেলে। বুদ্ধিমান ছেলে। তাতে আমি বেজায় খুশি। কিন্তু বাবা, রাজার ছেলে তুমি। একটু যুদ্ধটুদ্ধ না করলে কি তোমায় সাজে? আমি বুড়ো হচ্ছি। চারপাশে অনেক শত্রু। তারা যদি হানা দেয় তাহলে রাজ্যবাঁচাবে কে? আমায় আর তোমার মাকে সদি তারা ধরে নিয়ে যায় শেকলে বেঁধে, কেমন লাগবে তোমার?"

শুনে ইভান বলল, "বুদ্ধি থাকলে তলোয়ারে কাজ কী বাবা? আমি বুদ্ধি দিয়েই তাদের জয় করে ফেলব। তলোয়ার ছুঁতেই হবে না!"

"তাই কী হয়?" বললেন জার।

"চাইলে পরীক্ষা নিয়ে দেখ," ইভান জবাব দিল, "শুনেছি আমার দুই দিদিকে নাকি এক ঘূর্ণিঝড় এসে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। দেশে যত বড়ো বড়ো বীর আছে তাদের ডেকে এনে

বলো দেখি তারা তলোয়ারের জোরে খুঁজে আনুক আমার দিদিদের। যদি কেউ তা পারে তাহলে তাকে তুমি রাজ্য দিও। আমি তার চাকর হয়ে থাকব। আর যদি কেউ তা না পারে, তাহলে তখন আমি শুধু বুদ্ধি দিয়ে তাদের খুঁজে এনে দেব দেখে নিও।"

ছেলের কথা শুনে জার তো ভারী খুশি। দেশের সব বীরদের ডেকে সে বলল, "আমার হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের কে খুঁজে আনতে পারে? যে পারবে সে পাবে অর্ধেক রাজত্ব আর একজন রাজকন্যা।"

শুনে বীরেরা সবাই এ ওর পেছনে লুকোল গিয়ে। দুশমন ঝড় রাজকন্যাদের চুরি করে নিয়ে গেছে। তার সন্ধান তারা কোথায় পাবে? তখন ইভান বলল, "বাবা, এই ছোট্টো কাজটুকুও করে দেখাবার সাহস যদি কারো না থাকে তাহলে, আমাকেই সেটা করতে দাও।

"বেঁচে থাকো বাবা," জার খুশি হয়ে বলল, "কত সোনাদানা, হিরেমাণিক লাগবে রাজকোষ থেকে নিয়ে যাও। যত সৈন্যসামন্ত চাই তা- ও পাবে।"

"ওসব কিচ্ছু চাইনা বাবা," মিষ্টি হেসে ইভান জবাব দিল, "যা করবার আমার এই বীণাটাই করে দেখাবে দেখো। তিনটে বছর আমার ফেরবার জন্য অপেক্ষা কোরো তুমি। তার পরেও আমি না ফিরলে আর কাউকে ডেকে যুবরাজ করে নিও।"

তারপর তো বাপমায়ের আশীর্বাদ, রাজার চিঠি আর বীণাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে পথে বের হল ইভান। পথ চলে সে, আর বীণায় সুর তোলে। সারাদিন পথ চলে সে, আর রাত্রে তারাভরা আকাশের নীচে ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে।

এমনি করে চলতে চলতে অবশেষে একদিন সে এল এক গভীর বনের কাছে। সেখানে ভীষণ তোলপাড়ের শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে। সে ভারী ভয়ের ব্যাপার। ইভানের বুকটা একটু কেঁপে উঠল প্রথমে। কিন্তু তার পরেই সে সাহসে বুক বাঁধল, "মানুষ একবারের বেশি দুবার তো মরে না। এই ভেবে সে হাঁটা দিল বনের ভেতর। ঢুকে দেখে সেখানে দুটো দৈত্যের মধ্যে বেজায় মারপিট চলছে। একজনের হাতে একটা গোটা ওকগাছ আর অন্যজন একটা শেকরবাকরশুদ্ধু পাইনগাছ হাতে নিয়ে লড়াই করছে।

ইভান আস্তে আস্তে তাদের কাছে গিয়ে বীণাটা বের করে একটা নাচের সুর ধরল তাতে। দৈত্যদুটো সেই শুনে জোয় নাচ জুড়ল। সে কী নাচ! নাচের দাপে গটা বন থরথর করে কাঁপতে লেগেছে তখন।

এমনিভাবে, নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে দৈত্যদুটো যখন ঝিমিয়ে পড়েছে তখন ইভান তাদের কাছে এগিয়ে গেল। বলল, "এত ঝগড়া করছিলে কেন তোমরা? হয়েছেটা কী? তোমরা হলে গিয়ে বাপু বনরাক্ষস। বোকার মতন এমন মারপিট করা কি তোমাদের সাজে নাকি?"

"কেন আমরা লড়াই করব না শুনি?" একটা দৈত্য জবাব দিল, "সব শুনে তুমিই বিচার কর বাপু। বনের মধ্যে দুজন মিলে ক'টা জিনিস পেলাম। আমি বললাম এগুলো আমার। ও- ও বলল এগুলো ওর। তারপর ঠিকঠাক ভাগ করতে না পেরে মারপিট করছি। যে জিতবে জিনিসটা তার হবে।"

"হুম। তা জিনিসগুলো কী সেইটে জানতে পারি কি?"

শুনে তারা জিনিসগুলো বের করে দেখাল। একটা টেবিলক্লথ, একজোড়া বুটোজুতো আর একটা টুপি। "হুঁ হুঁ। এরা কিন্তু সাধারণ জিনিস নয়," এক দৈত্য বলল, "টেবিলক্লথটা মাটিতে পেতে যা খেতে চাইবে তক্ষুণি তা এসে হাজির হবে সামনে। বুটজোড়া পায়ে পরলে হাঁটতে পারবে ঘন্টায় একশো মাইল, আর তেমনবিপদে পড়লে টুক করে এই টুপিটা পরে নিলেই হল! ব্যস, তুমি চোখের পলকে হাওয়া!"

"ধুস। এই নিয়ে কেউ ঝগড়া করে?" ইভান বলল, "আমি যদি জিনিসগুলো কে পাবে তা ঠিকঠাক করে দিতে পারি তাহলে তোমরা কী করবে?"

"আমরা রাজি, আমরা রাজি," দুজন মিলে একসঙ্গে জবাব দিল।

"বেশ। তাহলে শোন। ওই যে দূরের পাহাড়টা দেখছ, এক ছুটে ওইটে অবধি যেতে হবে। যে আগে যাবে সে সবগুলো জিনিস পাবে। কী রাজি?"

"একেই বলে বুদ্ধি, " দুই দৈত্য একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরা রাজি। জিনিসগুলো তুমি ধরে দাঁড়াও আমরা ছুটটা দিয়ে আসি।" এই বলে ইভানের হাতে জিনিসগুলো দিয়ে যেই না তারা ছুট দিয়েছে, ইভানও অমনি টেবিলক্লথটা বগলদাবা করে মাথায় অদৃশ্য টুপি চাপিয়ে পায়ে জুতোজোড়া পরে নিয়ে দে ছুট—দে ছুট! দৈত্যরা দৌড় শেষ করে ফিরে সে দেখে সব ভোঁ ভাঁ।

ইভান আবার যায় যায় যায়—যেতে যেতে সামনে এল নতুন মুশকিল। রাস্তাটা সেখানে তিন ভাগ হয়ে তিনদিকে গেছে আর তেমাথায় দাঁড়িয়ে আছে মুরগির ঠ্যাঙের ওপরে একটা কুঁড়েঘর। ইভান তার কাছে গিয়ে বলল, "কুঁড়েঘর, কুঁড়েঘর, বনের দিকে পেছন ঘোড়, আমার দিকে দরজা কর।"

অমনি কুঁড়েঘর বনবন করে ঘুরে তার সামনে দরজা খুলে ধরল। ইভান ঘরে ঢুকে দেখে সেখানে বাবা ইয়াগা নামের ডাইনিটা বসে আছে। তাকে দেখে সে বলল, "আজ অবধি এইখানে কোন মানুষ আসতে পেল না। কোত্থেকে এলি রে তুই? কেন এলি?"

"ধুস্। কী যে বল ঠাকুমা তুমি। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই দেখছি! আগে তো পেট পুরে খাওয়াও আমায়, তারপর যা জানবার আছে সব জিজ্ঞেস কোরো'খন।"

শুনে বাবা ইয়াগা তাড়াতাড়ি উঠে উনুন ধরিয়ে মাংসের সুরুয়া রেঁধে দিল ইভানকে। তারপর তার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বলল, " কোথায় যাচ্ছিস তুই খোকন?"

"চলেছি আমার নিওসিয়েনা আর বেতসিয়েনা বোনদুটোকে খুঁজতে। কোন পথে যাই বলোতো ঠাকুমা? কোথায় গেলে তাদের খুঁজে পাবো তুমি জানো?"

"হুম। নিওসিয়েনার বাড়ির ঠিকানা আমার জানা আছে, বুঝলি? বুড়ো বনরাক্ষসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। মাঝখানের রাস্তাটা ধরে এগোলেই তার প্রাসাদ দেখতে পাবি। তবে কিনা, রাস্তাটা লম্বা। বেজায় শক্ত, আর যদি পথ পেরিয়ে বোনের বাড়ি গিয়ে পৌঁছোসও, তাহলে বুড়ো রাক্ষস বেরিয়ে এসে তোকে টুপ করে গিলে ফেলবে এই বলে রাখলাম।"

"গিলে ফেলবে বুঝি? তাহলে গলায় আটকে দম বন্ধ হবে তার দেখো ঠাকমা। আমার নাম ইভান ভগবান আমাকে রাক্ষসের খাবার হবার জন্যে দুনিয়ায় পাঠাননি। তোমার খাবারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আমি যাই,বুড়ো রাক্ষসটার খবর নিই গিয়ে।"

এই বলে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে মাঝের পথে পা ঠেকাল। অমনি জুতোজোড়া তাকে নিয়ে শোঁ করে পথ পেরিয়ে একেবারে বনরাক্ষসের প্রাসাদের সামনে এসে হাজির। আর সদর দরজার মাথায় একটা খুদে রাক্ষস বসেছিল। ইভানকে আসতে দেখে সে ঠোঁট উলটে বলে, "ঢোকা বারণ।"

"আরে ভাই দরজাটা খুলে দে না, ভালো খাবার দেব," ইভান জবাব দিল।

খুদে রাক্ষস অমনি হাত পাতল। কিন্তু খাবার খেয়েও সে দরজার তালা খোলে না। ইভান তখন ভাবল, "পাঁচিল টপকে ভেতরে যাই।" এই ভেবে সে যেই না তড়বড়িয়ে পাঁচিলের মাথায় গিয়ে উঠেছে অমনি সারা প্রাসাদ জুড়ে ঢং ঢং করে বেজে উঠেছে হাজারো ঘন্টা।

শব্দ শুনে প্রাসাদের বারান্দায় বের হয়ে এল তার দিদি নিওসিয়েনা। তাকে দেখে বলল, "তুই কি আমার ভাই ইভান?"

ইভান লাফ দিয়ে নেমে বারান্দায় গিয়ে তার দিদিকে জড়িয়ে ধরল।

"এবার তোকে কোথায় লুকোই বল দেখি ভাই? এক্ষুনি তো তোর রাক্ষস জামাইবাবু এসে পড়বে!" খানিক বাদে নিওসিয়েনা বলল।

"ধুস। আমায় আবার লুকোবি কোথা?" এই বলে ইভান যেই না হাসতে লেগেছে অমনি বাইরে থেকে বেজায় ঝড়ের শব্দ উঠল, তারপর পায়ের দাপে প্রাসাদ কাঁপিয়ে এসে হাজির হল বনরাক্ষস। ইভান অমনিটুক করে মাথায় টুপি চাপিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাক্ষস নিওসিয়েনার সামনে এসে বাজপড়ার মত গলায় বলল, "পাঁচিল টপকে কে এসেছে রে? সে কোথায় লুকোল?"

"কে আবার আসবে?" নিওসিয়েনা মাথা নেড়ে বলল, "বোধ হয় কোনো চড়ুইটড়ুই বসেছিল পাঁচিলের মাথায়!"

"চড়ুই! উঁহু। কেমন যেন মানুষ মানুষ গন্ধ পাই!"

"উফ্ সারা দুনিয়াকে জ্বালিয়ে বেড়াও, এখন আমাকেও জ্বালাতে লেগেছ দেখছি," নিওসিয়েনা রাগরাগ গলায় বলল।

"আহা রেগে যেও না রাজকন্যা। আমার একটু খিদে পেয়েছে কিনা, তাই পাঁচিল টপকে যে ঢুকেছে তাকে খুঁজছি। পেলে মুখে দিয়ে একটু জল খাব।"

অমনি ইভান্তার অদৃশ্য টুপি খুলে রাক্ষসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, "দেখো দেখি, আমি কেমন রোগাভোগা একটা ছেলে! আমায় খেয়ে পেট ভরবে নাকি তোমার? তার চাইতে এস তোমায় এমন খাওয়া খাওয়াব যে জীবনে কখনো তেমনটা খাওনি তুমি।"

এই বলে ইভান সেই টাবিল ক্লথটা বের করে এনে পেতে দিয়েছে ঘরের মেঝেয়। অমনি বড়ো বড়ো খাবারের থালা নিয়ে বারো বারো চব্বিশটা দাসদাসী এসে হাজির। খেতে খেতে

বনরাক্ষস শেষমেষ শুয়েই পড়ল একেবারে। আর তার নড়ার শক্তি নেই শরীরে। খানিক বাদেই মেঘের মত শব্দ উঠল তার নাকে।

“এবারে আমি চলি রে দিদি,” ইভান বলল, “মেজদিদি কোথায় আছে তুই কি জানিস?”

“জানি বইকি,” নিওসিয়েনা জবাব দিল, “সমুদ্রের মাঝখানে বিরাট এক ঘূর্ণি আছে। তার মধ্যে সে তার বর সাগর রাক্ষসের সঙ্গে থাকে। তবে সে অনেক দূরের, অনেক কঠিন পথ। যদি কখনো পৌঁছোতেও পারিস সেখানে তাহলে তোর জামাইবাবু তক্ষুনি তোকে টুপ করে মুখে পুরে দেবে।”

“গিলে ফেলবে বুঝি? তাহলে গলায় আটকে দম বন্ধ হবে তার দেখিস বড়দি। আমার নাম ইভান। ভগবান আমাকে রাক্ষসের খাবার হবার জন্যে দুনিয়ায় পাঠাননি। যাই, এবারে মেজদিদির খবর নিই গিয়ে।”

লম্বা লম্বা পায়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে ইভান দেখল সেইখানে এক জাহাজ পাল উড়িয়ে রওনা দিচ্ছে। “আমায় তোমরা সঙ্গে নেবে?” সে নাবিকদের ডেকে বলল, “পয়সাকড়ি দিতে পারব না বাপু, কিন্তু হ্যাঁ। দারুণ সব গল্প শোনাতে পারি তোমাদের।”

নাবিকরা তাতে খুব রাজি। জাহাজ ইভানকে নিয়ে রওনা হল। যাবে সে নুনপাথরের দ্বীপে। ডেকে বসে ইভান গল্পের পর গল্প বলে, আর নাবিকরা তাই শোনে। এমনি করে দিব্যি দিন যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর একদিন হঠাৎ এক দারুণ ঝড় উঠল সমুদ্রে। তার ঠেলায় ইশেহারা জাহাজটা ছুটতে ছুটতে হঠাৎ জলের মধ্যে পাক খেতে শুরু করল। তাইতে জাহাজের লোক ভয় পেয়ে কান্নাকাটি জুড়েছে। বলে, “হায় হায়, এ যে মহাসাগরের মহাঘূর্ণির পাল্লায় পড়েছি আমরা! এর হাত থেকে কেউ বেঁচে ফেরে না।”

হঠাৎ এক নাবিক ইভানকে দেখিয়ে বলে এই ছেলেটা অপয়া। জাহাজে উঠেছে বলে আজ আমাদের বিপদ। ওকে ছুঁড়ে ফেল ঘূর্ণিতে।”

শুনেই ইভান তাড়াতাড়ি তার টেবিল ক্লথ, জুতো, টুপি আর বীণাটা বগলদাবা করে সিধে হয়ে দাঁড়াল আর নাবিকরা তাকে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলল ঘূর্ণির জলে। অমনি সমুদ্র একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল, আর ঘূর্ণিতে ডুবে ইভান গিয়ে সোজা হাজির হল সাগর রাক্ষসের বাড়িতে। সেখানে সাগর রাক্ষস তখন তার মেজদিদিকে পাশে বসিয়ে নিজের সিংহাসনে বসে ছিল। তাকে দেখেই সাগর রাক্ষস ঠোঁট চেতে বলে, “আহা কতদিন তাজা মাংস খাইনি যে! এসো হে, কাছে এস দেখি, কোন পাশটা দিয়ে শুরু করব তাই ঠিক করি!”

শুনে ইভান বলল, “আপনি আমার জামাইবাবু। নিজের শালার সঙ্গে কেউ এমনটা করে?”

তাইতে বেজায় রেগে গিয়ে সাগর রাক্ষস বলল, “অ্যাঁ? এতবড়ো সাহস? আমার মুখের ওপর কথা? দেখাচ্ছি মজা তোকে দাঁড়া—”

এই বলে যেই না সে তেড়ে আসতে যাবে ইভান ওমনি তাড়াতাড়ি তার বীণাটা বের করে এনে তাতে সুর তুলেছে। সে ভারী দুঃখের সুর। শুনে রাক্ষস যেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে, ইভান তক্ষুণি বলে “এইবারে একটু নাচলে কেমন হয়?” এই বলে সে বীণায় তুলেছে এক নাচের সুর। ওমনি সাগর রাক্ষসের সভার যত পাত্রমিত্র সভাসদ সব্বাই একসঙ্গে নাচতে লেগেছে। রাক্ষস নিজেও চোখমুখ ঘুরিয়ে সে কী ধেই ধেই নাচ! দেখে সভাশুদ্ধু মাছের দল হেসেই অস্থির।

নেচেটেচে বেজায় খুশি হয়ে রাক্ষস বলে, “হুম।এ ছোকরাকে খাওয়াটা ভালো কাজ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ওহে। বলি কি এইখানেই থেকে যাও তুমি। আমার রাজ্যে হরেক মাছ। আশ মিটিয়ে খাওদাও, বীণা বাজাও, কী বল?”

তখন তো দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে বসে ইভান দারুণ খাওয়াদাওয়া করল, হেরিং মাছের গান শুনল, তিমিদের নাচ দেখল, অক্টোপাসদের জিমনাস্টিক দেখল।

খাওয়ার পরে রাক্ষস ঘুমোলে বেতসিয়েনা ভাইকে ডেকে বলে, “এ যাত্রা তো প্রাণে বেঁচে গেলি। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যদি মতি ফের ঘুরে যায় তাহলে তোকে কিন্তু তক্ষুণি গিলে খাবে। সময় থাকতে পালা।”

শুনে ইভান বলল, “হ্যাঁ মেজদি, তোকে আর বড়দিকে এই রাক্ষসদের খপ্পর থেকে কীভাবে উদ্ধার করি বল দেখি!”

“উপায় একটা আছে, বুঝলি ভাই,” বেতসিয়েনা বলল, “তবে বেজায় কঠিন। এই সমুদ্রের অন্যপাড়ে এক বিরাট রাজ্য আছে। সেখানে রাজত্ব করে এক রাজকন্যা। তুই গিয়ে তার দেয়ালঘেরা বাগানে ঢুকতে পারিস যদি তাহলে সেই রাজকন্যা তোর বউ হবে। দুনিয়ায় শুধু তারই সাধ্য আছে আমাদের উদ্ধার করবার। আর কেউ তা পারবে না। তবে মুশকিল হল, সমুদ্রের ধারে তার ভয়ানক এক সৈন্যের দল থাকে। দুনিয়ায় সবাই তাদের ভয় পায়, এমনকি রাক্ষসরাও। তাদের সাথে অনেক বন্দুক আর বল্লম। বল্লমের মাথায় মাথায় কত যে জার আর রাজপুত্রদের মাথা গাঁথা! সমুদ্র পেরিয়ে যে- ই সেখানে যায়, সে আর বেঁচে ফেরে না তাদের হাত থেকে। যাবি তুই?”

“হুঁ যাব।”

“বেশ। আমি তাহলে আমি যে স্টার্জন মাছটায় চড়ে ঘুরে বেড়াই সেইটে তোকে দিচ্ছি। আর দৌড়বাজ স্টারলেট মাছ একজন দিচ্ছি সঙ্গে । সে তোকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে।” এই বলে ভাইকে চুমু খেয়ে স্টার্জন মাছের পিঠে তাকে বসিয়ে দিয়ে বিদায় দিল বেতসিয়েনা।

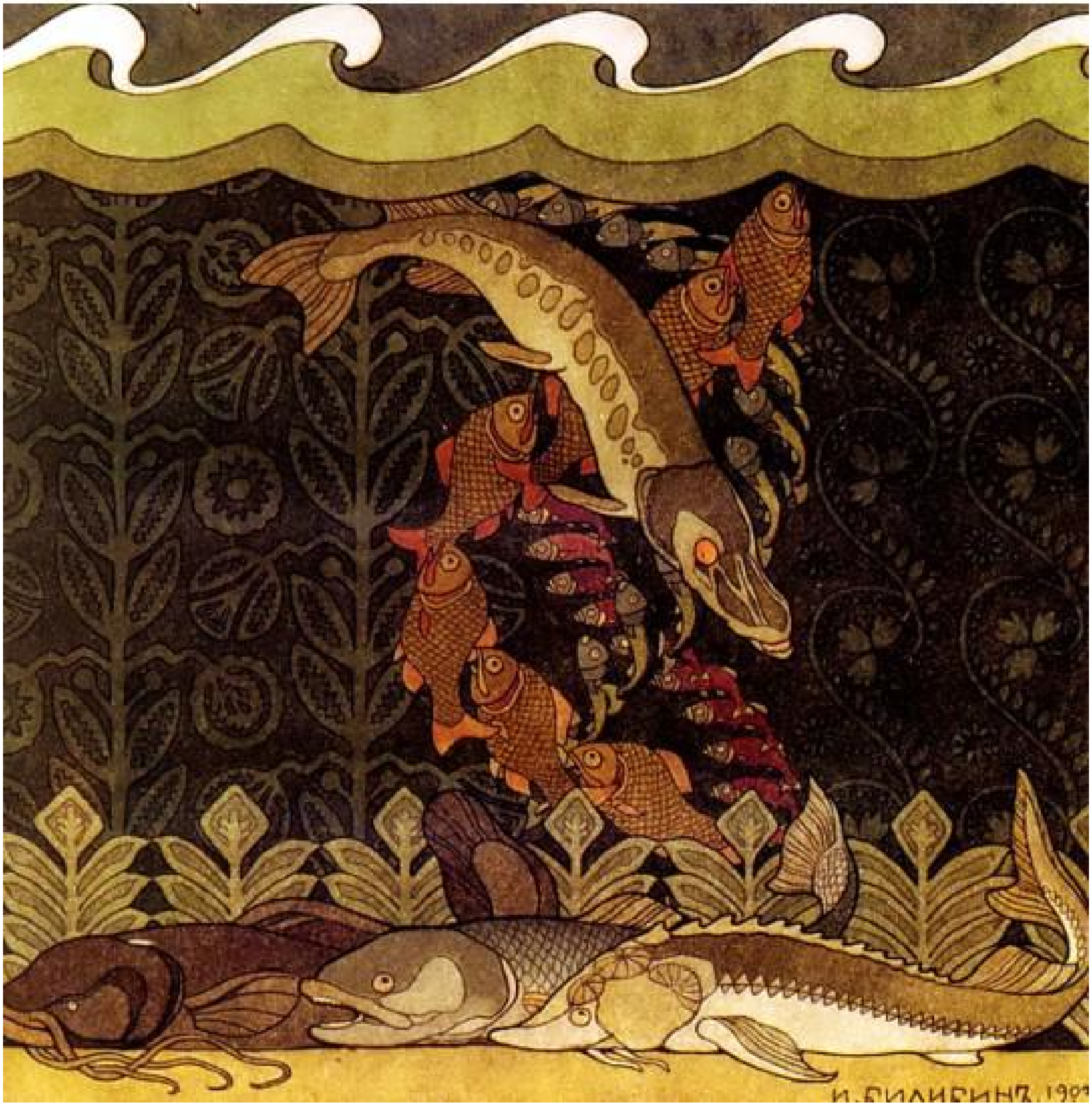

চোখের পলকে জল বেয়ে ছিটকে গেল স্টার্জন আর স্টারলেট মাছ। দেখতে দেখতে সাগর পাড়ি দিয়ে তারা এসে উঠল সেই রাজকন্যার রাজ্যের সমুদ্রের পাড়ে। পাড়ে ওঠবার আগেই ইভান মাথায় অদৃশ্য টুপিটা চাপিয়ে নিয়েছিল। পাহারাদারদের নাকের ডগা দিয়ে তাই প্রাসাদের দিকে যেতে তার কোন অসুবিধেই হল না। যেন হাওয়া খাচ্ছে এমনি করে হাঁটতে হাঁটতে ইভান গিয়ে ঢুকল রাজকন্যার বাগানে। সেখানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে আপেল পেড়ে খাচ্ছে এমন সময় দেখে কুড়িটা ঘুঘুপাখি একটা দিঘির পাড়ে এসে নামছে। মাটিতে নেমেই তারা কুড়িজন সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল। তাদের মাঝখানে যে সবচেয়ে সুন্দরী, সেই হল সে রাজ্যের রাজকন্যা। তারপর তারা সবাই মিলে সেই দিঘির জলে নেমে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল।

ঠিক সেই সময় ইভান দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে তার অদৃশ্য টুপিটা খুলে ফেলত্রেই জলের ভেতর থেকে মেয়েরা ভয়ে এমন চিৎকার জুড়ল যেবলার নয়। ইভান তাই দেখে হেসে বলল, "আরে আমি কি বাঘ না ভালুক যে আমায় দেখে ভয় পাচ্ছ তোমরা? আমি তোমাদের কাউকে কিচ্ছু বলব না। শুধু তোমাদের মাঝখানে ওই যে রাজকন্যা, তাকে বিয়ে করতে চাই।"

তাই শুনে লজ্জায় লাল হয়ে রাজকন্যা পাড়ে উঠে এসে তার হাত ধরে বলল, "আমার সেপাইদের পেরিয়ে কেউ যে কোনদিন আমার বাগানে ঢুকতে পারবে তা কখনো ভাবিনি। এইবার আমাদের বিয়ে হবে চলো।"

অমনি আলো জ্বলে উঠল, বাঁশি বেজে উঠল, সবাই মিলে ভারি আনন্দে তাদের নিয়ে চলল বিয়ের আসরে।

সারাদেশে খবর হয়ে গেল তাদের রাজকুমারীর বর মিলেছে এইবারে। সারা দেশ তখন আনন্দে অস্থির হয়ে গেল। তিন সপ্তাহ ধরে চলল গানবাজনা, খানাপিনা, আমোদের পালা।

তিন সপ্তাহ পার হতে ইভান একদিন তার বউকে সব কথা খুলে বলতে সে রাগে তিনখানা হয়ে বলল, "ডাক তো আমার শজারু উকিল আর চড়াই কেরাণিদুটোকে। এক্ষুণি আমি চিঠি পাঠাচ্ছি বনরাক্ষস আর সাগর রাক্ষসকে। ইভানের দিদিদের যদি চিঠি পেয়েই তারা ছেড়ে না দেয়, তাহলে তাদের এমন শাস্তি দেব যে ভাবতেও পারবে না।"

অমনি উকিল আর কেরাণি এসে চিঠির মুসাবিদা করে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিল সাগর আরবনের দেশে। রাজকন্যাকে দুনিয়ার সব্বাই ভয় করত। চিঠি পেয়ে দুই রাক্ষস কী আর করে? ভয়ে ভয়ে রাজকন্যাদের তারা ছেড়ে দিল।

তখন ইভান তার বাবাকে চিঠিতে সব লিখে শেষে বলল, "বাবা, দেখলে কিনা আমার বুদ্ধি আর আমার বীণার কেমন জোর? তলোয়ারে যে কাজ কোনদিন করতে পারত না তাই করে ফেলল কত সহজে! এখন আমার দেশে তোমার নেমন্তন্ন। বড়দি , মেজদি, আমার বউ আর আমি এখানে বেজায় মজায় আছি। কবে তোমরা আসবে বলো।।"

তারপর তো ইভান অনেকদিন বাঁচল, অনেক দেশ জয় করল, আর ভীষণ, ভীষণ আনন্দে থাকল। মাঝেমধ্যেই বড়ো বড়ো খানাপিনার আসর বসাত সে। তাইতে আমি অনেকবার ভালোমন্দ খেয়েছি , তাই আজ তার গল্প লিখলাম সব্বার জন্য।

বৈজ্ঞানিক

আর্যভটের সময়ের ভারতবর্ষে গণিত চর্চার আর এক প্রধান কেন্দ্র ছিল মধ্যভারতের উজ্জয়িনী। সেখানে তখন গণিতের তিন মহারথী ছিলেন। এঁরা হলেন ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির আর ভাস্করাচার্য। এবারে একে একে তাঁদের কথাঃ

<u>ব্রহ্মগুপ্তঃ(৫৯৮ খ্—৬৬৮ খ্)</u>

জিষ্ণুগুপ্তের পুত্র, সপ্তম শতাব্দির এই গণিতজ্ঞ গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা এই দুয়েরই ওপরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গিয়েছেন। আদতে তিনি রাজস্থানের ভিল্লমল অঞ্চলের মানুষ বলে মনে করা হয়। সেখানকার রাজার শিক্ষক হিসেবে তাঁকে ভিল্লমলাচার্য নামেও ডাকা হত। পরবর্তী সময়ে তিনি উজ্জয়িনীতে এসে সেখানকার জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা ও অবজার্ভেটরির প্রধানের পদ নেন। তাঁর বেশির ভাগ গবেষণাপত্রই কিন্তু গণিতের গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও লেখা হয়েছিল সুন্দর কবিতা দিয়ে।

৬৩৮ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত বই ব্রহ্মস্ফূটসিদ্ধান্ত বের হয়। এ বইতে তিনি শূন্য আর ঋণাত্মক সংখ্যাদের নিয়ে হিসেবনিকেশের কলাকৌশল বিস্তারিতভাবে দিয়েছিলেন। অলবিরুণীর তারিক ই হিন্দ বইতে দেখা যাচ্ছে, অষ্টম শতাব্দিতে খলিফা আল মনসুর এ দেশ থেকে তাঁর দূতদের দিয়ে এক মহা গুরুত্বপূর্ণ অংকের বই সেদেশে নিয়ে গিয়ে বাগদাদে তার আরবিক ভাষায় অনুবাদ করান। আরবিক ভাষায় তার নাম দেয়া হয়েছিল সিন্দহিন্দ। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, এ বইটা ব্রহ্মস্ফূটসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আরবদেশের সে সময়ের অংকবিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ভারতীর গণিতচর্চার যোগসূত্র সেই ঘটনাটা।

আর্যভটের মত ব্রহ্মগুপ্তও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর বহু গাণিতিক আবিষ্কারই কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার নানান গণনাসমস্যা সমাধান করতে গিয়েই ঘটেছিল। এমন কিছু আবিষ্কারের কথা এইবারে বলব।

পাটিগণিতের এলাকায় ব্রহ্মগুপ্ত কেমনভাবে একটা সংখ্যার ঘনফল বা ঘনমূল বের করা হয় (কিউব বা কিউব রুট)তার ব্যাখ্যা তৈরি করেন। তৈরি করেন বর্গ বা বর্গমূল (স্কোয়ার বা স্কোয়ার রুট) বের করবার সহজ পদ্ধতিও।

আচ্ছা বলো দেখি ১^{২} +২^{২} +------ +১০০^{২} এর মান কত হবে? কষতে বসলে তো জীবনে শেষ হবে না সে বুঝতেই পারছ। আর কষে যদি ফেলোও, তাহলে দুষ্টু মাস্টারমশাই যদি তারপর বলে বসেন, “এইবারে ১০০০^{২} অবধি যোগটা করে ফেল বাপু,” তখন তুমি কী করবে? তা ব্রহ্মগুপ্ত সে সমস্যার হাল বের করে দিয়েছিলেন একখানা ফর্মুলা আবিষ্কার করে।

ধরো তুমি প্রথম “ক” খানা সংখ্যার বর্গের যোগফল বের করতে চাও। (ক মানে ৩ , ৪, ৫০০০, ১২৩৪৫৬৭ এমন যে কোন সংখ্যা হতে পারে।) ব্রহ্মগুপ্ত ব্যাপারটাকে ভারী সরলভাবে সমাধান করে দিলেন। তিনি দেখালেন উত্তরটা হবে [(ক)x(ক+১)x(২ক+১)]/৬। কষে দেখতে পারো। সবসময় একেবারে সঠিক উত্তর জুগিয়ে দেয় এই ম্যাজিক ফরমুলা।

আবার ১^{৩} +২^{৩} +------ +ক^{৩} এমন জিনিসের সমাধানের ফর্মুলাও বের করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। ওর উত্তর হবে [(ক)x(ক+১)/২]^{২}

ব্রহ্মস্ফূটসিদ্ধান্ত বইতে ব্রহ্মগুপ্ত আর একখানা বৈপ্লবিক কাজ করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন শূন্য শুধু শূন্য নয়। সে- ও একটা সংখ্যা। আর দশটা সংখ্যার মতন তাকেও

যোগবিয়োগের কাজে লাগানো যায়। বিষয়টা এখন খুব সোজা ঠেকলেও, কিচ্ছু নয় বলে যাকে ধরা হত তাকে প্রথমবার এইভাবে একটা সংখ্যা বলে চিহ্নিত করবার জন্যে কিন্তু বেজায় দূরদৃষ্টি আর বিচারক্ষমতা লাগে। পুরনোকালের ব্যাবিলোনিয়ান গণিতবিদেরা তো শূন্যকে পাত্তাই দেননি। অংকের ফর্মুলাতে তার জায়গা ছিল না বিশেষ সেখানে। গ্রিক গণিতবিদরাও শূন্য বলতে বোঝাতেন কোন সংখ্যার বা মানের অভাব। ফলে সংখ্যার ধর্ম তার ছিল না গ্রিকদের কাছে। ব্রহ্মগুপ্তই প্রথম বললেন, শূন্যকে কোন সংখ্যার সাথে যোগবিয়োগ করলে সে সংখ্যাটাই হবে তার উত্তর, আর গুণ করলে তার উত্তর হবে শূন্য।

আর এই করতে গিয়েই ধনাত্মক(পজিটিভ) আর ঋণাত্মক (নেগেটিভ) শব্দদুটোর জন্ম। তোমরা বোধ হয় জানো, ধন মানে টাকাপয়সা সম্পত্তি, আর ঋণ মানে ধারবাকি। তা এই ধন আর ঋণের সঙ্গে শূন্যের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত বললেন,

কোন ঋণ (মানে ধারবাকি) থেকে শূন্য বাদ দিলে তা ঋণ থেকে যায়
কোন ধন (টাকাপয়সা) থেকে শূন্য বাদ দিলে তা একই ধন থেকে যায়।
শূন্য থেকে শূন্য বাদ দিলে শূন্য পড়ে থাকে
শূন্য থেকে কোন ঋণ বাদ দিলে তা ধন হয়
শূন্য থেকে কোন ধন বাদ দিলে তা ঋণ হয়ে যায়।
ধন বা ঋণের সঙ্গে শূন্য গুণ করলে ধন বা ঋণ দুইই লোপ পায়।
দুটি ঋণকে গুণ বা ভাগ করলে করলে ফলাফল ধন হয়ে যায়
ধন ও ঋণের গুণ করলে তা ঋণ হয়।
ধন ও ঋণ একটি দিয়ে অন্যটিকে ভাগ করলে পড়ে থাকে ঋণ।

একটাই শুধু ভুল ছিল তাঁর হিসেবে। কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কী ঘটবে সেইটে তিনি বলেছিলেন উত্তর হবে শূন্য। সে ভুল ভেঙেছিল তার পাঁচশো বছর বাদে আরেক গণিতজ্ঞ দ্বিতীয় ভাস্করের গবেষণায়। তিনি দেখিয়েছিলেন ওতে উত্তর হবে ইনফিনিটি বা অসীম। যুক্তিটা ছিল, কোন সংখ্যাকে যত বেশি টুকরোয় (ধরো টুকরোর সংখ্যা হল ‘ক’)ভাগ করবে ততই এককেটা টুকরোর মান ছোটো হয়ে চলবে অর্থাৎ শূন্যের আরো কাছাকাছি আসবে। তাহলে ‘ক’ এর মান অসীম হলে টুকরোর আয়তনও ছোটো হবার শেষ সীমায় পৌঁছোবে। সেইটে হল শূন্য। ওর চেয়ে ছোটো টুকরো কোন জিনিসের হতে পারে না যে।

এখন এই অবধি। পরের সংখ্যায় ব্রহ্মগুপ্তের আরো কিছু আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা বলা যাবে’খন।

ক্রমশ

কবুতরখানার চাল

সূর্য্যনাথ ভট্টাচার্য

সামান্য বারো কিলো চাল। তাই নিয়ে ধুন্ধুমার!

মানদামাসী গিয়েছিল দোকানে। বারো কিলো চাল তার নিজের, ক্ষেন্তিপিসির আর মলিনাকাকির জন্যে কিনে চার- চার কিলোর বস্তা বানিয়ে নিয়ে এসেছে। মোট বারো কিলো চাল আছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাগ করা বস্তাগুলো নিয়ে গোলযোগ দেখা দিল। ক্ষেন্তিপিসি বললে, "ও পবন আড়তদারের ভাগ করা তো? ব্যাটা এক নম্বরের ফেরেব্বাজ। আমি নিজে ওজন করে আমার চাল বুঝে নেব।"

ক্ষেন্তিপিসি নিজের বাড়ির দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে চোখ পাকিয়ে বলল, "এই দ্যাকো। বলিছিলাম কিনা! একটাই চার কিলোর বস্তা। আর দুটোর একটায় পাঁচশো গ্রাম কম অন্যটায় পাঁচশো বেশি!"

মানদামাসীও ছাড়বে কেন? তেড়েফুঁড়ে বলল, "বললেই হবে? পবন আমাদের ঘরের ছেলে, ও এক্কেবারে ঠিক ওজন করেছে। আমি একটুও এদিক ওদিক কত্তে দেবোনি।"

এইসব দেখে মলিনাকাকি বললে, "তোমরা ঝগড়া করে মরো। আমি আমার ঘরের যন্তরে ওজন করে যেটা চার কিলো বা তার বেশি পাব, সেটাই নেব বলে দিলাম।"

বচসায় কথাই বাড়ে, মীমাংসা আর হয় না। কী করা যায়? পাশ দিয়ে মাস্টারমশাই চলেছিলেন বাজারে। তাঁরই ডাক পড়ল। পাড়ায় তাঁর মান্যি ছিল, যতই হোক নেকাপড়া করা মানুষ বলে কতা।

তাঁকে ধরে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলা হোলো। তিনটে বস্তায় চাল আছে তিনজনের জন্য। মানদামাসী বলছে, সব সমান সমান। ক্ষেন্তিপিসি মানছে না, বলছে একটায় চার কিলো, একটায় সাড়ে চার কিলো আর একটায় সাড়ে তিন কিলো চাল আছে। মলিনাকাকির কারুর কথায় বিশ্বাস নেই, সে নিজে যাচাই করে সবচেয়ে বেশি ওজনের বস্তাটা নিতে চায়। মানদামাসী চাল চালা-চালি করতে দেবে না। সমাধান কী?

মাস্টারমশাই সব শুনে বললেন, "এই কথা? তা এতে তো মুশকিল কিছু দেখি না।"

ক্ষেন্তিপিসি বললে, "আমার পুরো চারকিলো চাল চাই। কমটা নেব না কিন্তু।"

মানদামাসী বললে, "কোনটাই কম নেই। পেত্তেকটাই চার কিলো করে আছে। ন্যাও না কোনটা নেবে। কিন্তু একদানাও চাল এদিক ওদিক কত্তে দেব নি।"

মলিনাকাকি বললে, "আমি আমার বাড়ীর যন্তরে মেপে তবেই নেব কিন্তু।"

"আহা তাই নাও না বাছা, " মাস্টারমশাই বললেন, "দেখো কোনটা তোমার যন্তরে ঠিক পাও।"

মলিনাকাকি নিজের যন্ত্রে ওজন করে একটা বস্তা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। ক্ষেন্তিপিসি গরগর করে মাস্টারমশাইকে বললে, "ও যে বেশি ওজনের বস্তাটা নিয়ে গেল না, আপনি জানলেন কি করে?"

"তাতে তোমার কী বাছা?" মাস্টারমশাই তাকে ধমকে বললেন, "তুমি চার কিলো চাল পেলেই তো হল। নাও না এই দুটো বস্তার মধ্যে যেটা চার কিলো বা তার বেশি পাবে সেটাই নিয়ে যাও। ... হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ওজন করে পরখ করেই নাও না!"

ক্ষেন্তিপিসিও আর রা কাড়তে পারল না, দেখা গেল সে যা চাইছিল তাই পেয়ে গেছে। যে বস্তাটা রইল মানদামাসীকে সেটা দেখিয়ে মাস্টারমশাই বললেন, "এইটা তুমি নিয়ে যাও। তুমি তো জানোই, তিনটেতেই সমান সমান চাল ছিল।"

মানদামাসীরও কিছু বলার নেই। সমস্যার সমাধান। মাস্টারমশাই আবার বাজারের রাস্তা ধরলেন।

আমি গুটিগুটি পায়ে তাঁকে ধরে বললাম, "আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনি মলিনাকাকিকে প্রথম নিতে দিলেন কেন?"

"কারণ আমি জানতাম, যদি তিনটে বস্তায় সমান সমান চাল নাও থাকে তাহলেও অন্তত কোন একটায় চারকিলো বা তার বেশি চাল থাকবে।"

"এটা কী করে বলছেন?"

"তিনটেই চার কিলোর কম হলে তো মোট বারো কিলো হতে পারে না ভাই..."

"ঠিক কথা। কিন্তু তাহলেও তো ধাঁধা কাটল না। বললাম, "কিন্তু তারপর যে দুটো রইল, তার থেকে ক্ষেন্তিপিসি কী করে সন্তুষ্ট হলেন? দুটোই তো চারকিলোর কম হতে পারত?"

“কী করে? ক্ষেন্তি নিজেই তো ওজন করে দেখেছে, একটাই চারকিলোর কম। মলিনা যদি সবচেয়ে বেশিটাই নিয়ে থাকে, তাহলেও ক্ষেন্তির নিজের কথা অনুযায়ী বাকি দুটোর মধ্যে একটা চারকিলোর হবেই। সিম্পল পিজিওনহোল প্রিন্সিপল।”

মাস্টারমশাই বুঝিয়ে দিতে দেখি এটাও ঠিক! ক্ষেন্তিপিসি তার মনোমত হিসেব বুঝে নেবার পরে আর সমস্যা কী? যেটা পড়ে থাকল, মানদামাসীকে তা নিতেই হবে। কেননা তার মতে তিনটে বস্তার ওজন সমান সমান।

“মাস্টারমশাই, আপনি তো অদ্ভুত খেল দেখালেন। এ যেন ম্যাজিকের মতো...”

“ম্যাজিক নয়, অঙ্ক,” মাস্টারমশাই মুচকি হেসে বললেন, “ওই যে বললাম না, কবুতরখানা নীতি।”

“বুঝে গেছি, সিম্পল পিজিওনহোল প্রিন্সিপল!”

ছবিঃ মধুশ্রী

ছদ্মবেশী ফল

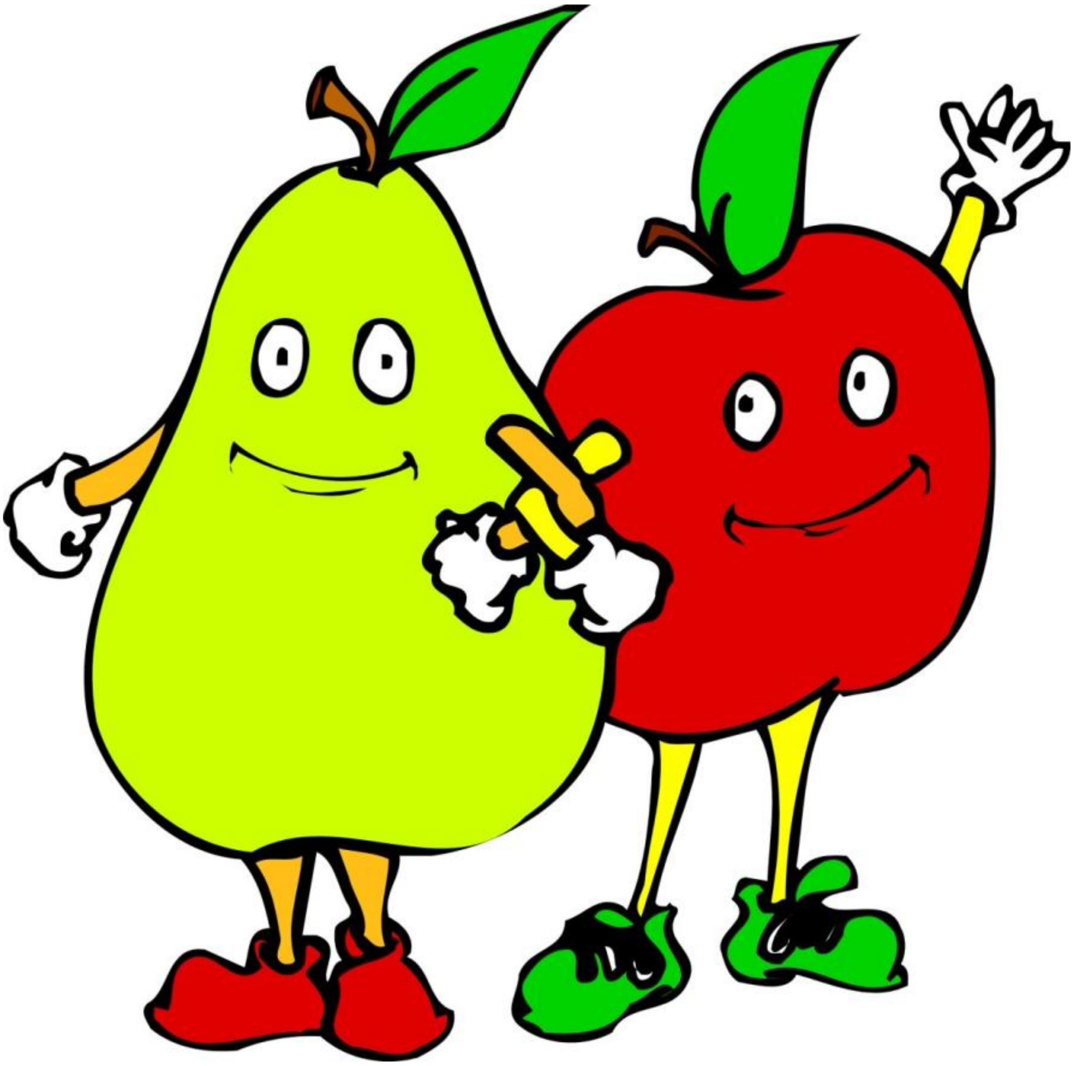

রবি সোম

বেঙ্গালুরুতে সুজিত ও আমার দিন ভালোই কাটছে। খরচাপাতি এখানে বেশি হলেও দু'জন একসাথে থাকি বলে সাশ্রয় হয় অনেকটাই। কলকাতার মতো বেঙ্গালুরুতেও আছে যানজটের সমস্যা। তবে অফিস আমাদের আস্তানার কাছে হওয়ার দরুন যাতায়াতে কোনো অসুবিধে হয় না। ছুটির দিনগুলোও পরমানন্দে কাটে দর্জিলদার সাথে আড্ডা দিয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ে।

নিরামিষ পদ বানানোর ব্যাপারে আমরা এক্স্‌পেরিমেন্ট চালাই মাঝেসাঝে। ডাল, আলুভাজা, ঘুগনি এসব সহজ রান্না রপ্ত করার পর মনে হল, এবার কিঞ্চিৎ জটিল কেস হাতে নেওয়া যেতে পারে। পটল, ঝিঙে, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, টমেটো, বিন, কুমড়ো এসব দিয়ে মিক্সড ভেজিটেবলের তরকারি বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এক শনিবার। লুচির অবাঙালি সংস্করণ 'পুরি' দোকান থেকে কিনে নিলেই চলবে। সবজিগুলো জোগাড় করে মিশ্র সবজির পদ কীভাবে রান্না করা যায় তা নিয়ে যখন গভীর গবেষণা চলছে, তখনই হাজির হল দর্জিলদা।

সবজিগুলোকে একঝলক দেখে গম্ভীর হয়ে বলল, "আজ তাহলে ফলাহার করাই ঠিক হয়েছে। তা বেশ! ফল খাওয়া খুবই ভালো অভ্যেস।"

আমি ও সুজিত মুখ চাওয়া- চাওয়ি করলাম। সবজিকে কেন ফল বলে ভুল করছে দর্জিলদা! মাথা- টাথা হঠাৎ খারাপ হল নাকি?

আমাদের মনোভাব বুঝতে চৌকশ দর্জিলদার দেরি হল না। বলল, "ভাবছিস ভুল বকছি! ও কে, বিচার করে দেখা যাক কে ঠিক আর কে বেঠিক। সুজিত, অভিধানটা বার কর।"

কবিতা লেখার অভ্যাস থাকায় সুজিতের কাছে যে হরবখত থাকে চলন্তিকা আর সমার্থশব্দকোষ, সেটা জানত দর্জিলদা। ড্রয়ার থেকে চলন্তিকা বের করে দর্জিলদাকে দিল সুজিত। অভিধান ঘেঁটে দু'টি পৃষ্ঠা চিহ্নিত করে ওটা আমার হাতে দিয়ে দর্জিলদা বলল, "ফল আর সবজির ফারাক কী তা নিজের চোখেই দেখে নে।"
চিহ্নিত স্থানে চোখ বুলিয়ে যা জানা গেল তা এইরকম :

ফল - বৃক্ষলতাদির শস্য বা বীজাধার ,

সবজি - শাক, আনাজ, তরকারি

আমি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষে বলেই ফেললাম, "সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! পুজো-আচ্চায় লাগে, অসুখ হলে বেশি করে খেতে হয়, স্বাদে মোটামুটিভাবে মিষ্টি, রান্না না করে সরাসরি খাওয়া চলে এমন জিনিসকে ফল আর শাকপাতা, আনাজপাতি যা লাগে নিরামিষ তরকারি বানাতে তাকেই সবজি বলে জানতাম। এখন তো মনে হচ্ছে সবজিদের দলে ছদ্মবেশী ফলের ভিড়ই বেশি! "

আমার অকপট স্বীকারোক্তিতে দর্জিলদা বেজায় খুশি হয়ে বলল,"কথাটা কিন্তু বেড়ে বলেছিস! আসলে রন্ধন-সম্পর্কিত বিবেচনায় যেগুলো সবজি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত, সেগুলোর বেশির ভাগই উদ্ভিদবিজ্ঞানের চোখে নির্ভেজাল ফল বই আর কিছু নয় ! স্রেফ মজা করার জন্যই ঝিঙে পটল এসব দিয়ে বানানো খাবারকে 'ফলাহার' বলে তোদের ভড়কে দিয়েছিলাম। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও বটানির বিচারে পটল, ঝিঙে, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, টমেটো, বিন, কুমড়ো গোছের জিনিসকে মোটেই সবজি বলা চলে না , কেননা সবই গাছের ফল।"

"সবজিরূপী ফলের ব্যাপারটা দারুণ গোলমেলে ঠেকছে! বিজ্ঞানমতে কোন্‌টা সবজি আর কোন্‌টা ফল সেটা চটজলদি বুঝব কীভাবে দর্জিলদা ?" জানতে চাইল সুজিত।

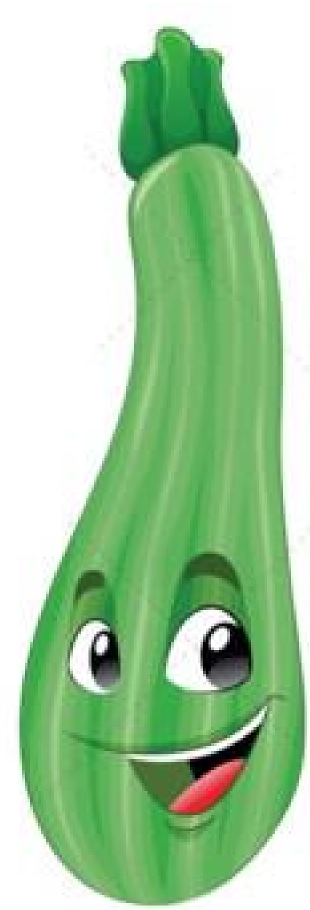

"ঠিক আছে, বলছি," দর্জিলদা ব্যাখ্যান শুরু করল, "উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিচারে ফল ও সবজির ফারাক দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। সহজ কথায়, বীজের থাকা বা না থাকার ওপরেই ফলত্ব বা সবজিত্ব নির্ভর করে। ব্যাপারটা খোলসা করে বলি। সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ ধারণকারী অংশকেই ফল বলা হয়। এই মাপকাঠিতে বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, টমেটো, কুমড়ো এসবকে ফল বলে মানতেই হবে। কেননা এদের ভেতর বীজ আছে যা থেকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে চারা বানিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের গাছ উৎপন্ন করা যায়। এখানে বলে রাখি, জেনেটিক কারিকুরি করে বীজহীন আঙুর বা কমলার মতো সিডলেস ফ্রুট সৃষ্টি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বীজ না থাকলেও এগুলোকে কিন্তু ফল বলেই গণ্য করতে হবে।

"এবার আসা যাক সবজির কথায়। ফল বাদে গাছের এডিবল অর্থাৎ ভক্ষণীয় অন্য অংশই সবজি। সেই এডিবল পার্টটা পাতা, শেকড়, কাণ্ড এমনকী ফুল বা কুঁড়িও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলি, পালং বা লেটুস হচ্ছে গাছের পাতা, মুলো বা গাজর হচ্ছে গাছের মূল আর ফুলকপি কিংবা ব্রকোলি হচ্ছে গাছের কুঁড়ি। ডাঁটাশাক, পুঁই এসবের পাতা ও কাণ্ড দুই- ই খাওয়া যায়। ভক্ষ্য ফুলের দৃষ্টান্ত এই মুহূর্তে যা মনে আসছে তা হচ্ছে সজনেফুল আর বকফুল।"

আমি এবার দর্জিলদার দিকে একটা কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়লাম, "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু বীজযুক্ত কাঁচালঙ্কা, সজনেডাঁটা বা মটরশুটিকে ফলপট্টিতে না রেখে কেন সবজিবাজারে রাখা হয়, সেটা তো মাথায় ঢুকছে না।"

সহজেই গোলমেলে প্রশ্নটার মোকাবিলা করল দর্জিলদা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে চটজলদি উত্তর দিল, "সাধারণ জনগণ বটানি জানে না। তাই স্বাদ আর ব্যবহারের ধরণ বিচার করেই আমজনতা উদ্ভিজ্জ জিনিসে ফল কিংবা সবজির লেবেল সেঁটেছে। সেইমত ওগুলোর ঠাঁই হয়েছে ফলপট্টি অথবা সবজিবাজারে।! "

"জ্ঞানলাভ তো অনেক হল, এখন দরকার এনার্জি লাভের। বেজায় খিদে পেয়েছে। চলো বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসি।" প্রস্তাব দিল সুজিত। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে বিলম্ব হল না। অত: পর আমাদের জ্ঞানগর্ভ আড্ডার আসর সমাপ্ত হল।

সৌড়ঝড়ের আঘাতে টালমাটাল পৃথিবী

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীকে ঘিরে মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহদের সমাবেশ

সেদিন তিতিলকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, “পৃথিবীর চাঁদ ক”টি?”

ও আমার প্রশ্ন শুনে মাথা চুলকোতে শুরু করে দিল। পাশেই বসেছিল ছোট বোন তিন্নি। দিদিকে মাথা চুলকোতে দেখে ও ফিক্ করে হেসে বললো, “এমা এটা জানিস না? পৃথিবীর চাঁদ তো একটা।” তিন্নির উত্তরটা ঠিক, আবার বেঠিকও বলা যায়। ঊর্ধ্বাকাশে পাঠানো মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে ধরলে পৃথিবীর চাঁদের সংখ্যা এখন অনেক।

মহাকাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি রয়েছে তার কিছু লাগে গবেষণার কাজে, আর বাকিগুলি লাগে মানুষের নানা কাজে। পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা, আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, অনুসন্ধান প্রভৃতি নানা কাজে এদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মহাকাশে গিয়েও শান্তি নেই। শত্রুর দল ওত্ঁ পেতে আছে সেখানেও। মাঝে মধ্যেই ওদের হাঙ্গামায় বেসামাল হয়ে পড়ে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি আর তখনই শুরু হয় গন্ডগোল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে সে এক লন্ডভন্ড কান্ড ঘটে।

আমাদের পৃথিবী ঘিরে আছে একটি চৌম্বকক্ষেত্র। এই চৌম্বকক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে যাকে বলা হয় চৌম্বকমণ্ডল (Magnetosphere)। এই চৌম্বকমণ্ডল আবার একটি সদা-পরিবর্তনশীল অঞ্চলের দ্বারা আবদ্ধ। এই অঞ্চলকে বলা হয় ম্যাগনিটোপজ (Magnetopause)।

পৃথিবীর চৌম্বক- মেরু ও ভৌগলিক- মেরু এক নয়। চৌম্বক- মেরুরেখা ও ভৌগলিক- মেরুরেখা ছেদবিন্দুতে ১১·৫ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। পৃথিবীর চৌম্বক- উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু একই ব্যাসের দু”টি

বিপরীত বিন্দু নয়। এছাড়াও এই মেরু দুটি সময়ের সাথে সাথে স্থান পরিবর্তন করে। দেখা গেছে, পৃথিবীর চৌম্বক- উত্তরমেরু প্রায় ১৭ ডিগ্রি ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তে ভৌগলিক- উত্তরমেরুর চারপাশে প্রায় ৯৬০ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে।

ভূ- বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল লোহা- নিকেল সমবায়ে গঠিত। পৃথিবীর এই স্তরকে বলা হয় "নিফে" (Nife) স্তর। কোনো কারণে এই নিফে স্তর যদি আবর্তিত হতে থাকে এবং পৃথিবীর মেরুরেখার সঙ্গে যদি কোনো সমান্তরাল চৌম্বকক্ষেত্র থাকে তবে পৃথিবীর নিরক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরাল বৃত্তাকার পথে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হতে থাকবে।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন আদিমকাল থেকে পৃথিবীর উপাদানে খুব অল্প পরিমাণ চৌম্বকত্ব ছিল। আকস্মিক তাপের উদ্ভবে অথবা ওই ধরনের কোনো কারণে ওই ক্ষীণ চৌম্বকত্ব ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর নিরক্ষরেখা অঞ্চলে চৌম্বক বল- রেখা সঞ্চালিত হয়ে বিদ্যুৎ- প্রবাহের সৃষ্টি করে। আবার অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এই বিদ্যুৎ- স্রোত তাপ- তড়িৎ ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত। সূর্যের তাপ পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে পড়ে না। ফলে ভূ- পৃষ্ঠের উপর তাপের পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না। এরফলে তাপ- বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, যা তাপ- তড়িৎ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কেউ কেউ মনে করেন, ভৌগলিক- মেরু এবং চৌম্বক- মেরু খুব কাছাকাছি হওয়ায় পৃথিবীর আহ্নিকগতির সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯১৮ সালের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই সময় পৃথিবীর আবর্তন গতির হঠাৎ- ই পরিবর্তন হয়। সেই সময় দেখা যায় পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে সূর্য থেকে নিঃসৃত তড়িতাবিষ্ট কণার সমবায়ে গঠিত সৌরবায়ু বা সৌরঝড়। এই সৌরবায়ুর প্রবাহে চৌম্বকমণ্ডল অস্থির হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কাছাকাছি

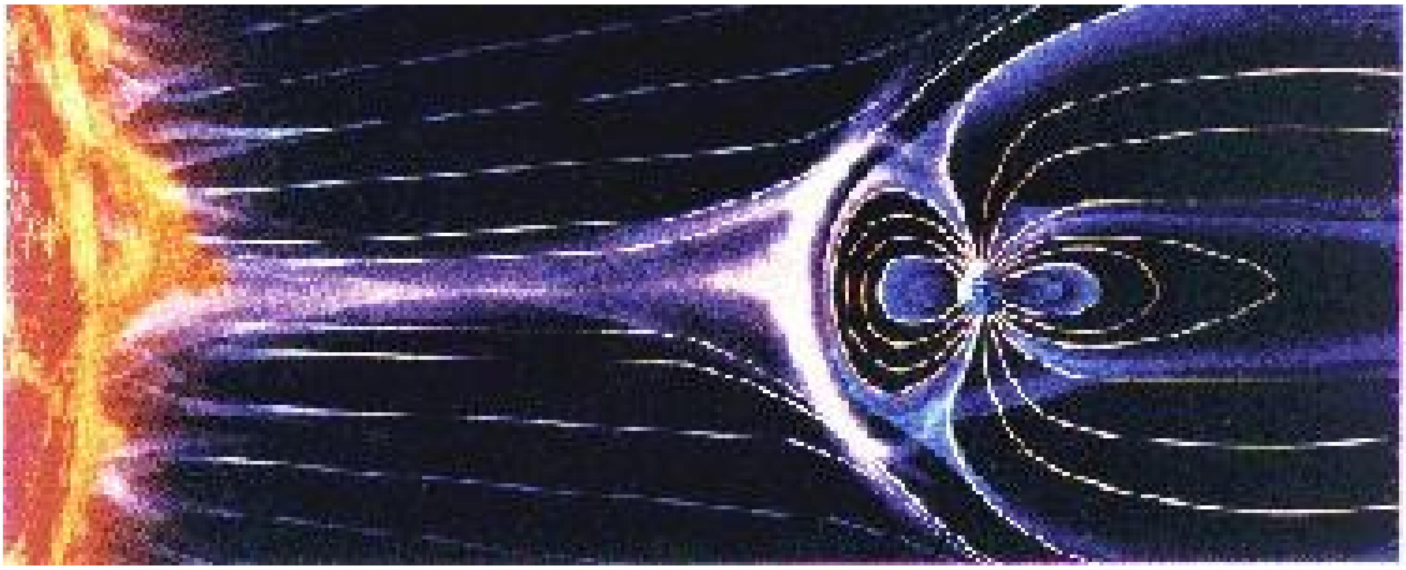

সৌরবায়ুর বেগ সেকেন্ডে ৪০০ কিলোমিটারের মতো হতে দেখা যায়। এই বায়ু সূর্য থেকে কখনো একটানা আসে আবার কখনো ঝলকে ঝলকে আসে।

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে দু'টি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলয়। পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৩২০০ কিলোমিটার ও ১৬০০০ কিলোমিটার। এছাড়াও প্রায় ১০০,০০০ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ও অন্তর্গ্রহ মহাকাশ অঞ্চলের সীমান্ত বরাবর আরও একটি বলয় আছে। এই বলয়গুলির মধ্যে প্রথমটি প্রোটন কণিকার দ্বারা গঠিত, যার শক্তির পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের মতো। এর প্রান্তভাগ কখনো কখনো পৃথিবীর ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে নেমে আসে। আর দ্বিতীয় বলয়টি প্রধানত ইলেকট্রন কণিকার দ্বারা গঠিত, যার শক্তির পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) ইলেকট্রন ভোল্ট। পৃথিবী ঘিরে ওঠা তেজস্ক্রিয় বলয়গুলির কণিকার উৎস সূর্য। সূর্য থেকে বেরিয়ে এসে এগুলি পৃথিবীর চুম্বকরশ্মির বেড়াজালে

বন্দি হয়ে পড়ে। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়া কমার সাথে এই সৌরকণিকা- স্রোতের পরিমাণ বাড়ে কমে।

বিজ্ঞানীদের মতে সৌরঝড়ের সময় সূর্যের আবহমণ্ডুল থেকে চৌম্বক শক্তি হঠাৎ করে ছিটকে বেরিয়ে আসে। সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসে অগুন্তি তড়িতাহিত সৌরকণা। শক্তিশালী কণাগুলি এক্স- রশ্মি এবং সৌরঝড়ে তৈরি হওয়া চৌম্বকক্ষেত্র তীব্র গতিতে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। পৃথিবীতে দেখা ঝড়গুলির তুলনায় এই ঝড় কয়েক লক্ষগুণ শক্তিশালী। তবে এই ঝড়ের আঘাতে প্রাণহানির আশঙ্কা তেমন থাকে না। পৃথিবীর চৌম্বকমণ্ডুল বা ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এই ঝড়ের আঘাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে।

তবে সূর্য থেকে ধেয়ে আসা এই ঝড় যে পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় ঘটায় না তা নয়। তড়িতাহিত সৌরকণা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়লে তা আর বের হতে পারে না। এই কণাগুলি তখন দু'টি মেরুর মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় মেরুজ্যোতি। প্রধানত পৃথিবীর দুই মেরুর কাছাকাছি জায়গায় এই জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়। আয়নোস্ফিয়ারে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার হল মেরুজ্যোতি। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল মেরুজ্যোতি দেখা গিয়েছিল। এই মেরুজ্যোতি এতটাই উজ্জ্বল ছিলযে ক্রিমিয়া এবং আফ্রিকা থেকেও এদের দেখা গিয়েছিল। এই সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তীব্র চৌম্বক ঝটিকার আবির্ভাব ঘটেছিল।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলে অনেক সময় কম্পাস সঠিক দিক নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় "চৌম্বক- ঝটিকা"।

চৌম্বক- ঝটিকার প্রভাবে ধাতব জিনিস, বিশেষত ধাতব তারের উপরে তড়িৎ প্রবাহের উদ্ভব হয়। এই তড়িৎ প্রবাহ এলোমেলোভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি মারফৎ বার্তা প্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চৌম্বক- ঝটিকার সঙ্গে আয়নোস্ফিয়ারে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সৌরকণিকার আঘাতে আয়নোস্ফিয়ার অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, ফলে এলোমেলো গতিসম্পন্ন আয়নিত মেঘের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর চারপাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ঘুরছে সেগুলি পৃথিবীর চৌম্বকমণ্ডুলের বাইরে থাকে। তাই এদের উপর সৌরঝড়ের আঘাতটা খুব বেশি আসে। সময়ের আগেই কোনো কোনো উপগ্রহ ভেঙে পড়ে পৃথিবীর বুকে। ১৯৭৯ সালে এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৭৩ সালে উৎক্ষেপণ করা "স্কাইল্যাব"-

এর নিজের কক্ষপথে থাকার কথা ছিল ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু সৌরঝড়ের আঘাতে উপগ্রহটি সময়ের আগে ১৯৭৯ সালে ভেঙে পড়ে ভারত মহাসাগরে এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়।

****

তথ্য সূত্রঃ

১) মহাকাশের বুকে পৃথিবী, শঙ্কর চক্রবর্তী, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা।
২) জ্ঞান ও বিজ্ঞান ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪
৩) আয়নোস্ফিয়ারেরকথা, এফ· আই· চেস্তনভ্, অনুবাদঃ রবীন্দ্র মজুমদার, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা।
৪) মহাকাশের কথা, শঙ্কর চক্রবর্তী, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা।
৫) Encyclopaedia Britanica, 15th Edition.

উড়বো এবার আকাশে (১)

কিশোর ঘোষাল

মানুষের আকাশে ওড়ার ইচ্ছে বহুদিনের। ঠিক কবে থেকে এই ভাবনার শুরু বলা সম্ভব নয়। তবে পাখিদের সাবলীল ডানা মেলে উড়তে দেখে মানুষেরও ওড়ার সাধ হয়েছিল, হয়তো সেই সভ্যতার শুরু থেকেই। আর সেই ইচ্ছা, স্বপ্ন বা কল্পনা হয়ে বারবার উপস্থিত হয়েছে আমাদের প্রাচীন কাহিনীতে, শাস্ত্রে এবং পুরাণে। কখনো সে এসেছে খুব ফিনফিনে সুন্দর ডানার সুন্দরী পরী হয়ে, কখনো বা দেবদেবীদের বিশিষ্ট বাহন হয়ে। যেমন মা সরস্বতীর বাহন রাজহংস, কিংবা মা লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। আবার কখনো ভগবান বিষ্ণুর বাহন, গরুড়ের মতো বিশাল শক্তিশালী পাখি হয়ে। এই গরুড় পাখির মহিমা এবং গৌরবের যেন শেষ নেই, তার দুই পাখায় নাকি ঋক ও সাম দুই বেদের আশ্রয়। মহাভারতে বলা হয়েছে, সোনার মতো উজ্জ্বল এই পাখি জন্মের পরেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে, বিশাল এক হাতি আর বিশাল এক কচ্ছপকে নাকি তার পায়ের নখে তুলে নিয়েছিলেন, তার ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যে।

এসব ছাড়াও আমাদের প্রাচীন পুরাণে বারবার পাওয়া যায় পুষ্পক রথ এবং বিমানের উল্লেখ। ধনসম্পদের রাজা কুবেরের যে পুষ্পক রথ ছিল, সেটিই সব থেকে বিখ্যাত। লঙ্কার রাজা রাবণ, কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে, পুষ্পক রথটি নিজের অধিকারে নিয়েছিলেন। এই পুষ্পক রথেই তিনি সীতাদেবী কে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সব বাহন পাখি- পক্ষী অথবা পুষ্পক রথ নিয়ে যুগ যুগ ধরে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই, কারণ আকাশে উড়তে গেলে যে অত্যন্ত জটিল কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তার কোন আভাস বা ইঙ্গিত, এই সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে বা পুরাণে আজ পর্যন্ত মেলেনি।

যিশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগে গ্রীসে, আর্কিটাস নামে একজন ব্যক্তি নাকি পাখির মতো দেখতে একটি উড়ানযান বানিয়ে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই উড়ানযান খুব সম্ভবত বাষ্পের সাহায্যে চালানো হয়েছিল এবং বলা হয় ২০০মি. (৬৬০ফিট) উড়তে সফল হয়েছিল।

কোন ইঞ্জিন ছাড়াই হাল্কা উড়ানের নাম গ্লাইডার, একটু উঁচু জায়গা বা ছোটোখাটো পাহাড়ের ধার থেকে লাফ দিয়ে, বড়ো বড়ো ডানায় ভর করে, হাওয়ায় ভেসে চলাকে গ্লাইডিং বলে। নবম শতাব্দীতে আরবের কবি ও বিজ্ঞানী আব্বাস ইব্‌ন্‌ ফিরনাসের বইয়ে এমন একটি গ্লাইডিংয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, এছাড়া একাদশ শতাব্দীতে ম্যাল্মেসবুরি অ্যাবের মংক (সন্ন্যাসী), ইলমারও গ্লাইডিংয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তবে দুটি ক্ষেত্রেই চালক গুরুতর আঘাত পাওয়ার ফলে, এই প্রচেষ্টায় কিছুদিনের মতো বিরতি পড়েছিল।

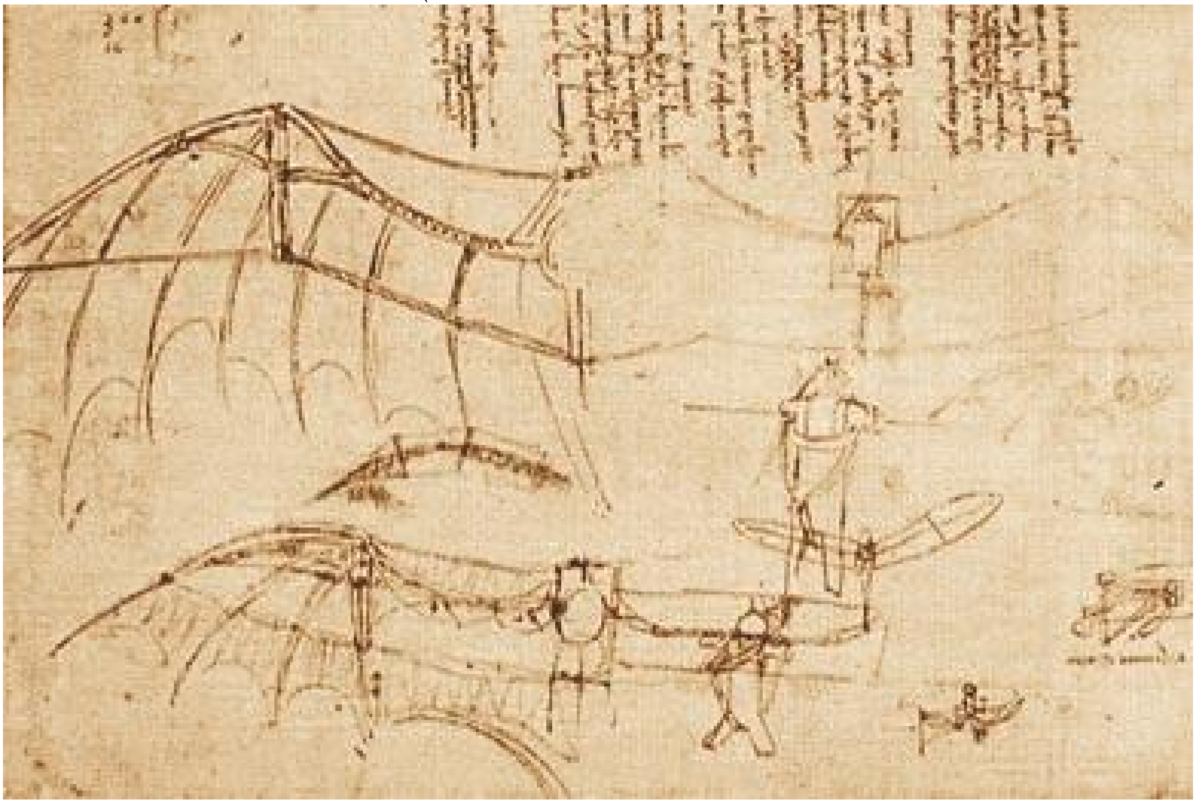

তারপর, ১৫০২ সালে বিখ্যাত শিল্পী ও বিজ্ঞানী লিওনার্ডো দা ভিন্সির “কোডেক্স অন দি ফ্লাইট অফ বার্ডস” নামক একটি গ্রন্থে, পাখির ডানা নিয়ে কিছু গবেষণার কথা এবং সেই পদ্ধতিতেই, মানুষের শক্তিতে চলতে পারে এমন একটি উড়ানযানের নকশা পাওয়া গেছে।

এরপর স্যার জর্জ কেলি, ১৭৯৯ সালে আধুনিক উড়োজাহাজ (Ai r pl ane) বানানোর ধারণা সামনে আনলেন। এই উড়ান যন্ত্রের ডানাদুটি ফিক্সড এবং শূণ্যে ভেসে ওঠার জন্যে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা ছিল। ১৮০৩ সালে কেলি সায়েব, এরকম একটি মডেল প্রথমে বানিয়েছিলেন। তারপর ১৮৫৩ সালে প্রথম যাত্রীবাহী গ্লাইডার বানাতেও সফল হয়েছিলেন। এরপর ১৮৫৬ সালে ফ্রান্সের জাঁ মেরি লা ব্রিস প্রথম শক্তিচালিত গ্লাইডার বানিয়েছিলেন। তার নাম ছিল ‘গ্লাইডার লা আলবাট্রস আর্টিফিসিয়েল’। এটিকে ঘোড়ায় টানত, এবং সমুদ্রের তীরে আলবাট্রস (Albatross) পাখির মতোই উড়তে পারত!

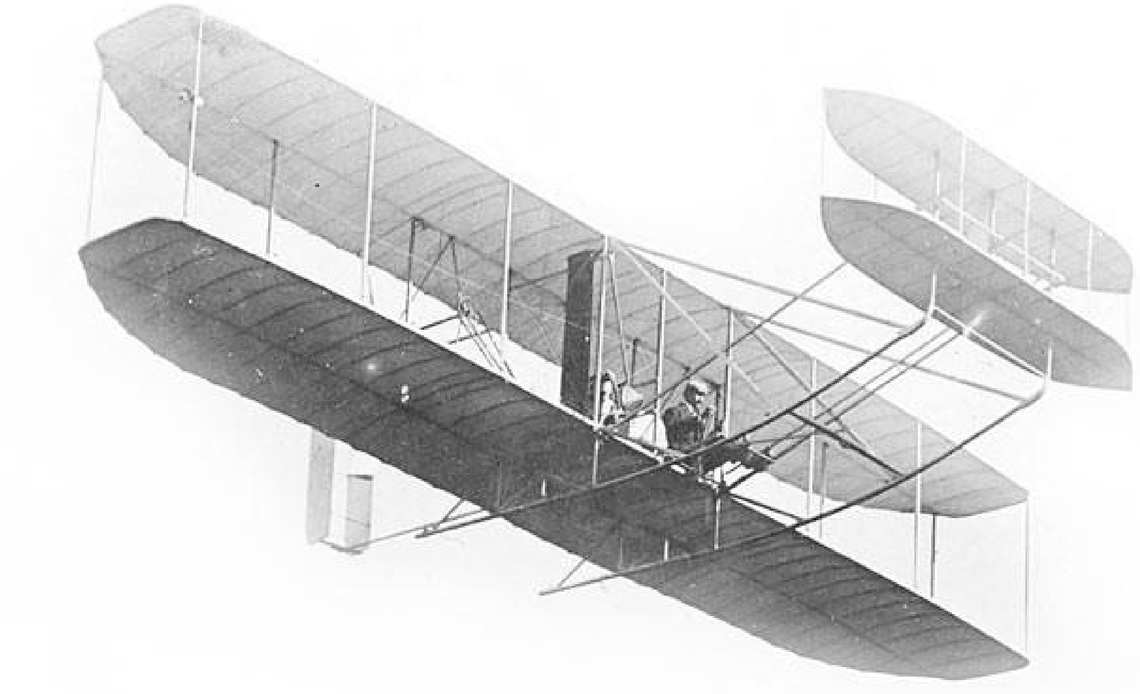

১৯০৩ সালে আমেরিকান দুই ভাই অরভিল আর উইলবার রাইট, যাঁরা রাইট ব্রাদার্স নামে বিখ্যাত, প্রথম শক্তিচালিত উড়োজাহাজ বানাতে সফল হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁদের বানানো রাইট ফ্লায়ার৩ (Wright Flyer III) , সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, বেশ অনেকটা সময় খুব সাবলীলভাবে উড়তে সক্ষম হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর, অরভিল রাইট নিজেই পাইলট হয়ে, ৩৩ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে প্রায় ২০.৭৫ মাইল উড়েছিলেন এই উড়ানযন্ত্রে। একটি ইঞ্জিন লাগানো এই উড়ানের শূণ্যে ভেসে উঠতে (take off) , ডান বা বাঁ দিকে (right or left turn) মোড় নিতে এবং মাটিতে নেমে আসতে (landing) খুব অসুবিধে হয় নি।

আধুনিক উড়ান বিদ্যায় প্রোপালশান (propulsion) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রোপালশান মানে কোন বস্তুকে হাওয়া বা জলের মধ্যে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। যে যন্ত্র বা পাখা এই প্রোপালশানের কাজটি করে, তার নাম প্রোপেলার। প্রো (pro) মানে সামনের দিকে, আর পেলার (peller) মানে চালানো। তার মানে, যে যন্ত্র সামনের দিকে চালায়, তাকে বলে প্রোপেলার, আর এই ঘটনাটাকে বলা হয় প্রোপালশান।

তোমাদের মধ্যে যারা নিউটনের তৃতীয় নিয়মের কথা শোনোনি, তাদের জন্যে সংক্ষেপে বলি, যে কোন ক্রিয়ার একটি বিপরীতমুখী ও সমান প্রতিক্রিয়া থাকে। জন্মদিনের সময় বাড়িতে নিশ্চয়ই বেলুন ফোলাও। সে সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, বা না করলে, এর পরের জন্মদিনে লক্ষ করবে। একটা বেলুন পুরোপুরি ফোলানোর পর, বেলুনের মুখটা বন্ধ করার আগে, হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেলে, বেলুনের থেকে হাওয়াটা সজোরে বেরিয়ে যায়, আর বেলুনটা চুপসে যেতে যেতে, পিছনের দিকে, এদিক সেদিক দৌড়োতে থাকে। এই ঘটনা নিউটনের তৃতীয় নিয়ম এবং প্রোপালশান ব্যাপারটা বোঝার খুব সুন্দর একটা উদাহরণ। ফোলানো বেলুনের মধ্যে জমে থাকা হাওয়াটা, খোলা মুখ দিয়ে সামনের দিকে হুশ হুশ করে যে গতিতে বের হয়, তার উল্টোদিকেও একটা সমান ধাক্কা তৈরি হয়, আর সেই ধাক্কায় বেলুন

পিছনের দিকে দৌড়োতে থাকে। যতবড়ো বেলুন হবে, যত বেশি হাওয়া ভরবে, খোলা মুখ পেলে, বেলুনটা পিছনের দিকে তত বেশি জোরে এবং দূরে দৌড়োবে।

একই নীতিতে প্রপেলারের ভিতর দিয়ে যত বেশি হাওয়া, যত দ্রুত পিছনের দিকে

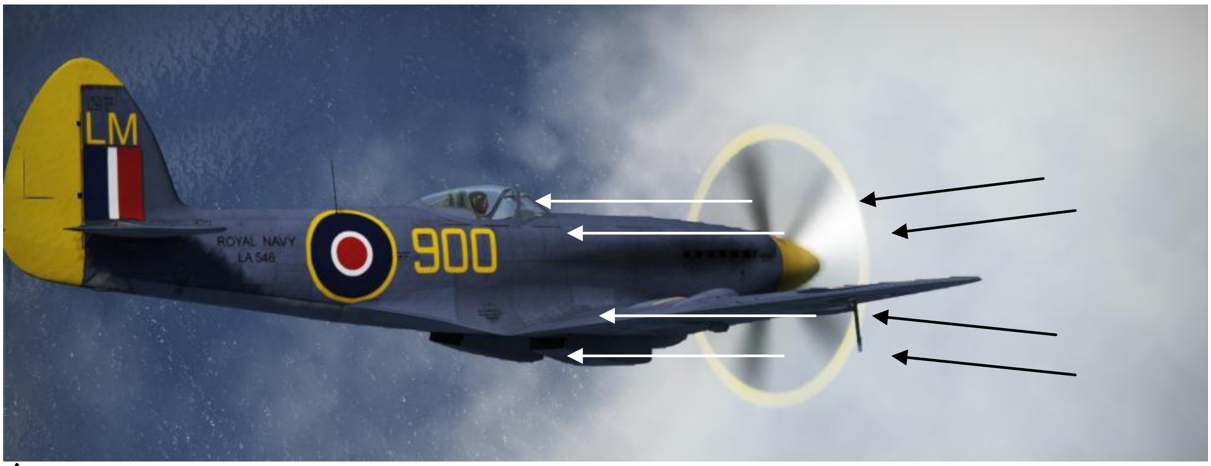

ঠেলতে পারা যায়, উড়োজাহাজ তত দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের উড়ানের জন্যে, এই প্রোপালশানের এখনো পর্যন্ত চারটে প্রধান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমটি, প্রোপেলার, দ্বিতীয় টারবাইন (turbine) বা জেট (jet), তৃতীয় র‍্যামজেট (ram jet) এবং চতুর্থ রকেট (rocket)।

গরমের দিনে, আমাদের ঘরে ঘরে যে সিলিং ফ্যান ঘুরে, আমাদের হাওয়া দেয়, সেই ফ্যানও কিন্তু খুব সহজ ধরনের প্রপেলার। একটু লক্ষ্য করে দেখবে, পাখার ব্লেডগুলো সামান্য ব্যাঁকা(twisted) হয়। পাখার সুইচ অন করলে, মোটরের সঙ্গে পাখার ব্লেড ঘুরতে থাকে এবং পাখার ওপরের দিকের হাওয়াকে নিচের দিকে ঠেলতে থাকে। ঠিক একই নিয়মে উড়োজাহাজের সামনে এবং ডানায় লাগানো পাখা যখন ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রচণ্ড জোরে ঘোরানো হয়, সামনের হাওয়াকে প্রচণ্ড বেগে পিছনের দিকে ঠেলতে থাকে। তখন উড়োজাহাজ সামনের দিকে এগোতে থাকে, এবং সামনের দিকে হাওয়ার চাপ কম হওয়ার কারণে উপরের দিকে উঠতে থাকে। যত বেশি পরিমাণ হাওয়া পিছনের দিকে ঠেলতে পারা যাবে, ততই উঁচুতে উঠবে এবং সামনের দিকে এগোতে থাকবে উড়োজাহাজ।

রাইট ভাইদের সাফল্যের পর, উড়ান ব্যাপারটা আর অসম্ভব বলে মনে হল না, বিজ্ঞানীদের কাছে। সমস্ত ইউরোপে এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা জোর কদমে শুরু করে দিলেন উড়োজাহাজ তৈরির চর্চা। প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিন আর প্রপেলার সিস্টেমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে, দিন দিন উন্নত হতে থাকল উড়ান যাত্রা। ১৯০৯ সালে ২৫শে জুলাই, লুই ব্লেরিয়ট উড়োজাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে জিতে নিলেন ১০০০ পাউণ্ড পুরস্কার এবং রাতারাতি সারা বিশ্বে তিনি এবং তাঁর উড়োজাহাজ বিখ্যাত হয়ে উঠল।

উড়োজাহাজের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে গেল। উড়োজাহাজকে প্রথম যুদ্ধের কাজে লাগালো ইটালি। ইটালি- তুর্কির যুদ্ধে, ১৯১১ সালের ২৩শে অক্টোবর, ইটালি প্রথমে উড়োজাহাজ পাঠিয়েছিল শত্রুপক্ষের যুদ্ধের শক্তি পর্যবেক্ষণের জন্য; কোথায় কোথায় আঘাত হানলে, শত্রুপক্ষকে সহজেই দুর্বল করে ফেলা যাবে। এরপর ১লা নভেম্বর, ১৯১১ থেকে ইটালি বোমা ফেলার জন্যে তুর্কিতে উড়োজাহাজ পাঠাতে শুরু করেছিল। সেই দেখে প্রথম বল্‌ক্যান যুদ্ধে (১৯১২- ১৩), বুলগেরিয়াও পর্যবেক্ষণ ও বোমা ফেলার জন্যে উড়োজাহাজের সাহায্য নিয়েছিল। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪- ১৮)

মিত্রশক্তি ও কেন্দ্রীয়শক্তি, উভয় পক্ষই আক্রমণের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য এবং পর্যবেক্ষণের জন্যও উড়োজাহাজের ব্যাপক ব্যবহার করেছিল। সত্যি বলতে কী, যে দেশ যুদ্ধের জন্যে উড়োজাহাজকে সবথেকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিল, তাদের পক্ষেই যুদ্ধ জয় করা সহজ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সব থেকে সফল উড়োজাহাজ ছিল ফকার ডি.আর.- ১

(Fokker DR 1)। প্রথম যুদ্ধবিমানের মধ্যে এই মডেলটিকেই সবচেয়ে সফল বলে ধরা হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে এই বিমান বিশ্বযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল। শত্রুপক্ষের ঘাঁটি লক্ষ করে বোমা ফেলা, বিমান থেকে হালকা কামানের সাহায্যে বিপক্ষের বিমান ধ্বংস করা, চট করে ওঠানামা এবং উড়তে উড়তে এদিকে সেদিকে ঘোরাফেরা করার ব্যাপারেও সেই সময়কার অন্যান্য বিমানের থেকে এই বিমান অনেক সাবলীল ছিল। ১৯১০ সালে, মাত্র ২০ বছর বয়সে জার্মানিতে পড়তে গিয়ে, অ্যান্টনি ফকার নামে একজন ডাচ যুবক প্রথম একটি বিমানের মডেল তৈরি করেন। তারপর ১৯১২ সালে জার্মানির বার্লিন শহরে 'ফকার এয়ারপ্লেনবু' নামে নিজের বিমান নির্মাণের কোম্পানি খুলেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানের ব্যবহার সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। ইউরোপ, আমেরিকা তো বটেই, বিশ্বের অন্যান্য প্রধান প্রধান দেশগুলিও বিমানপ্রযুক্তির উন্নতির জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। ১৯১৯ সালের জুন মাসে, জন অ্যালকক আর আর্থার ব্রাউন নামে দুই ব্রিটিশ, একবারও না থেমে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। তাঁদের বিমানটি ছিল ব্রিটিশ বিমান 'ভাইকারস ভিমি' মডেল, এই বিমান প্রথম ও পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ভারি বোমারু বিমান হিসাবে সফল হয়েছিল। কানাডার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেন্ট জনস শহর থেকে ১৪ই জুন দুপুর ১.৪৫- এ রওনা হয়ে এই বিমান পরের দিন ১৫ই জুন, সকাল ৮.৪০- এ আয়ারল্যাণ্ডের গলওয়ে শহরে পৌঁছেছিল। মাত্র ১৫ ঘন্টা ৫৭ মিনিটে (দুটো দেশের কালক্ষেত্র অর্থাৎ time-zone কিন্তু আলাদা) ওই বিমান ৩০৪০ কিমি পাড়ি দিয়েছিল, সমুদ্রতল থেকে ৩৭০০মি উচ্চতায় এবং গড় গতি ছিল ঘন্টায় ১৮৫ কিমি। এই বিপুল সাফল্যের পরেই, ছোট হাল্কা যুদ্ধ বিমানের

পাশাপাশি শুরু হয়ে গেল, নিয়মিত যাত্রী পরিবহনের জন্যে ভারী আর বড়ো বিমান বানানোর প্রচেষ্টা। সে কথা বলবো পরের সংখ্যায়।

[পরবর্তী সংখ্যায় আরো অনেক বিমানের কথা]

একালের জীবক রসায়নবিদ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

সংহিতা

জীবকের শিক্ষা সমাপনে তাঁর গুরু তাঁকে বলেছিলেন একটা গাছ খুঁজে আনতে যা মানুষের কোনো কাজে, কোনো অসুখের উপশমে লাগে না। জীবক ফিরেছিলেন খালি হাতে। রসায়নবিদ অসীমা চট্টোপাধ্যায় জীবকের উত্তরসূরী। তিনি প্রচলিত ভেষজের রস থেকে চিনে নিতে চেয়েছিলেন কোন পদার্থগুণে কোন গাছের কোনো কোনো রোগ উপশমের ক্ষমতা তৈরি হয়। জৈব রসায়নের ছাত্র ও সাধক হিসেবে তিনি প্রাণ আর অপ্রাণের সেতুটা বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন।

জন্মসূত্রে অসীমা মুখোপাধ্যায় মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সালে। কলকাতাতেই তাঁর ছাত্রজীবনের শুরু। ইস্কুলের পালা চুকিয়ে তিনি রসায়ন পড়তে শুরু করেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। তখন সে কলেজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। ১৯৩৬ সালে তিনি রসায়নে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ১৯৩৮ এ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন জৈব রসায়নে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। সেখানেই শুরু হয় তাঁর সাধনার পরবর্তী অধ্যায় জৈব রসায়নের গবেষণা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বোস।

তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কৃত্রিম জৈব যৌগ। তাঁর সামগ্রিক গবেষণার মধ্যে সবচেয়ে চর্চিত গবেষণাগুলি নয়নতারা জাতীয় গাছ থেকে পাওয়া

উপক্ষার নিয়ে। তাছাড়াও তাঁর মৃগী ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধের উদ্ভাবন-সংক্রান্ত গবেষণাগুলিও বিশেষভাবে চর্চিত।

সে সময় ভারতবর্ষের ডক্টরেট উপাধি পাওয়া মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল মাত্র একজন। জানকি আম্মাল। ১৯৩১ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সে উপাধি দেয়। ১৯৪৪ সালে প্রথম কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের বিজ্ঞানচর্চাকে স্বীকৃতি দিল। অসীমা চট্টোপাধ্যায় ডক্টরেট করলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রকাশিত হল ভারতীয় ভেষজ নিয়ে তাঁর বহুচর্চিত গবেষণাপত্র "*Indol-Alkaloids and Coumarin of Indian Medicinal Plants*"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে তাঁর গবেষণা পৌঁছেছিল ম্যাডিসনের ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন ক্যাম্পাসে এবং পাসাডিনার ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিট্যুট অফ টেকনোলজিতে। লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের হাতে, ১৯৪০ সালে। সেখান থেকে, ১৯৫৪ সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে।

সারা জীবনে নানান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করেছে সাম্মানিক ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রি দিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি থেকে শুরু করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদ,ভারত সরকারের শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার - সবই তিনি অর্জন করেছিলেন। এমনকি তিনি রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্যও ছিলেন।

ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের এই সাধককে হারায় ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বর। কৃত্রিম জৈব রাসায়নিক এবং উদ্ভিজ্জের রাসায়নিক ও নানান রোগ নিরাময়ে সেগুলির ভূমিকা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কাছে অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণাগুলি গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়।

বছরভোর বসন্তবৌরি

মনস্বিনী ঘোষাল

ছোটোবেলায় গরমকালে, স্কুলছুটির নির্জন দুপুরে ‘কুব্- কুব্- কুব্’ করে অবিরাম একটা শব্দ শুনতে পেতাম। মাকে জিজ্ঞেস করতে জেনেছিলাম যে ওটা একরকম পাখির ডাক। কিন্তু, কী পাখি, কেমন দেখতে – এসব ব্যাপারে তখন কৌতূহল হয়নি।

তারপর, একটু বড়ো হয়ে, যখন থেকে পাখি নিয়ে কৌতূহল বাড়তে লাগল এবং বার্ড-ওয়াচিং ব্যাপারটা খুব উপভোগ করতে লাগলাম, তখন সেই চেনা ডাকের অচেনা পাখিটিকে খুঁজে দেখার চেষ্টা শুরু করলাম। কিন্তু গাছের পাতার আড়ালে, কোন ভেতরের ডালে বসে পাখিটি অনবরত ডেকে যেত, কিছুতেই দেখতে পেতাম না। এক দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই, সেই একই ডাক শুনে ছুট্টে গেলাম বারান্দায়। দেখলাম সামনের বটগাছের ডালে বসে, আমার সঙ্গে পরিচয় করবে বলেই যেন, এই পাখিটি ডেকে চলেছে ।

চড়াই- এর থেকে সামান্য বড়, গায়ের রঙ গাছের পাতার মতই সবুজ, কিন্তু গলা আর মাথায় উজ্জ্বল লাল ও হলুদ রঙের ছোপ। এরা শীতকালে চুপচাপ থাকে। যত গরম বাড়ে, এদের গলার আওয়াজও তত বাড়ে। সাধারণত এরা একলা থাকতে ভালোবাসে।

এখন ভোরবেলায় বারান্দায় দাঁড়ালে প্রায় রোজই দেখতে পাই এই পাখিটিকে – যার ইংরিজি নাম “Coppersmith Barbet” । সামনের বটগাছটি থেকে মুখে করে ফল নিয়ে আসে, তারপর সামনের তারে বসে, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ব্রেকফাস্ট করে, আর যেন বলে ‘গুড মর্নিং’।

ছবিঃ লেখক

তারা- নাক মোল

কী ভাবছ? ভিনগ্রহী?

উঁহু সেসব কিছু নয়। একেবারেই পৃথিবীর জীব। ওর নাম ‘তারা’নাক মোল বা স্টার নোজড মোল।

তার ভালো নাম Condylura cristata। মাত্রই বিশ সেন্টিমিটার লম্বা, পঞ্চাশ গ্রাম মতন ওজনের এই ইঁদুর জাতের জীবের নাকের চারপাশে গোটা বাইশেক সরু সরু মাংসল আকর্ষী থাকে। সেইটেকে একখানা তারার মতন খুলে ধরে সে পথ চলে।

আকর্ষীগুলো সাংঘাতিক সংবেদনশীল। মানুষের হাতের অতবড়ো তালুতে যেখানে আছে মাত্র সতেরো হাজার সংকেত সংগ্রাহক রিসেপটর সেখানে ওই খুদে খুদে ২২টা আকর্ষির মধ্যে আছে পঁচিশ হাজারেরও বেশি রিসেপটর। মানুষের হাতের চেয়ে ছ গুণ বেশি সংবেদনশীল ওই আকর্ষীদের দিয়ে সে তার খাদ্য খোঁজে। তবে শুধু খাবারদাবারই নয়। ও দিয়ে সে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষও টের পেয়ে যায়।

আসলে প্রাণীটা প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ। ওই নাকের গায়ের আকর্ষীগুলো তার চোখের কাজটা করে দেয়, এবং তা করে বেজায় ভালোভাবে। কতটা শক্তিশালী তার নাক? দেখা গেছে, চারপাশে ছড়ানোছটনো নানান বস্তুর মধ্যে পছন্দের খাদ্য পোকাটির গায়ে আকর্ষী ঠেকলে

সেটাকে খাদ্য হিসেবে চিনে নিতে তার সময় লাগে এক সেকেন্ডের একশোভাগের হাজার ভাগের আট ভাগ বা আট মিলিসেকেন্ড। যেকোন জীবের নিউরোন বা নার্ভকোষের তথ্য পরিবহনের ওইটেই সর্বোচ্চ গতি। ওর চেয়ে বেশি গতিতে আর কোন প্রাণীর নিউরোন তথ্য পরিবহন করতে পারে না যে শুধু তাই নয়, গঠনগতভাবে কোন নিউরোনের তথ্য পরিবহনের গতি ওর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষ তার কাছে একেবারে শামুকের মতই ধীরগতির জীব। একই কাজ করতে মানুষের মস্তিষ্ক সময় নেয় এক সেকেন্ডের ষাট শতাংশ, বা ছশো মিলিসেকেন্ড।

বুঝতেই পারছ, শুধু দ্রুতগতির নিউরোন দিয়ে এ কাজটা হবে না। নিউরোনের বয়ে আনা খবরকে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য মস্তিষ্ককেও বেজায় গতিতে কাজ করতে হবে, তাইতো? পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের মস্তিষ্কের অর্ধেকের বেশি শুধুমাত্র ওই আকর্ষীদের কাজ করাবার জন্য নিযুক্ত থাকে সবসময়।

খাবার হিসেবে আন্দাজ করতে পারবার সঙ্গেসঙ্গে সে তার আকর্ষীদের মধ্যে এগারো নম্বর জুটিটাকে শিকারের গায়ে ঠেকিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। মানুষের চোখের ভেতর যেমন একটা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল বিন্দু থাকে যাকে বলে পীতবিন্দু বা ইয়েলো স্পট, ঠিক তেমনই এদের এই এগারো নম্বর আকর্ষী জুটি সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল হয়ে থাকে। মজার কথা হল, এই এগারো নম্বর জুটিতে রিসেপটরের সংখ্যা কিন্তু অন্য আকর্ষীগুলোর চেয়ে কম। কিন্তু তবুও এর শক্তি বেশি হয় কারণ এই এলাকার রিসেপটরগুলোর প্রত্যেকটার সঙ্গে অনেক বেশি সংখ্যায় নিউরোন জোড়া থাকে খবর আনানেওয়ার জন্যে।

আর সে কাজটি করবার পর খাবারটিকে ধরে মুখে চালান করে চুয়াল্লিশখানা দাঁতে তাকে চিবিয়ে গিলে ফেলতে সে সময় নেয় এক সেকেন্ডের বারো ভাগের এক ভাগ বা একশ কুড়ি মিলিসেকেন্ড। নেচার পত্রিকা তাই তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুত খাইয়ে- র শিরোপা দিয়েছে। দ্রুততম খাইয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও।

শুধু কি তাই? জলেস্থলে চড়ে বেড়ানো এই সাংঘাতিক খাইয়েটির আরো একটা গুণ আছে। সে জলের তলায় গন্ধ শুঁকবার কৌশল আবিষ্কার করে ফেলেছে। জানোই তো, গন্ধ বস্তুটা হল বাতাসে ভাসমান কোন বস্তুর কণা। সেইটে নাকের ভেতর এসে ঠেকলে গন্ধধরা কোষেরা মস্তিষ্কে তার ব্যাপারে খবর পাঠালে আমরা কোন জিনিসের গন্ধ পাই। জলের তলায় বাতাস নেই, তাই গন্ধও পাওয়া যাবে না। তা, 'তারা'নাক মোল বেজায় চালাক। জলের নীচে ঘোরাফেরা করবার সময় কোনো জিনিসের গন্ধ শুঁকতে চাইলে সে করে কি? একটা ঢেঁকুর তোলে। সেটা জলের ভেতর একটা বুদবুদের মত বের হয়ে আসে। বুদবুদটা লক্ষ্যবস্তুর গায়ে ঠেকবার পর সে ফের সেটাকে ওপরের দিকে উঠে যাবার আগেই সুড়ুত করে টেনে নেয় মুখের ভেতর। গন্ধমাখা হাওয়া থেকে এইবার গন্ধকে বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না তার নাকের কোষদের।

এরা থাকে সাধারণত পাশে দেয়া মানচিত্রের রঙ করা অংশটায় বিভিন্ন ভেজা জলাজমি এলাকায়।

শীতের জন্যে চর্বির সঞ্চয় তৈরি করে লেজের ভেতর। পেঁচা আর পাইক মাছ সাধারণত এদের প্রধান শত্রু হয়।

ডুমুর

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ঘুরে ঘুরে বাজার করতে কার না ভাল লাগে। চারিদিকে সবুজের সমাহার, সবুজ আর সবুজ। প্রায় সব জায়গাতেই রাস্তার ধারে বাজার বসে। মানুষের হাঁটার জায়গাতেই ঝুড়ি নিয়ে বসে ব্যাপারীরা। যেখানে সবজি বাজার করি সেই বাজারটি একেবারে স্টেশনের পাশে। মালগাড়ি থেকে মাল নামিয়ে যে'সব বড়ো বড়ো গুদামঘরে রাখা হয় সেই গুদামঘরে যাওয়ার রাস্তার ধারেই এই বাজারটি বসে। রাস্তাটি পাথরের। ইটের মাপের পাথরগুলি রাস্তায় সাজানো। তাই রাস্তাটি কিছুটা এবড়োখেবড়ো। বর্ষাকালে জলকাদায় প্রায় অগম্য হয়ে পড়ে। মাঝেমাঝে যখন মালবোঝাই লরিগুলি চলাচল করে, মনে হয় যেন মূর্তিমান বিভীষিকা। দু'দিকে বাজার বসার ফলে রাস্তা সরু হয়ে গেছে, তাই লরি এলেই মনে হয় এই বুঝি চাপা পড়লাম।

বাজারের শুরুতেই অবাঙালি ফড়েরা বসে। চালানিনী মাল যা আসে সেগুলি পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর ঢেলে বিক্রি করে। আর বাজারের অপর প্রান্তে গ্রাম থেকে যে সব মেয়েরা ঝুড়ি করে শাকসবজি নিয়ে আসে তাদের স্থান হয়। আমার লক্ষ্য থাকে এদের কাছে পৌঁছান। কেউ হয়ত মোচা বা থোড় আনে, কেউ শাক। মাঝে মাঝে মিলে যায় ডুমুর। ডুমুর আমার প্রিয়, কিন্তু সেটি আনার অসুবিধা রয়েছে। আনলে সেটি কাটবে কে, রান্নার মেয়েটির সময় নেই। ঝড়ের গতিতে রান্না করে চলে যায়। বাজারের থলিতে ডুমুর দেখলেই তার মুখ ভার।

ছোটো ঝুড়িতে করে ডুমুর আনে গ্রামের মেয়েরা। একটা ছোটো পলিথিন বিছিয়ে এক পাশে

নিজে বসে আর বাকি অংশে ডুমুরগুলি কয়েকটি ভাগ করে সাজিয়ে রাখে। বেশির ভাগ সময়ে ওজন করতে হয় না, এক একটি অংশের মূল্য ঠিক করা থাকে। তবে বেশি পরিমাণ ডুমুর নেবার প্রয়োজন হলে ওজন করে নিতে হয়। ডুমুরের সাইজ বড়ো হলে সেগুলি শক্ত হয়, তাই মাঝারি মাপটাই রান্নার পক্ষে সুবিধাজনক। পাকা ডুমুর আনা চলবে না, সেগুলি রান্নার পক্ষে অযোগ্য তবে পাখি আর হনুমানের বড়ই প্রিয়।

বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনকে দীর্ঘ দিন না দেখতে পেলে তাকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলে থাকি "কীরে, তুই ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি নাকি?" ডুমুর গাছে ফুল আমরা দেখতে পাই না তাই বাংলায় এই প্রবাদ বাক্যটির চল হয়েছে। তবে ডুমুরের ফুল হয়। ডুমুর কাটলেই তার ভিতরে ফুল এবং বীজ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণের পুষ্পবিন্যাসের নাম উদুম্বর পুষ্পবিন্যাস। গাছের গুঁড়িতেই ডুমুর ধরে থোকা থোকা। ফল পাকলে হলুদ হয়ে যায়, আর ভিতরটা লাল। গাছের পাতাগুলি খসখসে। মনে পড়ে ছোটবেলায় মাঠেঘাটে ছুটে বেড়ানোর সময় হাতে পায়ে শুঁয়ো লেগে গেলে সেগুলি ছাড়ানোর জন্য ডুমুর গাছের পাতা ঘসতাম। শুঁয়োগুলি উঠে গেলেও চুলকুনি কমত না।

ডুমুর গাছের রস ঘন দুধের মত, সাদা রঙের আঠালো। আয়ুর্বেদের ভাষায় এই জাতীয় গাছকে ক্ষীরীবৃক্ষ বলে। বট অশ্বত্থ পাকুড় এই জাতীয় গাছ। ডুমুর গাছের দুধের মত ঘন রসের ভেষজ গুণের কথা আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "শরীরের কোন জায়গায় গ্রন্থিস্ফীতিতে লাগিয়ে দিলে প্রদাহ বা ব্যথা কমে যায় এবং বসেও যায়, গ্রামাঞ্চলে এটা লাগিয়ে

দিলে তার উপর লবন ছড়িয়ে দিতে দেখেছি এবং অর্শরোগে ও অতিসারে খাওয়ার জন্য একে ব্যবহার করা হয়, এটা লেখা আছে ওয়াট সাহেবের সংগ্রহ গ্রন্থে।"

গ্রামাঞ্চলে ডুমুরের ঔষধীরূপে ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হয়েছে বইয়েতে। কয়েকটি ব্যবহারের কথা এখানে উল্লেখ করা হল।

- সরু ডাল সমেত কচিপাতার রস বোলতা ভীমরুলের হূল বা অন্য কোন পোকার কামড়ে ব্যবহার করা হয়।
- কুকুর বিড়ালের আঁচড় কামড় সহ আঘাতজনিত ব্যাথা ফোলায় এই রস উপকারী।
- কোন জায়গা কেটে রক্তপাত হলে কচিপাতা ও সরু ডালের রস ফুটিয়ে ঘন করে [ঘনসার] ক্ষতস্থানে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- গলার ব্যাথা বা মুখের ক্ষতে ঘনসারের সঙ্গে জল মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।
- দাঁতের গোড়া বা মাড়ি ফোলা, দাঁতের দুর্গন্ধ রোধে ঘনসারে জল মিশিয়ে তরল করে কুলকুচি করলে রোগের উপশম হয়।

এদেশে বেশ কয়েক ধরণের ডুমুর গাছ দেখা যায়। তবে আমরা যে গাছের ফল রান্নায় ব্যবহার করি তার বিজ্ঞান সম্মত নাম Ficus cunia . এই গাছটি Moraceae পরিবারভুক্ত।

সাধারণ ডুমুরের তুলনায় একটু বড়ো ফল ধরে এমন এক ধরণের ডুমুর গাছ রয়েছে যার নাম যজ্ঞডুমুর। এই যজ্ঞডুমুরের পল্লব 'সূতিকা হোমে' অর্থাৎ সূতিকাগৃহে যে হোম করা হয়, সেখানে

ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া যজ্ঞডুমুরের ব্যবহার রয়েছে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য। পারলৌকিক শ্রাদ্ধ এবং বৃষোৎসর্গে এই বৃক্ষের ব্যবহার রয়েছে।

কেম্যাজিক

অধ্যাপক পান্নালাল গোস্বামী

মোনালিসার আত্মাহুতি

“এই সেই মোনালিসা, যার ভুবনমোহিনী হাসিতে সমগ্র বিশ্ব আলোড়িত। অপূর্ব এক রূপলাবণ্য, নিষ্পাপ সহজ সরল মুচকি হাসিতে দর্শককে এক অচেনা জগতে নিয়ে চলে যায়। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য, গল্প, কবিতা ও গানে কতবার যে এই অপরূপ সৃষ্টির কথা বিধৃত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। এক বিমূর্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার স্রষ্টা সৃষ্টি করলেন সেই স্বর্গীয় হাস্যমধুর রূপকল্প- এক মুখচ্ছবি-- ”

জাদুকর এভাবে বলতে থাকার সময় এক শাগরেদ মোনালিসার ছবি আঁকা একটা ক্যালেণ্ডারের সমান কাগজ এনে একটা স্ট্যান্ড-এ আটকে দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল। এদিকে যাদুকরের বক্তৃতা চলছে-

“কে ছিলেন এই ছবিটির স্রষ্টা? কে সেই ঈশ্বরের বরপ্রাপ্ত শিল্পী, যাঁর জাদুকরী হাতের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো এক অপরূপা নারী? তিনি হলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। একধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী। তাঁর অবদানকে বর্তমানের চিকিৎসকরাও মাথা নুইয়ে স্বীকৃতি জানায়। দিনের পর দিন লাশকাটা ঘরে দুর্গন্ধময় পরিবেশে থেকে নিরলস সাধনায় আঁকতে থাকলেন শরীরের বিভিন্ন শিরা-উপশিরার পুংখাণুপুংখ অবস্থান, মাংসপেশীর স্তরে স্তরে থাকার দৃশ্য, যার পরিণামে চিকিৎসা জগতে এল বিপ্লব।”

বলছেন আর বারবারই খুব ভলো করে ফটোটাকে নিরীক্ষণ করছেন জাদুকর। আবারও আরম্ভ করলেন, “শুধু কি তাই? প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এক মহান গবেষক। বাতাসে অনায়াসে উড়ে বেড়ানোয় পাখিদের ডানা এবং পালকের যে একটা মস্তবড়ো ভুমিকা আছে সেটা উপলব্ধি করে দিনের পর দিন বিভিন্ন পাখিদের তির্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। আঁকতে থাকলেন অসংখ্য পাখির ডানার আকৃতির বিশেষত্ব। ডানার ওপর দিয়ে জোরে বয়ে যাওয়া বাতাস ডানাদুটির ঠিক ওপরে সৃষ্টি করে নিম্নচাপ। ফলে তলার থেকে উচ্চচাপ বিশিষ্ট বাতাসই যে পাখিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেটা আবিস্কৃত হল। সৃষ্টি হল “এরোডাইনামিক্স” তত্ত্বের। এরই ওপর ভিত্তি করে এঁকে ফেললেন অনেক উড়োজাহাজের নক্সা।”

বলতেবলতেই দেখা গেল যে মোনালিসার ছবি আঁকা ওই কাগজ থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জাদুকর তার বক্তৃতা অন্যভাবে শুরু করলেন।

“আমাদের মোনালিসার মনে এখন ভীষণ দুঃখ। একটু আগেই খবর পেয়েছেন যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আর ইহজগতে নেই। স্রষ্টাই যেহেতু নেই, সেক্ষেত্রে বেঁচে থেকে কী লাভ? তিনি আত্মাহুতির পথটাই বেছে নিলেন।”

এ-রকম বলতে বলতেই দেখা গেল যে ফটোটা আপনা আপনি দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে। দর্শকরাও প্রচণ্ড হাততালিতে পুরো হলঘর কাঁপিয়ে তুলল।

ফটোটায় আগুন জ্বললো কী ভাবে?

কাগজের ফটোটির অর্ধেকমতো একটা বিশেষ দ্রবণে চুবিয়ে এনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিশেষ দ্রবণ হল সাদা ফসফরাস দ্রবীভূত করা

কার্বন ডাই- সালফাইডের। কার্বন ডাই- সালফাইড এক অতিশয় উদ্বায়ী তরল। জাদুকর বক্তৃতা দিতে থাকার সময় ওই কাগজ থেকে কার্বন ডাই-সালফাইড উবে গিয়ে সাদা ফসফরাসকে উন্মুক্ত করে দিলে ওটা তখন বাতাসে থাকা অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া আরম্ভ করে দেয়। এই বিক্রিয়া সাংঘাতিক ধরনের তাপবর্জী (Exothermic)। এই তাপে বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে কাগজে আগুন ধরে যায়। এটাও একধরনের জারণ বিক্রিয়া (Oxidation reaction)

P_4+5O_2 ---→ 2P_2O_5+তাপ

কাগজ+তাপ+O_2(বাতাস) → আগুন।

এই আগুন জ্বলায় কাগজে রয়ে যাওয়া স্বল্প পরিমানের কার্বন ডাই-সালফাইডও দায়ী, কেননা এটাও এক অতিশয় দাহ্য পদার্থ।

সাবধানতা

- সাদা ফসফরাস যাতে কখনও উন্মুক্ত না থাকে। এটাকে সবসময় জলের নীচে রাখতে হবে।
- কার্বন ডাই-সালফাইডে করা দ্রবণের ওপর আধ থেকে এক সেন্টিমিটারের মতো একটা জলের স্তর সবসময় থাকতে হবে। জল আর কার্বন ডাই-সালফাইড অমিশ্রণীয়, উপরন্তু জলের ঘনত্ব কার্বন ডাই-সালফাইড-এর চেয়ে অনেক কম হওয়ার ফলে জল দ্রবণের ওপরে থেকে দ্রবণটিকে বাষ্পীভবন তথা অক্সিজেন থেকে রক্ষা করবে।
- ফটোর কাগজ থেকে কার্বন ডাই- সালফাইড উড়ে যাওয়ার সময়টা রিহার্সাল দিয়ে ঠিক করে নেবে যাতে জাদুকরের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

চলবে

কাঠঠোকরা: আর একটি পাখি যে সশব্দে ঘোষণা করে বসন্তের আগমন। বুকের কাছটায় গাঢ় লাল রং, আর সারাদিন কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠক ঠক শব্দ মানেই কাঠঠোকরা। একইভাবে একই গতিতে সে কাঠ ফুটো করে যেতে থাকে, আর প্রত্যেকবার ঠোঁট দিয়ে মারার পর একবার ডান, একবার বাম দিকে মাথা ঘোরায়। স্যার এডুইন আর্নল্ড তাঁর লাইট অফ এশিয়া বইতে ভারতের বসন্তকাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমের বোল ধরেছে, রোদ্দুরে পাখিরা চকমক করছে আর একা একাই সবুজ রঙের হাপরের মত কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে উচ্চকিত কাঠঠোকরা।" কিন্তু তুমি যদি জ্বরে কাবু থাক, তবে কাঠঠোকরার ঠক ঠক শুনতে শুনতে মাথা ধরবেই, সন্দেহ নেই।

চড়ুই

একটা পুঁচকে পাখি, এই যেখান-সেখান থেকে গলে যায়, উড়ে বেড়ায়, তা সে-ই হলো চড়াই পাখি। এই একটা পাখির খাবারের অভাব হয়না, মসজিদে দেখবে দুটো ছোটো পাত্রে একটাতে খাবার, একটাতে জল রাখা হয় ওদের জন্য। মন্দির, মসজিদে যত দর্শনার্থীরা আসেন, বেশিরভাগই গাছের তলায় খাবার আর জল রাখেন চড়ুইদের জন্য। ভারতীয় প্রবাদে বলে ভগবানের পাখি, ভগবানের মাঠ, তাই, খাও পাখি, তুমি পেট ভর্তি করে খাও।'

যদিও আসল ব্যাপারটা অন্য, রোজ মাঠ থেকে শস্য তুলে এনে ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের ঘরেই রাখে। পাখিকে খাওয়ানোর মত তুচ্ছ জিনিসের পরোয়া করেনা। নিজেরটা আগে। কিন্তু আসলে চড়ুই খুব উৎপেতে পাখি। এরা বোধহয় এমন জায়গা থেকে উড়ে আসে যেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। আর বাজ, শ্রাইক, বেজি আর

বনবিড়ালের মত এরাও খুব লুটপাট করে, জিনিসপত্র নষ্ট করে। অনেকের মুখেই চড়ুইয়ের এইসব কান্ডকারখানার কথা শোনা যায়। তবে লন্ডন শহরের চড়ুই পাখিরা অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বভাবের হয়। কিন্তু চড়ুইয়ের বাসা বাঁধার জায়গা সবসময় অন্যের বাড়ির ভিতর। যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না, ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ঘুলঘুলির মধ্যে, নাহলে জলের পাইপের মধ্যে। ঘরের মধ্যে ইঁদুরের চিঁ- চিঁ- র মত ডাকাডাকি, ডানা ঝাপটানো, তারপর বাসা বানানোর সরঞ্জাম যেমন খড়কুটো এদিক ওদিক পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রায়ই সকালে একটা পরিচিত দৃশ্য হল, বাড়ির গৃহিনীরা হয়ত একটা চেয়ার নিয়ে বাড়ির ছাদে মারছে বা কাজের লোকটি জানলা থেকে একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে- শূ শূ। তবে ভারতের কোন গ্রামে, চড়ুইয়ের ডাক, গরুর হাম্বা, কাঠবিড়ালির ছটফটানি, ঘুড়ির ওড়া, চাকার ঘড়ঘড়, গরুর গাড়ির চালকের গান, গ্রামের কুকুরের ডাক সব খুব স্বাভাবিক আর একটা গ্রামের চিত্র।

বাজপাখির সাহায্যে শিকার

এটি একটি প্রচলিত খেলা সিন্ধু এবং উত্তর ভারতে। এটা সাহিত্যের একটা বিষয়ও যেখানে বাজপাখিকে আলো বা খুব উজ্জ্বল রঙের চোখের, গোল বা লম্বা ডানা, সৎ অথবা অসৎ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু যাই হোক খেলাটা একটা বেশ অভিজাত খেলা। স্যার রিচার্ড বার্টন হলেন একমাত্র ইংরেজ লেখক যিনি একচেটিয়া এই বিষয়ের ওপর লিখেছেন। বাজপাখিকে আবার সাজান হয়, মাথার ওপর নরম হরিণের চামড়া, তার ওপর রেশম, সোনালী জরির কাজ করা, দস্তানা, টোপ আর ঘন্টা সবই পাঞ্জাবে তৈরি হয়। ইউরোপে টোপের সাথে পাখির ডানা লাগান থাকে। ভারতে তা থাকে না। আর শিকারী যখন তার পাখিকে নিয়ে বেরোয়, একটা বড়ো রিঙ শরীরে ঝুলিয়ে পাখিটাকে নিয়ে যায়। আর একাধিক পাখি নিয়ে গেলে দুটো সমান্তরাল প্রান্তে থাকে। বড় বড় শহরে একসাথে কতগুলো পাখি নিয়ে যায় দেখলে অবাক লাগে। এমনকি কারুর সাধ হল একটু ঘুরে বেড়াতে, তো হাতের বাজুতে বাজপাখি বসিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

লাহোরে একবার লর্ড ডাফারিন আর ডিউক অফ কনটের একটা সাক্ষাতের সময়, অনেক শিকারীরা এসেছিল তাদের বাজপাখি নিয়ে, তাদের সব রাজাদের বড়াই করতে। কিন্তু কর্তব্যরত কন্সটেবলরা তাদের পাখিসমেত ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল। কারণ জায়গাটা ছিল একটি সংরক্ষণশালা,

সেখানে কাচের বাক্সে বন্দি সব পাখিদের দেখলে যদি বাজপাখিগুলো উত্তেজিত হয়ে পড়ে? অবশ্য পাখিগুলোকে ঠিক করে ঢাকা দেওয়া থাকলে তাদের ঘুমন্ত বাচ্চার মত লাগত।

কিন্তু পাঞ্জাবে একবার বাজপাখির এই শিকার দেখতে গিয়ে একটু হতাশ হয়েছিলাম। একদিকে সুন্দর বাতাস, দূরে নীল আকাশের গায়ে সাদা স্বচ্ছ হিমালয় দেখা যাচ্ছে। হাওদা গায়ে দেওয়া হাতির দল আসছে, তাদের চওড়া কপালে নীল- সাদা প্রলেপ দেওয়া। আর একদিকে ঘোড়ার দল, বেঁধে থাকা কুকুরদের চীতকার। এদিকে বাজেরা উত্তেজিত, বারবার শেকল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করছে। শেষমেশ একজন পালাল এবং তাকে ধরতে কেউ ছুটল না বা বন্দুক চালাল না।

অবশ্য বাজপাখিদের ভালই শেখানো হয় এসব। আর তারা পুরস্কার হিসাবে পায় তাদেরই মারা কাক।

পাখিদের সম্পর্কে ছোটো ছোটো তথ্য

স্যান্ডপাইপার তার পিছনের দিকে ভর করে শুয়ে থাকে, কারণ সে বিশ্বাস করে যে সে এই মহাকাশকে অবলম্বন দিচ্ছে তার ওই সরু সরু পাগুলো দিয়ে। একটা সাদা- কালো মাছরাঙ্গা হঠাৎ করে হতবুদ্ধি হয়ে যায় যখন সে একভাবে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দিশেহারার মত জলে ডুবে যায়। একধরনের দোয়েল পাখি তারা শুধু দিঘী বা পুকুরের চারপাশে জায়গা খোঁজে, যেখানে ভিজে জামাকাপড় মেলা হয়। এদের ধোপানী বলা হয়। ফ্রান্সে এই একই পাখি, একই স্বভাবের, তাকে বলা হয় ল্যাভেন্ডার।

শিয়া মুসলিমরা তাঁদের মহাপুরুষ যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাদের নিয়ে অনেক রকম গল্প বুনে থাকেন। যেমন হুসেন আর হাসান নিহত হয়েছিলেন কারবালায়। কাকেদের রাজা বা কালো ফিঙে পাখি নাকি মৃতপ্রায় ইমাম হুসেনের জন্য জল

এনেছিল। আর ঘুঘু পাখি নাকি তার রক্তে ঠোঁট রাঙিয়ে উড়ে গিয়েছিল মদিনায় তার শহীদ হবার খবর দিতে।

এম এফ গ্রাউসের অনুবাদ করা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়লে, যাঁরা হিন্দি কাব্যের মধুর স্বাদ নিতে চান, তাঁরা বুঝবেন যে কী সুন্দরভাবে রূপকের ব্যবহারে ভালবাসার সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে। সেখানে পাখিরা তাদের চিরাচরিত পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"গান গাওয়া কোকিলেরা যেন তার অপরাজেয় হাতির দল, হিরণ তার ষাঁড়, উট আর খচ্চরদের পাল, ময়ূর, চকোর আর টিয়াপাখি তার যুদ্ধের ঘোড়া, আর পায়রা আর রাজহাঁস তার আরবের ঘোড়া। তার পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে আছে তিতির আর কোয়েল। আর এসব কিছুর হোতা হলো ভালবাসা। তাই তো শেষে বলা আছে - 'ভালবাসার সবচেয়ে বড় শক্তি লুকিয়ে আছে নারীর মধ্যে, কেউ যদি তাকে অতিক্রম করতে পারে সে সত্যিকারের বিজয়ী।'

বাদুড়

চামড়ার তৈরি ডানা নিয়ে,পা উপরে মাথা নিচে করে ঝুলে থাকে যে প্রাণীটা, তাকে কী বলে বলত? বাদুড়। ভারতে বেশি সংখ্যায় আর অনেক রকম বাদুড় দেখতে পাওয়া যায়। আর মানুষ এদের দেখলেই একটু ভয়ে ভয়ে তাকায়। এরা ভীষণ অন্ধকারপ্রিয়। কিন্তু বাদুড়কে ভালবাসতে হলে একটু বেশিই প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে, কারণ দূর থেকে ভয় লাগলেও, বাদুড়ের পাতার মত নাক, খুব অদ্ভুত আর সুন্দর।

সাধারণত অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, পরিত্যক্ত বাড়িতে বাদুড় থাকে। কিন্তু এসব বাড়িতে কেউ যেতে চায় না। আর এখানেও বাদুড় ওইরকম ঘুম ঘুম ভাব করে ঝুলে থাকে। কিন্তু একথা

কেউ বলে না যে বাদুড় কত উপকারে লাগে। বাদুড় প্রচুর কীটপতঙ্গ খেয়ে নিয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

বম্বে বন্দরের আশেপাশের খাঁড়িগুলোতে এক ধরণের বড় বাদুড় দেখতে পাওয়া যায় যারা শুধু ফল খায়। এরা ভাল ভাল ফল খেয়ে বেশ মোটাসোটা হয় আর মালয় আর্কিপেলাগোতে এই বাদুড় খাওয়া হয়। মাংসে কোন দুর্গন্ধ নেই, বরং অনেকটা খরগোশের মত স্বাদ। আমিও একটা বাদুড় পুষেছিলাম, সে প্রচুর কলা খেত। একদিন সে পালাতে গেছিল, পালিয়েওছিল আবার ফিরে এসেছিল। কারণ- তাকে ঘিরে ধরেছিল কয়েকটা কাক। কাক তো বাদুড় আগে কখনও দেখেনি। কারণ কাক সন্ধে হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর তারপর বাদুড় বেরোয়। ঠিক অনেকটা যেমন প্রথমবার ছাতা নিয়ে বেরোনর পর জোনাস হ্যানোয়েকে ঘিরে ধরেছিল লন্ডনের রাস্তার বাচ্চারা।

মিলনের সময় অবশ্য এই বাদুড়রা সারাদিন খুব হইচই করে। এরা খুব বেশিদূরে যায়না। স্থানীয় কোন গাছে গিয়ে ঝুলে থাকে আর সারাদিন ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, চিৎকার করে শান্ত গ্রামের শান্তিভঙ্গ করে।

ক্রমশ

আসাম ও পূর্ব হিমালয় বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট

ভারতের পূর্ব দিকের আরেক রাজ্য আসাম। ভৌগোলিক এলাকার বিচারে এই রাজ্যও পূর্ব হিমালয় বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের মধ্যে পড়ে। ভারত সরকারের সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে আসাম রাজ্যের যাবতীয় ভূ- ভাগের ৩৪. ২১% অরণ্যে ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ এলাকার বনকে নানান ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ডাল-

পাতাওয়ালা গাছের পরিমাণের ভিত্তিতে ঘন বন, মাজারি ঘন বন বা বনহীন বন্যপ্রান্তর হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। আবার সংরক্ষণের অবস্থা অনুসারে অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান কিংবা সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

ঘনত্বের পরিমাপ অনুসারে ঝোপ- ঝাড় আর বেশি ঘন বন সব থেকে কম এলাকায় আছে। তার থেকে বেশি আছে ঘন বন; আর তার থেকে বেশি আছে মাঝারি ঘন বন। সব থেকে বেশি আছে বন্য প্রান্তর বা ঘাসবন। এছাড়া দেখা গেছে যে চা বাগানে চা- গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে কাষ্ঠল গাছের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া ঝুম চাষের পরিত্যক্ত জমিতেও বন গড়ে তোলা হয়েছে। আসামের বনের এই দুটোই প্রধান শত্রু - চা বাগানের এলাকা বেড়ে বন ধ্বংস হয়ে যাওয়া, আর ঝুম চাষের জন্য বন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের বর্ণনা অনুসারে আসামে আঠার রকমের বন আছে যেগুলোকে পাঁচটা গোষ্ঠীতে ফেলা যায়। এই পাঁচটা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হলো নিরক্ষীয় আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য, নিরক্ষীয় প্রায় চিরহরিৎ অরণ্য, নিরক্ষীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন, নিরক্ষীয় শুষ্ক পর্নমোচী বন আর উপ- নিরক্ষীয় পাইন বন।

আসামে সংরক্ষিত বনের মধ্যে জাতীয় উদ্যান ৫টি, এদের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই কাজিরাঙা, মানস, ওরাং এবং ডিব্রু- সুখাওয়া। অভয়ারণ্য সংখ্যায় ১৮টি। এদের মধ্যে ব্যাঘ্র প্রকল্প ৩টি হলো কাজিরাঙা, মানস ও নামেরি। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান আর মানস অভয়ারণ্য এলাকা আবার বিশ্ব হেরিটেজ পর্যায়ভুক্ত।

পুরো এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কাজিরাঙা। কারণ এখানে বাস একশৃঙ্গ গণ্ডারের। পুরো কাজিরাঙার বাস্তুতন্ত্র এই প্রজাতির সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও কাজিরাঙার অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি হলো পিগমি হগ। বিরল প্রজাতির এই শূকরও কাজিরাঙাতেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়াও আছে জলের মোষ আর জলার হরিণ। তবে বুনো জলের মোষের মধ্যে সারা পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি বাস করে এখানে। পাখির বাসস্থাণ হিসেবেও এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া চিতা আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রজননক্ষেত্র হিসেবেও এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকা সংরক্ষিত হওয়ার কারণের মধ্যে অন্যতম হলো এই বনের হাতির পাল। তবে এতো জন্তুর আবাস হলেও পুরো বনের অধিকাংশ এলাকায় দেখা যায় লম্বা এলিফ্যান্ট গ্রাস আর নিরক্ষীয় আর্দ্র দীর্ঘপত্রী উদ্ভিদদের। তার কারণ হতে পারে যে এই এলাকায় প্রচুর জলা আর বিল আছে। তাই আছে প্রচুর জমা জল। তার কারণ এই এলাকায় ব্রক্ষ্মপুত্র উপত্যকার অংশ আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের এলাকাগুলির একটা।

কাজিরাঙার অন্যতম পাখিদের মধ্যে রয়েছে নানান প্রজাতির শকুন। নানা জাতের হাঁড়িচাচা পাখিরাও এই এলাকার পক্ষীবৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার এই সব বিশালদেহী পাখিদের পাশাপাশি বাস করে নীলকন্ঠ আর হুপোর মতো ছোটো পাখিরাও।

কাজিরাঙার পশুদের সংরক্ষণের প্রয়াসের মধ্যে খানিক অপচেষ্টাও আছে। যেমন শাকাহারী পশুদের পক্ষে মাইমোসা ইনভিসা প্রজাতির একটা লতা বিষাক্ত বলে চিহ্নিত হওয়ায়, এই লতাকে কাজিরাঙা থেকে নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। এই কাজটা সংরক্ষণের সপক্ষে হয় নি। সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় প্রজাতির সামগ্রিক অবলুপ্তি প্রতিহত করে বাস্তুতন্ত্রকে যথা সম্ভব অপরিবর্তিত অবস্থায় ধরে রাখা যাতে বিভিন্ন প্রজাতির সাথে মানুষ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়। সেই বিভিন্ন প্রজাতি মধ্যে কয়েকটাকে টিকিয়ে রাখতে একটাকে নির্মূল করে ফেললে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ধরে রাখার বদলে তা বিঘ্নিত করা হয়। এই বিঘ্ন সংরক্ষণের মূলনীতির পরিপন্থী।

ডিব্রু- সুখাওয়া জাতীয় উদ্যানের নানান পশুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্যাপ্ড লাঙ্গুর নামের এক জাতের হনুমান আর বুনো ঘোড়া। মানসের প্রাণীদের মুলত দুইভাগে ভাগ করা যায় – ঘাসবনের প্রাণী আর বনের প্রাণী। ঘাসবনের প্রাণীদের মধ্যে অধুনালুপ্ত পিগমি হগেরা আবার প্রচুর সংখ্যায় এই অঞ্চলে ফিরে এসেছে। এই প্রজাতিকে বনের বাইরে রেখে, এক্স সিটু সংরক্ষণের মাধ্যমে এদের প্রজনন ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করা হয়েছে। তারপর এদের প্রাকৃতিক আবাসে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে বেঙ্গল ফ্লোরিকান আর জলের বুনো মোষ। মানসের বনের পশুদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্লো লরিস নামের বানর আর মালয়ের দৈত্যাকার কাঠবেড়ালি বা কালো দৈত্যাকার কাঠবেড়ালি। অন্যান্য প্রজাতির সবই প্রায় কাজিরাঙায় পাওয়া যায়।

ওরাং জাতীয় উদ্যান একাধিক নদীর অববাহিকার অংশ। ফলে এই এলাকাও জলসমৃদ্ধ। এখানে মূলত ঘাসবনেরই প্রাচুর্য। সেই ঘাসবন নানান স্তন্যপায়ী প্রজাতির পছন্দের প্রজনন ক্ষেত্র। এই সব প্রজাতির মধ্যে এক শৃঙ্গ গণ্ডার, পিগমি হগ আর রয়েল

বেঙ্গল টাইগার অন্যতম। নামেরি টাইগার রিজার্ভের বিশেষত্ব এর ঢোল বা বুনো কুকুরের দলের জন্য।

আসামের বনের বৈশিষ্ট্যই হল যে এইসব বন ছড়িয়ে রয়েছে নানান নদীর অববাহিকা জুড়ে। কোনো কোনো নদী আবার ভাবর এলাকায় অন্তঃসলিলা। আবার প্রবল বর্ষণের কারণেও এখানে মাটিতে জলের যোগান নিয়মিত। তাই ঘন বন না থাকলেও এখানে জলা আর জলার লম্বা ঘাসের বন প্রচুর। এই সব ঘাসের বনে বাঘ, গন্ডার, হরিণ ছাড়াও হাতিও লুকিয়ে থাকতে পারে। এই কারণেই আসামের ঘাসবনের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের সাপেক্ষে এতো গুরুত্বপূর্ণ।

কাল্লুর সঙ্গে দেখা

রিশলু লাহিড়ী

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বান্ধবগড়ে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বছরতিনেক আগের কথা। আমার এক বন্ধু ও তার স্ত্রীর অনুরোধে এখানে এসেছিলাম। তখন আমার নিজস্ব জিপসি ছিল এখানে। যখনই আসতাম আমি আর আমার ড্রাইভার রাজা ঘুরতাম জঙ্গলে। তখন কোর এরিয়াতে প্রবেশ নিষেধ ছিল না। অবশ্য রুট আর সকাল বিকেলে সাফারির সময় নির্দিষ্ট ছিল।

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ, ক্রিসমাস ছুটি কাটাতে টুরিস্টদের বেশ ভিড় । আমাদের থাকার ও পার্কে ঘোরার ব্যবস্থা করাই ছিল আগের থেকে। তিন দিন অর্থাৎ ছ'টা রাইডে যতটা দেখা যায় তাই দেখব। এই পার্কটিতে বাঘের এলাকাসাপেক্ষে সংখ্যা সবচাইতে বেশি হওয়াতে তাদের দর্শন পাওয়াটা কিছুটা সহজ।

শেষের দিন। বিকেলের রাইডে ঘুরছি। ফেরার মুখে আমরা তখন কোর এরিয়ার মাঝামঝি জায়গায় এসে পড়েছি। কয়েকটা অ্যালার্ম কলও শোনা গেছে, মানে বাঘ কাছে কিনারেই আছে। সবাই ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। আমাদের নজর যেদিক থেকে কল এসেছিল সেই দিকে। কিন্তু কলটা ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

এদিকে পার্ক বন্ধ হবার সময় এগিয়ে আসছে ,কাজেই আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। ড্রাইভার রাজাকে বললাম চল ফেরা যাক। কোর এরিয়াতে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না, তাছাড়া পার্ক বন্ধ হবার সময়ও হয়ে আসছে।

কয়েক ফারলং চলার পড়ে জিপটা হঠাৎ একটা আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। রাজা বলল, “সাব আওয়াজ সে লগ রহা কুছ টুটা।”

বললাম, “দেখ বাবা একটু নেমে।”

যদিও পার্কের মধ্যে গাড়ি থেকে নামা নিষেধ থাকে কিন্তু কোন উপায় তো নেই। এখানে আটকে যাওয়া নিরাপদ নয়। রাজা গাড়িটা চেক করে বলল, “সাব ক্রস টুট গিয়া। গাড়ি নহি চলেগা।”

আমার তো মাথায় হাত! এবার কী হবে? সঙ্গে বন্ধু আর তার স্ত্রীও আছেন। একটাই বাঁচোয়া গেটে যত গাড়ি পার্কে ঢুকেছে তারা ফিরল কিনা সমস্ত গাড়ির হিসেব তারা রাখে। কোন গাড়ির ফিরতে অস্বাভাবিক দেরি দেখলে গাইড নিয়ে গাড়ি খুঁজতে বেরোয় এবং তাদেরকে খুঁজে ফেরত নিয়ে আসে। কাজেই আমি খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না। তবুও একটা ‘তবুও’ তো ছিলই কারণ আমরা আটকে পড়েছিলাম কোর এরিয়াতে অর্থাৎ বাঘের ঘরে।

জঙ্গলে অন্ধকার ঝপ করে নেমে আসে। তার ওপরে শীতের বেলা। আমরা জিপের মধ্যে বসে আছি, হাল্কা হাল্কা কথাবার্তাও হচ্ছে, অপেক্ষা করছি কতক্ষণে পার্কের গাড়ি এসে উদ্ধার করে আমাদের। এদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, চারদিকের গাছগুলোকে অচেনা লাগছে। জঙ্গলে রাতের চেহারা যে কী ভয়াবহ হয় যাদের এ অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে। ফিসফিস করে গাইড বলল, “এটা কাল্লুর এরিয়া।”

কাল্লু বান্ধবগড়ের সব চাইতে তেজ পুরুষ বাঘ। একে আমরা বাচ্চা বয়েস থেকে দেখেছি। এখন সে পূর্ণবয়স্ক মেল টাইগার। খুবই ভদ্র, অনেক ছবি তুলেছি এর, কিন্তু তবু বন্য প্রাণীর মতিগতি বলা যায় না। আমার বন্ধুদেরকেও কাল্লুর গল্প অনেক বলেছি।

ভাবছি রাত বেড়ে চলেছে এখনও কেউ আসছে না কেন। আমার চিন্তাটা প্রকাশও করতে পারছি না পাছে আমার বন্ধুরা ঘাবড়ে গিয়ে কিছু করে বসে। রাতের আকাশে ঝকঝক করছে গ্রহ তারা নক্ষত্র, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই তাদের ছুঁতে পারব। তাদের আলোয় আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে গাছপালা, রাস্তা।

হঠাৎ চোখে পড়ল সামনের রাস্তা দিয়ে বেশ বড় একটা জানোয়ার হাল্কা চালে হেঁটে আসছে। একটু কাছে আসতে বোঝা গেল ওটা একটা বাঘ আর আয়তন দেখে মনে হল কাল্লু হতে পারে।

আমার বন্ধুর স্ত্রী ঠকঠক করে কাঁপছে ভয়ে। ভয়ে আমার শরীরও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দিনের বেলায় বাঘ দেখেছি কিন্তু রাতে ঝাপসা আলোতে বাঘের মুখোমুখি কোনোদিনও হই নি। ফিসফিস করে বললাম, "একেবারে চুপ করে বসে থাকো, আওয়াজ কোর না, কিচ্ছু হবে না।"

বাঘটা কাছে আসতে গাইড শুধু বললেন, "কাল্লু।"

কাল্লু হাঁটতে হাঁটতে এসে আমাদের জিপের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে নেমে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল, তারপর জিপটা পেরিয়ে পেছনের রাস্তা ধরে চলতে চলতে দূরে মিলিয়ে গেল। সেই সময় সামনে থেকে একটা গাড়ির আলো দেখা গেল, আমাদের উদ্ধার করতে রক্ষীরা এসে গেছে ।

সাপুড়ে

গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়

ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁ পেঁ- পেঁ
সাপ খেলানো দেখবে কে?
মনসা মায়ের পুজো করে
এনেছি এই ঝোড়ার ভরে
জংলি তেজি কেউটেকে
অমানিশা রাত জেগে
ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ।
এক্কেবারে নয়া সাপ
দেখলে পড়ে লাগবে কাঁপ।
এ নয় হেলে, এ নয় ঢোঁড়া,
এটা খাঁটি চন্দ্রবোড়া
বিঘত খানেক ফণার সাপ
ঐ দেখ না বাপরে বাপ!
এক্কেবারে নয়া সাপ।

ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ
সাপ খেলানো দেখবে কে?
দেখবে বাবু? বেঁটে এটা।
আসল কালীনাগের বেটা
লখিন্দরকে কাটলো যে
এই বদমাশ সেই গো সে
ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ।
বার কর ও বেদেনি
দাঁড়া, শেকড় বেঁধে নি।
ঐ মোড়াতে শঙ্খচূড়,
লাফায় বেটা অনেক দূর
ফুঁসে কাঁপায় মেদিনী;
মন্তরটা সেধে নি
দাঁড়া একটু বেদেনি।

ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ
আয় তো এবার খেলা দে,
দেখ না ব্যাটার রাগের তাপ!
খেলতে আমার উঠছে হাঁপ;
ফেনা ছোটায় ফনাতে
পারছিনা বাগ মানাতে
ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ।
যা এবারে ঝোলায় যা
একটু আমার জুড়াক গা।
এই বেরুল মেঘডম্বর
অলসে বেটা এক নম্বর।
পেটটি কীসে ভরবে গা?
গিলে হরিণ- ভেড়াটা?
যা বাবুদের কাছে যা।
ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ
গোখরটা ঐ আসছে রে!
এ মুখপোড়া মারলে ছোঁ
নেইক এমন ওঝার পো
নামাবে বিষ ঝেড়ে যে,
এবার বাবু পয়সা দে
ভেঁপুর- ভেঁপুর- পেঁপ্পেঁ- পেঁ।

ছবিঃ অংশুমান

তোমার যখন

দেবাশিস বসু

তোমরা যখন বইয়ের পড়া পড়ো
আমি তখন বইয়ের পড়া ফেলে
মনকাগজে দোয়েল-কোয়েল পাখি
নানান রঙে, নানান ঢঙে আঁকি
পেরজাপতির সাথে বেড়াই খেলে।

তোমার যখন বইয়ের পড়া পড়ো
আমি তখন বইয়ের পড়া ফেলে
নিজের মনে দত্যি-দানোর সাথে
ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই শূন্যি হাতে
লড়াই করি, পাঠাই তাদের জেলে।

তোমার যখন বইয়ের পড়া পড়ো
আমি তখন বইয়ের পড়া ফেলে
একলা-একা রাজকুমারের বেশে
দেশ থেকে দেশ দেশান্তরে হেসে
বেড়াই ঘুরে, খুশির ডানা মেলে।

তোমার যখন বইয়ের পড়া পড়ো
আমি তখন বইয়ের পড়া ফেলে
ছুটিয়ে দিয়ে পক্ষিরাজের ঘোড়া
বাধার পাহাড় কেয়ার করি থোড়া
তোমার বলো যতই ভিতু ছেলে।

ছবিঃ মধুশ্রী

ভারতবর্ষ

আকাশে আকাশে মেঘেদের বাড়ি
গাছে গাছে লেজ সারি সারি সারি
হনুমান থাকে গুহাতে না গাছে
জলেদের বাড়ি ভরে আছে মাছে
বাড়ি বাড়ি ঘোরে কথা টেলিফোনে
কারা বাড়ি বোনে দেওয়ালের কোণে
কারো বাড়ি ছাদ সারাটি আকাশ
জুড়ে আছে তারা যেদিকে তাকাস
কারো বাড়ি নেই, জুতোয় সর্ষে
আমাদের বাড়ি ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষ, সে আবার কী রে
ভারতবর্ষ বুকের ভিতরে

ছড়া ও ছবি অংশুমান

যাবি?

আবু হোসেন

যাবি কি লাঠি কাঁধে
খালি হাতে
খোলা ছাতে
আধা রাতে
মেঘগলা বর্ষাতে
পাড়বি ঘন ঘন হাঁক
চঙ্ক চম্বন গিটিকিরি...
ধাঁইকিরি
কিড়িমিড়ি
আয় ধরি
টেকো ভুঁড়ো সাতকড়ি
তাক কুরু তাক।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

প্যাঁচ কষছেন

তরুণ কুমার সরখেল

প্যাঁচ কষছেন তরুণবাবু
দিনেরাতে,
পুরুলিয়ায় নিজের ঘরে
আমডিহাতে।
প্যাঁচ কষা তার স্বভাব এমন
খাওয়া ভুলে
ব্যস্ত থাকেন কাজ-টাজ সব
শিকেয় তুলে।
তা হলে কি তরুণবাবু
ঘোর প্যাঁচালো?

মনটা পুরো আলকাতরার
মতই কালো?
না গো দাদা, খুলেই বলি
ব্যাপারখানা,
পাড়াপড়শি লোকের এটা
নয় অজানা।
তরুণবাবু চশমা এঁটে
ঘ্যাচাংঘ্যাচ,
মুক্তাঙ্গনে বসেই কষেন
ছড়ার প্যাঁচ।

ঙ্কুবিঃ মধুশ্রী

গিন্নিপনা

পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

ও পুসিক্যাট, ও পুসিক্যাট, লক্ষ্মীটি শোন্
মায়ের নাকি শরীর খারাপ আজকে ভীষণ
দোহাই তোকে আজকে আমায় জ্বালাস না
দরজা খুলে এদিক ওদিক পালাস না।

বাবাও নেই, কোথায় গেছে নিজের কাজে
এই মরেছে, শব্দ শুনলি? দশটা বাজে।
আড্ডা মারার সময় নেই আর, রান্না করবো
মা যা উইক, স্নানে গেলে মাকেও ধরবো।

তুই বরং যা, খেলনা নিয়ে বসার ঘরে
খেল গে, নাহয় ঘুমিয়ে থাক' গে চুপটি করে।
মা বলেছেন, গয়লা, ধোপা' র অনেক বাকি
কলিংবেলের শব্দ পেলেই আমায় ডাকিস।

না বাবা, আর গল্প না, যাই এবার উঠি
মায়ের জন্যে গ্লুকোজ, দাদার জন্যে রুটি
তুই কি খাবি, ওমলেট না মাছের মুড়ো
চাউমিন, সুপ, বার্লি খাবি, মিছরিগুঁড়ো?

যাই দেখি গে কাজের মাসি এলো নাকি
ছাদের উপর ডালের বড়ি, বসলে পাখি
হেই যা বলে তাড়িয়ে দিবি, নইলে তোকে
দেখিস, বুনো, দুষ্টু বেড়াল বলবে লোকে।

হন্তদন্ত বাইরে কিসের আওয়াজ পেয়ে
বেড়িয়ে গেল আট বছরের ছোট্ট মেয়ে
আজকে টুপু দায়িত্বশীল, অনেক বড়
হুবহু মা' র গিন্নিপনার অনুকরণ।

হিন্দী সমস্যা

বহ্নি মুখার্জি

আগর যদি ধূপবাতি হয়
মগর তবে মাছ।
মছলীবাবা মাছ না কুমীর?
জানেন তা মেঘরাজ।

কপি মানে ফুল, বাঁধা নয়,
বিটকেলে এক বাঁদর
গোভীর ভালো পরাঠা হয়
মান হলগে' আদর।

আদর মানে শ্রদ্ধা- ভক্তি
রেকাব- ভরা পুরী
লুচির সঙ্গে গুলিয়ো নাকো
সমুদ্দুর আর নুড়ি।

আমের মানে লোকসাধারণ
কাঁঠাল মানে এঁচোড়

সিঙ্গাড়া চাই বলতে পেলাম
পানিফল এক কোঁচড়।

পানির সঙ্গে পুর মিশিয়ে
ফুচকা- পানিপুরী
প্রজাপতি, যা উড়ে যা-
পতঙ্গ মানে ঘুড়ি।

সামোসাটার মুন্ডু ভেঙে
যেই ধরেছি 'মোসা'
মশা কোথায়? মেসোমশাই-
বড্ড করেন গোঁসা।

শুকিয়ে গলা কাঠ হল ভয়ে
চেঁচিয়ে বলি চা- চা-
ছোটকা- একি, মারবে নাকি?
আপন প্রাণটি বাঁচা...

রূপবদল

শুভজিৎ বরকন্দাজ

চেহারাটা তাগড়াই
গোঁফজোড়া পাকানো
দেখলেই ভয়ে কাঁপি--
কী ভীষণ তাকানো !
চলাফেরা নাটকীয়
হাতে থকে ডান্ডা
অতি বড় বিচ্ছুও
তাকে দেখে ঠান্ডা ।
ভয়ে ভয়ে থাকি বাপু
যাই নাকো পাশটায়
তবে কিছু ছাড় মেলে
ফাল্গুন মাসটায় ।
কেননা কী চারপাশ
ভরে থাকে বাহারে
মেজাজেও ছাড় মেলে
খুশি পাই তাহারে !

আচার- বিচার

উত্তীয় কোলে

ভেবলি পিসি
জাগলো নিশি
ছারিয়ে কুশি
বেজায় খুশি

কাজের ফাঁকে
আচার মাখে
ঘরের তাকে
লুকিয়ে রাখে

চোখটি ট্যারা
কানটি খাড়া
পরলে ধরা
করবে তাড়া

সুযোগ বুঝে
দুইটি ভুজে
যাচ্ছি খুঁজে
চক্ষু বুজে

রাত দুপুরে
পিসির ঘরে
হামলা করে
পেলাম জারে

নিজের ঘরে
অন্ধকারে
দিলাম ঘোরে
মুখে পুরে

জ্বালায় পুড়ি
চেঁচিয়ে মরি
বুঝতে পারি
চুনের হাঁড়ি

ছবিঃ অংশুমান

যেমন তেমন

কবিরুল ইসলাম কঙ্ক

যেমন খুশি তেমন দুখী
মাঝামাঝি কী হলে ?
ভাবনাগুলো ভাসতে থাকে
তাক- ধিনা- ধিন ডুব জলে ।
টেলিফোনে হয় কি কথা
শনি কিংবা মঙ্গলে
টাপুরটুপুর বৃষ্টিগুলো
লুকিয়ে পড়ে জঙ্গলে ।
যেমন মামা তেমন জামা
দর্জি ভায়া কী বলে
নাচিয়ে কাঁচি বাঁচিয়ে হাঁচি
সরেন তিনি কৌশলে ।
উড্ডুতুড়ে চিন্তাগুলো
মনের মাঝে কান মলে
ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম
থাকবে তুমি কোন দলে ?

ছবিঃ মধুশ্রী

চিচিং ফাঁক

শেখর রায়

জামরুল গাছে ভীমরুল চাক
মাঝরাতে দেয় সন্দেশে পাক
দাবানলে পুড়ে বন হয় খাক্
উঠে গেল চুল মাথা জুড়ে টাক।
মাঝরাতে কেন হৈ-চৈ ডাক
পড়েছে কি ধরা চুরি করে ফাঁক
চোর?
ধুত্তোর
আজগুবি সব ভাবনা
ঢাকঢোলহীন বাজনা।
আকাশেতে মেঘ করে গুরগুর
হাতির নাকেতে ইয়াবড়ো শুঁড়
দেখলেই পরে করে দুরদুর
বুক
ধুকপুক
ধুকপুক।

আলিবাবা গেল কাটতে কাঠ
জনমনিষ্যিহীন ধূ ধূ মাঠ
সামনে গভীর জঙ্গল বন
পেয়ে গেল সে বরাত জোরে
গোপন গুহার দস্যুধন।
তিন তিনবার মস্ত হাঁক
চিচিং চিচিং চিচিং ফাঁক।
ভেবোনা এসব নিছক সত্য
কিংবা কোনো দৈবমাহাত্ম্য
নিছক গল্পগাছা
মন দিয়ে শোনায় চাচি
শোনায় রসিক চাচা

ছবিঃ মধুশ্রী

প্রথম ধাঁধা

আমায় দেখতে খুব সুন্দর তাইনা? স্নিগ্ধ, নরম, ঠান্ডা। কিন্তু ভীষণ ভীষণ একলা আমি। বন্ধু আছে অনেক। কিন্তু তারা অ্যাত্তো দূরে দূরে থাকে, সে বলার নয়। দুনিয়ায় থাকবার মধ্যে আছে এক বড়ো ভাই। বেজায় তেজি, বেজায় রাগী। তাই তাকে দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাই আমি। তুমি আমাকে চেন? সেকী রোজই তো দেখা হয় আমাদের? তাও চিনলে না? ছি।

দ্বিতীয় ধাঁধা

এক জেলে একশোজন বন্দি আছে একশোটা আলাদা ঘরে। তারা কেউ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনা একদম। একবার সেই জেলে এক নতুন সুপার এলেন। তিনি সব বন্দিকে একটা ঘরে ডেকে এনে বললেন, আমরা একটা খেলা খেলব। প্রতিদিন একজন করে বন্দিকে একটা ঘরে ডেকে আনা হবে। একজন বন্দিকে একাধিকবারও ডাকা হতে পারে। সে ঘরে একটা সুইচ আছে। বন্দি ইচ্ছে করলে সে সুইচটা একবার টিপতে পারে, ইচ্ছে করলে না- ও টিপতে পারে। সুইচ টিপলে প্রত্যেক বন্দির ঘরে একটা বাজনা বাজবে। প্রথম একশো দিনের পর একশো এক নম্বর দিনে সুইচের ঘর থেকে বেরোবার সময় বন্দিকে একটা কথা বলতে হবে। কথাটা হয় হবে "প্রত্যেক বন্দিকে এই ঘরে আনা হয়ে গেছে" অথবা হবে "এখনো প্রত্যেক বন্দিকে এই ঘরে আনা হয়নি।" যদি তার কথাটা সত্যি হয় তাহলে সেইদিন সব বন্দিকে মুক্ত দেয়া হবে, আর যদি কথাটা ভুল হয় তাহলে সেইদিনই সব বন্দিকে হত্যা করা হবে। এরপর বন্দিদের দশ মিনিট সময় দেয়া হল আলোচনা করবার জন্য। তারপর সবাইকে যার যার ঘরে ফেরত নিয়ে যাওয়া হল। সব বন্দিদের যদি ছাড়া পেয়ে যেতে হয় তাহলে তারা আলোচনা করে কী কায়দা স্থির করবে?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

সাদার সঙ্গে সবুজ মিশে লাল হয় কখন?

কুইজ

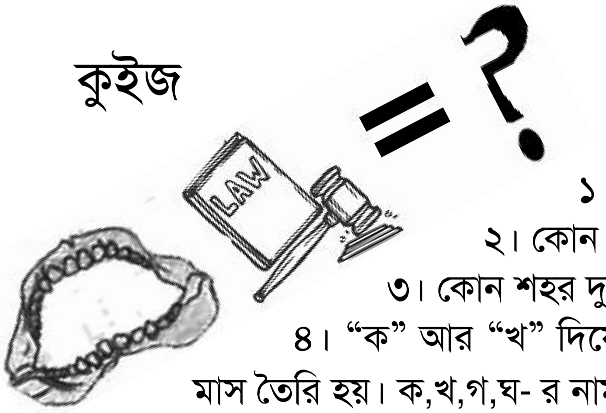

১। কোন ফুল দুটো দেশের জাতীয় ফুল?

২। কোন লেখক দুটো দেশের জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন?

৩। কোন শহর দুটো রাজ্যের রাজধানী?

৪। “ক” আর “খ” দিয়ে একটা মাস তৈরি হয়। “গ” আর ঘ” দিয়ে একটা মাস তৈরি হয়। ক,খ,গ,ঘ- র নাম বল।

৫। “ক” আর “খ” দিয়ে একটা দিন তৈরি হয়। “গ” আর ঘ” দিয়ে একটা দিন তৈরি হয়। ক,খ,গ,ঘ- র নাম বল।

৬। কোন দুটো সংখ্যা দিয়ে সমস্ত সংখ্যা তৈরি হয়?

৭। চোয়াল আর আইন মেশালে কী তৈরি হয়?

৮। পরিকে খুশি রাখে কে?

৯। আকাশে কোন ফুল থাকে?

১০।পাথরে পাথরে ঠুকলে তাতে যা হয় তাতে কোন অংকটা থাকে?

কুইজ ২

মগজ ধোলাই

রণিত পাল

১) পুরাণ মতে,তাঁকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। বলা হয়, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী।তাঁর স্বামী গৌতম মহর্ষি একবার তাঁকে অভিশাপ দিয়ে পাথরে পরিণত করেন। এর কয়েকহাজার বছর পর রাম যখন বনবাসে যাচ্ছিলেন,তখন রামের পায়ের স্পর্শে তাঁর মুক্তি ঘটে। সাম্প্রতিককালে,অন্য কোনও কারণে তিনি খবরে এসেছেন। কার কথা বলছি?

২) বাঁটুল দি গ্রেট কোন পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন?

৩) পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহগুলি কোন ধাতু দ্বারা নির্মিত নয়।এগুলি একটি নির্দিষ্ট কাঠ দ্বারা নির্মিত।কোন কাঠ?

৪)১৭৯০ সালে,হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় ১২ জন ব্রাহ্মণ বন্ধু মিলে পাড়ার সবাইকে নিয়ে দুর্গাপুজো চালু করেন। এই ঘটনা থেকে কোন বহুল প্রচলিত শব্দের উৎপত্তি হয়?

৫) দেবীপক্ষের সূচনা যদি মহালয়া হয়,তবে দেবীপক্ষের শেষ দিন কোনটা?

৬) ১৯৮৭ সালে,মুম্বাইের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে,বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত,ইংল্যান্ডের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। সেই ম্যাচে তিনি বলবয় ছিলেন।বিশ্বকাপে এর পর,১৯৯২ সালে ভারতের প্রথম ম্যাচটাই ছিল,ইংল্যান্ডের সাথে।অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে,সেই ম্যাচে তিনি ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। কার কথা বলছি?

জানো কী?

১। হান রাজবংশের রানি দাই দু হাজার বছর আগে মারা গিয়েছেন। তাঁকে মমি করা হয় নি। কিন্তু কোন অজানা তরকে তাঁর শরীর ডোবানো হয়েছিল তাঁর চামড়া এখনো নরম। শরীর মোটামুটি অবিকৃত আর হাত পা এখনো ভাঁজ করা যায়।

২। বিশ শতকের শুরুতে মানুষের বিভিন্ন ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার হয়। কিন্তু বিজ্ঞান আজও জানে না কেন একেক মানুষ একেক ব্লাডগ্রুপের হয়।

৩। তোমার ক্যামেরাটা কত মেগাপিক্সেলের? ক্যাননের ৫০ মেগাপিক্সেলের EOS 5DS এই মুহূর্তে বাজারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বেশি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা মডেল।

৪। চিলির পাহাড়ের মাথায় বসানো ৫৭০ মেগাপিক্সেলের "ডার্ক এনার্জি ক্যামেরা" আট বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের তারাদের ছবি তুলেছে।

৫। এইবারে বলি তাহলে, তোমার চোখটার সমান শক্তির রেজোলিউশানের ক্যামেরা যদি তৈরি হয় তাহলে সেটা হবে ৫৭৬ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা।

৬। কেরালার কদিনহি গ্রামে দু হাজার পরিবারের মধ্যে ৩৫০জোড়া যমজ ভাইবোন রয়েছে। প্রতি বছর সংখ্যাটা আরো বেড়ে চলেছে। কেন কেউ জানে না।

৭।জয়সলমিরের কাছে কুলধারা গ্রামের দেড় হাজার বাসিন্দা পাঁচশো বছর আগে এক রাত্রে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। সে গ্রাম আজও পরিত্যক্ত। সেখানে থাকতে গিয়ে বহু লোকের প্রাণ গেছে। কিছুদিন আগে দিল্লি প্যারানরমাল সোসাইটির ১৮ জনের একটা দল প্রচুর যন্ত্রপাতি নিয়ে সে গ্রামে একরাত কাটাতে গিয়ছিল বারো ঘন্টা পরে ফিরে তারা স্বীকার করেছে ওখানে ভয়ংকর কিছু আছে যা তাদের সারা রাত ধরে বারবার আক্রমণ করতে এসেছে। কিন্তু সেটা যে কী তা সমস্ত যন্ত্র দিয়ে চেষ্টা করেও তারা ধরতে পারেনি।

ড্রুডল—কীসের ছবি হতে পারে এটা?

অবিশ্বাস্য

২০০৩ সালে আটাকামা মরুভূমির ভেতর এক পরিত্যক্ত শহরে এই ছ ইঞ্চি লম্বা কংকালটা মেলে। বিজ্ঞানীরা তার পাঁজরের ফাঁক থেকে নেয়া নমুনার ডি এন এ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন এটা একটা বাচ্চাছেলের কংকাল। সে বেঁচে ছিল সাত থকে আট বছর। এর মাথাটা বেজায় বড়ো আর বুকে মাত্র নটা পাঁজর ছিল। প্রমাণটমাণ যাই হোক, প্রচুর লোক একে ভিনগ্রহীর কংকাল বলেই দাবি করে চলেছেন এখনো।

আশ্চর্য উলকি

কীসের ফটো?

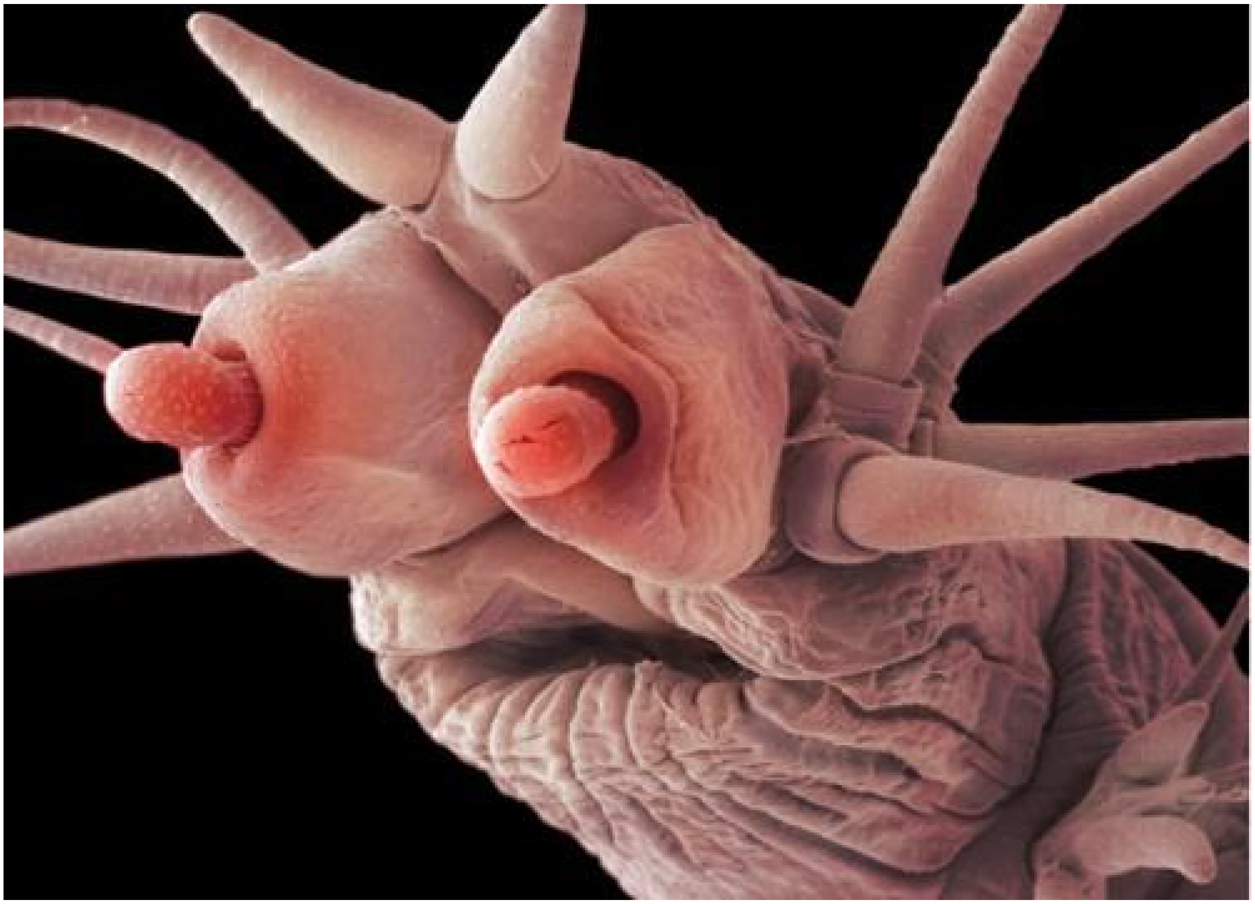

গত সংখ্যার উত্তর

উত্তরঃ

প্রথম ধাঁধাঃ একটা দাঁড়িপাল্লার একই দিক লাইটার ও হেভিয়ার এমন একটা ছবি আঁক।

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ স্বপ্ন

তৃতীয় ধাঁধাঃ ৩ নম্বরটা সত্যি। একমাত্র সেক্ষেত্রেই অন্য তিনটে বাক্য সত্যি সত্যি মিথ্যে হবে।

চতুর্থ ধাঁধাঃ প্রথমে তিনসেরি পাত্রটা ভরে বাঘা সেটা পাঁচসেরিতে ঢালল। তাহলে পাঁচসেরিতে খালি রইল দু সের জায়গা। তারপর ফের তিনসেরি ভরে পাঁচসেরিটা একেবারে ভর্তি না হওয়া অবধি ঢেলে গেল। তাহলে পাঁচসেরিতে ঢুকল আরো দু সের। তখন এইবারে তিনসেরিতে যতটা পড়ে রইল তার পরিমাণ এক সের। ব্যস।

কুইজ

১। নীল বেড়াল ২। জোয়ি, ডি ডি, মার্কি ৩। তুতো দাদা ৪। ভয়াল কুকুর ৫। মোনিকা ৬। মার্কি ৭। লাল ৮। রক গায়ক ইগি পপ ৯। অলিভিয়া ১০। লেডি কে।

কীসের ফটো

একধরণের অস্ট্রেলিয়ান ইউক্যালিপটাস। এরা বাকল ছাড়বার সময় এইরকম রঙ দেখায়

ড্রুডলঃ

পাস্কালের সূত্র ভুল প্রমাণিত হল।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

“কার্তাং- এ স্বাগত। আমি টাইকো, কার্তাং- এর নিয়ন্ত্রক গণক। কোড ভি এস ১৯৭৪৫৬। সঙ্গে নতুন লোক দেখছি কা পোন? কে হে?”

পর্দার বুকে ভেসে থাকা কুকুরটা হাসি হাসি মুখে কথাক’টা বলে দুবার মৃদু ভুক ভুক করে ডাক দিয়ে উঠল। বেশ মোটা কিন্তু সুরেলা গলা। সেদিকে চোখ রেখে জিষ্ণুর মুখে হাসি ফুটল একটু।

কা পোন সতর্ক চোখে তার মুখটার দিকে দেখছিল। ঘন্টাকয়েক আগে গুহাগ্রামে যান নিয়ে এসে পৌঁছোবার পর থেকে জিষ্ণুর মুখে হাসি দেখেনি সে একবারও। যন্ত্রচালিতের মতন যান থেকে ওয়ার্কশপে জ্বালানির বাক্স সরিয়ে নেবার কাজ সেরেছে তার দলের সঙ্গে। তারপর প্রফেসর বোসকে একলা রেখে এসে তার সঙ্গে যানে উঠেছে।

“উফ্ আংকল, অনেক রকম কমপিউটার ইনটারফেস দেখেছি, কিন্তু অ্যানিমেটেড কুকুর—”

কা পোনের চোখদুটো হাসিতে কুঁচকে উঠল, “অ্যানিমেটেড বটে আবার আসল কুকুরও বটে। ওর নাম টাইকো। আমার ছোটোবেলার বন্ধু। একটা শিকার অভিযানে গিয়ে মারা গেল। বেশ কিছু ভিডিও ছবি ছিল ওর। সেগুলো কাজে লাগিয়ে ইনটারফেসটা বানিয়ে নিয়েছি। টাইকো এখন আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার গাইড যা বলবে। যান চালায়, দরকারে তথ্য জোগায়, অবস্থা বিশ্লেষণ করে কী করা উচিত সে নিয়ে পরামর্শও দেয়। টাইকো খুব ভালো লোক, তাই না রে টাইকো?”

টাইকো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল একবার। তারপর ফের জিষ্ণুর দিকে ঘুরে দেখে নিয়ে বলল, “তোমার বন্ধুটি তো বেজায় অভদ্র হে কা পোন। নিজের নামটাও বলল না এখনো!”

বিস্মিত চোখে ছবিটার দিকে দেখছিল জিষ্ণু। গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অপেক্ষা করছে টাইকো। চাঁদে থাকতে যে শিক্ষাগণকদের কাছে সে পড়াশোনা করত তাদের থেকে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে এখন যন্ত্রগণোকের প্রযুক্তি। ভিএস শ্রেণীর এই যন্ত্রগণকগুলোতে কৃত্রিম চেতনা রয়েছে। ব্যক্তিত্বও আছে এদের। সে খবর তার অজানা নয়। কিন্তু তা যে এতটা উন্নত সে কথা জিষ্ণু ভাবতে পারেনি।

তার মনের কথাটা বুঝে ফেলেছিল কা পোন। মুচকি হেসে বলল, “লেটেস্ট প্রোগ্রাম আপগ্রেড। সবে কয়েক সপ্তাহ হল সেট আপ করেছি। এখনো এটা বাজারে আসেনি। তবে খরচ করতে পারলে কোনকিছুই নাগালের বাইরে থাকে না সে তো জানই।”

“আমার নাম জিষ্ণু। জিষ্ণু বসু।” পর্দায় ভাসন্ত ছবিটার দিকে তাকিয়ে জিষ্ণু বলে উঠল।

“আলাপ করে ভালো লাগল,” টাইকো গরগর করে উঠল। এখনো তার রাগ পড়েনি পুরোপুরি।

“থ্যাংক ইউ টাইকো,” কা পোন একবার হাত নাড়াল তার দিকে, “তুমি এবারে যেতে পার। যানের নিয়ন্ত্রণ নাও। আমরা কোথায় যাব তা তো তোমায় আগেই জানিয়েছি।”

“জানালা দিয়ে একবার দেখুন,” বলে পর্দা থেকে মিলিয়ে গেল কুকুরটা।

বাইরে তীব্র সার্চলাইটের আলোয় শ খানেক ফুট নীচে সমুদ্রের জলে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। তীব্র গতিতে ক্রমশই পেছনে ছুটছে তা। সেদিকে দেখতে দেখতে কা পোন মাথা নাড়ল একবার,

“মাঝে মাঝে এই নতুন কন্ট্রোল প্রোগ্রামটা আমাকেও চমকে দেয় বুঝলে? কোন ফাঁকে জমি ছেড়ে উঠে এতটা পথ পাড় হয়ে এসেছে টেরও পাইনি।”

“তার মানে আপনার নির্দেশ ছাড়াই টাইকো- ”

আমাদের জ্বালানি নামিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার যে নির্দেশটা পাঠিয়েছিলেন প্রফেসর বোস, সেটা টাইকোই রিসিভ করেছিল জিষ্ণু। যান আর তার আরোহীর জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকলে এরা নির্দেশের অপেক্ষা করে না। নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়।”

হঠাৎ করেই নির্জন সেই গুহার ছবিটা ফের ঝাঁপিয়ে এল জিষ্ণুর চোখের সামনে। সেখানে অতিকায় একটা ক্ষেপণাস্ত্রের পেটের ভেতরে তীব্র শক্তিপ্রবাহে এতক্ষণে ঝলমল করে উঠেছে চৌম্বক কয়েলের বন্দিশালা। একলা একজন বৃদ্ধ যন্ত্রের সামনে বসে তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে চলেছেন প্রাণঘাতী প্রতিবস্তুর পিণ্ড দিয়ে। এতটুকু ভুল, সামান্য একটা হিসেবের গরমিল হলেই—

“কাজ কতদূর এগোল একবার দেখে নিতে চাই কা পোন” বলতে বলতে হঠাৎ কন্ট্রোল প্যানেলের ডানদিকের যোগাযোগ সার্কিটের বোতামগুলোর ওপরে হাত রাখতে গেল জিষ্ণু। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তীব্র একটা যন্ত্রণার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার গোটা শরীরে। পর্দায় টাইকোর মুখটা ভেসে উঠেছে ফের। রাগে গরগর করছে সে। দাঁতগুলো বের হয়ে এসেছে আক্রমণের পূর্বমুহূর্তের ঢঙ- এ। জানে ত্রিমাত্রিক ছবি একটা, তবু বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে উঠল জিষ্ণুর একবার।

“যান নিয়ন্ত্রণে অননুমোদিত হস্তক্ষেপ। কন্ট্রোল প্যানেলের ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা হয়েছে। শত্রুকে সাবধানতামূলক আঘাত দেয়া হল-- ” টাইকো গর্জন করছিল।

“হাতটা সরিয়ে নাও জিষ্ণু, শিগগির-- ” বলতে বলতে একটা আলতো ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে টাইকোর দিকে ফিরল কা পোন, “অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আছে টাইকো। কন্ট্রোল প্যানীর নিয়ন্ত্রণ আমাকে ফিরিয়ে দাও।”

“কিন্তু কা পোন, এই আগন্তুক যানের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় হাত দিতে চলেছিল। এই অবস্থায়- ”

“আঃ! কথা শোন টাইকো। নাহলে- ” কা পোন এইবার উঠে দাঁড়াল পর্দার সামনে, “আমি, কমান্ডার কা পোন, তোমাকে আদেশ করছি, তুমি যানের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দাও।”

জবাবে টাইকো ফের কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে কা পোন ফের বলে উঠল, “ওভাররাইডিং কমান্ড কোড, ক- ৩১৪৭।”

“টাইকোর মুখটা কালো হয়ে গেল যেন একটু। বিড়বিড় করে বলল, “চরম আদেশ। যো হুকুম প্রভু।”

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে আঙুল চালাতে চালাতে কা পোন আপনমনেই বলল এবার, “আমারই ভুল। শুরুতেই তোমার অনুমোদন দিয়ে দেয়া দরকারি ছিল। এখন এস,”

কন্ট্রোল প্যানেলের গায়ে বসে থাকা ছোটো একটা লেন্সের গায়ে জিষ্ণুর বাঁহাতের মণিবন্ধটা চেপে ধরল কা পোন। পর্দায় দ্রুত কিছু তথ্য ভেসে উঠছিল। পরিচয়- চিপ থেকে তার যাবতীয় খবর জেনে নিচ্ছে কার্তাং- এর যন্ত্রগণক।

তথ্য বিনিময় শেষ হতে প্যানেলের বোতামগুলোয় আঙুল চালিয়ে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল কা পোন। তারপর হাসিমুখে জিষ্ণুর দিকে ফিরে বলল, একবার টাইকোকে ডাকবে নাকি?”

জিষ্ণু একটু ইতস্তত করছিল, “মানে- আমি- টাইকোকে- ”

“ডেকে দেখোই না?”

একটু ভয়েভয়েই জিষ্ণু ডাক দিল, “টাইকো?”

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই সামনের পর্দায় একটা লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল টাইকো। তার হাবভাব বদলে গিয়েছে একেবারে। জিষ্ণুর সামনে পর্দার গায়েই চার হাতপা ছড়িয়ে বসে বলল, “অভিবাদন ফার্স্ট মেট জিষ্ণু। কার্তাং-এ ফের একবার আপনাকে স্বাগত জানাই। আদেশপালনের জন্য বান্দা হাজির—”

“ধন্যবাদ টাইকো। আশা করি এরপর থেকে তুমি জিষ্ণুর সমস্ত আদেশ আমার আদেশ হিসেবেই পালন করে চলবে এবং আমার মতন, যানে থাকাকালিন তার নিরাপতত্রা দায়িত্বও নেবে।” কা পোপনের গলায় কর্তৃত্বের সুর ছিল।

“নিশ্চয় ক্যাপ্টেন। আনন্দের সাথে। আদেশ করুন জিষ্ণু।”

“আমার বাবার ওয়ার্কশপের সঙ্গে যোগাযোগ কর। আমি একবার- ”

“এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল টাইকো। তারপর বলল, “তিনি ভালো আছেন। তাঁর কাজ সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে। রাত্রি শেষ হবার কিছু আগেই তা শেষ হবে বলে তাঁর গণকের অনুমান।”

“আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

টাইকো একটু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, “আপনার আদেশ শিরোধার্য জিষ্ণু। কিন্তু ভিডিও সংযোগস্থাপনের আগে একটি নিবেদন ছিল।”

“বল।”

আমার স্মৃতিভাণ্ডারে প্রফেসর বোসের এই মুহূর্তের কাজ সম্পর্কে যা তথ্য এসেছে তা সঠিক হলে এখন তিনি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে এই সময়ে যোগাযোগ করতে গেলে মনঃসংযোগ নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা বেশি। তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ে আপনার উদ্বেগ লক্ষ করে আমি তাঁর গণকের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যোগাযোগ রেখে চলেছি ও আমার গণনাশক্তিকে তার কাজে ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছি। এতে কাজটি আরো দ্রুতগতিতে এগোতে পারবে। পরিস্থিতির ওপরে আমরা দুজন নজর রেখে চলেছি।”

“থামো। এটা বিপজ্জনক হতে পারে। যোগাযোগ চ্যানেলের ওপরে কেউ নজর রাখলে তারা একাগ্নির বিষয়ে- ”

“নিশ্চিন্ত থাকুন মালিক। ভি এস ১৯৭৪৫৬- এর সাংকেতিক যোগাযোগব্যবস্থা এই মুহূর্তে যেকোন পরিচিত প্রযুক্তির চোখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। আমার নিবেদন, এখন প্রফেসর বোসের সঙ্গে কোন ভিডিও সংযোগ না করাটা উচিত হবে।”

“উফ্‌ফ্‌। ঠিক আছে। নিবেদন গৃহীত হল। তুমি এখন যেতে পার।”

জিষ্ণুর মুখে হাসি ফুটে উঠছিল। টাইকো পর্দা থেকে মিলিয়ে গেছে। মনের ভেতর একটা আশ্চর্য ভরসা গড়ে উঠছিল তার। আর পাঁচটা পোষা কুকুরের মতন টাইকোও তার পরিচিতদের মনে ভরসা জাগিয়ে তুলতে পারে। তাছাড়া তার কথাগুলোতে যুক্তি রয়েছে।

"মুখ নিচু করে কী এত ভাবছ বল দেখি নতুন ফার্স্ট মেট? তার চেয়ে জানালা দিয়ে দেখ একবার বাইরে—"

কা পোন কখন যেন তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে। যানের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছিল সে। জিষ্ণু উঠে জানালার ধারে গেল।

"পৃথিবীর যে সামান্য কিছু জায়গায় শহর এখনও থাবা বসায়নি এটা তারই একটা। দেখে নাও। এর পরে হয়ত আর কখনো এ চেহারা দেখতে পাবে না ব্যারেন আইল্যান্ডের।"

শেষরাত্রের চাঁদের আলোয় অতিকায় ওলটানো বাটির মত দ্বীপটা তাদের পায়ের তলায় ঘুমিয়েছিল। তার শরীরের জমাটবাঁধা পাথুরে আগ্নেয়ভস্মের মধ্যে মিশে থাকা আকরিককণাদের গায়ে ঝিলিক দিচ্ছিল চাঁদের আলো। যানটা নিঃশব্দে ভাসছিল মাত্র ত্রিশ ফুট উঁচুতে।

"বেশিদিন আর এ দশা থাকবে না হে। লাজলোর নজর পড়েছে দ্বীপটার ওপরে। শক্তি উৎপাদন শিল্পে মোটা লগ্নী করতে চলেছে লোকটা। এ দ্বীপে আগ্নেয়গিরির কল্যানে অঢেল ভূ-তাপশক্তি মিলবে। লাজলো একে ছেড়ে দেবে না। আজ না হোক কাল—"

****

জানালার পাশে দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিল ওরা দুজন। কতক্ষণ যে কেটে গেছে তাদের এইভাবে বসে তারা নিজেরাও তা জানে না। দেখতে দেখতে চাঁদ মাঝ আকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ল। তাদের পায়ের নীচে জোয়ারের জল বেড়ে উঠে ঢেকে দিয়েছে দ্বীপের খানিকটা এলাকা। জল আর বালিতে পড়ন্ত চাঁদের চিকিমিকি—

পুবের আকাশে যখন সবে হালকা লালের ছোঁয়া লেগেছে তখন ভরাট একটা নীচু গলার শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল জিষ্ণুর। কা পোনও চোখ খুলে ফেলেছে গলার শব্দটা শুনে।

"পর্দায় বাবার ছবিটা ভাসছিল। হাসছেন প্রফেসর বোস। বহুদিন পরে সেই পুরোনো ঝকঝকে হাসিটা ফের ছেয়ে আছে তাঁর বয়োজীর্ণ মুখে। তাদের ঘুরে তাকাতে দেখে চশমাটা খুলে একবার মুছে নিয়ে ফের চোখে পরলেন তিনি। তারপর বললেন, "কাজ শেষ। কোন ত্রুটি হয়নি। এবং কা পোনকে আরো একবার ধন্যবাদ। তোমার জাহাজের গণকের সাহায্য না পেলে এত জটিল একটা কাজ এত নিখুঁতভাবে শেষ করা কঠিন হত।"

জিষ্ণু হাসিমুখে বলল, "থ্যাংক ইউ টাইকো।"

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই পর্দায় সত্যব্রত বোসের ছবিটার পাশে টাইকোর ছবিটা ফুটে উঠল। ঘনঘন লেজ নড়ছে তার।

"এবার তোমরা ফিরে আসতে পারো," সত্যব্রত ফের কথা বলে উঠলেন, "এবারে বিশ্রামের সময়। আজ এই আনন্দের দিনটা আমি বিশেষভাবে উদযাপন করতে চাই। আমরা আজ বনভোজনে যাব জিষ্ণু। কতকাল পরে, ফের একবার খোলা আকাশের তলায়—কা পোন তুমিও যাবে আজ আমাদের সাথে।"

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল কা পোন, "ধন্যবাদ প্রফেসর বোস। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে একটা ভালো দাঁও মারবার সুযোগ এসেছে। এবারে আমি দিনপনেরোর জন্য নিজের ব্যাবসাপাতি দেখে তারপর ফিরে আসব। জিষ্ণুকে পৌঁছে দিয়ে আমি আর অপেক্ষা করব না ওখানে।"

তার কথা চলতেচলতেই দ্বীপের আকাশ থেকে উড়ান দিয়েছে কার্তান। মেঘ ছাড়িয়ে অনেকটা উচ্চতায় পৌঁছে শব্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি গতিতে দূরত্বকে গিলে খাচ্ছিল সে। পায়ের নীচে বাংলার অদৃশ্য সমতলভূমি ছাড়িয়ে গিয়ে এগিয়ে আসছিল পাহাড়—

ক্রমশ

চিত্ত ঘোষাল

মামা আমাকে বলে দিয়েছিল পঞ্চাকে যে আমরা বিক্রি করে দিচ্ছি সেকথা বস্তির কাউকে না বলতে। লিফলেটগুলোও মামা বিলি করেছিল দূরে দূরে। “হাজার প্রশ্ন করবে, লক্ষ লক্ষ উপদেশ দেবে –এ আর ভালো লাগে না,” মামা বলেছিল।

নিলামের দিন দশটার একটু আগেই পঞ্চাকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম মাঠে।

কুড়ি- পঁচিশ জন লোক এসেছে। তারা কেউ বস্তির নয়। বাঁচা গেল। বস্তির কয়েকটা বাচ্চা ছেলে শুধু চু- কিতকিত খেলছিল।

মামা ফিশফিশ করে আমাকে বলল, “চটপট কাজটা সেরে ফেলি আয়।”

অচেনা লোকগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা।

“আপনারা ভালুক কিনতে এসেছেন?” মামা জিজ্ঞেস করল।

কেউ মাথা নাড়ল, কেউ মুখে বলল, “হ্যাঁ।”

“বেশ, এই ভালুক। দেখুন এর চেহারা- ছবি। খুব বাধ্য অনুগত ভদ্র –হ্যাঁ, অত্যন্ত ভদ্র।”

একটা খিটখিটে চেহারা লোক বলে উঠল, “ভালুকের আবার ভদ্র- অভদ্র।”

“হয়, ভালুকেরও ভদ্র- অভদ্র হয়। আপনি জানেন না বলেই হয় না তা কেন ভাবছেন?” মামা দাবড়ে দিল লোকটাকে, “বলুন, দাম বলুন এবার এক এক করে, কে কত দিতে পারবেন?”

সেই লোকটা বলল, “তিরিশ টাকা।”

আমি রেগেই ছিলাম, তিরিশ টাকা শুনে হাড়পিত্তি জ্বলে গেল একেবারে, “আপনাকে ভালুক কিনতে হবে না। তিরিশ টাকায় বড়ো সাইজের ছুঁচো পাবেন, তা- ই একটা কিনে নিন।”

“কী? কী বললি ছোঁড়া?” রেগে আমার দিকে তেড়ে এল লোকটা।

চুপচাপ বসে ছিল পঞ্চা। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। তারপর বিড়বিড় করতে করতে চলেই গেল একেবারে।

একজন রোগামতো গরিব- গরিব চেহারার মানুষ বলল, “আমি একশো টাকা দিতে পারি।”

“কী করবেন ভালুক নিয়ে?” মামা জিজ্ঞেস করল।

“আমার চাকরি নেই। খেলা- টেলা দেখিয়ে যদি...”

“কিন্তু অত কমে তো ভালুক দিতে পারব না ভাই। বলুন আর কে কী দিতে পারবেন?”

কেউ কিছু আর বলে না। সবাই চুপ। বুঝতে পারি, এত লোক যে এসেছে সে শুধু মজা দেখতে। আমি আর মামা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

হঠাৎ দেখি ভিড়ের পাশ দিয়ে টুকটুক করে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক এগিয়ে আসছে। পেছন পেছন চাকর গোছের তাগড়াই দু’জন লোক।

“সমঝলম,” আমাদের সামনে এসে মাড়োয়ারি বলল, “ভল্লু খরিদনে কোই আসে নাই। লেকেন হামি আসিছি। হামার নাম মোটেরাম কংকরিয়া। না ভাই, কংকরিয়া হোনেসে ভি হামি চালে কংকর মিশানোর গন্দা কারবার করি না। হামার একটা রোলিং মিল আছে –কংকরিয়া রোলিং মিল।”

“দেখেছি তো,” মামা বলল, “আপনি কিনবেন ভালুক? পুষবেন বুঝি?”

মোটেরাম শব্দ না করে হাসল। ওপর পাটির সামনের তিনটে দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, “না ভাই, হামি কুছু পুষি না –জন্তুজানবারের কথা বলছি। হামার বিবি আছে –

মোটুমতী, নামটা হামি দিলাম, একশো পন্দরো কিলো ওজন আছে না –তাকে পুষি। সাত বেটা, চার বেটি –তাদের পুষি।”

সন্দেহে কুঁচকে যায় মামার কপাল, চোখ, “তবে আপনি পঞ্চাকে কিনতে চাইছেন কেন? দেখুব মোটেরামজি, পঞ্চা আমাদের বড়ো আদরের ভালুক। দায়ে পড়ে ওকে বিক্রি করতে হচ্ছে। আমরা চাই ও এমন জায়গায় যাক যেখানে ও ভালো থাকবে, আরামে থাকবে।”

“শুনেন ভাই, হামি ভল্লুকে বহুৎ মজামে রাখব, খিলায়ে খিলায়ে অ্যায়সা তাগড়াই বানাব যে আপনি শোচতে ভি পারবেন না।”

“কিন্তু কেন?”

“হামি বেওসাদার মানুষ। স্বোয়ার্থ ছাড়া কুছু করি না। স্বোয়ার্থ না থাকলে হামি ভল্লু কেন কিনব? হামার কারখানায় রাতে পাহারা দেয় দুটো দারোয়ান। আউর একঠো লাগবে। আপনাদের ভল্লুর সব খবর আমি জানি। তাই হামি শোচলাম কী আউর একঠো আদমি না রেখে এই ভল্লুটাকে হামি কিনে লিব। রাতে হামার কারখানা পাহারা দিবে।”

চুপচাপ খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল মামা, তারপর বলল, “বেশ, কত দেবেন বলুন।”

“আপনি বোলেন।”

“পাঁচ হাজার দিন।”

“বোলেন কী?” মোটেরাম যেন মস্ত একটা আছাড়া খেল, “পান্চ হাজার!”

“কেন, বেশি বলেছি?”

“বহুৎ বেশি, হামি তো শোচলাম চার- পান্চশো হবে।”

“মোটেরামজি, আপনার রাতের দারোয়ানদের মাইনে কত?”

“উসব পেরাইভেট বাত পুছবেন না।”

“বেশ। কিন্তু মাইনে যত কমই দেন না কেন হাজার- দেড় হাজার তো দিতেই হয়। তারপর যখন রিটায়ার করবে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটিও দিতে হবে। আর পঞ্চার জন্য মাসে আপনার খরচ হবে বড়ো জোর পাঁচশো টাকা। পঞ্চার দাম এক বছরেই উঠে আসবে আপনার। নাঃ, পাঁচ হাজারের কমে আমি বেচব না।”

“বাঙালি লোক ভি বেওসা বুঝে গেল,” খুব দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে লাগল মোটেরাম, “লেও বাবা, পান্চ হাজারই লেও।”

বলতে বলতে কোমর থেকে একটা গেঁজে খুলে এনে তা থেকে একটা মোটা নোটের বান্ডিল বের করে আনল মোটেরাম। একখানা একখানা করে ভারি যত্ন করে শুনতে লাগল নোটগুলো।

মামা পঞ্চার পাশে মাটিতে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। একটু সরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনবার গুনে পঞ্চাশখানা একশো টাকার নোট মামার হাতে দিয়ে মোটেরাম বলল, “লেও ভাই, বহুৎ নুকসান হয়ে গেল, একটা ভল্লুর দাম পাঁচ হাজার!”

“না মোটেরামজি,” মামা নোট গুনতে গুনতে বলল, “লোকসান হলে আপনি পঞ্চাকে নিতেন নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে আমরাই ঠকে গেছি। দশ হাজার বললেও আপনি রাজি হতেন।”

“কী যে বোলেন আপনি?” জিব কেটে মাথা নাড়ল মোটেরাম, “আরে এ লাড্ডু, এ জিলাইবি, ভল্লুকা রশি পাকড়। জয় সীয়ারাম..”

দুই চাকর পঞ্চার গলার দড়ি হাতে নিয়েছে কি নেয়নি বইচই করে বস্তির একদল ছেলেবুড়ো মাঠে ঢুকে পড়ল। সকলের সামনে পরানদাদু আর বদ্যিনাথদাদু। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের ঘিরে ধরল সবাই। আমরা হতভম্ব। মোটেরামের চোখে ছানাবড়া।

রেগে লাল পরানদাদুই প্রথমে কথা শুরু করল, “পোলাপানেরা গিয়া খবর না দিলে আমরা তো জানতেই পারতাম না যে তুমি পঞ্চারে বিক্রয় করনের মতলব করছ। এইডা কি আমাগ ভালোবাসার প্রতিদান হইল নয়কড়ি?”

“পরানবাবু ঠিক বলেছেন। আমরা যে এত ভালোবাসি পঞ্চাকে তার কোনো দাম নেই? তোমরা ওকে বিক্কিরি করে দেবার কথা ভাবতে পারলে? ছি ছি!”

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম বদ্যিনাথদাদু পরানদাদুর কোনো কথায় সায় দিল। বদ্যিনাথদাদুর কথা শেষ হতে না হতে একদল স্লোগান দিয়ে উঠল, “পঞ্চা ভালুক কার ভালুক? তোমার আমার সবার ভালুক, সবার ভালুক, সবার ভালুক। পঞ্চাননকে বিক্রি করা –চলবে না চলবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ –জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম...”

এই যখন চলছে হঠাৎ দেখা গেল থানার বড়োবাবু তাঁর দুই কনস্টেবল ক্যাবলা আর ভ্যাবলাকে নিয়ে মাঠে ঢুকছে।

“চুপ, চুপ সবাই,” বলতে বলতে বড়োবাবু ভিড় সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, “এই মাঠে ভালুক নিলাম হচ্ছে শুনেই চলে এসেছি। এ তো সাধারণ নিলাম নয় –ভালুক নিলাম। জানতাম গোলমাল একটা হবেই। ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। এর নাম বাবা ও. সি. রাধেশ্যাম মুখুটি। এক মাইল দূর থেকেও গোলমালের গন্ধ পাই। তা, গোলমাল কীসের? আপনি কে?” শেষ প্রশ্নটা মোটেরামকে।

মোটেরাম হাত জোড় করে বলল, “হামি মোটেরাম কংকরিয়া। এই বাবুর কাছ থেকে ভল্লুটা হামি কিনলাম। এখুন এরা ঝামেলা পাকাচ্ছে কি ভল্লু বিকতে দেবে না।”

“হুঁ...উ...উ,” ভীষণ গম্ভীর মুখ করল দারোগাবাবু, “ভালুক বেচাকেনা দুই- ই বে-আইনি কাজ।” তারপর মামার দিকে ঘুরে বলল, “তোমাদের ভালুকের খবর সব আমি জানি সেই জিতু চোরকে ধরার সময় থেকেই। আমি কঠোর কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু মনের ভেতরটা আমার গরম রসগোল্লার মতন নরম তুলতুলে। এইজন্যেই জঙ্গলের জীবকে বে-আইনি ভাবে তোমরা আটকে রেখেছ জেনেও তখন কিছু বলিনি। কিন্তু এখন যা শুরু হয়েছে তাতে আমাকে তো কিছু করতেই হবে।”

মোটেরাম মামাকে বলল, “হামার টাকাটা ফিরত দিন হামি চলে যাই। ভল্লু দারোয়ান হামার কপালে লিখে নাই রামজি।”

মামাও চুপচাপ টাকাগুলো পকেট থেকে বার করে তার হাতে দিতে সে দুই চাকরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

“বেশ, এবার শুনি কার কী বক্তব্য,” দারোগাবাবু বলল।

বদ্যিনাথদাদু পরানদাদু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পরানদাদু বলল, “আপনেই কন বৈদ্যনাথবাবু।”

হাতজোড় করে বদ্যিনাথদাদু দারোগাবাবুর দিকে ঘুরল, "হুজুর, ভালুক এদের। কিন্তু আমরাও একে কম ভালোবাসি না। পঞ্চা এই বস্তির মস্ত সহায়। সে আসাতে চুরি বন্ধ হয়েছে। আপনার ঝামেলা কত কমেছে বলুন হুজুর? সেই জিতু চোরের ঘটনার পর থেকে কোনো চোর এখানে চুরির চেষ্টাও করেনি।"

"তা ঠিক। এই তো জিতু চোর সেদিন ফিরেছে তিন মাস জেল খেটে। এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে থানায় এসেছিল আমাকে প্রণাম করতে। এমনিতে ব্যাটা আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে তো! তা আমি বললাম, 'এবার চুরি-টুরি ছেড়ে দে জিতু।' সে বলল, 'ছেড়ে দিলে খাব কী স্যার? তবে ওই ধুকধুকিয়া বস্তিতে আর ঢুকছি না বাবা। অন্ধকারে গা মিলিয়ে, একেবারে শব্দ না করে ভালুকের চোর ধরার কায়দাই আলাদা। না বাবা, ওদিকে আর না।'"

"তবেই বোঝেন," পরানদাদু বলল, "তা ছাড়া পোলাপানগুলাও আর পাড়ার বাইরে যায় না। ওর লগেই খেলা করে।"

"বুঝলাম," দারোগাবাবু এবার মামার দিকে ঘুরল, "তাহলে ন'কড়ি না কী যেন তোমার নাম..."

"আজ্ঞে ন'কড়ি।"

"হুঁ। তোমার বক্তব্য বলো শুনি।"

মামা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর বলল, "বিক্রি করতে যখন পারব না আপনিই নিয়ে যান পঞ্চাকে।"

"ধেত্তেরি..." খিঁচিয়ে উঠল দারোগাবাবু, "ভালো কায়দা। আমার ঘাড়ে একখানা দু'শো কেজির ভালুক চাপিয়ে দিতে চাইছ! বেশ মজা যা হোক!"

"আজ্ঞে দু'শো না, দেড়শো কেজি," আমি মিনমিন করে শুধরে দিলাম।

"ওই হল। ভালুক নিয়ে তোমরা যা শুরু করেছ, আমি কিন্তু ভয়ানক রেগে যাচ্ছি।"

এদিকে ভিড়ের মধ্যে আবার স্লোগান শুরু হয়েছে। অনেক বাচ্চারাও গলা মিলিয়েছে- "পঞ্চা এখানেই থাকছে থাকবে –থাকছে থাকবে। যাবে না সে যাবে না – কোথাও যাবে না। তোমার ভালুক আমার ভালুক, সবার ভালুক পঞ্চানন, তোমার আমার আপনজন।"

কটমট করে মামার দিকে তাকাল দারোগাবাবু, "কী ঝামেলায় আমাকে ফেলেছ বুঝতে পারছ?"

তখন ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল মামা, "কী করব দারোগাবাবু, আমরা যে বড়ো গরিব! খেলা দেখিয়ে প্রথম প্রথম ভালোই রোজগার হত। এখন সামান্যই হয়, অন্য রোজগারও তেমন কিছু নেই। নিজেরাই পেট ভরে খেতে পাই না। ওকে কী খাওয়াব?"

পরানদাদু মামার কথা শুনছিল। সে ভিড়ের দিকে ঘুরে দু'হাত তুলে বলল, "এই তোমরা চ্যাঁচানি বন্ধ করো। শুনো, নয়কড়ি কইতাছে অর্থাভাবে ওরা পঞ্চারে ভরণপোষণ করতে পারতাছে না।"

হইহই করে উঠল পাড়ার লোকেরা, "সেকথা বললেই হত। আমরা সবাই মিলে পঞ্চার খাবার দেব। হল তো?"

ভিড়ের মধ্যে গোপাল ডাক্তারও ছিল, সে হাত তুলে বলল, "আমি পঞ্চার সব চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছি। ফি লাগবে না, ওষুধও ফ্রি।"

হাবুল মন্ডল ঘোষণা করল, “আমি পঞ্চাকে রোজ চারটে করে কলা খাওয়াব।” আরো অনেকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিল।

“বেশ, শান্তিপূর্ণভাবে সব মিটে গেল। চল্ রে ভ্যাবলা ক্যাবলা...” বলে দারোগাবাবু তার দুই কনস্টেবলকে নিয়ে চলে গেল। তারপর আনন্দে সবাই যে নাচানাচি হইহট্টগোল শুরু করল সে আর কী বলব। একসময় বাচ্চারা পঞ্চাকে ঘিরে নিয়ে চলে গেল চাতালের দিকে।

আমি আর মামা ফিরে এলাম ঘরে। আমাদেরও মন খুব হালকা, খুশি- খুশি। পঞ্চা এখন আমাদের দু’জনের হয়েও সকলের। তাকে নিয়ে আর আমাদের চিন্তা নেই।

পরানদাদু একটা কমিটি করে দিয়েছে। পঞ্চার খাওয়াদাওয়া দেখাশোনার সব দায়িত্ব তাদের। অবশ্য পঞ্চাকে নিয়ে মাঝে- মধ্যে খেলা দেখিয়ে মামা যা পায় সেটা আমাদেরই।

তবে আজকাল খেলা দেখাতে বেরোনো বড়ো একটা হয় না। বস্তিতে ঢোকার মুখে একটা ছোটো চালার নিচে আমর তেলেভাজার দোকান দিয়েছি। দোকানটা যে আমরা দিতে পেরেছি সেও পঞ্চারই জন্যে। বস্তির লোকেরাই খুশি হয়ে আমাদের দোকান দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বেশ বিক্রি হয় আমাদের দোকানে। সেই যে একদিন খেলা দেখিয়ে ফেরার সময় এক তেলেভাজাওলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে- ই মামাকে মশলার ভাগ- টাগ শিখিয়ে দিয়েছে। খুব ভালো লোক দক্ষিণামামু। তার শেখানো কায়দায় তেলেভাজা বানিয়ে আমাদের দোকানের তেলেভাজারও বেশ সুনাম হয়েছে। দামও আমরা অন্য দোকান থেকে কম নিই। ভালোই চলে যাচ্ছে আমাদের।

পঞ্চা মাঝে মাঝে দোকানে এসে বসে থাকে। মামা ওকে ফুলুরি আলুর চপ- টপ দেয়। আমরা নাম দিয়েছি পঞ্চার তেলেভাজা। লোকে কিন্তু বলে ভালুকওলার তেলেভাজা।

এখন আমার একটাই লক্ষ্য –মাধ্যমিকে স্টার আমাকে পেতেই হবে, আর তিনটে অন্তত লেটার। ভবেশবাবুস্যারের নাম আমাকে রাখতেই হবে। মামাও খুশি হবে খুব। যেদিন রেজাল্ট বেরোবে সেদিন পঞ্চার পছন্দের ভালো ভালো জিনিস সব তাকে খাওয়াব। তার জন্যেই তো সব। বলো, সত্যি না!

শেষ

ভুলো

বাবাঃ তোর মোবাইল নম্বরটা বলবি?
ছেলেঃ এত ভুলে যাও কেন বাবা? মনে না রাখলে নম্বরটা স্টোর করে রাখতে পারো তো।
বাবাঃ হুঁ হুঁ। স্টোর করে রেখেছি। দাঁড়া। আগে বল ভারতের জাতীয় ফুলের নাম কী?
ছেলেঃ পদ্ম।
বাবাঃ বেশ বেশ। (গলা তুলে) পদ্ম, তোমার ছেলের মোবাইল নম্বরটা বলো দেখি—

ঘোট(ক)ম্যান্ড

“দারুণ ঘোড়া স্যার। কেনবার আগে একবার চড়ে দেখুন!”
ঘোড়াটা তারিফ করবার মতন। শান্ত। বড়োসড়ো। এক লাফে তার পিঠে চেপে লাগাম ধরে বললাম, “চল।“

ঘোড়া নড়ে না। মালিক বলে, “ওই একটা মজা স্যার। এর ট্রেনিংটা অদ্ভূত। লাগাম ঝাঁকিয়ে বলবেন, “বাঁচলাম।” তাহলেই ছুটতে শুরু করবে।

“আর থামাতে হলে?”

“বলবেন হ্যাট হ্যাট।”

ছুট শুরু করলাম সামনের পাহাড়টার দিকে। ক্রমেই তার খাড়াই ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছি। উল্টোদিকের খাদ এগিয়ে আসছে। এবার থামতে হয়।

বললাম, “থাম, থাম।”

সে আর থামে না। ওদিকে খাদ এগোচ্ছে। বুঝলাম বিপদ। থামাবার শব্দটা ভুলে গেছি। বললাম, “টুপিটাপা”- সে থামল না। বললাম, “হাঁটাহাঁটি” সে থামল না।

শেষমেষ একেবারে খাদের মুখে, তিনশো ফিট গভীর ড্রপটার নাকের ডগায় আসবার যখন উপক্রম হয়েছে তখন মনে পড়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, “হ্যাট হ্যাট।”

এক চুলের জন্যে খাদের ভেতর পা না দিয়ে থেকে গেল ঘোড়া। আমার তখন ঘাম ছুটে গেছে শরীরে। ঘোড়ার পিঠে বসে টুপিটা খুলে হাওয়া খেতে খেতে বললাম, “আঃ, বাঁচলাম।”

জয়ঢাক শুনেছি ভূতদের লেখা ছাপায়। তাই সাহস করে পাঠালাম।

আমাদের শরণ্যার লেখাটি দফতরে যখন পৌঁছোল এসে তখন পুজোর জয়ঢাক বেরিয়ে গেছে। তবু, পুজো আসছে কথাটা সারা বছরই তো ঠিক। সত্যিই তো আসছে পুজো। আবার—বার বার। ক'দিন পরে যেই বসন্ত আসবে অমনিই তো মা দুর্গা ফের আসবেনবাসন্তী সাজে সেজে। তাই----

পুজো আসছে

শরণ্যা ঘোষ, নৈহাটি বয়স ১০ বছর

ঢ্যাং কুড়াকুড়, ঢ্যাং কুড়াকুড়
বাজছে ওই ঢাক
সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ
করছে হাঁকপাঁক
কার্তিকের সাজই নেই
তির ছুঁড়ে খালাস
দেবাদিদেব তাড়া দিয়ে যান
বাহনেরা করে বিলাস

মা দুর্গার কাজ যে কত
বলতে নাহি পারি
গোছান দ্রুত ব্যাগ সুটকেস
গোছা গোছা শাড়ি

মর্ত্যে তখন কাশফুলেরা
করছে হাসাহাসি
পদ্মেরা সব গন্ধ ছড়ায়
শিউলি রাশি রাশি

বর্ম গায়ে খড়গ হাতে
অসুর এসেছে
মা দুর্গা আসবেন তাই
টগর সেজেছে
সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায়
শারদ আনন্দে
দেবী হাসেন মর্ত্যে নামেন
সুনীল সানন্দে

বায়োলজির প্রজেক্ট

রক্তের উপকারিতা

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
ক্লাশ সিক্স, এপিজে ইশকুল
সল্ট লেক

উদ্দেশ্যঃ প্রমাণ কর, রক্ত খুব শক্তিশালী তরল।

উপকরণঃ

একটি ড্রাগন, একটি বালতি, একটি তলোয়ার ও একটি রোগা মশা

প্রথম ধাপ

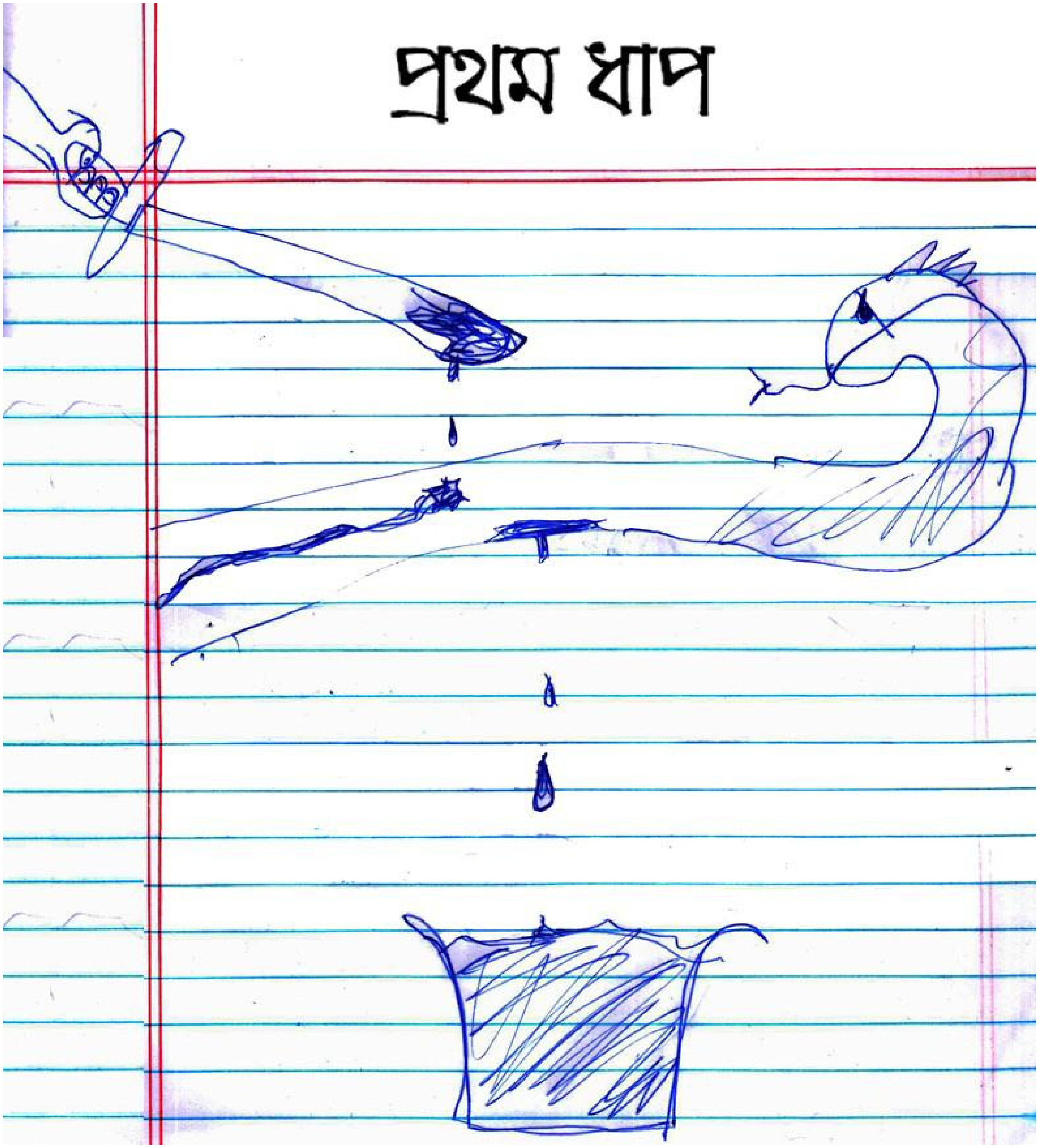

দ্বিতীয় ধাপ

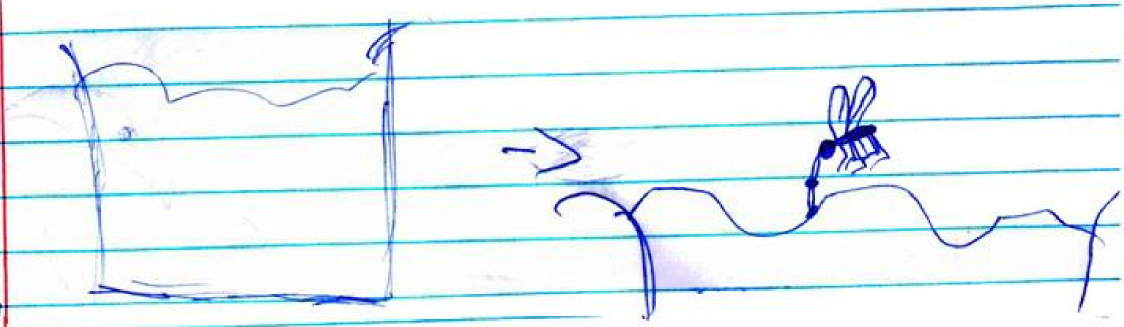

তৃতীয় ধাপ

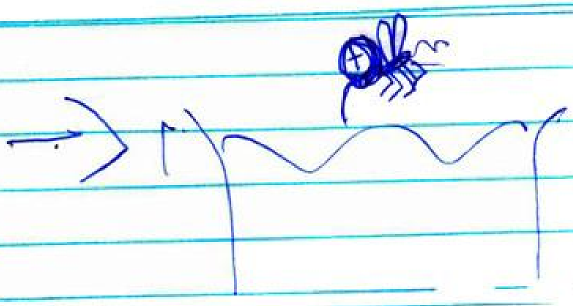

চতুর্থ ধাপ

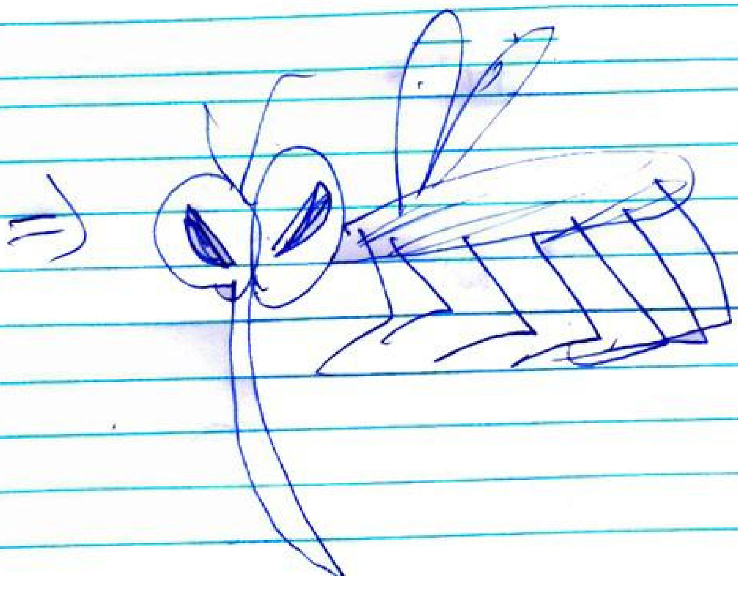

পঞ্চম ধাপ

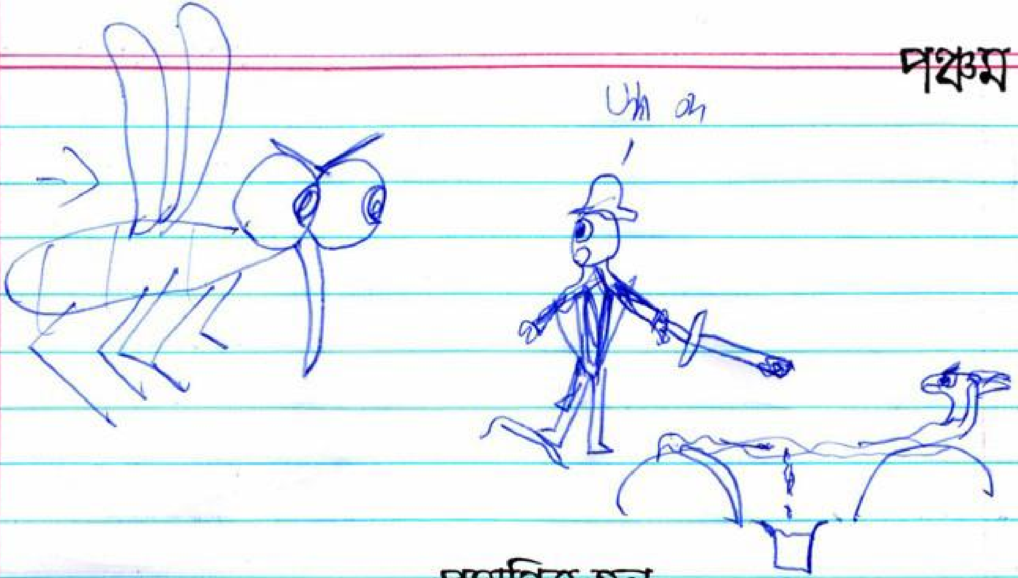

প্রমাণিত হল

নচিকেতা ও সত্য

সংহিতা

পর্ব ৪

নচিকেতার মনের কথা জানতে পেরে যম প্রসন্ন হলেন। সে কথা প্রকাশও করলেন সোচ্চারে, “নচিকেতা, তুমি কামনার নিবৃত্তি দেখলে, দেখলে যাবতীয় রীতি মেনে যজ্ঞ করলে কী অসীমপ্রসারী ফলাফল পাওয়া যায়, পাওয়া যায় দীর্ঘায়ু, দীর্ঘযৌবন, অকল্পনীয় সুখ, সমৃদ্ধি, মনোরঞ্জন; জানলে যে এতে সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায়।যেখানে ভয়ের কোনো ঠাঁই নেই, তুমি সেই পরপারের কথাও জানলে। এইসব কী এবং কেমন তা জেনে ফেলাটা প্রশংসনীয়, মহৎ

এবং সমর্থনযোগ্য। তবুও যথার্থ জ্ঞানী বলেই তুমি এই যা কিছু অর্জন করলে তার সবই পরিত্যাগ করলে। যে জ্ঞানী নিজের অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে নিজেকে জানার, নিজেকে চেনার চেষ্টা করেন এবং সেই অধ্যবসায়ে জেনে নেন নিজের হৃদয়ের গভীরতম কোটরে থাকা, নিজের অস্তিত্বের গহনে থাকা দুর্জ্ঞেয় প্রাচীন স্বত্ত্বাকে এবং সেই স্বত্ত্বাকেই সৃষ্টিকর্তা বলে চিনে নেন তিনি জাগতিক সুখ- দুঃখের শেকলে বাঁধা পড়েন না আর। যে মরণশীল ব্যক্তি জ্ঞানীর এই বিবরণ শোনে আর বোঝে, সে নিশ্চয়ই নিজের অস্পষ্ট স্বত্ত্বাটিকেও টের পায়। সেই টের পাওয়াতেই তার পরমানন্দ। কারণ নিজের অন্তরের গহীনে, অজানা অচেনা নিজের মধ্যে জগৎস্রষ্টার বসতটি চিনে নিতে পারাতেই তার সকল আনন্দের উৎস। তাই আমার বিচারে সত্যের প্রাসাদের সিংদরজা তোমার জন্য খোলা, নচিকেতা।”

উত্তর নচিকেতা আরও স্পষ্ট করে জানালেন তাঁর অতৃপ্ত কৌতহলের আরও খানিকটা। তিনি বললেন, “তাহলে আপনি যে দোষ- গুণের বাইরে, কার্য- কারণের বাইরে, অতীত- ভবিষ্যতের বাইরে দেখতে পান, সেটা কী বা কেমন তা আমাকে বোঝান।”

যম বললেন, “চতুর্বেদে মহিমান্বিত, সব তপস্যায় কাঙ্খিত, সমস্ত ব্রহ্মচারীর অভীষ্ট হলো ওঁ। এই শব্দই ব্রহ্ম। এই শব্দই মহত্তম। যে এই শব্দের সন্ধান পায় সে যা চায় তাই পায়। এই শব্দই সর্বোত্তম আশ্রয়, যে এই আশ্রয়ের সন্ধান জানে সেই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতম স্বত্ত্বার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এর কোনো উৎস নেই, এ কিছুর উৎস নয়। এই সুপ্রাচীন স্বত্ত্বাটি অজাত, শাশ্বত, অবিনশ্বর। দেহ নিহত হলেও একে হত্যা করা যায় না। যে হন্তা ভাবে একে হত্যা করেছে, যে হত মনে করে যে তার অন্তর্লীন স্বত্ত্বাটি নিহত হয়েছে তারা কিছুই জানে না। কারণ এই স্বত্ত্বা হত্যা করে না, হত হয় না। এই অস্তিত্ব মহতের চেয়ে মহত্তর, অস্পষ্টের থেকেও অস্পষ্টতর। এর অধিষ্ঠান প্রত্যেক জীবের অন্তরে। দুঃখ আর কামনা নেই যার, যার মন আর ইন্দ্রিয় শান্ত সে- ই দেখতে পায় আত্মার মহিমা। বসে বসেও এই অস্তিত্বের গমন বহুদূর, শুয়ে শুয়েও এ সর্বত্রগামী। আমি ছাড়া আর কে- ই বা এই ঈশ্বরের কথা জানে? কে- ই বা একইসাথে নিরানন্দ ও পরমানন্দ? যে মহাজ্ঞানী বুঝতে পারেন যে শরীরের গমন ও ব্যপ্তি সীমিত হলেও, সর্বব্যাপী, মহৎ ও নিরাকার আত্মা নশ্বর শরীরেই বাস করে, তিনি কখনওই দুঃখ পান না। বুদ্ধিদীপ্ত ধারণার সাহায্যে কিংবা পুঁথিপাঠ করে কিংবা বারবার এর নাম শুনে এই অস্তিত্বকে অধিগত করা যায় না। এই অস্তিত্ব, যাঁকে আত্মা বলি, তিনি যাঁকে বেছে নেন কেবলমাত্র তিনিই আত্মার দর্শন পান। কেবল তাঁর কাছেই আত্মা স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে অসদুপায় অবলম্বন করে, যার ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসংযত, যে শান্ত নয়, যার মনে শান্তি নেই, তার কাছে জ্ঞানের দ্বারাও আত্মার উন্মোচন হয় না। তাহলে কে- ই বা জানে কোথায় এই অদ্ভুত অস্তিত্বের বাস, সেই অস্তিত্ব যার ভোগ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, মৃত্যু যার সৌরভ?

চলবে

পুরাতনী

প্রচলিত বাংলা ছড়া

খুকু যাবে খেলা করতে সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে ময়রা বুড়ো তাকে পাঠিয়ে দে।
খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে কালাচাঁদ তাকে পাঠিয়ে দে।
খুকু যাবে চান করতে সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে ময়না দিদি তাকে পাঠিয়ে দে

খুকুমণির বিয়ে কাল
আধখানি মুসুরের ডাল
বর খাবে বরযাত্রী খাবে
পাড়াপড়শী এলে পাবে
নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে।

খুকু বল্‌তে পারে কইতে পারে
সইতে পারে না।
খেতে পারে নিতে পারে
দিতে পারে না।

খুকু বল্‌তে পারে কইতে পারে
সইতে পারে না।
খেতে পারে নিতে পারে
দিতে পারে না।

খুকু বল্‌তে পারে কইতে পারে
সইতে পারে না।
খেতে পারে নিতে পারে
দিতে পারে না।

খুকু বড় সেয়ানা
খেলে নিয়ে খেলানা
হাসে কাঁদে এক সাথ
পড়ে যায় চিৎপাত।

খুকু বড় সেয়ানা
খেলে নিয়ে খেলানা
হাসে কাঁদে এক সাথ
পড়ে যায় চিৎপাত।

খুকুনবালা টাকার ছালা
মট্‌কী ভরা ঘি
খুকুর ভাতে ভোজ হ'ল না
ছি! ছি! ছি!

খুকু এসেছে বেড়িয়ে
পায়ের ঘুঙুর হারিয়ে
গেছে গেছে হারিয়ে
আবার দেবো গড়িয়ে
দুধ আন গো জুড়িয়ে।

খুকুনমণি দুধের ফেণী
কৌ গাছের মৌ
সব ছেলেদের বল্‌ব খুকুন
হাঁড়ীখাকীর বৌ।

ঈশা খাঁ

(১৫৩৩- ১৫৯৯)

উমা ভট্টাচার্য

এবারের পর্বে থাকছে বাংলার স্বাধীনচেতা বিখ্যাত বারো ভুঁইয়ার একজন, ঈশা খাঁ মসনদ আলির কাহিনি। বাংলার বারোজন ভূঁইয়া স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন ছিলেন, অধিকৃত এলাকা বাড়াতে এঁরা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ করতেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে একটা মিল ছিল, মোগল ছিল এঁদের সকলেরই শত্রু। এঁরা তুর্কি, হাবশি, পাঠান, মোগল এমনকি ইংরেজ কারও অধীনতা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। প্রবল বিরোধিতা করে অনেক সময় মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু আক্রমণকারী বিদেশী সুলতান, সম্রাট কারোর কাছেই মাথা নত করেননি।

এঁদের অধিকৃত বিশাল এলাকা, এঁদের প্রতিপত্তি, সেনাবল, শক্তিশালী নৌবাহিনীর বিবরণ থেকে মনে হয় এঁরা ছিলেন সামন্তরাজা বা বড়োমাপের জমিদার। এঁদের কেউ বা পাঠান আমলে জায়গির পেয়েছিলেন, পরে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন। আবার কেউ বা অন্য জায়গা থেকে বাংলায় এসে বসতি করেন ও নিজ প্রতিপত্তি বাড়িয়ে বড়ো জমিদার হয়ে উঠেছিলেন।

এঁদের প্রতিরোধের জন্যই মুঘল সম্রাট আকবর বারবার বাংলার সুবেদার বদল করেও নিজের জীবিতকালে সুবা বাংলার পুরোটা করায়ত্ব করতে পারেননি। এই ভূঁইয়াদের মধ্যে বিখ্যাত ঈশা খাঁ ছিলেন ভাঁটির দেশের অধীশ্বর। ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন অযোধ্যাবাসী ক্ষত্রিয় রাজপুত। তাঁর ঠাকুর্দা ভগীরথ ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন বাংলাদেশে। তখন বাংলায় রাজত্ব করছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ শাহ। ১৫৩৩ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল। ভগীরথ নিজ দক্ষতায় সুলতানের অধীনে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। তাঁর দুই পুত্রের একজন, কালিদাস, ছিলেন ঈশা খাঁর পিতা। তিনি যজ্ঞে হাতি দান করতেন বলে পরিচিত ছিলেন কালিদাস গজদানী নামে। পিতার মৃত্যুর পর কালিদাস গজদানী উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার দেওয়ানীটি লাভ করেন। তিনি ভাঁটি অঞ্চলে বাস করতেন। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ, বঙ্গের পুর্ব অঞ্চল, বর্তমান ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চল, আর এর দক্ষিণে সুন্দরবনের কিছু অংশ জুড়ে ছিল তাঁর এলাকা। শোনা যায় তিনি এক মুসলমান ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বিতর্কে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নাম নেন সলিমান খাঁ। সুলতানের কন্যা সইদা খাতুনকে বিয়ে করে সরাইলের জমিদারী লাভ করেন।

গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের রাজত্বের শেষভাগে, ১৫৩৬ সালের কাছাকাছি সময়ে ঈশা খাঁর জন্ম হয়। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর সলিমান খাঁ নিজেকে সুলতানের বৈধ উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। সেই সময় দিল্লিতে পাঠান শের শা শূরী তখ্‌ত্‌ দখল করেছেন। সলিমান খাঁ পাঠানদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন। বাংলার পাঠান শাসক ইসলাম শাহ শূরীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হলেন। তাঁর দুই নাবালক পুত্র ঈশা খাঁ আর ইসমাইল খাঁকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে তুরানে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর বাংলায় কারনানী বংশের শাসন শুরু হয়। তাজ খাঁ কারনানী বাংলার শাসক হলে ঈশা খাঁর মামা (অনেকের মতে তাঁর কাকা) তাঁর অধীনে চাকরি নেন। সুলতানের রাজদপ্তরে থাকার সুবাদে সুযোগ বুঝে খোঁজখবর করে দুই ভাগ্নে- ঈশা খাঁ আর ইসমাইল খাঁকে তুরান থেকে বাংলায় ফিরিয়ে আনেন।

এরপর যুবক ঈশা খাঁ নিজের দক্ষতায় সুলতানের নেকনজরে পড়েন। এই সময়ই তিনি প্রথমে খিজিরপুরের শাসনভার পান, পরে ১৫৬৪ সালে সোনারগাঁ ও মহেশ্বরদী পরগনার অধিকার লাভ করেন। ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করেন,

জঙ্গলবাড়ি, একডালা প্রভৃতি পুরানো দুর্গগুলির সংস্কার করেন। ১৫৭৫ সালে সোনারগাঁয়ে মোগলবাহিনীর অভিযান ব্যর্থ করতে তাঁর শক্তিশালী নৌবাহিনী নিয়ে দাউদ খাঁকে অভূতপুর্ব সাহায্য করেন।তাঁর কৃতিত্বে খুশি হয়ে দাউদ খাঁ তাঁকে খিজিরপুরের মসনদ-ই- আলা উপাধি দেন।

মোগল- পাঠানের দ্বন্দ্বের সুযোগে নিজের এলাকা আর ক্ষমতা দুইই বিস্তার করতে থাকেন সুচতুর ঈশা খাঁ। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁয়ের পরাজয় হয়। তিনি পালিয়ে যান। এরপর ঈশা খাঁর জীবনের বাকি সময়ের অনেকটাই ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়েই কেটেছে।

সুযোগ বুঝে তিনি ঢাকা, রংপুর, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহের অনেকাংশ দখল করে নেন। নিজের সুরক্ষার জন্য এগারোটি নদীর মিলনস্থল ‘এগারোসিন্ধু’তে দুর্গ নির্মাণ করেন, এগারোসিন্ধুকে রাজনীতি ও ব্যাবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। ১৫৮১- ৮২ সালের মঝামাঝি সময়ে নিজেকে সমগ্র ভাঁটির অধীশ্বর ঘোষণা করেন। ছোটখাটো একটা রাজ্য গড়ে তুলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এইবার দিল্লির মোগল সম্রাটের টনক নড়ল। বাংলার সুবাদার করে খান জাহান আলিকে পাঠালেন ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে। ঈর্ষাণ্বিত কিছু বাংলার পাঠান জমিদার মোগলের সঙ্গে যোগ দিল। এই যুদ্ধে সরাইলের কাছে খান জাহানের নৌবাহিনীর পরাজয় ঘটে ঈশা খাঁর পক্ষের দুই জমিদার মজলিস প্রদীপ আর মজলিস দিলওয়ারের বাহিনীর হাতে। খান জাহান তাণ্ডায় পালিয়ে যান প্রাণ বাচাঁতে। এই সময় ঈশা খাঁ রাজ্যে ছিলেন না, তিনি ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কাছে গিয়েছিলেন সৈন্যসংগ্রহ করতে। ৫২, ০০০ সৈন্য সাহায্য পেলেন ত্রিপুরারাজের কাছ থেকে। ফলে মোগল সৈন্যের মোকাবিলা করার মত যথেষ্ঠ শিক্ষিত সৈন্যবল হলো তাঁর।

এরপর ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন শাহাবাজ খান, তিনি ঈশা খাঁর একটি প্রাসাদ ধ্বংস করে দেন। পরে সোনারগাঁ, এগারোসিন্ধুর দিকে অভিযান করেন। চতুর ঈশা খাঁ এই সময় সন্ধি করার ভান করে কিছুদিনের জন্য মোগলদের নিরস্ত রাখলেন। আর পাঠান সর্দার মাসুম খাঁ কাবুলির সহায়তায় মাস্কেট আর বারুদ ও গুলি সংগ্রহ করে, হঠাৎ করে একযোগে জলে- স্থলে আক্রমণ করলেন মোগল সেনাকে। এগারোসিন্ধু ও ভাওয়ালের যুদ্ধে শাহবাজ খানের সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করলেন ১৫৮৪ সালে। এক মোগল সেনাপতির মৃত্যু হল, শাহাবাজ খানও পালিয়ে গেলেন তাণ্ডায়।

আবার ১৫৮৬ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য শাহাবাজ খাঁ এলেন ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এইবারও ঈশা খাঁ ভান করলেন যেন আকবরের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর বাঙলা জয়ে সাহায্য করবেন।

তিনি পাশের কোন রাজশক্তিকে শক্তি বাড়াতে দিতেন না। এই কারণে পূর্বতন আক্রমণকারী কোচ রাজা রঘুদেবের রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করে কোচ-হাজো শক্তিকে স্বপক্ষে আনলেন মোগলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিশালী করতে। এবার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করতে এলেন মোগল সুবাদার রাজপুত রাজা মানসিংহ। ১৫৯৪ সালে বাংলার সুবাদার হয়ে এসে রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করে পুত্র দুর্জন সিংহকে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন ১৫৯৫ সালে। ভাঁটি অঞ্চলের দিকে এগোতে এগোতে অনেক বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি হল ১৫৯৭ সালে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ঈশা খাঁর অবস্থান সুবিধাজনক ছিল না। প্রথমে তিনি পিছু হঠার নীতি

নিলেন। শেষে একমাসের মাথায় যুদ্ধে দুর্জন সিং নিহত হলেন। মোগল বাহিনী পরাজিত হল।

আবুল ফজল ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের নানা লেখা থেকে জানা যায় এরপর তাঁকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে দ্বৈরথে অংশ নিতে হয়েছিল। বাংলার সুবাদার মহাযোদ্ধা মানসিংহের সঙ্গে ডুয়েল লড়বেন বাংলার এক সামন্ত রাজা। ভাবা যায়না। শুরু হল তলোয়ারের লড়াই। দুজনেই সমানে সমানে লড়ছেন। আসলে ঈশা খাঁ- ও তো রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশেরই সন্তান, রক্তে তাঁর ক্ষাত্রতেজের উপস্থিতি। হঠাৎ ঈশা খাঁর তরোয়ালের আঘাতে মানসিংহের হাতের তলোয়ারটি ভেঙে টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ ঈশা খাঁ থেমে গেলেন, কারণ প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র। শত্রুপক্ষ হলেও নিরস্ত্রকে আঘাত করা যুদ্ধের নীতিবিরুদ্ধ। যেমন মহারাজ পুরুকে সম্মান দিয়েছিলেন বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার, তেমনি বীর বীরের সম্মান রাখলেন। একজন উচ্চাকাঙ্খী সামন্ত রাজার এমন মহৎ আচরণ স্পর্শ করলো মানসিংহের হৃদয়। দুজনেই দুজনকে সম্মান জানিয়ে করমর্দন করলেন, বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন দুজনে।

সুচতুর ঈশা খাঁও দেখলেন সেনাপতি মানসিংহই যেখানে একক লড়াইয়ে হেরে গেছেন তাঁর কাছে, তখন তো সম্রাটের পরাজয়ই হয়েছে। তাই ঠিক করলেন অযথা যুদ্ধ করে নিজের সেনাবল ধ্বংস না করে, রাজ্যের মানুষের জীবনকে অশান্তিময় না করে তুলে দিল্লীর সম্রাটকে সম্মান জানিয়ে দেখাই যাক না। তিনি তো আর যুদ্ধে হেরে বশ্যতা স্বীকার করছেন না!

তাঁর ব্যবহারে আপ্লুত মানসিংহ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী গেলেন, সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করালেন, তাঁর মহৎ আচরণের কথা জানালেন। ছিলেন ভাঁটির অধীশ্বর, হয়ে গেলেন বিস্তীর্ণ বঙ্গের ২২টি পরগণার পূর্ণ অধীশ্বর। সম্রাট তাঁকে ২২টি পরগনার পূর্ণ শাসনভার দিলেন বিনা শর্তে। এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর রাজ্য তাঁরই ছিল। শান্তিতে দিন কাটিয়ে এই অফুরান প্রাণশক্তির অধিকারী এই বিচক্ষণ সামন্তরাজার স্বভাবিক মৃত্যু হয় ১৫৯৯ সালে।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁর নামে ডাকটিকিট বার করেছেন।

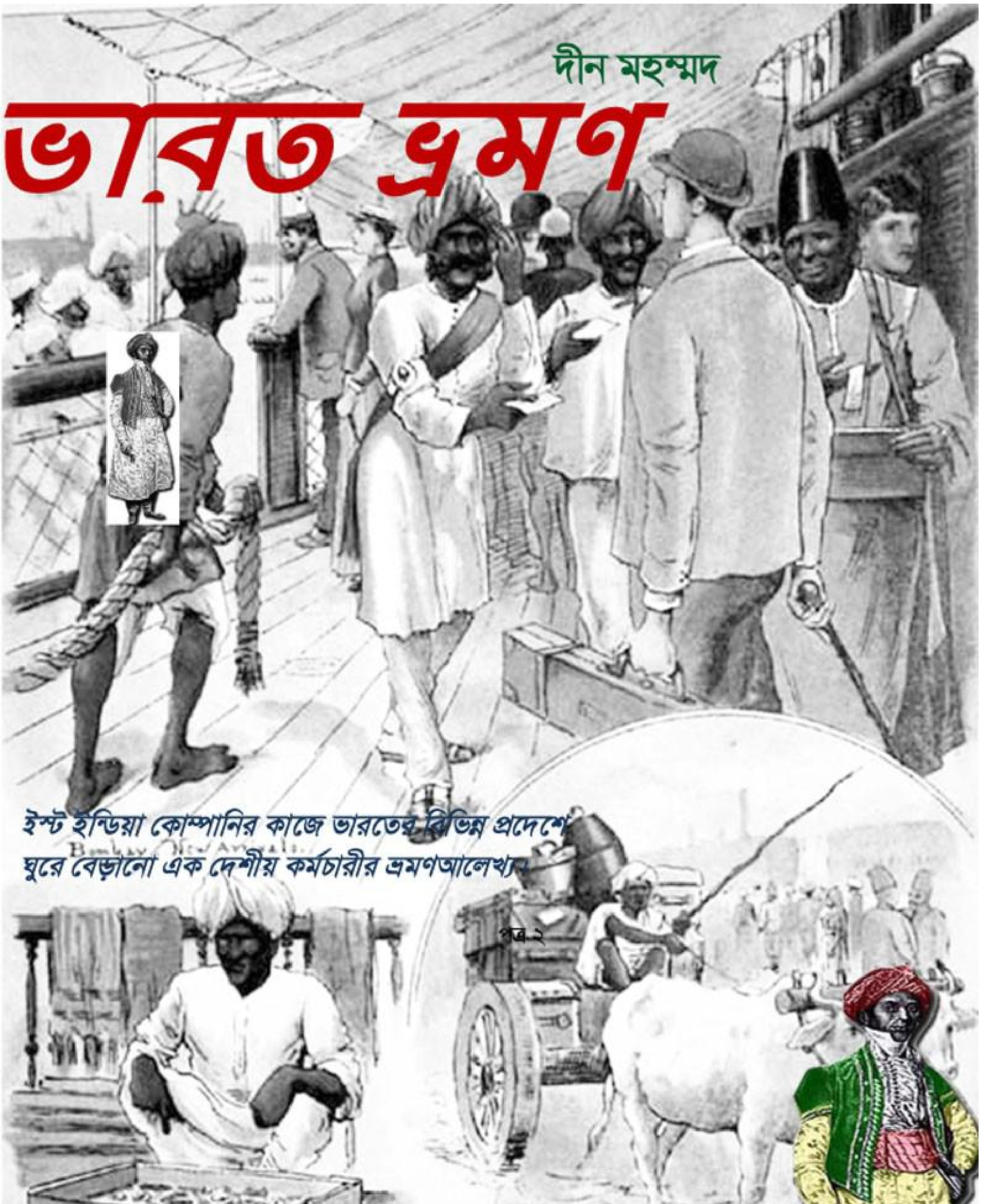

পত্র – ১৭

দেনাপুর থেকে বিলগ্রাম যাবার পথে কয়েকদিনের জন্য বেনারসে থামলাম। গঙ্গার উত্তর পাড়ে এটি একটি সমৃদ্ধ ও জনবহুল শহর। বেনারসের খ্যাতির অন্যতম কারণ অতীতের শিক্ষাকেন্দ্রের গৌরব। এককালে এখানে একটি উন্নত মহাকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও ছিল আর এই সেদিন বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বের একজন ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসু বহু জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারও করেছেন। সেগুলি সময়ের অভিঘাতে খানিক নষ্ট হয়েছে ঠিকই তবু

অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাদের উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। এমনটা মনে করা হয় মুঘল সম্রাট আকবরের হুকুমে এসব যন্ত্রপাতি শখানেক বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল। আকবর বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তারই নিরন্তর উৎসাহে পন্ডিতদের বড়ো অংশ জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

বেনারসকে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বর্গ- এর তুল্য মনে করা হয়। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, চমৎকার পরিবেশ ও প্রকৃতি, অধিবাসীদের সারল্য, তাদের আন্তরিক ও সহজ ব্যবহার কাছাকাছি আসা সকল মানুষকেই প্রভাবিত করে। ভারতের অন্যান্য জায়গাতে যখন কিছু না কিছু যুদ্ধের বিভীষিকা সেই সময় এখানে যুদ্ধের আঁচ প্রায় নেই। হয়তো সমুদ্রবন্দর থেকে দূরে বলেই, অথবা আরো যুক্তিযুক্ত কারণ হতে পারে এর ধার্মিক মাহাত্ম্য। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ নগরী ধর্মের এবং শিক্ষার কেন্দ্র, পাশাপাশি হিন্দুজাতির সহজ জীবনচর্চার পীঠস্থান। যুদ্ধের হানাহানি কাটাকাটি কোনো সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না বলে, এ ব্যাপার নিয়ে একেবারেই এখানকার মানুষেরা একেবারেই উদাসীন ও বিমুখ।

তো, বেনারসে, গঙ্গার পাড়ে গড়ে ওঠা নগরীতে ফেরা যাক। রাজঘাট থেকে গঙ্গার পাড় বরাবর রাজা চৈত সিং –এর প্রাসাদ অবধি, নয় নয় করে চার মাইল বিস্তৃত এই শহর। শহরের মাঝখানে এক প্রাচীন ও বিশাল মহলা বাড়ি, যার নাম মাধো দাস ধরহরা। প্রথম দর্শনেই চোখকে টানবে, এমন চমৎকারী। প্রাসাদের মিনারগুলির পাশাপাশি অবস্থানও এমন যেন শহর ও আশপাশের জায়গাকে তা পর্যবেক্ষণ করছে। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের অন্তর্বর্তী সাময়িক বাসস্থান এই বেনারস। এ শহরের ওপর দিয়ে যাবার সময় এমন শান্তিপূর্ণ স্থানে সকলেই দু চারদিন কাটান। খানিক দূরে হিরে ব্যবসায়ী বেণী মহাশয়ের আকর্ষণীয় প্রাসাদসম বাড়ি। বাড়িটা ঘাটের ওপরেই। বাড়ির মালিকের নামে নাম মিলিয়ে সে ঘাটের নাম বেণীমাধব রায় ঘাট। যেমন আইরিশ ভাষাতে বলা হয়ে থাকে সালিভানের চত্বর (*সালিভান = আইরিশ ভাষায় শিশুনাম; কোয়ে = পাথরের বাঁধানো চত্বর - অনুবাদক*) বা ফরাসিতে জেটি বা স্লিপ তেমনই নদী থেকে ডাঙা অবধি পরপর এমন অনেক পাথরের সিঁড়ি- ঘাট বানানো রয়েছে আর

সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে সেখানে যিনি বা যারা বাড়ি করেছেন তার বা তাদের নাম অনুসারে। যথা রাম ঘাট, রাণা ঘাট, পিল্লাই ঘাট, চৌকি ঘাট, মারাঠা ঘাট ইত্যাদি।

শহরের একেবারে পুবদিকে বড়ো চৌকো পাঁচিলঘেরা বাড়ি একখানা। এটা সরাইখানা, সমস্তরকম ভ্রমণকারী, পথিকের থাকার জায়গা। পয়সাওয়ালারা তাদের থাকার সুবন্দোবস্তের জন্য অর্থব্যয় করেন, কিন্তু গরীব মানুষেরাও থাকতে পান বিনেপয়সাতেই। এই প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনা শহরের প্রথিতযশা ব্যবসায়ীদের স্বতস্ফুর্ত দানের অর্থেই চলে।

এ ছাড়াও এমন চমৎকার সব জায়গা আছে যা অন্যান্য ব্যবসাদার, উৎপাদক, বৌদ্ধস্তূপ বা হিন্দুদের মন্দির এর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। বেনারসের রাস্তা, বলা ভালো গলিগুলো কিন্তু বেশ চাপা আর সরু। বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি, একটার গা লাগোয়া আরেকটা, বেশ উঁচু আর সমতল ছাদওয়ালা। বাসিন্দারা সেই ছাদে গরমের বিকেলে হাওয়া খেয়ে বেড়ান। শহরের নানান অংশে বাসিন্দাদের অথবা আগত ভ্রমণার্থীদের ব্যবহারের জন্য চৌবাচ্চা বা কুয়ো মজুত। এমনকি দরকারে গরিব পথিকের জন্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থাও, মানবিকতার খাতিরে, ওই কুয়ো বা চৌবাচ্চার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিই করে থাকেন। এই শহরের বাসিন্দারা সুনাগরিক এবং বাইরের মুলুকে সুভদ্র ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন, সে ঘোড়ায় চড়েই যান আর পালকিতে। পারিষদেরা তাদের উৎফুল্ল চিত্তেই বরণ করে থাকেন। এখানকার সিল্কের কাপড় সর্বোৎকৃষ্ট ও নিখুঁত। ভারতে এমন জায়গা হাতে গোনা যেখানে এত ধরণের সাটিন, কিংখাব, সোনার ফুলকারি কাজ করা সিল্কের কাপড় – স্বর্ণবাঁধনি এবং তার পাশাপাশি পাড়জুড়ে সোনা- রুপার কাজ করা মসলিনের শালও পাওয়া যায়। এ জায়গা আরো নানা কারণে বিখ্যাত। যেমন উৎকৃষ্ট কার্পেট, সোরা(*পটাশিয়াম নাইট্রেট*), চিনি, আতর ও কস্তুরী। ব্যবসা বাণিজ্য হয় মূলত কম্পানির সেনা আর অন্যান্য প্রদেশের খুচরো মজুতদারদের সাথে। এদের পসরার বদলে হিরে এবং বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য বিনিময় করা হয়ে থাকে।

শহরের তিন মাইল উত্তরে রাজবাড়ি। এক অসামান্য রাজপ্রাসাদ। রাজা সাধারণত সেখানে গ্রীষ্মকালটুকু কাটান। বাড়ির চারপাশ ঘিরে গাছের সারি, ঘাসে ঢাকা জমি, ছায়াঘেরা হাঁটাপথ, পুকুর আর ছোটো ছোটো ঝরনা।

পত্র ১৮

এবারে হিন্দু মানুষজন, যারা এখানকার বাসিন্দা, তাদের সম্পর্কে বলি। হিন্দুরা চারটে শ্রেণীতে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে অগ্রবর্তী, প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় এবং এরা পুরোহিত, দার্শনিক ও শিক্ষক। দ্বিতীয় শ্রেণী ক্ষত্রিয়, যারা মূলত যোদ্ধা। সরকারের ও দেশের প্রতিরক্ষার ভার থাকে এদের হাতে। যুদ্ধে এরাই সৈনিক, সেনানায়ক, শান্তির সময় এদের মধ্যেই কেউ বিচারক কেউ শাসক। বৈশ্য, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষেরা; এরা বণিক, বাণিজ্য যাদের জীবিকা। এরাই জীবনধারণের নানান বস্তু সরবরাহ করেন কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে। এভাবেই সমাজের বিভিন্ন খাতে সম্পদের হস্তান্তর ঘটে। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরাই শুদ্র। এরা প্রধানত শ্রমিক, মজুর ও ভৃত্য। এছাড়াও সর্বনিম্ন স্তরে আরেক সম্প্রদায় আছেন যাদের মধ্যে স্বর্ণখোঁজি, চামার, ডোম বা ঝুড়ি প্রস্তুতকারক মানুষেরা অন্তর্ভূক্ত। এদের এতটাই নীচু ও সামাজিকভাবে ঘৃণ্য মনে করা হয় যে এদের নাম নিলেও সাধারণ উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনে অস্পৃশ্যতা ও সমাজের নিম্নস্তরের আভাস জেগে ওঠে। কোনো মানুষই ধর্মান্তর্করণ বা

বর্গাকরণ ছাড়া আপন আপন বর্ণ বা জাতি পরিবর্তন করতে পারেন না। সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীবিভাগ, আর তাদের নিজের নিজের জাতের প্রতি দৃঢ় ও একনিষ্ঠ সংযোগ দেখে মনে হয়, প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে এই শ্রেণীবিভাজন, আর এভাবেই চলবে আরো আরো বহুদিন।

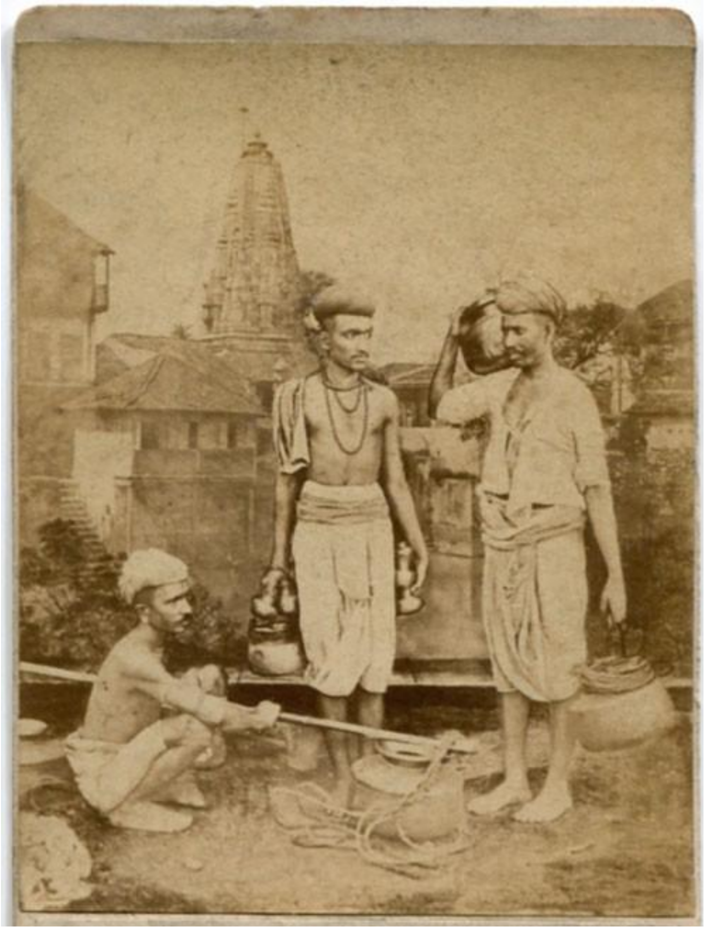

ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার পাঁচটা বর্গ। প্রথম, যাঁরা মাংস খান না। দ্বিতীয় যাঁরা কোনো কোনো মাংস খেয়ে থাকেন। তৃতীয়, যাঁরা বিবাহ করেন। চতুর্থ, যাঁরা কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। পঞ্চম যারা বেশিরভাগ সময়েই নিশ্চল থাকেন। এই নড়াচড়া না করার কারণ পাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী এতে মারা যায়। এমনকি এঁরা মুখে একখন্ড মসলিন বা সিল্কের কাপড় বেঁধে রাখেন পাছে সুক্ষ্ম জীবাণুরা শ্বাসের সঙ্গে মুখে চলে না যায়। তাঁরা এতই এ বিষয়ে যত্নবান ও সতর্ক থাকেন যে কাঠ জ্বালান না, পাছে কোন পতঙ্গ ধংস হয়। এঁরা সঙ্গে একটা ঝাড়ন রাখেন, কোথাও বসার আগে সেখানটা পরিষ্কার করে নেন যাতে সে জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীও সরিয়ে দেওয়া যায়। এই চরম সাবধানতার কারণ তাঁরা আত্মার দেহবদলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন মৃত আত্মা জীবজন্তুর দেহে প্রবেশ করে এবং কারো মৃত্যুর পর কোন প্রাণীকে বাড়ির আশপাশে বেশিবার ঘোরাফেরা করতে দেখলেই অবধারিতভাবে সিদ্ধান্ত হবে যে তাঁদের প্রিয়জনই এই নতুন রূপে ফিরে এসেছেন। জীবনবিযুক্ত কোনকিছু ভাবতেই পারেন না তাঁরা। ছোট্টো মশা থেকে বিশাল হাতি সকলের মধ্যের প্রাণকে একইরকম শ্রদ্ধায় দেখেন এঁরা।

তাঁরা বিশ্বাস করেন অনাদিকাল থেকে শুধুই একজন অসীম, গুণাতীত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই নন, তার পরবর্তী ধাপে আরো তিন দেবতা আছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রথমজন সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয়জন পালনকর্তা ও তৃতীয়জন সংহারকর্তা। এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা বোঝানোর জন্য এদের মূর্তিতে প্রায়শই একাধিক চোখ এবং হাত যুক্ত করা হয়। যাতে লোকের মনে এদের শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে একটা জোরালো ধারণা হয়। আর তাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে দেওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা তাদের অনুসরণকারী মানুষজনকে তীর্থযাত্রার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, বিশেষত গঙ্গার উজানে যেসব ধর্মীয়স্থান আছে সে’সব জায়গাতে। তাদের মতে গঙ্গায় স্নান করলেই বহু বহু পাপ ধুয়ে যায়। মহিলারা সকালে উঠে পুষ্পপত্র নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান। নিজের হাতে প্রদীপ ভাসান। স্নানের পর ধূপধুনো ঘন্টা সহযোগে গঙ্গাপুজো। এসব আচার বিচার ধর্মীয় বিশ্বাস ইউরোপীয়দের কাছে আশ্চর্যের মনে হতে পারে

তবু সেগুলির সামাজিক মূল্য অসীম, বিশেষত নীতিনিষ্ঠ জীবনচর্চার জন্য। ত্যাগ তিতিক্ষা সুবিচার মানবিকতা এসব গুণের চর্চাই হয় এসমস্ত আচারের মধ্য দিয়ে। নানান আড়ম্বর, বিচিত্র আচার- বিচার আর সংস্কারের মধ্যেও আমরা আবিষ্কার করে ফেলতে পারি নৈতিকতা, গভীর দর্শন আর পরিশীলিত কাজের পদ্ধতি। কিন্তু যেই এসমস্ত ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্থাগুলির উৎস খোঁজার চেষ্টা করব, দেখব প্রাচীনত্বের ভুলভুলাইয়ার মধ্যে তা হারিয়ে গেছে। ভারতীয় হিন্দুরা স্বভাবগতভাবেই খুব সক্ষম এবং পারঙ্গম। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানচর্চা যে তাদের অভ্যাসে নেই এমনটাও নয়। আইন ই আকবরী- এর ইংরিজি অনুবাদ পড়লেই তা টের পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের নানান শাখার সূচনাপত্র প্রাচীন পুঁথির মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনকি পিথাগোরাসের আমলের আগেই গ্রিকরা নানান পরামর্শের জন্য এদেশে আসতেন তার প্রমাণ রয়েছে। সেসময়ে এদেশের সাথে ওদেশের বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের বিনিময়- বাণিজ্যের উপস্থিতিই কলা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।

উচ্চ অভিজাত শ্রেণী বাদে সাধারণভাবে মূলত ঘরের মহিলারাই রান্নাঘর সামলান। কোনো হিন্দুই তার স্ত্রীর তৈরি করা খাবার ছাড়া খেতে পছন্দ করেন না। খাবার বলতে ভাত, তরিতরকারি, মাছ এইসব। যথেষ্টই মশলাদার এবং ঝালঝাল। সঙ্গে নানান রকম আচার। পরিবারের পুরুষেরা একত্রে খেতে বসেন, মহিলাদের সাথে নয়। খাবার আগে পাগড়ি, বাইরের জামাকাপড়, জুতো খুলে রেখে হাতমুখ ধুয়ে তবেই খেতে বসেন। খাবার পরেও একপ্রস্থ হাতমুখ ধোওয়া চলে। খাবার শেষে বসবার ঘর বা অন্যত্র বসে তামাক খান নয়ত পান চিবোন। মদ বা অন্যান্য পানীয় গ্রহণের চল নেই কিন্তু নানান স্বাদের সুগন্ধি জলপান পছন্দ করে থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের মানুষদের অন্ত্যেষ্টিও নানানভাবে হয়। কেউ দেহটিকে বসা অবস্থানে মাটিতে চাপা দেন, সাথে খাবার জল ইত্যাদি দিয়ে রাখেন। মৃতদেহটি অলঙ্কারে সাজানো থাকলেও মাটিচাপা দেবার আগে ঘনিষ্ঠজনেরা সমস্ত কাপড় অলঙ্কার খুলে রেখে দেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য মৃতদেহ পোড়ানো হয়। নিয়ম হল জলের কাছাকাছি চিতা সাজিয়ে তার ওপর দেহটিকে রেখে পোড়ানো। নিকটাত্মীয় একজন মলিন কাপড় পরে চিতায় আগুন দেন। হিন্দুরা মনে করে মলিন বস্ত্র শোকের প্রতীক। আর আছারি পিছারি কান্না দুঃখ প্রকাশ এসব তো আছেই। দেহটি সর্বাংশে পুড়ে গেলে ছাই সংগ্রহ করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। খুব বড়ো বিখ্যাত মানুষের অস্থিভষ্ম ধাতব পাত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্রাহ্মণ নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেন। গঙ্গার জল তাঁদের কাছে বড়োই পবিত্র যে!

ক্রমশ

।২৫।

আলোচনাসভার শেষে বাড়ি ফিরে এসে আজিমাকে বললাম, দক্ষিণে সেবার ব্যাবসা করে টাকাপয়সা যা এসেছিল সে'সব প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বাড়িতে তার কাছে থাকতে যদিও আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু এইবার না বের হলে আর উপায় নেই। বাবা আমায় কিছু টাকা দিয়েছে মূলধন হিসেবে। নাগপুরের বাজারের যা খবর পেয়েছি তাতে সেখানে ভালো ব্যাবসার সম্ভাবনা রয়েছে। সব ঠিকঠাক চললে এযাত্রা ফের মোটা রকম লাভ করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

আজিমা সে'সব কথা মোটেই শুনতে রাজি নয়। নানা যুক্তি দেখিয়ে সে আমাকে আটকাতে চাইল, পথে কত বিপদ আপদ আসতে পারে সে'সব ভয় দেখাল। আমি ধৈর্য ধরে তাকে বোঝালাম যে আমার না গিয়ে উপায় নেই। সাগরে আমার লোকজন বেশ কিছু ঘোড়া জোগাড় করে নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি সেগুলোকে নিয়ে নাগপুরের বাজারে বিক্রি করতে যাব। তখন সে ধরে বসল, তাহলে তাকে আর ছেলেটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। তখন আর এক প্রস্থ বোঝানোসোজানো, কান্নাকাটির পালা চলল। অনেক কষ্টে শেষমেষ তাকে বাড়িতে থাকতে রাজি করানো গেল বটে, কিন্তু যেদিন রওনা দেব তার আগের দিন সে একবোঝা মালা, আংটি, মাদুলি তাবিজ এনে আমার গলায় হাতে কোমরে ঝুলিয়ে দিল। বলে নাকি আমার জন্য নানান ফকির আর মোল্লার কাছ থেকে জোগাড় করে এনেছে। তারপর তাকে, ছেলেকে আশীর্বাদ করে টরে আমি ছাড়া পেলাম।

বাড়ি থেকে বের হতে যেটুকু মন খারাপ লাগছিল, দলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে সে'সব ঘুচে গেল। দেখলাম আমার নেতৃত্বকে সবাই মেনে নিয়েছে। সম্মানটম্মানও করছে। মনে যেন নতুন উৎসাহের জোয়ার এল। নিজেকে বললাম, "আমীর আলি, এইবার তোমার গৌরবের দিন শুরু হল হে!"

বদ্রীনাথ আর না থাকায় এ যাত্রায় গোপীনাথ আমাদের দলের পুরুৎ। রওনার আগে লক্ষণটক্ষণ বিচার করে সে রায় দিল সব শুভ। প্রথম কয়েক ক্রোশ রাস্তা বাবা আর হুসেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমায় নানান উপদেশ টুপদেশ দিতে দিতে চলল। তার মধ্যে প্রধান উপদেশটা ছিল, পারতে মেয়েদের গায়ে হাত না তোলা। বাবা বলছিল, "আগেকার দিনে তো মেয়েদের গায়ে হাত তোলাই হত না, যদি কোন দলের সঙ্গে মেয়েরা থাকত তাহলে সে দল ভালো শিকার হলেও তাদের

ছেড়ে দেয়া হত। মনে করা হত তাঁর স্বজাতীর কাউকে মারলে দেবী ভবানী রাগ করবেন। এখন দিনকাল বদলেছে। কেউ আর সেসব- - ”

“তুমি নিশ্চিন্ত থেকো বাবা, ” আমি বললাম, “আগের যাত্রায় মেয়ে খুন করবার ব্যাপারে আমি তো মানা করেছিলাম, কিন্তু বদ্রীনাথ আর সরফরাজ খান কথা শুনল না। তাদের পরিণতিটা তো দেখলাম! ”

“না না, অত সাংঘাতিক কিছু ভেবে বসিস না। আমি আর হুসেনও তো সারা জীবনে কম মেয়ে খুন করিনি। কই আমাদের তো কিছু হল না! আমি বলতে চাইছি যা করবি, বিচার বিবেচনা করে করবি। অযথা যেন কেউ মেয়েদের না মারে।”

গ্রামের সীমানায় পৌঁছে বাবারা ফিরে গেল। আমি আমার দল নিয়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

আমাদের দলের প্রথা হল, প্রথম শিকারটা না হওয়া পর্যন্ত কেউ পান খাবে না বা চুলদাড়ি কামাবে না। ওতে অনেকের খানিক অসুবিধে হয়। এবারের যাত্রায় সে অসুবিধেটা বেশ ভালোরকমই হল। চারদিকে চোখকান খোলা রেখেও এমন একটা দল পাই না যাতে কোন মেয়ে নেই। ওদিকে আমিও পণ করেছি যে দলে মেয়ে আছে তাদের গায়ে হাত দেয়া চলবে না। তার পেছনে বাবার উপদেশ যতটা কাজ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করছিলো বার বার আজিমার মুখটার কথা মনে পড়ে যাওয়া।

এইভাবে চারদিন খালি হাতে কাটবার পর পাঁচদিনের মাথায় একটা ভালো শিকারের সন্ধান মিলল। সেদিন সকাল- সকাল একটা চৌমাথার মোড়ের কাছে পৌঁছে ন’জন লোকের একটা দলের দেখা পেলাম আমরা। লোকগুলোকে দেখে ভদ্রবংশের বলেই মনে হয়। তিনজন টাট্টু ঘোড়ায় চেপে চলেছে, আর বাকিরা পায়ে হেঁটে। মোড়ে পৌঁছে তারাও, আমরা যে রাস্তাটা ধরব বলে ঠিক করেছিলাম সেই রাস্তাটাতেই ঢুকে এল। দেখে আমাদের খুশি ধরে না। মোড়ের মুখে পৌঁছে আমরা ভান করতে শুরু করলাম যেন কোন পথে যাব বুঝতে পারছি না। তারা আমাদের ঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

আমাদের এতবড়ো দলটা দেখে একটু আশ্চর্য হলেও, একসঙ্গে পথ চলতে তারা বিশেষ আপত্তি করল না। দলটার নেতাগোছের একজনের সাথে আমি গিয়ে গল্প জমালাম। তার কৌতুহলের জবাবে জানালাম, আমরা পেশায় সৈন্য। নাগপুরে ঘাঁটি। হিন্দুস্তানে ছুটি কাটিয়ে কাজের জায়গায় ফিরছি। আমার প্রশ্নের জবাবে তার কাছ থেকে জানা গেল তারা দুই ভাই, আরো কিছু লোকের সঙ্গে চলেছে ইন্দোর থেকে বেনারসের দিকে। ধর্মকর্ম করবে, আর তার সাথে কিছু দামি কাপড়চোপড়ও কিনে আনবে ব্যাবসার জন্য।

শুনে আমি মনে মনে বললাম, তার মানে কাছে নগদ ভালোই আছে তোমাদের। এরা যে আমাদের সঙ্গে ভিড়েছে তা এখনো কারো চোখে পড়েনি। কাজেই এদের যদি খুব তাড়াতাড়ি নিকেশ করে ফেলা যায় তাহলে আমাদের ওপরে কারো সন্দেহ হবার ভয়টাও থাকবে না। একটু পিছিয়ে পড়ে দলের একেবারে শেষে

হাঁটতে থাকা পীর খানকে আমি খবরটা দিয়ে দিলাম। সে গোটা দলের মধ্যে চুপচাপ খবরটা ছড়িয়ে দিল আকারে-ইঙ্গিতে।

চলতে-চলতেই দেখতে পাচ্ছিলাম, গোটা দলটা তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেকটা শিকারের সঙ্গে তিনজন করে দলের লোক লেগে গেছে। বাকিরা তাদেরকে ঘিরে এমনভাবে হাঁটছে যাতে কেউ ফাঁক পেয়ে পালাতে না পারে।

রাস্তাটায় আমি আগেরবারও গেছি। ফলে আমার জানা ছিলো, জায়গাটা একেবারে ন্যাড়া লাগলেও খানিক দূরেই একটা নদী রয়েছে। তার বালিভরা খাতে অনেক ঝোপঝাড়। সেখানে শরীরগুলো লুকিয়ে ফেললে কেউ আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাবে না।

নদীটার ধারে পৌঁছে, যে লোকটার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, সে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল। বলে, "কাল মাঝরাত থেকে হাঁটছি। এবারে একটু না বসলেই নয়।" আমিও ঠিক তাই চাইছিলাম। কাজেই আপত্তি করলাম না।

ঘোড়াটাকে নিয়ে নদীতে জল খাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে দলের মধ্যে ফিরে এসে দেখি, লোকগুলো খাবারদাবার বের করে বসেছে। দলের লোকজন তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে, বসে আরাম করছে, কিন্তু সবাই যার যার নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়েনি একেবারেই।

ভুত্তোটরা নিঃশব্দে রুমালগুলো হাতে তুলে নিচ্ছিল। আমি ঝিরনি দিতে যাবো, ঠিক সেই মুহূর্তে বেশ খানিক দূরে কাদের যেন গলার শব্দ আমার কানে ধরা পড়ল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম আমি। খানিক বাদেই দেখি চোদ্দজন লোকের একটা দল এদিকে আসছে। চেহারা দেখে ভক্তি হয় না বিশেষ। সাধারণ লোক সব। একবার ভাবলাম এগুলোকেও শেষ করে দেব, কিন্তু লোকগুলোর কপাল ভালো। তারা এগিয়ে এসে আমাদের দেখে একেবারেই না দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলেই নিজেদের পথে চলে গেল।

খানিক অপেক্ষা করে আমি হাঁক দিলাম, "তাম্বাকু লাও।" সঙ্গে সঙ্গে ভুত্তোটরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রুমাল হাতে। যে লোকটার সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছিলাম, তার সঙ্গে কথা বলতেবলতেই আমি তার গলায় রুমালটা জড়িয়ে ফেললাম। দেখা গেল তিন বছর ঘরে বসে থেকেও কায়দাকানুন আমি কিছুই ভুলিনি। মুহূর্তের মধ্যে তার মৃতদেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চারদিকে তাকিয়ে দেখি বাকিরাও তাদের কাজ শেষ করে ফেলেছে। একটা লোক তখনও একটু নড়ছিল। কিন্তু তাকেও থামিয়ে দেয়া হল প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই।

লুগাইদের দিকে ফিরে বললাম, "তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়ে ফেলো সব।" উত্তরে তাদের একজন হেসে বলল, "সব হয়ে গেছে। দয়ারাম আর আরো চারজন খানিক আগেই ওই ঝোপগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলো খেয়াল করেননি?"

সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা এবারে লোকগুলোর জিনিসপত্র হাতড়াতে শুরু করে দিলাম। খেয়াল করিনি কখন যেন আরো দুটো লোক সেইখানে এসে হাজির হয়েছে। সবকিছু দেখে তারা এমন ভয় পেয়ে গেল যে জায়গা থেকে নড়বার ক্ষমতা চলে গেল তাদের। আমি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "হতভাগা। আমাদের কাজ যখন দেখেই ফেলেছিস তখন মরবার জন্য তৈরি হ।"

তাদের মধ্যে লম্বা চওড়া চেহারার একটা লোক এইবার ভয় কাটিয়ে বুক টান করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "সাহেব, সময় যখন এসেই গেছে, তখন মরবার ভয় আমি করি না।"

বললাম, “বাঁচবার একটা সুযোগ আমি তোমাদের দিতে পারি। আমাদের দলে ভিড়ে যাও।”

সে অহংকারী গলায় বলল, “কক্ষনো না। তিলক সিং রাজপুত প্রাণের ভয়ে এই পাপের পেশা নেবে না। আমরা মাত্র দু’জন। আপনারা অনেকে আছেন। কিন্তু আপনাদের কারো মধ্যে যদি মরদের রক্ত থেকে থাকে তাহলে সে একা আমার সামনে লড়াই করতে আসুক। দেখি কত ক্ষমতা! ” এই বলে সে তার তলোয়ার খুলে দাঁড়াল।

“আমি নিজে লড়বো তোর সাথে, ” এই বলে আমিও আমার কোমর থেকে তলোয়ার খুলে হাতে তুলে নিলাম। দলের মধ্যে একটা বিরাট হইচই পড়ে গেল। সবাই তখন আমায় আটকাতে চাইছে। বলে ও লোকটার সঙ্গে তুমি এঁটে উঠতে পারবে না। আমি তাদের কথা কানে না তুলে বললাম, “চলে আয়। দেখি কত তাকত ধরিস হাতে। ইনশাল্লা এই জায়গা থেকে আজ তুই জ্যান্ত ফিরবি না।”

“চলে আয় ছোকরা। যদি তোমার দলবল এসে না ধরে তো আজ একা লড়লে তোর অত গর্ব আর থাকবে না রে! ” বলতে বলতে সে-ও এগিয়ে এলো।

আমি পেছন ফিরে বললাম, “শুনে রাখো, এই লোকটা আমার। অন্যটাকে তাড়াতাড়ি নিকেশ করে দাও, কিন্তু এর গায়ে আমি ছাড়া কেউ হাত দেবে না।”

বলার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তিলক সিং-এর সঙ্গী অন্য লোকটা মাটি নিলো।

তলোয়ার উঁচিয়ে আমার দিকে এগোতে এগোতে রাজপুতটা বলল, “মরব যখন তখন বীরের মত যুদ্ধ করে মরব। এর মত কুকুরের মৃত্যু আমার জন্য নয়।”

লোকটার হাতে কোন ঢাল ছিলো না। সেটা একটা সুবিধে। কিন্তু উচ্চতায় আর শক্তিতে সে আবার আমার চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। বুঝতে পারছিলাম এ লড়াইয়ে কৌশল আর দক্ষতাই আমার একমাত্র সহায়।

একটা ক্ষ্যাপা জন্তুর মত তেড়ে এসে সে আমার চারদিকে দৌড়ে দৌড়ে তলোয়ারের কোপের পর কোপ মারতে শুরু করল। আমি তার একটা জবাবি আক্রমণও করছিলাম না। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তার তলোয়ারের আঘাতগুলো আমার ঢাল আর তলোয়ার দিয়ে ঠেকিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি

জানতাম, এইভাবে আর কিছুক্ষণ চললেই লোকটার দম ফুরিয়ে যাবে। তখন আমার সময় আসবে।

খানিক বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা বলে, "ব্যাটা বিধর্মী বেজম্মা, জায়গা ছেড়ে না নড়ে বাঁচবি ভেবেছিস?"

আমি নিচু গলায় বললাম, "আমায় যা বললি, তাতে তোর আর কোন আশা নেই," বলতে বলতেই ঝড়ের মত আমি গিয়ে পড়লাম তার ওপরে। লোকটা এইরকম একটা প্রতি-আক্রমণের জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না। ক্ষীণ একটা প্রত্যাঘাত সে করল বটে কিন্তু আমি সহজেই সেটা আমার ঢালে আটকে দিলাম। পরমুহূর্তে আমার তলোয়ার গিয়ে তার গলায় ঢুকে গেল।

পীর খান পেছন থেকে হাঁক দিয়ে উঠল, "শুকুর খুদা। ব্যাটাকে উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছো।" বলতে বলতে সে এগিয়ে এসে আমায় দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

রাজপুতটা তখনো মরেনি। শুয়ে শুয়েই সে আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল আর কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে বের হতে থাকা রক্তের ফলে তার কোন আওয়াজ বের হচ্ছিল না। সেদিক দেখে আমি বললাম, "এর কষ্টের শেষ করে দাও কেউ। লোকটা ভালো লড়েছে।"

শুনে পীর খান তলোয়ার তুলে নিয়ে তার বুকের মধ্যে গেঁথে দিতে সে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে থেমে গেল। লুগাইরা এসে তাড়াতাড়ি মৃতদেহটার হাত পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা জায়গাটায় কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কোন চিহ্নও রইলো না আর।

আমাদের মরশুমের প্রথম কাজ থেকে টাকাপয়সা বেশ ভালোই পাওয়া গিয়েছিল। তাই দেখে দু'একজন যে বাড়ি ফিরে যাবার কথা না বলেছিল তা নয়, কিন্তু বাকিরা সবাই তাদের কথা উড়িয়ে দিল।

অতএব আমরা এগিয়ে চললাম। সাগর পৌঁছোতে পৌঁছোতে আমাদের শিকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ঊনিশে। টাকাপয়সা অবশ্য সেই প্রথম শিকারের পর বিশেষ মেলেনি। এক-একটা শিকারের কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা করে পেয়েই খুশি থাকতে হয়েছিলো আমাদের।

হুসেনসাগরের ঝিলটার মতই বড়ো একটা ঝিলের পাশে সাগর শহরটা তৈরি হয়েছে। ঝিল থেকে বয়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব্যস্ত শহরটার আবহাওয়া বেশ সুন্দর। এই ঝিলের ধারেই শহরের একপ্রান্তে আমরা গিয়ে ঘাঁটি গাড়লাম। দিনতিনেক সাগরের বাজারে ঘোরাঘুরি করবার পর একদিন সন্ধেবেলা বসে তামাক খাচ্ছি তখন পীর খান এসে বলল, "ভালো খবর আছে। বাজারে আমার চেনা এক ভুত্তেরা (ঠগিদের গুপ্তচর। এরা নানা গ্রামে শহরে ছোটখাটো কাজ আর ব্যাবসা করত, আর ঠগিদের দলকে শিকারের খবর বিক্রি করত) আছে। সে বলল এক রইস সাহুকার দিনসাতেকের মধ্যে সাগর ছেড়ে রাস্তায় বের হবে। যাবে আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই। কিন্তু আমরা এখানে থাকলে কাজ হবে না। আমার ভুত্তেরার পরামর্শ হল গোটা দলটা কয়েক ক্রোশ গিয়ে গিয়ে পথে কোথাও অপেক্ষা করুক,

আর দলের দুতিনজন বিশ্বাসী লোক এখানে থেকে যাক খবরটবর আনা নেয়া করবার জন্য। আপনি কী বলেন?”

“উলহমুদ-উল ইল্লা। ভালো খবর বলেই মনে হচ্ছে পীর খান,” আমি জবাব দিলাম, “যা বলেছে ঠিক তাই করব। কাল ভোর ভোর রওনা হয়ে যাব আমরা। ভালো দৌড়বাজ দুতিনজনকে বেছে নাও পেছনে রেখে যাবার জন্য।”

“একটা কথা মীরসাহেব, লোকটা কিন্তু কাজ হয়ে গেলে বখরা চাইছে অনেক।”

“তাতে আর আপত্তি কী? বিশ্বাসী হলেই হল।”

“সে নিয়ে ভাববেন না। লোকটা কথার খেলাপ করে না। ”

“বেশ। তা কত চাইছে?”

“প্রতি পাঁচ হাজারে দুশো টাকা করে।”

“সাহুকার যদি রইস হয় তাহলে আমাদের অসুবিধে হবে না। গিয়ে বলে এসো আমরা রাজি।”

“ঠিক আছে। আমি চললাম। যদি না ফিরি তো বুঝবেন আমি রয়ে গেছি।” এই বলে বিশ্বাসী কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে জামাকাপড়ের ছোটো একটা পুঁটুলি নিয়ে পীর খান বেরিয়ে গেল।

ছবিঃ মৌসুমী

সীমান্তের অন্তরালে

সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

থাল ফোর্ট। কর্মমুখর দুর্গের ভিতর সেদিন বিকেলবেলায় হঠাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিউগলে লাস্ট পোস্টের বিষাদময় সুর কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে

পড়ল দিগন্তে। একটি ছোটো বৃটিশ রক্ষিদল 'প্রেজেন্ট আর্মস' করে শেষ অভিবাদন জানাল চিরনিদ্রায় শায়িত মেজর রলিন্সকে।

পেশওয়ারে 'উইক এন্ড' এর অবসর উপভোগ করার পর মেজর রলিন্স এবং তাঁর বন্ধু ইংরাজ লেফটেন্যান্ট ও তাঁর বেয়ারা ফিরছিলেন মোটরগাড়িতে। পেশওয়ার থেকে দু'সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে আফ্রিদি উপজাতি অঞ্চলের দর্রা হয়ে কোহাট, আর কোহাট গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ওয়াজিরি উপজাতি এলাকার গা ঘেঁসে থাল পর্যন্ত । অগণিত পাখতুনের রক্তে সিঞ্চিত এই রাস্তা বৃটিশ শক্তির হৃদয়হীন দম্ভের পরিচয় নিয়ে এঁকেবেঁকে চড়াই উতরাই বেয়ে এগিয়ে চলেছে। উপজাতীয় পাখতুনরা কিন্তু কখনও মেনে নেয়নি বৃটিশের একাধিপত্য এই সড়কের ওপর।

মেজর রলিন্সের গাড়ি রাস্তার বিপদজনক অংশগুলি পেরিয়ে প্রায় থালের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, সামান্য খানিকটা রাস্তা অতিক্রম করতে পারলেই একটা রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং , তার অনতিদূরেই বিমান অবতরণের ল্যান্ডিং স্ট্রিপ, আর কিছু দুরেই থাল ফোর্ট, সবশুদ্ধ মাত্র মিনিট দশেকের পথ মোটরে। হঠাৎ মেজর রলিন্স গাড়ির ব্রেকে চাপ দিলেন। গাড়িটি ঝাঁকুনি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে থেমে গেল লেভেল ক্রসিং এর বন্ধ ফটকের সামনে। মেজর রলিন্স ও তাঁর বন্ধু হতভম্ব হয়ে গেলেন। লেভেল ক্রসিং এর গেট তো এ'সময়ে বন্ধ থাকবার কথা নয়! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। রলিন্স সবে ভাবছেন যে গাড়ি থেকে নেমে অসময়ে লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকার কারণ অনুসন্ধান করবেন, ঠিক সেই সময় রাস্তার ধারের একটি ছোট্ট পাহাড়ের দিক থেকে কড়কড় শব্দে একঝাঁক গুলি এসে পড়ল তাঁর গাড়ির ওপর। মেজর রলিন্স ও তাঁর বন্ধু তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কাছেই একটা কালভার্টের নীচে আশ্রয় নিলেন। জায়গাটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কালভার্ট এর দেয়াল শত্রুর রাইফেলের গুলি থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের বাঁচাতে পারবে।

কিন্তু রলিন্স সাহেবের বেয়ারা গাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি! রলিন্স সাহেব আবার ছুটে ফিরে গেলেন নিজের গাড়িতে। তাঁর বন্ধু কালভার্টের আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে রলিন্সকে ফায়ার কভার দিলেন। গাড়ির পিছনের সিটে তখন বেয়ারা কশ গড়িয়ে রক্ত পড়ছে, বুকের নীচে কাপড়চোপর রক্তে ভিজে গেছে। রলিন্স সাহেব তাঁর বেয়ারাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটলেন কালভার্টের দিকে।

কাঁধে একজন মানুষের ভার নিয়ে শত্রুর গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা মোটেই সহজসাধ্য নয়, তথাপি রলিন্স সাহেব সেই গুরুভার নিয়ে পৌঁছে গেলেন কালভার্টের প্রায় মুখের কাছে। আর দু'পা এগোতে পারলেই কালভার্টের নিরাপদ আশ্রয়। রলিন্সের বন্ধুও কালভার্ট থেকে বেরিয়ে এলেন বন্ধুকে সাহায্য করতে।

কড়াক কড়াক শব্দ করে আবার শত্রুর রাইফেল গর্জে উঠল। ক্ষণিকের জন্য রলিন্সের মনে হল যেন বুকে সামান্য একটু ধাক্কা লাগল। তারপর সব অন্ধকার, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর লেফটেন্যান্ট বন্ধুর পায়ের একটু মাংস কেটে বেরিয়ে গেল আর একটি গুলিতে।

কিছুদূরে একটি পাহাড়ের চুড়ায় বৃটিশ সামরিক পিকেট থেকে হেলিওগ্রাফে খবর পেয়ে থাল ফোর্ট একটি সশস্ত্র দল গিয়ে মৃত এবং আহতদের উদ্ধার করে ফোর্টে নিয়ে এল। ডাক্তাররা রলিন্সকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন ও তাঁর বেয়ারার জখমে অস্ত্রোপচার করা হল। কিন্তু সে- ও কিছুক্ষণ পরে মারা গেল। রলিন্সের বন্ধুর আঘাত সামান্যই ছিল।

এই হত্যাকাণ্ডে ফোর্টের বৃটিশ অফিসাররা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্রিগেড কম্যান্ডার এর হুকুমে তৎক্ষণাৎ এক ব্যাটারি গোলন্দাজ ও এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত হল এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্য। কিন্তু পলিটিক্যাল কর্তাদের নির্দেশে সৈন্যদল ব্যারাকে ফিরে গেল আর তার বদলে পাঠানো হল একদল সশস্ত্র ফ্রন্টিয়ার কন্সটিবিউলারি ও এক ব্যাটেলিয়ান কুরাম মিলিশিয়া। এই দুটি আধা সামরিক দল থাল এর আশেপাশে দশ মাইল ব্যাসের মধ্যে কোনও উপজাতীয় যোদ্ধার দলের অস্তিত্ব খুঁজে পেল না। সন্ধ্যার দিকে তারা রিপোর্ট দিল যে উপজাতীয় লশকর প্রত্যাঘাতের ভয়ে সে অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে পাড়ি দিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা, সূর্যদেব আফগানিস্থানের সুলেমান পর্বত শ্রেণীর পিছনে ডুব দিয়েছেন কিন্তু গোধুলির ক্ষীণ আলো তখনও ছড়িয়ে রয়েছে কুরাম উপত্যকার ওপর ; দূরে কুরাম নদী দেখা যায়। পাহাড়ের গা ঘেঁসে কালনাগিনীর মত এঁকে বেঁকে চলেছে, তার ধারেই থাল গ্রামের বাড়িগুলির আবছা আকৃতি তখনও দেখা যাচ্ছে। ফোর্টের ভিতর একখানি দোতলা ব্যারাকে আমার ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবছিলাম, দিনের বেলার ওই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা। মেজর রলিন্স ও তাঁর বেয়ারার অহেতুক প্রাণহানির কথা ভেবে মনটা যদিও কিছুটা বিষাদগ্রস্ত ছিল কিন্তু কতকটা নিশ্চিন্তও হয়েছিলাম খবরটা শুনে যে, উপজাতীয় লশকর থাল থেকে অনেক দূরে পাড়ি দিয়েছে। মনে করলাম যাক এখন কয়েকদিন কার্যোপলক্ষে ফোর্টের বাইরে গেলে উপজাতীয় স্নাইপিং এর আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না।

মনে মনে এইরকম আকাশপাতাল চিন্তা করছি, এমন সময় হঠাৎ কড়াক শব্দে একটা রাইফেলের ফায়ার হোল কুরাম নদীর ওপারে থাল গ্রামের বিপরীত দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আর একটি ফায়ার। আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে চেয়ারে আর বসে থাকা চলল না। উঠে দাঁড়ালাম নদীর ওপারে কী হচ্ছে দেখবার জন্যে। অত দূর থেকে কী হচ্ছে কিছুই দেখা গেল না , কারণ আকাশ সেদিন ধূলায় ভরা। ওপারের পাহাড়গুলো পর্যন্ত ঝাপসা আর অস্পষ্ট। সেই মুহূর্তেই কড়কড় শব্দে অজস্র ফায়ার শুনতে পেলাম আর সেই সঙ্গে দ্রিম দ্রিম শব্দে দামামা বেজে উঠল থাল গ্রামের মালেকের (উপজাতীয় প্রধান) বাড়ির ছাদে। হতভম্ব হয়ে গেলাম রাইফেল আর দামামার শব্দ শুনে, ব্যাপারখানা কী হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না। খাসাদার (ইংরাজ সরকারের মাইনে করা উপজাতীয় রক্ষি) ইব্রাহিম খাঁ কাছেই দাঁড়িয়েছিলো, সে এই ধাঁধার সমাধান করে দিল, "কাবুলখেল ওয়াজিরি উপজাতির লশকর থাল গ্রামের কুরাম উপজাতীয়দের আক্রমণ করেছে। মালেকের দামামা বাজিয়ে গ্রামবাসিদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে আর তাদের আহ্বান করা হচ্ছে হাতিয়ার নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে। আমাকেও যেতে হবে।"

প্রশ্ন করার আগেই ইব্রাহিম খাঁ ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেল। সে কুরাম উপজাতীয় ও থাল গ্রামের বাসিন্দা। অনুসন্ধানকারী সশস্ত্র কন্সটাবিউলারি ও মিলিশিয়া বাহিনির চোখে ধূলা দিয়ে কাবুলখেল ওয়াজিরি দল যে কোথাও লুকিয়ে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কাবুলখেল উপজাতীয় লশকর ইংরাজ সরকারের মিলিশিয়া ও কন্সটিবিউলারির সঙ্গে মহড়া নিয়ে সে সময় নিজেদের শক্তি অপচয় করতে চায় নি কারণ তাদের লক্ষ ছিল থাল গ্রামের কুরাম উপজাতি।

ড্রিম ড্রিম ড্রিম – মালেকের বাড়ির মিনার থেকে দামামা বেজে চলেছে। গ্রামের পুরুষ বাসিন্দারা, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেই ছুটে চলেছে কুরাম নদীর তীরে। সহস্র রাইফেল গর্জে উঠলো কুরাম নদীর এপার থেকে কাবুলখেল উপজাতীর ক্ষণপূর্বের গুলিবর্ষণের উত্তরে। কাবুলখেল ও কুরাম উভয় উপজাতিই আজ রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে এক ঘাসে ভরা জমিটার অধিকার কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর।

দামামার ড্রিম ড্রিম শব্দ থেমে গেছে কিন্তু রাইফেলের গর্জন অব্যাহত। রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গেসঙ্গে রাইফেলের নির্ঘোষ কিছুটা শ্লথ হয়ে এল। তারপর সব চুপচাপ। অন্ধকারের দরুন নদীর এপাড় থেকে অন্যপাড়ে তখন আর কিছুই দেখা যায় না। মনে হল যেন সে রাতটার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখল দু পক্ষই।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। সেই মুহূর্তেই অজস্র হাউইবাজি দু'দিক থেকে উঠে স্বল্প পরিসর নদীর তীর আলোয় ঝলমলে করে তুলল তখন আর সেই ক্ষণিক আলোর সুবিধা নিয়ে আবার দু'দিকের রাইফেল কড় কড় শব্দে ডেকে উঠল। ভোরবেলা পর্যন্ত এইভাবেই অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকল।

পরদিন একটা সরকারি কাজে আমাকে থাল গ্রামে যেতে হল। গতরাতের যুদ্ধের কোনোরকম উত্তেজনা বা আতঙ্ক গ্রামে দেখা গেল না। গ্রামবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রার কোনোরকম ফেরবদল দেখতে পেলাম না। গ্রামের ব্যবসায়ীরা, যারা বেশিরভাগই হিন্দু, প্রতিদিনের মতোই আফগান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কেনাবেচা করছে, আফগানী পণ্য যেমন পার্সিয়ান ও বোখারা কার্পেট, ভেড়ার ছালের কোট বা পোস্তিন এবং হিং প্রভৃতি। মুদ্রা বিনিময়ের প্রভুত লাভজনক ব্যাবসাও প্রতিদিনের মতোই থালের হিন্দুরা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মেয়েরা কুরাম নদী থেকে জল আনছে কলসি ভর্তি করে। গ্রামের রেস্তোরাঁগুলিতে তীব্রস্বরে গ্রামাফোন বেজে চলেছে আর আফগান খদ্দেররা মাথা নেড়ে নেড়ে সেই গান উপভোগ করছে, সবুজ চা আর মাংসের রোস্ট খেয়ে রেস্তোরাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। রাখাল বালকেরা কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে অথবা কোমরে রিভলভার বেঁধে ভেড়ার পাল নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের বাইরে মাঠের দিকে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এমন স্বাভাবিকভাবে চলছে যেন যুদ্ধটা একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

একটি ছোট্ট কাপড়ের দোকানের সামনে জনাপাঁচেক লোককে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাদের দেখে থাল গ্রামের লোক বলে মনে হল না। তাদের পায়ে ঘাসের তৈরি চপ্পল। থাল গ্রামের বাসিন্দাদের গায়ে খানিকটা আধুনিক সভ্যতার হাওয়া কিছুটা লেগেছে বলে তারা চামড়ার চপ্পল পরে।

এই নবাগতদের দিকে একটু অবাক হয়ে আমাকে তাকাতে দেখে আমার পাখতুন দেহরক্ষী নজীব গুল বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন, এই লোকগুলি থাল গ্রামের বাসিন্দা নয়, এরা কাবুলখেল উপজাতি, গত রাতের যুদ্ধে এদের দলের যারা মারা গেছে, তাদের জন্য কফিনের কাপড় কিনতে এখানে এসেছে। কাবুলখেলদের গ্রামে কোনও কাপড়ের দোকান নেই। সেইসঙ্গে নজীব গুল এ কথাও বুঝিয়ে দিল যে, যদিও ওরা শত্রুপক্ষের লোক কিন্তু ওরা এ'সময় নিরস্ত্র। ওদের মাথার চুলটিও কেউ স্পর্শ করবে না থাল গ্রামে। নিরস্ত্র শত্রুকে পাখতুনরা আঘাত করে না, এটা হল পাখতুনদের অলিখিত আইন।

দিনটা কেটে গেলো শান্তিতে। ভাবলাম ঝড়ের অবসান ঘটেছে; রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারব। কিন্তু অদৃষ্টে তা আর হল না। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কুরাম নদীর দু পার থেকেই

রাইফেল গর্জে উঠল। গোটা রাত রাইফেলের গর্জন চলল অবিরাম এবং পর পর তিন রাত ধরে অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটল না।

ইতিমধ্যে থালের কুরাম উপজাতীয় পাখতুনরা বোধহয় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, চতুর্থ দিন সকালবেলা তারা রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ করল না, মরিয়া হয়ে দিনের আলোতেই কুরাম নদী পার করে ছোট পাহাড়টির চূড়া দখল করে নিল আর পিছন থেকে নিজেদের দলের কভারিং ফায়ারের আওতায় চূড়ার ওপর একটি সাঙ্গড় (পাথরের দেয়াল)গড়ে তুলল ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে। তারপর সাঙ্গড় থেকে গুলিবর্ষণ করে সেই জমিটির দখল নেওয়া মোটেই কঠিন হল না । যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু তা কিছুকালের জন্য মাত্র, কারণ পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া পাখতুনদের স্বভাববিরুদ্ধ। এই আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব কতদিন ধরে চলবে কে জানে, সেই সবুজ ঘাসে ভরা জমিটার রক্ততৃষ্ণা কখনো মিটবে কি না তাও কেউ জানে না।

পাখতুনরা ইংরাজের সঙ্গে সুদীর্ঘকালের যুদ্ধে যদিও কখনও জয়লাভ করতে পারে নি, কিন্তু পরাজয়ও স্বীকার করেনি তারা। ইংরাজদের পাখতুনিস্থান থেকে বিতারিত করতে না পারলেও তাদের নিরুদ্বেগে রাজত্বও করতে দেয় নি তারা। প্রথম অ্যাংলো আফগান যুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত ইংরাজকে তারা ঘাত প্রতিঘাতে সর্বক্ষণ অস্থির ও সংকটময় অবস্থার মধ্যে রেখেছিল।

১৮৫১ সালের থাল অঞ্চলে যুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই উত্তর সোয়াট উপত্যকার রানিজাই উপজাতির একটি লশকর একদিন মালকান্দের কাছে একটি ব্রিটিশ রক্ষিদলকে আক্রমণ করে পরাস্ত করল। তাদের এলাকায় ব্রিটিশদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করাতে এই উপজাতির আক্রোশ দিন দিন পুঞ্জিভূত হয়ে ফেটে পড়েছিল সেদিন। দুর্ঘটনার খবর পেশাওয়ারে পৌঁছোনমাত্রই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেলের অধীনে দু'হাজার সোলজার ও অফিসারের এক বাহিনী গঠন করে পাঠানো হল সোয়াট উপত্যকায়।

ব্রিটিশ বাহিনী যে অত তাড়াতাড়ি সরেজমিনে গিয়ে হাজির হবে রানিজাই উপজাতীয় পাখতুনরা সেটা ধারণা করতে পারেনি। কাজেই তারা ক্যাম্বেলের গোলন্দাজ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রানিজাই উপজাতির নায়করা দেখলেন যে সে অবস্থায় ক্যাম্বেলের ফৌজের মোকাবেলা করার চেষ্টা করলে তাঁরা ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর কোনও রকম ক্ষতিসাধন তো করতে পারবেনই না, উপরন্তু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর হাতে তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। রানিজাই নেতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্যার ক্যাম্বেলের কাছে দূত পাঠালেন, প্রস্তাব করলেন যে স্যার ক্যাম্বেল যদি সোয়াট উপত্যকা থেকে নিজের সৈন্যসামন্ত অপসারণ করেন, তাহলে তাঁরা ইংরাজ সরকারের বশ্যতাস্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ অর্থদণ্ড দেবেন। স্যার ক্যাম্বেল এ প্রস্তাবে খুশি হলেন বিনাযুদ্ধেই তিনি রানিজাই উপত্যকাকে পদানত করতে পারলেন মনে করে। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ফেরত নিয়ে গেলেন পেশাওয়ারে ।

ক্রমশ

ঠাকুরবাড়ির পাদুকাবিলাস

অনুপূর্বা রায়

আভিজাত্য আর বনেদিয়ানায় যে'সব পরিবার কালের যাত্রায় বাঙালির সাহিত্য এবং শিল্পচর্চায় ছাপ রেখে গেছে, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবার তার মধ্যে অন্যতম। উনিশ শতকে পশ্চিম দিগন্তের আলো এসে পড়েছিলো পুব আকাশে। শুরু হল বাংলার নবজাগরণ। আর এই নবজাগরণের প্রথম ঊষার সবটুকু উষ্ণতা গ্রহন করেছিলো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। সংস্কারমুক্ত আলো চুঁইয়ে পড়েছিলো এই পরিবারের শুধুমাত্র শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা কিংবা কৃষ্টিতে নয়; সাজেগোজেও। পোশাক এবং অলংকারের পাশাপাশি এই পরিবারের নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ছিলেন পাদুকাবিলাসী।

ঠাকুরবাড়ির পাদুকাবিলাসের কাহিনী এই পরিবারের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দিয়েই শুরু করি। যে দ্বারকানাথকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "My prince" বলে সম্বোধন করতেন কিংবা যার সাথে Charles Dickens, Max Muller এর বন্ধুত্ব ছিল সেই দ্বারকানাথের জীবনযাত্রা যে রাজকীয় হবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই রাজকীয় জীবনযাত্রায় তিনি যে শুধু পোশাককেই প্রাধান্য দিতেন তা নয়; তাঁর জুতোবিলাসও ছিল নজর কাড়া। নিজের জাহাজে চড়ে তিনি যখন বিলেত যেতেন তখন সঙ্গে নিতেন কুড়ি থেকে পঁচিশ জোড়া জুতো। লন্ডন এবং প্যারিসে তিনি ছিলেন রাজপুরুষের মতো। ফ্রান্সের রাজার সম্মানে তিনি একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি পরেছিলেন সোনার জালিকাজ করা একটা জুতো। সেই জুতোয় সোনার সাথে গাঁথা ছিল অসংখ্য দামি পাথর। কলকাতার বিশেষ জহুরিকে অর্ডার দিয়ে বানানো হত এই জুতোগুলো। যে জুতো দ্বারকানাথ একবার পরতেন তা আর একমাসের মধ্যে পরতেন না। দামী মখমল, তসর দিয়ে বানানো মুক্তাখচিত দ্বারকানাথের জুতোগুলোর দাম তখনকার বাজারদর অনুযায়ী ছিল প্রায় দু'থেকে আড়াই হাজার টাকার কাছাকাছি।

১৮৪৬ সালের ১লা আগস্ট লন্ডনের সেন্ট জর্জেস হোটেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। মারা যাওয়ার আগে তিনি বাজারে রেখে গেছিলেন ৫০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি দেনা। তাঁর পাদুকাবিলাস থেকে শুরু করে বিপুল বৈভবের জীবনযাত্রাই এই দেনার উৎস ছিল।

এবার আমি প্রিন্সের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাদুকাবিলাসের কথায়। বাবার মতো সোনার জালিকাজ করা জুতো তিনি হয়ত পরতেন না কিন্তু পাদুকাবিলাসী হিসাবে তিনিও কম খ্যাতি পাননি। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহনের আগে পর্যন্ত তিনি যথেষ্ট শৌখিন জীবনযাপন করতেন এবং বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে জুতোর জৌলুশে আমন্ত্রিতদের চমকে দেওয়া ছিল তাঁর নেশা।

একবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে সেকালের কলকাতার বড়লোক বাবু এবং রাজাদের নিমন্ত্রণসভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুক্তোখচিত জুতো পরে গিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অতি পুরনো করমচাঁদ জহুরিকে দিয়ে জুতোটা বানানো হয়েছিলো। করমচাঁদ দামী মখমলের ওপর পাথর আর দানা দানা মুক্তোয় ভরে দিয়েছিলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রণসভা শেষ হওয়ার পরেও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের জুতোর ঘোর কাটেনি। তিনি যতক্ষণ আসরে ছিলেন সকলের দৃষ্টি ছিল তাঁর জুতোর ওপর।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বউরাও পাদুকাবিলাসে পিছিয়ে ছিলেন না। সেই সময় মেয়েদের মধ্যে জুতো পরার প্রচলন একেবারেই ছিলনা। কিন্তু যে ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বউরা ইংরিজি ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য তখনকার দিনে ইংরিজি মাধ্যম স্কুলে পড়তেন, বাড়িতে ফরাসি ভাষা শিখতেন এবং পিয়ানো বাজাতেন সেই মেয়েবউরা যে জুতো পরবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে দোকানে গিয়ে জুতো কেনার চল ঠাকুরবাড়িতে তখনও ছিলনা। চীনা জুতোর কারিগররা বাড়িতে আসতেন। খবরের কাগজে ভাঁজ করে সরু ফিতের মতো বানিয়ে বাড়ির মেয়ে- বউদের এবং কচিকাঁচাদেরও পায়ের মাপ নিয়ে যেতেন।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েবউদের সাজগোজের ধারায় নতুন বাতাস এনেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের পুত্র প্রথম ভারতীয় I.C.S সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তিনি ছিলেন এই পরিবারের ফ্যাশন আইকন । তিনি যে শুধু বাঙালি মেয়েদের জ্যাকেট, শেমিজ, পেটিকোট পরা চালু করেছিলেন তা নয়, বাহারী তসর কিংবা মখমলের পাম্পশু পরে স্বামীর সাথে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে পর্যন্ত যেতেন। এই জন্য তাঁকে কম নিন্দা সহ্য করতে হয়নি! দেবেন্দ্রনাথের আরেক পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীও জুতো পরতেন। তবে জরির কাজের চটিই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়।

খুলনা জেলার ফুলপুর গ্রামের ভবতারিণী রায়চৌধুরী ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন দেবেন্দ্রেনাথের কনিষ্ঠ পুত্রবধু হিসাবে। তখন তিনি মৃনালিনী। ঠাকুরবাড়ির অন্যতম নক্ষত্রের স্ত্রী হয়েও মৃনালিনী সাজগোজে ছিলেন খুব সাদামাটা। তাই জুতো পরলেও সে ব্যাপারে কোনো বিলাসিতা তাঁর ছিলনা। সামনে ঢাকা কাপড়ের চটিই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। খুব বেশি হলে তাতে কাশ্মীরি কাজ করা থাকত সুতো দিয়ে। মৃনালিনী দেবী যেদিন ঠাকুরবাড়ি থেকে চিরবিদায় নিলেন, শেষকৃত্য সেরে এসে

সেদিন রবীন্দ্রনাথ- পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ডেকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্ত্রীর ব্যবহৃত শেষে চটিজোড়া। বলেছিলেন, 'এটা তোর মার, তোকে দিলুম- তোর কাছে রেখে দিস।' সেই নীল রঙের চটিজোড়া আজও ঠাকুরবাড়িতে রাখা আছে সকলের দেখার জন্য।

পাদুকা নিয়ে শুধু বিলাসিতা নয়, এই পাদুকাই একসময় ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের কাছে স্বদেশী আবেগের প্রাণবস্তু হয়ে উঠেছিল। সেই সময় ইঙ্গবঙ্গ সমাজে কোনো নিমন্ত্রণ থাকলে ঠাকুরবাড়ির আরেক প্রতিভাময় সন্তান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর 'রবিকাকা' ধুতির সাথে স্বদেশী জুতো পরে হাজির হতেন। জুতো নিয়ে সেই অর্থে কোনো বিলাসিতা ঠাকুরবাড়ির বিশ্বখ্যাত নক্ষত্রটির ছিলনা। তবে হ্যাঁ কট্‌কি জুতোর প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তার প্রমাণ শিশুপাঠ্য 'দামোদর শেঠ' কবিতাতেই তিনি তুলে ধরেছেন, 'আনবে কট্‌কি জুতো, মটকিতে ঘি এনো'। তবে শুধু কবিতায় নয়, কটকি জুতোর জন্য তিনি একবার জলে পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সে গল্প খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর পুত্রের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে। শিলাইদহে থাকার সময় একদিন কবি এবং পুত্র রথী 'পদ্মাবোটে' ঘুরেছিলেন। বোটের খুব ধারে বসে পা দোলাতে গিয়ে কবির কট্‌কি জুতো পড়ে যায় জলে। তিনি ঝপাং করে ঝাঁপ দেন পদ্মার বুকে। অনেকদূর সাঁতার কেটে তিনি জল থেকে তুলে আনেন তাঁর প্রিয় কট্‌কি জুতোজোড়া।

তবে কট্‌কি জুতো নিজের খুব পছন্দের হলেও বিদেশ ভ্রমণের সময় কবি লম্বা জোব্বার সাথে পা ঢাকা পাম্পশু জুতোই পড়তেন আর শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'গুরুদেব' হিসাবে পৌরহিত্য করার সময় জুতোর বদলে খালি পায়েই তাঁকে বেশি দেখা যেত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির একটা অংশেও জুতোর উপস্থিতি উজ্জ্বল। 'নষ্ট নীড়' উপন্যাসে চারুলতা পান মুখে দিয়ে কাপড়ের জুতোয় সুতোর নকশা তুলেছিলেন দেওর 'অমর' এর জন্য। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলাকে অচলায়তন ভেঙে অন্দরমহল থেকে জুতো পরে বাইরে আসতে দেখা গেছে।

তবে সব উদাহরণকে ছাপিয়ে গেছে 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি। রাজা হবুচন্দ্রের পা ধুলো থেকে রক্ষা করার জন্য উপায় বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে। শেষ অনেক সাধ্যসাধনায় আবিষ্কার হল 'জুতা' বস্তুটি। মানুষের পা ধুলো থেকে বাঁচল, মন্ত্রীরও প্রাণরক্ষা হল-

সেদিন হতে চলিল জুতা পরা
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা ।।

ইতিহাসের খণ্ডচিত্র

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অকথিত ধ্যানচাঁদ

বার্লিন অলিম্পিক। জার্মানির বিরুদ্ধে গোল করছেন ধ্যানচাঁদ

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকের আসর জমজমাট তখন। হকির ফাইন্যাল ম্যাচে ইন্ডিয়া বনাম জার্মানি। ইন্ডিয়ার হকি দলের ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদের নাম তখন বিশ্বজোড়া। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলা এই মানুষটির হকি- স্টিকে যেন আঠার মত লেগে থাকে বল। ধ্যানচাঁদের মাঠে নামা মানেই যেন অন্যান্য দলের বুকে শিরশিরানি ভয়। ম্যাচ শুরু হল। দেখা গেল, জার্মান খেলোয়াড়েরা ধ্যানচাঁদের উপস্থিতিতে রীতিমত ভয় পেয়ে খুব আক্রমণাত্মক ভাবে খেলতে শুরু করেছে। যেনতেনপ্রকারেণ আঘাত হানাই যেন ধ্যানচাঁদকে আটকে দেওয়ার একমাত্র উপায়।

হঠাৎ এক আঘাতে ধ্যানচাঁদের মুখ রক্তে ভরে গেল। দেখা গেল জার্মান টিমের কোন খেলোয়ারের আঘাতে ধ্যানচাঁদের একটি দাঁত উপড়ে গেছে। সহযোগীদের সাথে মাঠের বাইরে এলেন আহত রক্তাক্ত ধ্যানচাঁদ। জার্মানরা যেন খানিক নিশ্চিন্ত। আর নিশ্চয়ই মাঠে ঢুকবে না হকির এই মহাত্রাস। কিন্তু এলাহাবাদে জন্মানো এই রাজপুতের রক্তে ছিল প্রবল জেদ, আত্মবিশ্বাস আর তীব্র দেশপ্রেম। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে আবার মাঠে নামলেন উনি। জার্মান খেলোয়ারেরা আর দর্শকেরা অবাক! শুরু হল ধ্যানচাঁদের 'ম্যাজিক'। হকির এই জাদুকর জাদুদন্ডের কেরামতিতে প্রতিপক্ষকে চমকে দিলেন খেলার বাকি সময়টুকু। একের

পর এক গোলে ধরাশায়ী হয়ে গেল জার্মান দল। ম্যাচের শেষে ভারত জয়ী হল ৮- ১ গোলে। আর তারমধ্যে ধ্যানচাঁদের কৃতিত্ব ৬ টি গোল!

এখানেই শেষ নয়। আরো কিছু আশ্চর্য ঘটনার জন্য ইতিহাস অপেক্ষা করছিল। জানা গেল জার্মান সুপ্রিমো অ্যাডলফ হিটলার এই অলিম্পিকের পরে ধ্যানচাঁদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জার্মানি দলে খেলার জন্য এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জার্মান নাগরিকত্ব এবং জার্মান মিলিটারী বাহিনীর উচ্চপদের চাকুরির। সে আমলে এ এক লোভনীয় আমন্ত্রণ। কিন্তু দেশপ্রেমী এই হকির জাদুকর সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন হিটলারের এই প্রস্তাব এবং সারা দেশের মানুষের মাথা উঁচু করে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে।

সাধারণত যে সব বইকে ছোটোদের বই বলা হয়, এ বইটা ঠিক সেরকম নয়। তবে শুধু বড়োদের বইও নয়; সবাই পড়তে পারে। আমার মতে এ বই যদি পড়তেই হয় তো ছোটোবেলাতেই পড়া ভাল, কাজে দেবে; বুড়ো বয়েসে যখন পায়ে গেঁটে বাত ধরবে তখন আর এ বই পড়ে কোনও লাভ হবে না।

লেখক শ্রী অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় একজন অভিযাত্রী। পর্বতারোহণ তাঁর নেশা এবং পেশা। হিমালয়ে তিরিশটির বেশি অভিযান করেছেন; জয় করেছেন কামেট, নন্দাদেবী পূর্ব, শিবলিঙ্গ, ভাগীরথী, সতোপন্থ, ত্রিশূল, মনিরাং, নন্দাঘুন্টি- র মতো কিছু শৃঙ্গ। এখনকার অনেক পর্বতারোহী, যাঁরা কোনওরকমে হাঁকপাঁক করতে করতে শেরপাদের কোলেপিঠে চড়ে শৃঙ্গে উঠে একটা পতাকা পুঁতে দিয়ে নেমে আসেন, অনিন্দ্য সে দলে পড়েন না। তিনি একজন সত্যিকারের অভিযাত্রী, যাঁদের সংখ্যা এ দেশে কেন, গোটা পৃথিবীতেই খুব কমে এসেছে। অচেনা, অজানা, অখ্যাত উপত্যকা কিংবা হিমবাহে নতুন পথের সন্ধানই তাঁকে উত্তেজিত করে। অভিযান আর ভৌগোলিক অনুসন্ধানের নেশা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে গ্রিনল্যান্ডের সাগরপাড়ে, আইসল্যান্ডের হিমবাহে কিম্বা ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা পর্বতে। ২০১১ - তে জেমু গ্যাপ আরোহণের জন্য অনিন্দ্য পেয়েছেন ‘জগদীশ নানাবতী অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন মাউন্টেনিয়ারিং।’

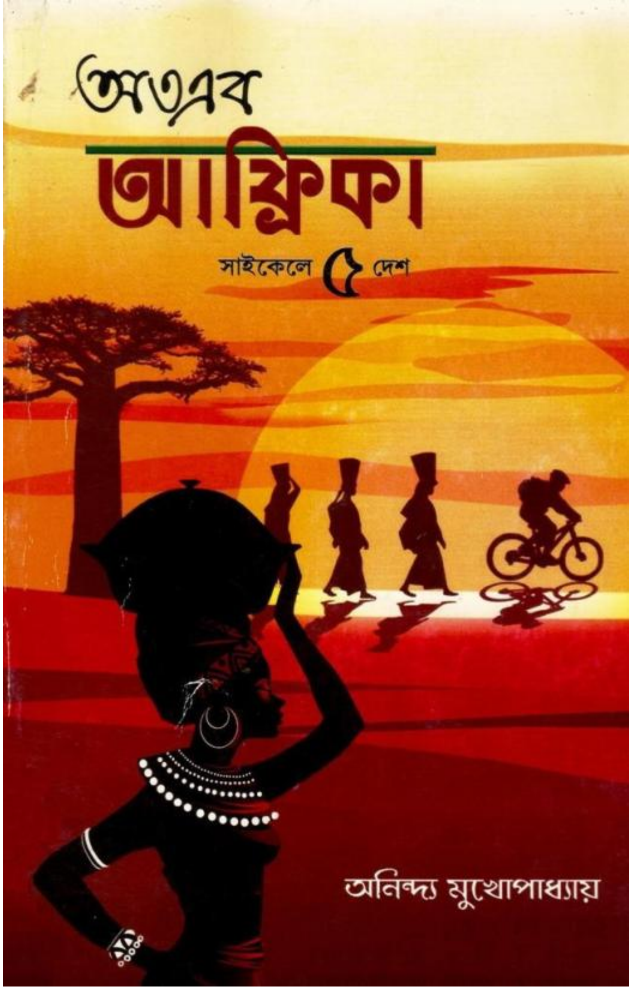

বই: অতএব আফ্রিকাঃ সাইকেলে ৫ দেশ
লেখক: অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক: উত্তর পাবলিকেশনস
১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা ২৬
ফোনঃ ২৪৫৪ ৩০৪৪; প্রকাশকালঃ জানুয়ারি ২০১৫
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৩২; দাম: ১০০ টাকা

আলোচ্য বইতে লেখক শুনিয়েছেন আফ্রিকা মহাদেশে তাঁর ৪৫০০ কিলোমিটার সম্পূর্ণ একা সাইকেল চালানোর কাহিনী। বিষুবরেখা থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি পৌঁছেছেন মকরক্রান্তিরেখা; কেনিয়ার নানইয়ুকি শহর থেকে সফর শুরু করে, তানজানিয়ার দার- এস- সালামে আফ্রিকার পূর্ব- উপকূলে ভারত মহাসাগরকে ছুঁয়ে, তারপর আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড পেরিয়ে, পৌঁছে গেছেন নামিবিয়ার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে। পথে পার হয়েছেন পাঁচটি দেশ – কেনিয়া, তানজানিয়া, মালাউয়ি, জাম্বিয়া এবং নামিবিয়া। আর ভূগোল বইয়ে আফ্রিকার প্রাকৃতিক মানচিত্র সামনে রেখে দেখলে, কেনিয়ান হাইল্যান্ডে মাউন্ট কেনিয়ার পাদদেশ থেকে শুরু হয়েছে লেখকের যাত্রা, দক্ষিণে চলে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর পায়ের তলা দিয়ে এগিয়ে ভারত মহাসাগর ছুঁয়ে আসা, তারপর পশ্চিমে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে একে একে পার হতে হয়েছে লেক মালাউয়ি, লিভিংস্টোনিয়া পর্বতশ্রেণী, জাম্বেজির জঙ্গল, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, ওকাভাঙ্গোর জলাভূমি, কুখ্যাত ট্রান্স কালাহারি হাইওয়ে এবং শেষে নামিব মরুভূমি।

এমন বইয়ে যাত্রাপথের বর্ণনা যে বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর হবে সে আর বেশি কথা কি? তবে এ বইয়ের আসল আকর্ষণ আফ্রিকার সাধারণ মানুষজনের কথা। পথ চলতে চলতে লেখকের প্রতিদিনই আলাপ জমে ওঠে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে, কত নতুন নতুন জাতি- উপজাতি, কত নতুন

ভাষা। লেখক পরম মমতায় ছবি আঁকেন সেইসব বন্ধুদের, পথচলার মাঝে যাদের সঙ্গে ক্ষণিকের আলাপ, কিছুক্ষণের বন্ধুত্ব, একসঙ্গে কিছু হাসি- গল্প- মত বিনিময়, তারপর বিদায়। আমাদেরও জানা হয়ে যায় কেমন আছে এখনকার আফ্রিকা।

শুধু পথচলার বিবরণ আর পথচলতি আলাপ হওয়া লোকজনের কথাই তো নয়, লেখকের ডায়রির পাতায় পাতায় মিশে আছে ইতিহাস; যে জায়গা দিয়ে চলেছেন তার ইতিহাস, আফ্রিকা মহাদেশের ইতিহাস। তাঁর সঙ্গে চলতে চলতেই আমরা জেনে যাই কেমন করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 'বাঁদরের পিঠে ভাগ' করার মতো আফ্রিকাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ- বাঁটোয়ারা করে নিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলেছিল লোভের, শোষণের গল্প; আফ্রিকার খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, এমনকি মানবসম্পদও লুণ্ঠিত হয়ে ভরে তুলছিল ইউরোপের তথাকথিত ধনী, সভ্য ও উন্নত দেশগুলির কোষাগার। জানতে পারি ভয়াবহ ক্রীতদাস প্রথার ইতিহাস, জাঞ্জিবার বন্দরের কথা, নামিবিয়ার হেরেরো উপজাতির মর্মান্তিক ইতিহাস - মাত্র তিন বছরের মধ্যে জার্মানরা যাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়ের লেখার ধরণ অনায়াস, বাহুল্যবর্জিত, ঝরঝরে; কোথাও কোনও দেখনদারি নেই, মাত্রাছাড়া আবেগ নেই। আপনমনে সাইকেল চালাতে চালাতে, চারদিক দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে, যেন নিজের সঙ্গেই একা একা কথা বলে চলেছেন তিনি। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি; আর সেই সুযোগে ঢুকে পড়ছি এক দুরন্ত অভিযাত্রীর মনের ভেতর, যিনি বলতে পারেন... 'আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ, যার ভুল হয়, ক্লান্তি আসে, আঘাত লাগে, মন খারাপ হয়, এমনকি মাঝেমধ্যে রীতিমতো ডিপ্রেসড লাগে, কিন্তু তবুও সে এগিয়ে চলতে চায়।' শুধু তাই? লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব কিনা তাই নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয় না? জনমানবহীন ধুধু মরুভূমি, দুর্ভেদ্য জঙ্গল বা পার্বত্য উপত্যকায় রাস্তা ধরে একা একা সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে ভয় হয় না? হ্যাঁ, তাও হয়! অনিন্দ্য লিখছেন... 'প্রতিদিন সে আসে। সে আমার ক্লান্ত পেশিতে একটা কালো মেঘের মতো ছায়া ফেলে। আমার মনে দ্বিধার জন্ম দেয়। আমাকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে। আমাকে হেরে যাওয়ার আগেই হারিয়ে দিতে চায়। আমি দুর্বল হয়ে যাই। মনের মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা দানা বাঁধে। আমি হেরে যাওয়ার আগে আর একবার নিজের দিকে চাই। এরকম কথা তো ছিল না। আর একটু লড়াই করাই যাক না। দেখাই যাক না শেষপর্যন্ত কী হয়। আমি আরও এক পা ফেলি সামনে। আরও একটা চড়াই পার হয়ে যাই। আমার ভয় দশ পা পিছিয়ে যায়। আমি এবার দশ কদম এগিয়ে যাই, ভয় এবার আমাকে ভয় পায়। সে দূর থেকে আমায় দেখে। আমার দেখার সময় নেই ওকে। আমাকে এগিয়ে যেতেই হয়। আমি জানি ও দূর থেকে আমায় দেখছে। আমার দুর্বলতার সুযোগের অপেক্ষায় সে ওত পেতে বসে আছে। আমার মনের আলোক বিন্দুগুলি ছুঁয়ে চলি আমি। তাদের সযত্নে লালন করি। ভয় আসলে আমার কল্পনায়।'

অনিন্দ্যর কথায়... 'অ্যাডভেঞ্চার জীবনের প্রতি পদে করা যায়। অ্যাডভেঞ্চার এমন একটা পথ যে পথ সবার জন্য সবসময় খোলা। সেটা ছোট মাপের না বড়, তাৎপর্যপূর্ণ না একঘেয়ে, তার বিচার বাকিরা করে। কিন্তু যে অ্যাডভেঞ্চার করে সে কেবল আনন্দ পাওয়ার জন্যই করে।'

এসব কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, ধুত্তোর, কী ঘরের মধ্যে পচে মরছি! বেরিয়ে পড়ি। একটা সাইকেল জোগাড় করতে হবে শুধু। প্রথমদিন নয় ত্রিশ কিলোমিটার চালিয়ে দেখব, তার পরদিন পঞ্চাশ, তারপর একশো। তারপর একটা লম্বা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব। একা।

অনিন্দ্য তাঁর লেখার মাধ্যমে পারেন অ্যাডভেঞ্চারের এই 'স্পিরিট'- টাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে। বাংলার নাতিস্ফীত অভিযান সাহিত্যে এ বই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তাপস মৌলিক

একজন পুলিশের হাতে যখন কলম, তাও শুধু পুলিশ বলা ভুল, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের প্রথম ভারতীয় আই জি শ্রী বিশ্বনাথ লাহিড়ী, তখন বইটা পড়তেই হয়, কারণ এমন বই সচরাচর পাওয়াই যায় না। পেলেও তথ্যের ভারে ভারি হয়ে ওঠে।

এ বইটার নাম কোটাল কাহিনি। এর ১৫৯ পাতার প্রতিটিই রোমাঞ্চকর। ছোটো ছোটো গল্পে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন সহজ ভাষায়। লেখার ভঙ্গীটি নিরপেক্ষ। তিনি যখন চাকরিতে যোগ দেন তখন ১৯২২ সাল। ব্রিটিশ শাসন ভারতে পুরোমাত্রায় কায়েম। ১৯৫৩ সালে যখন তিনি অবসর নেন তখন ভারত স্বাধীন। মুখবন্ধে লেখক নিজেই লিখছেন, "অনেক ব্যাপারে সেকালের রীতিনীতি অন্যরকমের ছিল, যা আজ

ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতের জন্যে সেগুলি অক্ষুণ্ন রাখা দরকার। এই বইখানার অন্যান্য অজুহাতের মধ্যে সেও এক অজুহাত।"

আর একটা কারণে বইটা তরতরিয়ে পড়া হয়ে যায়, সেটি লেখকের ভাষায় বলি, "যতদূর সম্ভব আমি নিজেকে আড়ালে রেখে বিষয়মুখী করার চেষ্টা করেছি, কোথাও মিথ্যা রঙ চড়াবার প্রয়াস করিনি"।

হারিয়ে যাওয়া যুগের গল্প শোনানোর ইচ্ছেতেই এ বই লেখা। লেখক বলছেন ইংরেজ শাসনের দোষ ও গুণ দুটিই সমান মাত্রায় ছিল, তবে শাসনকার্যটি তারা ভালোভাবেই জানত। তবে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল হাতে গোণা, আর নিযুক্ত হলেও তাদের কীভাবে ব্রাত্য করে রাখা হত তার বর্ণনা চমৎকার সরসভাবে লিখেছেন। ওই কাজে "যেসব ব্রিটিশ যুবক যোগ দিত, তারা একেবারে নিরক্ষর না হলেও তেমন শিক্ষিত ছিলনা, তাদের এদেশে আসার মুখ্য প্রলোভন ছিল বাঘ ভাল্লুক শিকার।"

বইটি অনেকগুলি প্রচ্ছদে ভাগ করা। সূচনায় 'হাতেখড়ি', তারপর সত্যযুগ, কোকেন বিক্রেতা কেরামত, পাতাল প্রবেশ, বম মহাদেব, মাধো সিং-এর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, সশরীরে স্বর্গারোহন, ব্রহ্মদৈত্যের দৌরাত্ম ইত্যাদি। নামগুলো পড়লেই বোঝা যায় বেশ মজাদার গল্পের রসদ রয়েছে এতে।

চতুর রামদাস এর গল্প পড়ে মনে পড়ে যাচ্ছিল Clint Eastwoodএর বিখ্যাত মুভি 'Escape from Alcatraz'। সত্যি বলতে কি, প্রায় প্রতিটি গল্পেই এরকম থ্রিলার বানানো যেতে পারে ইচ্ছে করলেই। এখন তো short filmএর যুগ। বশীরের অধ: পতন গল্পে সবচে বেশি মন টানে সাবিরার কথা যে বশীরের মত ডাকাতকে বিয়ে করতে রাজি ছিল সানন্দে এবং "সে স্বামীর সংগে সমানে ঘুরে বেড়াত। কখনো হেঁটে, কখনো বাইসাইকেলে, আবার কখনো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে"।

বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯ সালে দেজ পাবলিশিং এর শ্রী সুধাংশুশেখর দের পক্ষে। এই বইটি আমি আমার বাবা মলয় কুমার ব্যানার্জির কাছ থেকে পুরস্কার পাই কোন বছর ক্লাসে ওঠার সময়, তাই এই সুযোগে বাবাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। সে সময় বইটির দাম ছিল ১০ টাকা। আর প্রচ্ছদটি দেখাতে না পারার জন্যে দু:খ রইল, পোকার হাত থেকে বাঁচাতে বাঁধাইএর সময় ওটি ফেলে দিতে হয়েছিল। এখনকার যুগ হলে নিশ্চই ছবি তুলে রাখা যেত ফোনেই।

শেষ কথায় বলি:

বইয়ের শেষ পাতায় পুনশ্চ অংশটি আমার খুব জরুরি ও প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। লেখকের জবানিটাই তুলে দিলাম এখানে

"উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দুজনেই খুব উঁচুদরের ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তাঁরা আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন ও আমার কাজে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে পুলিশের যথেষ্ট সুনাম হয় ও অপরাধের সংখ্যা ও কমে যায়। আজ কিন্তু আগেকার তুলনায় অপরাধের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। পুলিশের কাজ অপরাধ ও অপরাধীদের *বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু তা করতে হলে তাদের কাজের উৎসাহ ও স্বাধীনতা চাই। অফিসাররা নিজে থেকে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। এ সম্বন্ধে দোষ তাঁদের যাঁরা শাসনের উচ্চশিখরে বসে। শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অনভিজ্ঞ অথচ তাঁদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা চাই। দেখা যাক কতদিনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।"*

সম্পাদকীয় সংযোজনঃ

এ বইটার ই কপি সংরক্ষিত হয়েছে দিল্লির ডিজিটাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়ার ইনটারনেট অর্কাইভে। সেখানে গিয়ে নীচের ঠিকানায় বইটার সব পাতাগুলোকে ছবি ফর্ম্যাটে ডাউনলোড করতে পারো। সেইখান থেকেই বইটার মলাট উদ্ধার করে সঙ্গে দিলামঃ

http://www.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=Kotal%20Kahini&author1=Lahiri,%20Biswanath&subject1=Literature&year=0&language1=bengali&pages=161&barcode=99999990345191&publisher1=Dey

যখন সব অন্যরকম ছিল

মহাশ্বেতা

পৃথিবীটাকে আমরা এখন যেরকম ভাবে দেখি, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার, মাটি, সমুদ্র, তা কিন্তু চিরকাল এরকম ছিল না। তাহলে কীরকম ছিল সেই পৃথিবী? গল্পের বই বা সিনেমার পর্দায় তার অনেক নিদর্শন আমরা পেয়েছি। স্টিফেন স্পিলবার্গের 'জুরাসিক পার্ক'এ ডাইনোসরের নাচনকোঁদন দেখে কতই না মজা হয়, অথবা হাসির কার্টুন ছবি 'আইস এজ'এও আছে সেই বহু কোটি বছর আগের বরফে ঢাকা পৃথিবী। ইতিহাস বা ভূগোল বইতেও কিছু কিছু আছে কিন্তু তা পড়ে কি আর মজা হয়, বলো? একটু পড়েই খটোমটো শব্দ ও তত্ত্বকথার মুখোমুখি হয়ে শেষমেশ ঢুলুনি এসে যায়।

কিন্তু এই বইটা একেবারেই আলাদা। পাতলা, ৩২ পাতার বই, কিন্তু প্রচ্ছদ দেখেই হাত নিশপিশ করে, পড়তে ইচ্ছে হয়। কত রঙ। এতে খুব সহজ ভাষায় যেন গল্প বলার ঢঙেই লেখক অংশুমান দাশ বিজ্ঞানের হরেক রকম কান্ডকারখানা তুলে ধরেছেন। মহাবিশ্বের জন্ম থেকে শুরু করে অণু পরমাণুর গঠন, পৃথিবীর জন্ম, প্রাণের উদ্ভব ও বিভিন্ন প্রাণীর বিবর্তন, এরকম একটা বিশাল, যাকে ইংরিজিতে বলে 'ম্যামথ' বিষয়বস্তুকে নিয়ে যে কখনও এত সহজবোধ্য ভাবে লেখা যায়, তা এই বইটা না পড়লে বিশ্বাস করা যেত না। সহজবোধ্য মানে কিন্তু এই নয় যে তিনি এই জটিল বিষয়গুলিকে অতিরিক্ত সরলীকরণ করেছেন। লেখাটা ঝরঝরে কিন্তু বোকাবোকা নয়, বিজ্ঞানের সমস্ত জটিলতা এতে রয়েছে; কিন্তু গল্পের মত করে, যাতে সাধারণ পাঠক তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তা উপভোগও করতে পারে।

মহাবিশ্বের স্থিতিশীলতাটা যে আসলে শুধুই মানুষের কল্পনা, অনু পরমাণু থেকে তারা অবধি, সর্বত্র সর্বক্ষণ মহাবিশ্ব পরিবর্তনশীল। ঠিক তেমনি ভাবেই এককোষী প্রাণী থেকে ডাইনোসর থেকে চিন্তাশীল মানুষ- কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনের ফল হল আমাদের জীবজগতের এই অতুলনীয় বৈচিত্র। এরকম একটা সুন্দর, গভীর তত্ত্বকে লেখক অপূর্ব সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বইটাতে। পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। শুধু তাই নয়, ডপলার বা স্টিফেন হকিং- এর মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলিকেও সরলভাবে উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া প্রায় প্রতি পাতায় আছে কমিক্স ঢঙে আঁকা ছবি, ম্যাপ ও বিভিন্ন ধরণের ডায়াগ্রাম। আর প্রচ্ছদের কথা তো আগেই বলেছি।

অতএব এই বইটা অবশ্যই পড়ে নিও!

কিছু তথ্য-
বইয়ের নাম- যখন সব অন্যরকম ছিল
লেখক – অংশুমান দাশ
প্রকাশক- প্রতীতি
অলংকরণ – অংশুমান দাশ

দাম- ৬০ টাকা

(৩)

দীপক গোস্বামী

গত সংখ্যায় আমরা দেখেছি রঙ্গনাথনের প্রথম সূত্র : **‘বই ব্যবহারের জন্য’।**

এই একটা সূত্রই বই ব্যবহারের চিন্তায় বিপ্লব এনে দিয়েছিল। বোঝা গেল— ব্যবহার ছাড়া বই-এর অস্তিত্বের কোন মূল্যই নেই। তাই আমরা দেখলাম, কী কী কাজের মধ্যে দিয়ে বই-এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করা যায়।

বেশ, ব্যবহার তো হল। কিন্তু বই ব্যবহার করবে কে বা কারা ? নিশ্চয়ই মানুষ— মানে পাঠক। আর পাঠক মানে যাঁরা সেই সব বই-এর ভাষা, বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ পাঠককে ব্যবহার করাবার মতো করেই বইগুলো তাঁদের সামনে সাজিয়ে দিতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই হিতোপদেশের সারস আর শিয়ালের গল্প জানো। দুষ্টুবুদ্ধি শিয়াল একদিন বন্ধু সারসকে নিমন্ত্রণ করে তাকে থালায় খেতে দিয়েছিল। সারসের পক্ষে তো সরু ঠোঁট দিয়ে থালা থেকে খাবার খাওয়া সম্ভব নয়– সে কিছুই খেতে পারল না। এরপর একদিন সারস শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করল এবং খেতে দিল কলসিতে। এবার শিয়ালেরও একই দশা– নিজের দুষ্টুমীর প্রতিফল পেল। কিন্তু আমরা তো পাঠককে ঠকাবার জন্য ডেকে আনিনি। তাকে তার চাহিদা মতো বই দেবার জন্যেই আমাদের সংগ্রহ। তাই রঙ্গনাথনের দ্বিতীয় সূত্রটা হল :

(সংগ্রহে) প্রত্যেক পাঠক তাঁর বই পাবেন।

আমাদের আলোচনাটা বই নিয়ে। যদি পত্র-পত্রিকা-র সংগ্রহ হত, তাহলে পাঠককে তাঁর প্রয়োজনীয় ম্যাগাজিনটি পেতে হত, রেকর্ড বা সিডি-ডিভিডি-র হলে পেতে হত সেই জিনিসগুলি। আগেই বলেছি, সংগ্রহ বিভিন্ন জিনিসের হতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই নাট্যকার বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)-এর নাম শুনেছ। আধুনিক নাটক ও নাট্য –আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম ভারতজোড়া। তাঁর একটা ছোট্ট নাটক আছে –‘হট্টমালার ওপারে’ – খুব মজার নাটক। সেটা একটা দেশ, যেখানে টাকাপয়সা কী জিনিস কেউ জানে না। সেখানে বাড়িতে থাকতে ভাড়া লাগে না, দোকানে জিনিসপত্র নিতে দাম লাগে না, হোটেলে খেতে (সবাই দু’ বেলা হোটেলেই খায়)

পয়সা লাগে না। সেখানে যে যার নিজের কাজটা শুধু যত্ন নিয়ে করে যায় আর তার ফল ভোগ করে অন্য লোকেরা – যেমন সে নিজেও অন্য লোকের কাজের ফল ভোগ করে। সেখানকার লাইব্রেরিতে (সংগ্রহে) অনেক জিনিস পাওয়া যায়, যেগুলো লোকেরা বই-এর মতো ধার নিয়ে ব্যবহার করে, আবার হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে যায় – এমন কি সোনার গয়না পর্যন্ত। কী মজার দেশ না!

একটা কথা আজকাল আমরা খুব শুনি – 'সকলের জন্য শিক্ষা'। তাই যদি হয়, তবে শিক্ষার অন্যতম বাহন হিসাবে 'প্রত্যেকের জন্য গ্রন্থাগার' নয় কেন ? 'প্রত্যেক' কথাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার বন্ধুদের মধ্যে সন্দীপ গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালবাসে, পিঙ্কি ভালবাসে গল্পের বই, বুল্টন ধাঁধাঁর বই, অর্চির পছন্দ জীবনী, ঋতুর ইতিহাস। মাত্র কয়েকজন বন্ধুর মধ্যেই পছন্দের এত ফারাক। সেইমতো তোমার সংগ্রহতেও এই পছন্দের ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের বই সংক্রান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোও সমাধান করতে হবে। এই সমাধানের জন্য আমরা সমস্যাগুলো আর একটু বড়ো করে ভাবতে পারি। বড়ো গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে যেমন সরকারের দ্বায়িত্ব আছে, তেমনি গ্রন্থাগারেরও দ্বায়িত্ব আছে। দ্বায়িত্বটা কী ? পাঠককে সবরকমভাবে তার পছন্দমতো বই পড়ার সুযোগ করে দেওয়া।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রথম দায়িত্ব হল বই কেনার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা। তোমার সংগ্রহের বই তুমি কত কষ্ট করে জোগাড় করেছ! বড়োদের কাছ থেকে উপহার পেয়ে, একটু একটু করে নিজের টিফিনের পয়সা জমিয়ে, ছোটকা'র ফাই-ফরমাস খেটে পয়সা আদায় করে। কিন্তু এইভাবে তো শহরে বা গ্রামে সকলের জন্য লাইব্রেরি তৈরি করা যায় না। প্রতি বছর বই কেনার জন্য, আসবাবপত্র কেনার জন্য, কিছু যন্ত্রপাতি কেনার জন্য, যাঁরা সেখানে কাজ করবেন তাঁদের মাইনে দেবার জন্য যে টাকার দরকার তা সরকার ছাড়া কে দেবে ? সরকার কোনো লাইব্রেরি কত বড়ো বা কত ছোটো, সেই অনুযায়ী প্রতি বছর টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

এ রকম আর একটা কাজ করতে পারেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যেমন মিউনিসিপ্যালিটি)-কে ট্যাক্স বসানোর মত লাইব্রেরির জন্য কর (যাকে 'সেস' বলা হয়) বসানোর ক্ষমতা দিতে পারেন। যাঁরা কোনো মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্যই তো এই সব গ্রন্থাগার। তাঁদের কাছ থেকে সেস-এর মাধ্যমে পাওয়া টাকা দিয়েই লাইব্রেরিগুলোকে সাহায্য করা যেতে পারে।

এখানে আমরা ধরে নিয়েছি বই পড়া বা বই-এর মধ্যে যে জ্ঞান লুকোনো আছে তার নাগাল পাওয়া প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব অধিকার। কোনো অধিকার দিতে পারে সেখানকার আইন। তাই সরকারের দিক থেকে গ্রন্থাগার আইন তৈরি করাও খুব জরুরি।

সিঙ্গাপুরের পুরোনো ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বাড়িটাকে ২০০ সালের কিছু আগে ভেঙে ফেলা হয়। রয়ে গেছে তার ছবি

সরকারের আর একটা কাজ আছে। তার আগে তোমাদের জিজ্ঞাসা করি – নিজের সংগ্রহ চালাতে গেলে কোন সময় তোমার খুব খারাপ লাগতে পারে, বল ত ? অনেক কিছুই লাগতে পারে। এখানে শুধু একটার উল্লেখ করি? যখন বন্ধুদের মারফত জানতে পার যে পাশের পাড়ায় তোমার আর এক বন্ধুও তার একটা সংগ্রহ তৈরি করেছে যা অনেকেই ব্যবহারও করছে, আর তার সংগ্রহে এমন অনেক বই আছে যা তোমার নেই। ফলে তোমার সংগ্রহ ব্যবহারকারীদের মধ্যে কয়েকজন তোমাকে ছেড়ে তার সংগ্রহ ব্যবহার করতে চলে যাবে ভাবছে। মজার কথা দেখ, যেটা তোমার পক্ষে আনন্দের ব্যাপার হওয়া উচিত ছিল, সেটাই তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে। বই পড়াটাই তো আসল কথা, আর সেই জন্যেই তুমি তোমার সংগ্রহ তৈরি করেছ – তা যেখান থেকেই পড়া হোক না কেন, তোমার তো খুশি হওয়াই উচিত। অথচ তা হচ্ছে না। এবার অন্য একটা অবস্থার কথা বলি। ধর, যদি তোমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার এমন ব্যবস্থা থাকত, যাতে তোমার যে সব বই নেই, কিন্তু তার আছে, সেগুলো তোমার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে সে তোমায় ধার দেবে। একই ভাবে তার ব্যবহারকারীদের জন্যেও তোমার বই তাকে তাকে ধার দিতে হবে।

তাহলে কী হত? যে কোনো বই ব্যবহার করবার জন্য একটা সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই চলত। এটাকে লাইব্রেরির ভাষায় বলে Inter-library loan। বাংলাটা একটু খটোমটো – আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ। সে যাই হোক, মূল কথাটা হল যে কোনো লাইব্রেরির বই অন্য লাইব্রেরি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। এটা তোমার পক্ষে করা যতটা ঝুঁকির (অন্য সংগ্রহ বই ধার নিয়ে ফেরত নাও দিতে পারে), সরকারী গ্রন্থাগারের পক্ষে ততটা নয়। কারণ সেখানে সরকারী আইন আছে।

এটা একটা উদাহরণ। সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তার অধীনে থাকা বিভিন্ন লাইব্রেরির মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা, যাতে এক গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং পরিষেবা অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। এই পরিষেবা ব্যবহারের একটা গল্প বলি। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে

ছোটো বড়ো অনেক লাইব্রেরি আছে, সবাই একটা সরকারী ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে। সে সময় আমরা কয়েকজন তার মধ্যে কিছু লাইব্রেরি দেখার জন্য বিভন্ন শহরে ঘুরছি। লণ্ডনের পিমলিকো লাইব্রেরি দেখতে দেখতে একটা দরকারি বই পেয়ে গেলাম। সারাদিন লাইব্রেরিতে কাজের মাঝে তো বই পড়া যায় না। বইটা ভাল করে দেখতে গেলেও অন্তত একটা দিন সময় লাগবে। কিন্তু পরের দিন ভোরেই আমরা চলে যাব ইয়র্ক। লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা ইয়র্ক সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতেও কি এ বইটা পাওয়া যাবে ? তাহালে ওখানে গিয়ে ভাল করে দেখে নিতাম।' তিনি বললেন, 'পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু না-ও তো যেতে পারে। তার চেয়ে আপনি এই বইটাই নিয়ে যান না।' আমি বললাম, 'সে কী ! ফেরত দেব কী করে ? আমরা তো কাল ভোরেই ইয়র্ক চলে যাচ্ছি।' তিনি আশ্বস্ত করলেন, 'কেন, ইয়র্ক লাইব্রেরিতেই ফেরত দিয়ে দেবেন। ওরাই আবার আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। এখানে পাঠকের সুবিধামত এক লাইব্রেরির বই অন্য যে কোনো লাইব্রেরিতে ফেরত দেওয়া যায়। নিজেদের কাজকর্ম সামলে পাঠকের পড়ার কোনো অসুবিধাও হয় না।' এটা পরিষেবারও আন্তঃগ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

এ তো গেল সরকারের দ্বায়িত্ব। 'প্রত্যেক পাঠকের বই'-এর জন্য গ্রন্থাগারেরও কিছু দ্বায়িত্ব আছে। পাঠকের জন্য সব বই জোগাড় করা ছোট বা বড়ো কোনো সংগ্রহের পক্ষেই সম্ভব নয়। বই পত্রপত্রিকার জন্য এত টাকা, সেগুলো রাখার জন্য এত জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে ! তাই অজস্র বই-এর মধ্য থেকে তোমাকে প্রয়োজনীয় বই নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচন এমন হবে যাতে চাহিদামতো বেশিরভাগ পাঠক তার বই পেতে পারেন। তোমার সংগ্রহের ব্যবহারকারীদের অনেকেই হয়ত রামকৃষ্ণ বিষয়ক বই পড়তে ভালোবাসে। তোমার ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে মতি থাক বা নাই থাক, পাঠকদের জন্য এইসব বই রাখতেই হবে এবং রামকৃষ্ণের পরিবর্তে যিশুখৃস্টের ওপর বই দিলে তারা খুশি হবে না। তাছাড়া তোমার সংগ্রহের বইগুলোর মান তোমার পাঠকের মানের সমপর্য্যায়েরও হওয়া দরকার। না হলে তাঁরা সে সব বই পড়তেই চাইবে না।

গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় দ্বায়িত্ব হল পাঠকের যে কোনো প্রয়োজনেই তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তার জন্য কেনার পর বইগুলোকে অকারণ ফেলে না রেখে তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক সাজিয়ে ফেলা, বইগুলোর তালিকা (ক্যাটালগ) তৈরি করা, আর এ সবই যেন পাঠকরা ব্যবহার করতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া।

সবশেষে, দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী পাঠকের দ্বায়িত্ব কী, সেটাও জেনে নেওয়া ভালো। সর্বপ্রধান দ্বায়িত্ব– সংগ্রহটা যে সকলের জন্য সে কথা সব সময় মনে রাখা। আর সে জন্যই কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি না করা। বই-এ কোনো দাগ না দেওয়া বা বই-এর পাতা না কাটা এবং বই ঠিক সময়ে ফেরত দেওয়া। সব মিলিয়ে লাইব্রেরির নিয়মগুলো ঠিকঠাক মেনে চলা।

আপাতত এটুকু জানলেই দ্বিতীয় সূত্রটা বোঝা যাবে। আগামী বারে আমরা তৃতীয় সূত্রটা দেখব।

ক্রমশ

বিশ্বের জানালা

উমা ভট্টাচার্য

ত্রিপুরা

বিশ্বের জানালা পথে এবারে দেখব আমার ভারতের একটি আঞ্চলিক রাজ্য ত্রিপুরাকে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি ছোট্ট, সুন্দর ছবির মত রাজ্য ত্রিপুরা। স্বাধীনতার আগে, অনেক অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরার এলাকা ছিল এখনকার বাংলাদেশের অনেকখানি অংশ নিয়ে। তখন কোন রাষ্ট্র ছিলনা। রাজ্যের এলাকা নির্ভর ছিল সেখানকার রাজশক্তির বাহুবলের ওপর। যে রাজা যখন যতটা দখল করতেন তখন সেইসব অন্য রাজ্যের এলাকা তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। সেই সময় থেকেই বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছিল ত্রিপুরার অবস্থান।

ত্রিপুরার নাম নিয়ে অনেক মিথ আছে। সংস্কৃতে ত্রিপুরার অর্থ তিনটি নগরের সমষ্টি। অনেকে বলেন ত্রিপুরার আদি নাম ছিল 'ডাহন' দেশ। কেউ বলেন ত্রিপুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীই এই নগরের সৃষ্টি করেন। ত্রিপুরি 'ককবরক'ভাষীদের মতে নামটি হল টুইপ্রা বা তিপরা নগরী। ককবরক ভাষায় 'টুই' মানে জল, আর 'প্রা' মানে কাছে। কথার অর্থ 'সমুদ্রের সন্নিকটে' অবস্থিত দেশ। এখানে যারা বাস করত তারা তিপরা জাতির মানুষ, যারা পরে ত্রিপুরি বলে পরিচিত হয়। নিজেদের বাসভূমির এই নাম তারা দিয়েছিল বোধ হয় এই কারণে-

অতীতে ত্রিপুরার সীমানা এখনকার বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকের সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাই সমুদ্রের সন্নিকটের দেশ –তিপরা নাম হয়েছিল। দূর অতীতে ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের রাজাদের রাজ্যসীমা গারো পাহাড় থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ত্রিপুরার ইতিহাস ধরা আছে 'রাজমালা' নামক বইয়ে। ঐতিহাসিকেরা বলেন ত্রিপুরার রাজবংশ শান জাতি থেকে সৃষ্টি। ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা ত্রিপুরীরা আসলে তিব্বতি-ব্রহ্ম আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। চীনের 'ফা' জনজাতির মানুষ। এরা ইয়াংসিকিয়াং আর পীত নদীর উপরের দিকের, অর্থাৎ বর্তমান চীনদেশের পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসাম উপত্যকায় ঢোকে, তারপর ক্রমশ আরও দক্ষিণ দিকে বসতি বিস্তার করে। এরা রাঙামাটিতে, (বর্তমান নাম উদয়পুর) রাজধানী স্থাপন করেছিল। এরা ছিল প্রকৃতিপূজক, বনজীবী, যাযাবর আদিবাসী মানুষ।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে ১৯টি আদিবাসী উপগোষ্ঠী আছে।যারা সকলেই এখনো ত্রিপুরার বাসিন্দা।কোচ, মেচ, গারো, রিয়াং, লুসাই, মগ, চাকমা, হালম, কুকি প্রভৃতি উপজাতি উপগোষ্ঠী এখানে বাস করে। আদিবাসীদের মত এরাও পশুপালক, যাযাবর, আর বনজীবি ছিল আদিতে।তাই হয়তো মহাভারতে ত্রিপুরাকে বলা হয়েছে 'কিরাতভূমি'। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরিদের একটি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী পরিবার 'দেববর্মণ' রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরাই প্রায় দু'হাজার বছর ধরে এখানে রাজত্ব করেন।পরে এই রাজারা 'মানিক্য বংশ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রাজমালায় লিখিত নথিতে এই বংশের ১৭৯ থেকে ১৮৪ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাতেই প্রমাণ হয় এই দেশ কত পুরোন।

ত্রিপুরার রাজাদের 'মাণিক্য' উপাধি দিয়েছিলেন মুগিসউদ্দিন তুগ্রিল খাঁ। তিনি বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যগুলিকে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরার সিংহাসনে ছিলেন রাজা 'দান-কুরুফার' ছোটো ছেলে 'রত্ন-ফা'। কিন্তু তাঁর অন্য ভাইরা তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়। তিনি গৌড়ে চলে আসেন, ও তুগ্রিল খাঁ-র আশ্রয়ে চার বছর বাস করেন। তিনি তুগ্রিল খাঁকে ১০০ হাতি ও প্রচুর মাণিক্য নজরানা দিয়েছিলেন। সেসবের মধ্যে খুব বড়ো আর উজ্জ্বল একটি 'মাণিক' ছিল। সেটি পেয়ে খাঁ সাহেব এত খুশি হয়েছিলেন যে 'রত্ন-ফা'কে ১২৭৯ সালে 'মাণিক্য' উপাধি দিয়েছিলেন। তারপর রত্ন-ফা আবার রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর থেকে এই বংশের রাজারা 'মাণিক্য' উপাধি ব্যবহার করতে শুরু করেন।

পাহাড়, বনানী ঘেরা সুন্দর উপত্যকাময় ত্রিপুরার প্রকৃতির কোলে ধীরে গড়ে ওঠা

দেশটির সৌন্দর্য আর উৎকর্ষ উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছিল এখানকার মিশ্র ঐতিহ্যের মানবসম্পদ আর তাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে। প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসাবে আছে দেশটিতে বিভিন্ন দর্শনীয় প্রত্নস্থল। সেগুলি ছড়ানো আছে, আধুনিক ত্রিপুরার চারটি জেলার সবকটিতেই। দক্ষিণ ত্রিপুরায় আছে দেওতামুড়া পাহাড় আর পিলাকের প্রাচীন বৌদ্ধস্থাপত্যের প্রত্ননিদর্শনস্থল, এখানেই উদয়পুরে আছে রাজপরিবারের আরাধ্যা দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির, প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ,

সিপাহজলার অভয়ারণ্য। পশ্চিম ত্রিপুরায় আছে সোনামুড়া পাহাড়ের দর্শনীয় স্থান, মধ্যে আছে ধলাই জেলা। আগরতলায় আছে রাজাদের পরবর্তীকালের রাজপ্রাসাদ- উজ্জয়ন্ত প্যালেস। এই প্যালেসের এক অংশে আছে রাজ্য মিউজিয়াম, কাছেই আছে প্রাচীন আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। সেখানে দীর্ঘ সন্ধ্যারতির সময় এখনো রাজপরিবারের কেউ না কেউ বড় করতাল বাজিয়ে যান, সঙ্গে থাকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রিক ঢাক। সেই পুরাতন ঐতিহ্যকে এখনো এঁরা ধরে রেখেছেন।

ত্রিপুরার সবচেয়ে অবাক করা দর্শনীয় স্থান আছে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ‘উনকোটি’ পাহাড়ে। সেখানকার পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা আছে বিশাল কালভৈরবের মুখ, আছে শান্ত শিবের মূর্তি, আছে বিক্ষিপ্ত জটাজাল ছড়ানো বিশালচক্ষু রুদ্র ভৈরবের মুখ। আছে শিবের সহচরী দেবীদের বাহনসহ মূর্তি। আছে গনেশ প্যানেলে চার হাতওয়ালা বিনায়ক গণেশের মূর্তি, ছয় হাতওয়ালা গণেশের মূর্তি, আছে আট হাতওয়ালা গণেশ মূর্তি, তার পাশেই চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি। আছে কামদেবের মূর্তি, আছে দেবদাসী মূর্তি, আছে পাথর কেটে তৈরী মহাদেবের বাহন ষাঁড়ের মূর্তি, পিঠ তার নানা ভাস্কর্যে সাজানো। আছে ধর্মঠাকুরের প্রতিরূপ কচ্ছপের মূর্তি। এরও পিঠে

নানা মঙ্গলচিহ্ন খোদিত। সবই কঠিন পাথরের গায়ে খোদাই করে তৈরি। আর সব মূর্তির পোশাক, গহনা, মুকুট, কোমরবন্ধনী, সব কিছুতেই আদিবাসী ঐতিহ্যের ছাপ। কত কী যে আছে এখানে ছড়ানো তা নিজের চোখে না দেখে এলে বলে বোঝানো যাবে না। এইসব মূর্তিতে ব্যবহৃত সব মোটিফ, চিহ্ন, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ চিহ্ন, লম্বালম্বি- আড়াআড়ি স্ট্রাইপ, গহনার ডিজাইন, সবই এই অঞ্চলের শুধু নয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতির পোশাকে, গহনায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আরণ্যক পরিবেশে পাহাড়ের গায়ের এই ভাস্কর্য এক গা- ছমছমে অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি করে। তীব্র আকর্ষণে ধরে রাখতে চায় স্তব্ধ অতীতকে।

সংক্ষেপে কিছু তথ্য-

ভারতের পুর্বাঞ্চলে চারদিক স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা বর্তমান ত্রিপুরার চারদিক ঘিরে আছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমা। আন্তর্জাতিক সীমার ৮৩৯ কিলোমিটার বাংলাদেশের সীমা, ৫৩ কিলোমিটার জাতীয় সীমা আসামের ও ১০৯ কিলোমিটার জাতীয় সীমা মিজোরামের সঙ্গে।

রাজ্যটির ভূমিতলে রয়েছে আড়াআড়িভাবে পরস্পরের সমান্তরালে বিস্তৃত ৫টি পাহাড়ের সারি। বড়োমুড়া, আঠারোমুড়া, লংথারাই, শাখান, জাম্পুই এই ৫টি দীর্ঘ পাহাড়ের শুরু উত্তর- পশ্চিমে, বাংলাদেশের সিলেট(শ্রীহট্ট) অঞ্চল থেকে। পাহাড়গুলি পশ্চিম থেকে পুর্বে ক্রমশ উঁচু হতে হতে গিয়ে মিলেছে দক্ষিণ- পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় শ্রেণীতে। দুই সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে মাঝে অবস্থিত উপত্যকায়, পাহাড়ের ঢালে আছে জনবসতি। রাজধানী আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরার এক পাহাড়ি উপত্যকার মাঝের সমতল ভূমিতে অবস্থিত।

ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য, আর উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়

জনবহুল রাজ্য ত্রিপুরার আয়তন ১০. ৪৯২ বর্গ কিলোমিটার। ২০১২ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৩৬৫৮ মিলিয়ান। জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ আদিবাসী, শিডিউলড ট্রাইব। আদি অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমে কমে এসেছে, আর জনস্ফীতি ঘটেছে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশের শরণার্থীদের আগমনে। ১৯টি জনজাতি, কিছু মণিপুরী আর বাংলাদেশীদের

নিয়েই এখনকার ত্রিপুরার মিশ্র জনসমাজ। শিক্ষিত মানুষের হার খুবই ভালো। পুরুষদের মধ্যে ৮৭.৮% ও মহিলাদের মধ্যে ৮৩.২% শিক্ষিত। ত্রিপুরার স্থানীয় ভাষা ত্রিপুরী, ককবরক, ও বাংলা। স্কুল কলেজও অনেক।

চিরদিনের স্বাধীন ত্রিপুরা, মুঘল শক্তিও যাকে অধীন করতে পারেনি, সেই ত্রিপুরা ইংরেজ আমলে হয়েছিল করদ রাজ্য। স্বাধীনতার পর ১৯৫৬ সালে হয়েছিল ভারতের কেন্দ্রশাসিত রাজ্য, ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত সরকার পেয়েছিল। ভারতের একটি পূর্ণ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ৩৫ বছর পরে ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারিতে।

অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। রাজ্যের ৬৪% মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত। বাঙালিদের মতই এখানকার খাদ্যাভ্যাস। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আছে আনারস, কমলা, কাজুবাদাম, কাঁঠাল, নারকেল, চা আর রবার। দীর্ঘ রাস্তার দুপাশে অন্য গাছগাছালির মতই আছে রবার গাছের বাগান। গাছের গায়ে দাগ কেটে তার নীচে নারকেলের আধখানা মালা বেঁধে রাখে রস জমবার জন্য। বিকেলে সেগুলিতে জড়ো হওয়া আঠা সংগ্রহ করে।

ঘরোয়া পদ্ধতিতেই অনেক মানুষ ছোট ছোট রবারের চাদর তৈরি করে, রাস্তার ধারে দড়ি বা বাঁশ টাঙিয়ে সেগুলি রোদে দেয়, শুকোলে সেগুলি কারখানায় পাঠায়। বাঁশের কাজের জন্যও ত্রিপুরা প্রসিদ্ধ, এই শিল্প থেকেও প্রচুর মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়।

এখানে আছে প্রায় ৯০ রকমের স্তন্যপায়ী স্থলচর প্রাণী। যাদের মধ্যে আছে হাতি, ভালুক, গাউর, চিতা, বার্কিংডিয়ার, সম্বর, সজারু, ক্লাউডেড লেপার্ড, বনবিড়াল, বাঁদর,

হনুমান। ভারতে যে ১৫ রকম প্রাইমেট(বাঁদর, হনুমান প্রভৃতি) প্রজাতি দেখা যায় তার মধ্যে ৭টিই আছে ত্রিপুরার বনাঞ্চলে। উদ্ভিদের মধ্যে শাল, বাঁশ, বেত, রবার আর তৃণভূমি প্রধান। গাছপালায় চারদিক সবুজে সবুজ। পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। গ্রামাঞ্চলে লালমাটির উঁচু জমিতে মানুষ টিনের ঘর তৈরি করে। মাটি কেটে ঢালু রাস্তা করে নেয় বাড়িতে পৌঁছুতে। শহরাঞ্চলে সবই পাকা বাড়িঘর।

ত্রিপুরার সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ নাচ। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির নিজস্ব নৃত্যধারা বজায় আছে এখানে, যা বিভিন্ন পার্বণের সময় প্রদর্শিত হয়। নিজ নিজ ঐতিহ্যের পোশাক, গহনায় সজ্জিত হয়ে এরা নাচ করে। বাংলার মত উনকোটিতেও চৈত্রসংক্রান্তিতে অনেক লোকসমাগম হয় শিবের পূজার জন্য। বাঙালিদের অনুষ্ঠানের মধ্যে ধামাইল, কীর্তন, মনসামঙ্গলের সমবেত গানও মিশে গেছে ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে। ‘গড়িয়া’দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় উপজাতীয় ‘গড়িয়া নৃত্য’। বাংলা নববর্ষে যেমন গণেশ পূজা করে হালখাতা হয় তেমনি একই সময়ে ত্রিপুরায় হয় ‘গড়িয়া’ পূজা। সারা দেশ জুড়ে পালিত হয় বসন্ত উৎসব, বাংলা নববর্ষ, বিহু উৎসব, দুর্গাপূজা, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, সুকান্তজয়ন্তী, শচীনদেববর্মণ জয়ন্তী, রথযাত্রা। সবই সরকারী সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। সবমিলিয়ে এক ঝলমলে রাজ্য আমাদের ত্রিপুরা। সবকিছু মিলিয়ে ত্রিপুরা যেন বিভিন্ন স্তরীয় সংস্কৃতির এক মোজাইক চিত্র।

ইনুইট উপকথা

জলসাঘরের ভূত

মহাশ্বেতা

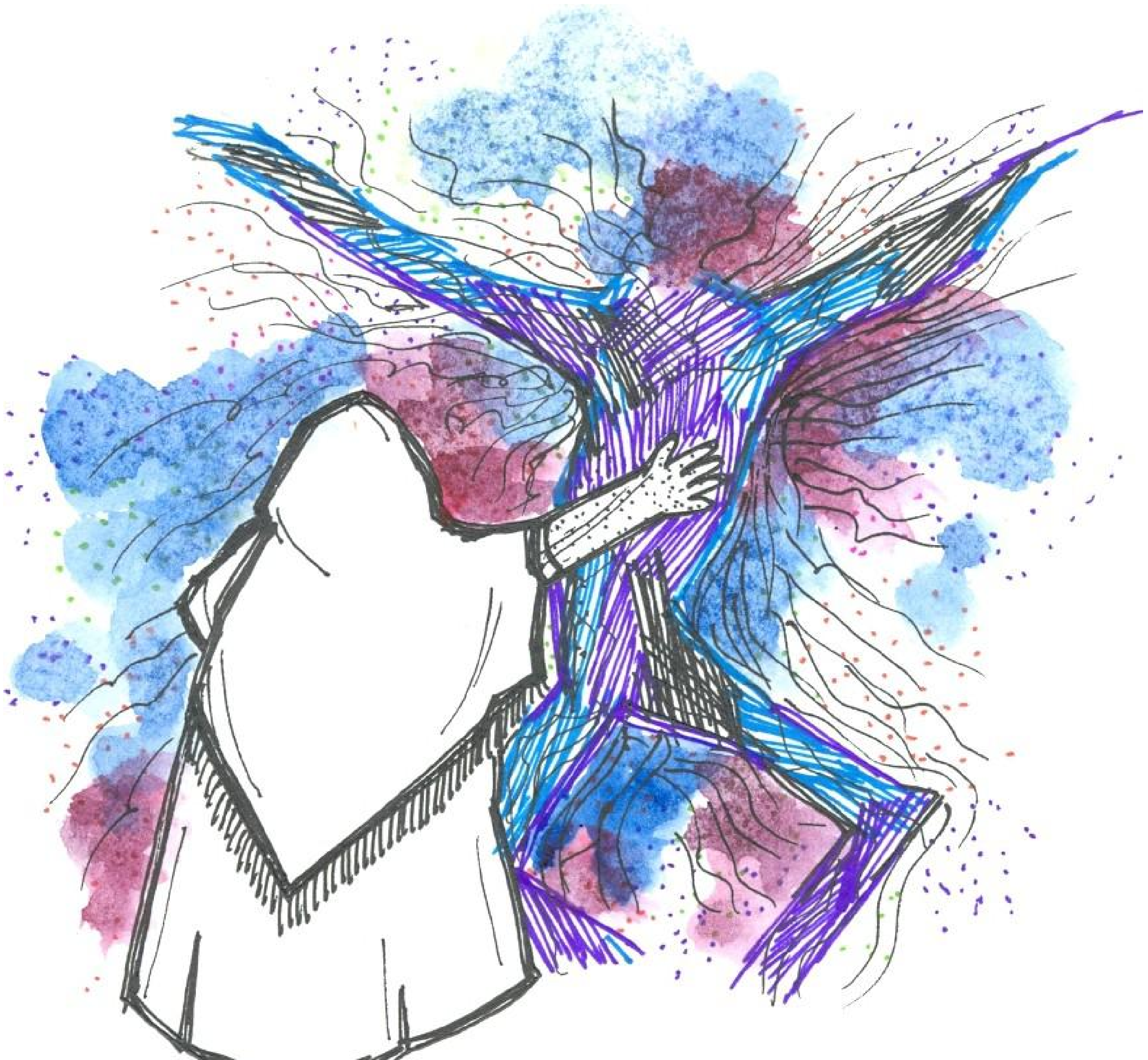

ইনুইটদের প্রতিটি গ্রামে একটা করে গান-বাজনা করার জলসাঘর থাকে। এই ঘরটাতেই উৎসব, আনন্দের সময় গ্রামের লোক গান-বাজনা করে, ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে একসাথে।

লোকে বলে যে এরকম প্রতিটি ঘরেরই নাকি নিজস্ব একটা করে ভূত থাকে। ভূতটা সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যেই থাকে, ভুলেও কখনও বেরোয় না। এক গ্রামে থাকত একজন খুব কৌতুহলি

মহিলা। লোকের মুখে সে এই জলসাঘরের ভূতের ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছিল আর তাই বহুদিন ধরে তার ভূতটাকে নিজের চোখে দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে যতবারই তার এই ইচ্ছে প্রকাশ করে ততবারই গ্রামের লোক তাকে সাবধান করে দিত এই বলে যে সেই ভুত যদি কোনক্রমেও কাউকে দেখা দেয়, তাহলে তার দুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকবে না। অতএব দেখবার চেষ্টা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক রাতে তার আর তর সইল না। গ্রামের সব লোক বাড়িতে শুয়ে টুয়ে পড়লে সে চুপিচুপি অন্ধকার একটা জলসাঘরে ঢুকল। ঢুকে সে জোর গলায় বলল,

“এই ঘরে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে সে আমাকে দেখা দিক!”

কিছুই হল না।

তাই দেখে সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল, “তাহলে কোন ভূত নেই এখানে। কেউ যখন দেখা দিচ্ছে না।”

“এই যে আমি এখানে; ওই যে আমি ওখানে।” একটা ফ্যাসফ্যাসে গলায় ফিসফিস করে কে যেন বলে গেল।

“তবে তোমার পায়ের আঙুল দেখাও দেখি।” মহিলাটি বলে উঠল কারণ সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

“এই তো এখানে; ওই তো ওখানে।” আবার সেই গলাটা বলে গেল।

“তাহলে তোমার হাঁটু কোথায়?” আবার প্রশ্ন করল মহিলা।

“এই তো এখানে; ওই তো ওখানে।” উত্তর দিল গলাটা।

মহিলা কিছুই দেখতে পারছিল না তাই সে তার দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করল। হাত লাগাতে লাগাতে সে টের পেল যে তার সামনে সত্যিই একজন কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা লিকলিকে লোক, বেঁকে দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাঁটুদুটোতে হাত পড়তে মহিলা দেখল যে সে দুটো বাইরের দিকে বাঁকানো।

সে একইসঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগল একের পর এক, “তোমার কোমর কোথায়?”, “তোমার ঘাড় কোথায়?”, “তোমার গলা কোথায়?” আর প্রতিবার সেই ফ্যাসফ্যাসে গলাতেই কেউ উত্তর দিল, “এই তো এখানে; ওই তো ওখানে।”

সবশেষে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, “তোমার মাথা কোথায়?”

“এই তো এখানে; ওই তো ওখানে।” ভূতটা ফিসফিস করে উত্তর দিল।

কিন্তু মহিলা হাত দিয়ে তার মাথাটা ছোঁয়া মাত্রই দড়াম করে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পটল তুলল। তাতে না ছিল হাড়, না ছিল চুল!

ছবিঃমৌসুমী

ঘড়িওয়ালা বাড়ি

২৭৯ রবীন্দ্র সরণীতে বহু ঘড়ি আজও যেন কথা বলে। পুরাতন ঐতিহ্য ধরে রাখে সেইসব সংগৃহীত ঘড়ি।মতিলাল মল্লিক এদের সংগ্রহ করেছিলেন।

বাড়ির ছাদে রাস্তা ধারে বসানো কুক অ্যান্ড কেলভি- র পুরোনো আমলের গোল ঘড়িটা দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে এই বাড়ি ছিল মধুসূদন স্যান্যালের। জোড়াসাঁকোর এই বাড়ি পেশাদারী নাট্যশালার এক ঐতিহাসিক আবাস। এই বাড়িতে নীল দর্পন, সধবার একাদশী ইতাদির অভিনয় হয়েছিল। এ বাড়ির চেহারা পরে পরিবর্তন করা হয় ম্যাকিনটশ বার্ন কোম্পানির সহায়তায়। ১৮৭৩ এ বাড়িতে শেষ অভিনয়ের আসর বসেছিল। অভিনীত হয়েছিল বুড়ো শালিকের ঘারে রোঁ।

মতিলাল মল্লিকের বংশধর গোবিন্দলাল মল্লিক বের করেছিলেন ম্যালেরিয়ার ওষুধ, গোবিন্দসুধা নামে। মল্লিকদের খুলনা সাতক্ষিরা অঞ্চলে প্রচুর জমিজমা ছিল। কলকাতার ধনী সুবর্ণবণিক পরিবারগুলির মধ্যে তারা অন্যতম। কলকাতায় তাঁদের ছিল প্রচুর ভাড়াবাড়ি ও বস্তি।

মতিলাল শীলের বাড়ি, কলুটোলা

নানা ব্যাবসা ছিল এঁর। শিশিবোতলের ব্যাবসা করে প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এদেশ থেকে নীল, রেশম, চিনি ও চাল রফতানি করতেন। কিনেছিলেন ১২টি জাহাজ, এবং কোলাঘাট, মহিষাদল, যশোর ইত্যাদি এলাকায় বড়ো বড়ো জমিদারি। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য বারো হাজার টাকা দান করেন। মেডিকেল

কলেজের মূল বাড়ির জন্য মতিলাল শীল জায়গা দিয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজের কাছে ৬০ নম্বর কলুটোলা স্ট্রিটে ওঁর বাড়ি। সেখানে আছে সাবেক কালের ঠাকুরদালান। এই ঠাকুর দালানে দেড়শো বছরের পুরাতন দুর্গোৎসব হয়।

জাহাজ, জমিদারি ও ব্যাবসা থেকে তিনি এত টাকা আমদানি করেছিলেন যে শেষ বয়সে তাঁর টাকার প্রতি আর কোন মোহ ছিল না। ১৮৪১ সালে তিনি বেলঘরিয়াতে ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালা গড়ে তুলেছিলেন। সেই অতিথিশালায় বহু মানুষ নিখরচায় অন্নলাভ করত। এখনকার ১২৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে বিনাখরচে পড়াশোনা করবার জন্য মতিলাল শীল কলেজে ৪০০ ছাত্রের পড়বার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলায় যিনি প্রথম বিধবাবিবাহ করেছিলেন তাঁকে কুড়ি হাজার টাকা দেন। বহু অনাথ ও বিধবা তাঁর দেয়া বৃতির টাকায়

মোতিলালের নামে গঙ্গার ঘাট

প্রতিপালিত হয়েছিলেন। দানশীল মতিলালকে কলকাতা ভোলেনি। ওঁর নামে আছে রাস্তা, গঙ্গার ঘাট, মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ড আর কাশীপুর মতিলাল ঝিল।
তাঁর বড়োপুত্র ছিলেন হীরালাল। ১৮৬৪ সালে আকালের সময় অন্নসত্র খুলে প্রতিদিন হাজার লোকের অন্নের জোগান দিতেন।

কলকাতা হাইকোর্ট প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কোর্টে ব্যারিস্টারি করতে দেয়নি। বঙ্গসমাজের নানা বিশিষ্ট পরিবার থেকে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে ভালো সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন হীরালাল শীল। এছাড়াও ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র, টিপু সুলতানের ছেলে গোলাম মুহম্মদ। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিজ্ঞানপত্রের দরুন মাইকেল ১৮৬৭ সালে আইনব্যাবসার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন।

আজ দুর্মূল্যের বাজারে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে যাতে সুলভে চিকিৎসা পেতে পারে সেজন্য কালিদাস মল্লিকের চ্যারিটেবল ট্রাস্ট থেকে মাসিক দান দেয়া হয়ে থাকে মেডিকেল কলেজ, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকে।

মার্বেল প্যালেসঃ চোরবাগান

চোরবাগানের পথে যেসব পুণ্যার্থী ও বণিকেরা স্নানে বা বাণিজ্যে যেতেন তাঁদেরকে অনেক সময় ডাকাতের হাতে লুন্ঠিত হতে বা প্রাণ দিতে হত। এই কারএ সে পথের নামই হয়ে যায় চোরবাগান। রাজেন্দ্র মল্লিক ১৮৩৫ সালে এখানে তাঁর বাড়ি তৈরি শুরু করেন। সে সময় মাটির নীচে মানুষের অনেক কংকাল পাওয়া গিয়েছিল। রাজেন্দ্র সোনা কেনাবেচার

ব্যাবসা করতেন। ক্রমে দানধ্যান, শিক্ষাতে ওঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বৃটিশ সরকার এঁকে রায়বাহাদুর ও রাজাবাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন।

মার্বেল প্যালেস তৈরি হয়েছিল পাঁচ হাজার ইউরোপীয় স্থাপত্যশিল্পী ও কারিগর দিয়ে, তাঁর মা ও তাঁর নিজের রুচিবোধ অনুযায়ী। ইতালির স্থপতিরা মার্বেলের ফ্লোরিং করেছিলেন। ফরাসিরা করেছিলেন বাড়ির লে আউট, ভেস্টিব্যুল, পোর্টিকো এবংবাড়ির সামনের অংশ। ইংরেজ কারিগররা বানিয়েছিলেন আসবাবপত্র ও অন্যান্য ফিটিংস্‌। রাজেন্দ্র মল্লিক তাঁর বাবার নামে রেখেছিলেন বাড়ির বাগানের নাম- নীলমণি নিকেতন। বাগানে ফোয়ারা, গ্রিনহাউস, দুর্লভ অর্কিড, সবুজ ঘাসের লন, পাম গাছ আছে। আছে প্রচুর অর্থে কেনা ম্যাকাও পাখি। আর

আছে দূরদেশের গাছ ও লতা। মার্বেল প্যালেসের ঠাকুরদালান ফরাসি স্থাপত্যে তৈরি করেছিলেন। বিশিষ্ট স্থাপত্যের এই দালান ঢালাই লোহার লতা-ফুল-পাতার নকশাতে সুসজ্জিত। পুজোর ঘর দুর্লভ পিয়েত্রা ওরো দিয়ে বানানো। স্বর্ণাভ শিরাবহুল এই শেতপাথর আজ ইটালিতেও দুর্লভ।

ক্রমশ

বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী

উমা ভট্টাচার্য

১৯১৮ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায় চলছে। ভারতের স্বাধীনতার লড়াইও তখন চুড়ান্ত আকার নিয়েছে। এই সময় একদিন দুপুর বেলা, কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরের স্পেশাল অফিসারের ঘরে হই হই কাণ্ড। গোয়েন্দা দপ্তরের স্পেশাল অফিসার মিস্টার গোল্ডির গালে সপাটে এক চড় কষিয়েছেন বছর ত্রিশের এক বন্দিনী। দ্বিতীয় চড়টি মারবার আগেই তাঁর হাত চেপে ধরেছেন অফিসের অন্য কর্মীরা। হাত চেপে ধরা অবস্থাতেই ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত গর্জাচ্ছেন, অফিসারকে বলছেন, "এত বড় স্পর্ধা তোমাদের? আমাদের দেশের মানুষ পরাধীন বলে কি কোন মান-সম্মান নেই? চিঠিটা যদি ছিঁড়েই ফেলবে তবে লিখতে বলেছিলে কেন?"

তাঁর স্পর্ধা আর তেজ দেখে সবাই থ! জেলে তাঁর ওপর লাগাতার পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন করে আছেন ২১ দিন। তবুও কোন দুর্বলতা নেই, মনোবল অটুট। এমনই দৃঢ়চেতা ছিলেন বিপ্লবী ননীবালা দেবী।

অনেক অনুসন্ধানের পর রিষড়ার বিপ্লবী ননীবালা দেবীকে পেশোয়ার থেকে গ্রেফতার করা যায় ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে। তাঁকে রাখা হয়েছিল বেনারসের জরাজীর্ণ পুরনো জেলে। সেখানে নানাভাবে অত্যাচার করেও বিপ্লবীদের বিষয়ে একটি কথাও বের করতে পারেননি কাশীর জেলের দুঁদে বাঙালি পুলিশ সুপার জিতেন ব্যানার্জী। তাঁর গায়ে লঙ্কাবাটা লাগানো হয়েছে জমাদারনীদের দিয়ে। অসহ্য জ্বালা সহ্য করলেও টুঁ শব্দটি বের করা যায়নি তাঁর মুখ থেকে। তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁকে সুপার জেলের পাঁচিলের বাইরের দিকের স্যাঁতসেঁতে আলোবাতাসহীন অন্ধকার আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে একাকি আটকে রেখেছেন দিনের পর দিন। প্রতিদিন সেই সেলে একলা আটকে রাখার সময় বাড়িয়েছেন অল্প অল্প করে। একদিন সেই বাতাসহীন সেলে ৪৫ মিনিট আটকে রাখার পর তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় বের করে আনা হল।

তারপরেও তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করা যায়নি। এরপরই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোলকাতায়, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

আলিপুর জেলে প্রতিদিনের মত সেদিনও তাঁকে জেরা করার জন্য সেল থেকে গোয়েন্দা অফিসে আনা হয়েছিল। সাহেব তাঁকে বারবার অনশন তুলে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, "অনশন তুলে নিতে পারি একটি শর্তে। আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীসারদা মা' র কাছে রেখে আসতে হবে।"

সাহেব বললেন চিঠিতে লিখে দিতে। কাগজ কলমও দেয়া হল। তিনি চিঠি লিখলেন। চিঠিটি হাতে নিয়েই মুচকি হেসে সাহেব চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে। অপমানের ফল মিলল হাতে হাতে, সাহেবের গালে পড়ল চড়।

এক সাধারণ নেটিভ বন্দিনীর এত স্পর্ধা! ফলে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের ধারা প্রয়োগ হল তাঁর বিরুদ্ধে, রাজবন্দি হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে চালান হলেন তিনি।

বাংলার প্রথম রাজবন্দি ননীবালা দেবী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালির এক সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। সেই সময়ের সামাজিক রীতি মেনে ১৮৯৯ সালে মাত্র এগার বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় ১৯০৪ সালে স্বামী মারা গেলেন তাঁর। বয়স তখন মাত্র ষোল।

সেকালের হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবাদের জীবন ছিল বিষণ্ণতায় মোড়া, বৃহৎ পরিবারের এক কোনায় জীবন্মৃতের মত বাঁচাই ছিল তাদের ভবিতব্য। নানা ব্রত, উপবাস আর কঠোর নিয়মনিষ্ঠার বেড়াজালের গণ্ডিতে আমরণ কাটাতে হত পরের গলগ্রহ হয়ে। হয় শ্বশুরবাড়িতে, সেখানে ঠাঁই না হলে বাপের বাড়িতে। বিনা মাইনেতে খেটে খেটে বাকি জীবনটা চলত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

ননীবালা সে'সব মেনে নেবার মত ধাতুতে তৈরি ছিলেন না। সমাজে প্রচলিত প্রথা মেনে জীবন কাটাতে রাজি হলেন না তিনি। স্বদেশীদের নানা খবর তিনি রাখতেন, সামান্য লেখাপড়াও জানতেন। জীবন্মৃতের মত বেঁচে থাকার বাইরেও যে জগৎ আছে তা তিনি জানতেন। অতএব শ্বশুরবাড়িতে তাঁর জায়গা হল না। ফিরে এলেন বাপের বাড়িতে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তখন যুবা- বৃদ্ধ সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যে যেভাবে পারছে সাহায্য করছে বিপ্লবীদের। দেশের ডাকে শহীদ হয়েছে কিশোর ক্ষুদিরাম। ননীবালা স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত হলেন। তাঁর ভাইপো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি ছিলেন নামকরা বিপ্লবী, চরমপন্থী যুগান্তর পার্টির নেতা। ভাইপো অমরেন্দ্র তাঁকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শুরু হল ননীবালার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির একজন নির্ভরযোগ্য সক্রিয় সহযোগী। দেশকে ভালোবেসে বিপ্লবীদের হয়ে তিনি নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতেন ও নিপুণ দক্ষতায় সে কাজ সম্পন্ন করতেন। অনেক কাছের মানুষও টের পেত না যে তিনি বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য। তিনি বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, এক জায়গার নেতাদের নির্দেশ ও নানা দরকারী খবর অন্য জায়গায় বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র

গোপনে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এমনকি জেলে বন্দী কর্মীদের সঙ্গে বাড়ির লোক সেজে দেখা করে খবর স্ংগ্রহ করতেন।

তখন থাকতেন রিষড়ায় একটি বাড়িতে। সেখানে অনেকদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের ভাইপো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জিকে। ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো অন্য বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন সে বাড়িতে, তাদের খাবার যোগাতেন। সারাদিন বিপ্লবীরা শুয়ে ঘুমিয়ে, আলাপ আলোচনা করে কাটিয়ে দিত নিশ্চিন্তে, অন্ধকার নামলেই তারা মানুষের চোখ এড়িয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজে বেরোত। তিনি সারাদিন তকলিতে সুতো কাটতেন, সুতো পৌঁছে দিতেন যারা পৈতে বানাতো তাদের কাছে- যা সাধারণ বাঙালি ঘরের আর পাঁচটা বাল্যবিধবা করুতেন সে'সময় জীবিকার জন্য। সাধারণ জীবন যাপন দেখে কেউ তাঁকে সন্দেহও করতে পারত না বিপ্লবী বলে।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে ১৯১৫ সালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভারত- জার্মান অস্ত্র ষড়যন্ত্রের ঘটনা। চারদিকে তুমুল ধরপাকড় শুরু হয়েছে। যুগান্তর পার্টির একজন প্রধান বিপ্লবী বাঘা যতীন 'কোপতিপোতায়' পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়ে বালাসোর হাসপাতালে মারা গেছেন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫তে। কলকাতাতে পুলিশি ধরপাকড়ের সময় অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি পালিয়ে গেছেন , ধরা পড়ে গেছেন রামচন্দ্র মজুমদার। তাঁর হাতে একটি মাউজার পিস্তল এসেছিল, কিন্তু তিনি সেটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কেউ জানতো না। বিপ্লবীদের দরকার ছিল সেটির, কিন্তু কীভাবে সন্ধান জানা যাবে?

অতএব জেলে ঢুকে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে পিস্তলের খোঁজ আনতে চললেন দুঃসাহসী ননীবালা। সেদিনের সমাজে যা কেউ কল্পনা করতেও পারত না তাই করলেন ননীবালা। বিধবা ননীবালা সধবার সাজে একগলা ঘোমটা দিয়ে রামচন্দ্রের স্ত্রী সেজে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন জেলে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিস্তলের সন্ধান জেনে বেড়িয়ে এলেন প্রেসিডেন্সি জেল থেকে। এরপর পুলিশের টিকটিকি মানে ইনফর্মার লাগলো তাঁর পিছনে। বাসাবদল করতে হল।

এবার থাকতে এলেন চন্দননগরের কাছে। বিপ্লবী ভোলানাথ চ্যাটার্জি বেনামে দুটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। সেখানে এনে রাখলেন তাঁর নিজের বড় পিসিমাকে আর ননীবালাকে। এই বাড়িগুলোতে অনেকদিন নিরাপদে থেকে গেছেন বিপ্লবী ভোলানাথ চ্যাটার্জি, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ দত্ত, নলিনীকান্ত কর, অতুল ঘোষ প্রমুখ বাঘা বাঘা বিপ্লবীরা যাঁদের নামে অনেক টাকার হুলিয়া জারি করেছিল পুলিশ। এঁদের কাছ থেকে খবর বা অস্ত্র সংগ্রহ করে বাইরের বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতেন আর বাইরে থেকে কিছু জোগাড় করতে হলে সেগুলি জোগাড় করে এনে এঁদের পৌঁছে দিতেন ননীবালা। এঁরা ছিলেন নিশাচরের মত। রাতেই এঁরা কাজে বেরোতেন। পুলিশের গন্ধ পেলেই বেবাক অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

এবার পুলিশের নজর পড়লো বাড়ির কর্ত্রীদের- বিশেষত ননীবালার ওপর। তাঁর সব কাজের খবরই পেল পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসার খবর পেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দুঃসাহসী ননীবালা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শুরু হল তাঁর খোঁজ। অবশেষে তাঁর খোঁজ মিলল পেশোয়ারে, গ্রেপ্তার হবার সময় তিনি কলেরায় আক্রান্ত ছিলেন। অসুস্থ শয্যাশায়ী ননীবালা গ্রেপ্তার হলেন। বেআইনি অস্ত্র রাখা, বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া এইসব অভিযোগে তাঁর জেল হল, রাখা হল এনে কাশী জেলে যে কথা আগেই লিখেছি।

১৯১৬ সালে ধরা পড়ার চার বছরের মাথায় ১৯১৯ সালে মুক্তি পেলেন। অসুস্থ, ভগ্নস্বাস্থ্য ননীবালা দেবীর তখন মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও ছিল না। কোনও পূর্বপরিচিতের অনুগ্রহে একটি কুঁড়ে ভাড়া পেলেন হুগলিতে। সুতো কেটে রান্নার কাজ করে কোনমতে আধপেটা খেয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকে। কেউ সে সময় তাঁর খবর নেয়নি।

অবশেষে মৃত্যু এসে তাঁকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায় অমরধামে, ১৯৬৭ সালে। কেউ মনে রাখেনি যাঁদের আত্মত্যাগের কথা তাঁদের দলেই ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী ননীবালা দেবী। তবে স্বদেশীদের নিয়ে তৈরি একটি বাংলা সিনেমায় তাঁকে নিয়ে একটি দৃশ্য ছিল, এইটুকুই। তাঁর কিছু মহিলা সহযোদ্ধাদের টুকরো টুকরো নানা লেখা থেকে যেটুকু জানা গেছে তাঁর বিষয়ে সেটুকু পুঁজি করেই তাঁকে এই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন। তোমরাও একটু স্মরণ কোরো তাঁকে স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যদিনে।

অটো চন্দ্রনের কাহিনী

উমা ভট্টাচার্য

'অটো চন্দ্রন' নামটা শুনেই একটু অদ্ভুত লাগছে না? ঠিক। আমারও লেগেছিল। এ আবার কেমন নাম? না, ভালো নাম তাঁর একটা আছে। সেটা হল এম চন্দ্রকুমার। তিনি এক নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বাড়ি থেকে পালানো ছেলে। স্কুলে দশম শ্রেণীর বেড়া টপকাতে না পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেও আজ তিনি একজন নামকরা ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা বইটির গল্প নিয়ে তামিল সিনেমা হয়েছে আর সেই সিনেমা ২০১৫ সালের ৭২তম আন্তর্জাতিক ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। গত মাসে তিনিও সামিল হয়েছিলেন ভেনিসে, সেই উৎসবের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম এম চন্দ্রকুমারের। সালটা ছিল ১৯৬২। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব একটা মনোযোগ ছিল না। তাঁদের একটি ছোট খামার ছিল, অর্থাভাবে বাবাকে সেটা বিক্রি করে দিতে হয়। এই পারিবারিক অবস্থায় ছেলে দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না। যথারীতি মা বাবার বকাঝকা। অভিমানী চন্দ্রন আগুপিছু না ভেবে কপর্দকহীন অবস্থায় বাড়ি ছাড়লেন।

উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের জীবন শুরু হল। পায়ে হেঁটে, কখনো বিনাটিকিটে ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, চেন্নাই, মাদুরাই, তুতিকোরিন প্রভৃতি নানা জায়গায়।

খাবার জোটাতে নানা কাজ করেছেন তখন। কখনো কোন দোকানে, কখনো কারও বাড়িতে। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতেন না। রাতে শোবার জায়গা হত কারো বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দা, ফুটপাথের ধার, বা বাসস্টপের প্রতীক্ষালয়ে যাত্রীদের বসার সিটগুলিতে।

একবার রওনা দিলেন হায়দ্রাবাদের দিকে। ট্রেনে উঠে পড়লেন। দুঃখ আর হতাশাময় ভবঘুরে জীবনে সেদিন প্রথম আনন্দ পেলেন। ট্রেন চলতে চলতে এসে দাঁড়াল বিজয়ওয়াড়া স্টেশনে। হঠাৎ নীচে তাকিয়ে দেখেন এক বিশাল নদী, তাঁর দেখা কৃষ্ণা নদীর মত উচ্ছ্বসিত জলরাশি নিয়ে কলকল্লোলে বয়ে চলেছে। সূর্যের আলো পড়ে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় জ্বলছে হাজার হাজার হিরে। সামলাতে পারলেন না নিজেকে। এক লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নেমেই ঝাঁপ দিলেন নদীতে। ছোটোবেলার মত আনন্দে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে এলেন অনেক দূরে। জায়গাটা অন্ধ্রের গুন্টুর। অনেক চেষ্টা করে সেখানে এক গাঁয়ের দিকে একটা ছোটো হোটেলে কাজ মিলে গেল। তাঁর বয়সী আরও কিছু ছেলে সেখানে কাজ করত।

বেশ ভালই চলল কিছুদিন। তারপর হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এল জীবনে। শহর থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরের গাঁয়ে পুলিশ হানা দিল এক অপরাধীর খোঁজে। চন্দ্রন সেই গাঁয়ে নতুন ছেলে। বাড়ির কোন ঠিকানা নেই। কয়েকজন সন্দেহভাজনের সঙ্গে তাঁকেও সন্দেহবশত ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। বয়স তখন তাঁর কুড়ি। শুরু হল লক-আপে এক বীভৎস জীবন। পুলিশের অত্যাচার কী নৃসংশ আর অমানবিক হতে পারে তা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করলেন ১৫ দিনের লক-আপ বাসে। বুঝলেন বিনা অপরাধেও মানুষের জীবনে এই অবিচারের খাঁড়া নেমে আসতে পারে।

বাড়ি থেকে পালানোর পর অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটানো কয়েকটা বছরে জীবনের কাছে শিখেছিলেন অনেক কিছু। সাহসী আর ব্যতিক্রমী চরিত্রের যুবক জীবনকে দেখতে শুরু করলেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ভাবতে শুরু করলেন সাধারণ মানুষদের কথা। যাদের অর্থবল নেই, ক্ষমতা নেই, সমাজে বিশেষ পরিচিতি নেই, যারা খেটে খাওয়া নিম্নবর্গের মানুষ, তারা সবাই এক দলে। তাদের একটাই পরিচয়-তারা সর্বহারা। শুধু নামেই মানুষ এরা, অন্যথায় এদের জীবন পশুরই তুল্য। এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছিল পাঁচমাসের কারাবাসের দিনগুলিতে। মার্চ মাসের দুঃসহ গরমের মধ্যে ১০x১০ মাপের খুপরির মত লকআপের ঘরে বেশ কয়েকজন অপরাধী বলে চিহ্নিত মানুষের সঙ্গে থাকতেন তিনিও। সেই স্বল্প পরিসরে কষ্টকর পরিবেশে অপরাধের সূত্রসন্ধানে প্রতিদিন পুলিশ যে শারীরিক নির্যাতন চালাত সে কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। ভাবলেন সব দেশেই কি পুলিশ লক-আপে একই ব্যাপার ঘটে, যা বাইরের মানুষ জানতেও পারে না? বুঝলেন কেন কিছু মানুষ নাচার হয়ে দাগী আসামীতে পরিণত হয়ে যায়।

এরপর শুরু হ'ল ৫ মাসের জেল জীবন। এখনও ওই লক-আপের দিনগুলি এক দুঃস্বপ্নের মত বেঁচে আছে তাঁর জীবনে, তাড়া করে বেড়ায় তাঁকে। সেই রক্তঝরা দিনগুলিতে ভোগ করা তিক্ত আর করুণ অভিজ্ঞতার ফসল হল তাঁর কলমে উঠে আসা

"লক-আপ"-নামে ১৬০ পাতার মর্মস্পর্শী উপন্যাস। জেলজীবনে শুনলেন কত নিরপরাধ মানুষের জেল হওয়ার কথা। কেউ বা খেতে না পাওয়া মানুষ, লোভে পড়ে পাশের বাড়ির মুরগীটিকে(যেটি তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল) কেটে একদিন মাংসভাত খেয়েছিল পেটপুরে। কেউ বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাগের মাথায় স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে, আর এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। আবার এক ভবঘুরে বন্দী সারাদিন গুনগুন করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তানালাপ করে যেত আপনমনে। সে নাকি এক নামকরা নকশাল নেতা। আবার একজন আদিবাসী বন্দী ছিল যে নাকি পরিবারের মুখে আহার তুলে দেবার কোনও উপায় না পেয়ে ওয়াগন ভেঙে খাদ্যশস্য চুরি করেছিল। এদের সঙ্গেই কাটিয়েছিলেন ৫ মাস।

জেলে থাকতে থাকতেই তাঁর জীবনদর্শন পালটে গেল। চিন্তাধারার গতিপথ বদলে গেল। ভাবতে শুরু করলেন সমাজের সম্বলহীন এইসব মানুষদের কথা।

একদিন যখন পুলিশ জানল তাঁকে ভুলবশত আটক করা হয়েছিল তখন তাঁকে ছেড়ে দিল। ঠিক করলেন সমাজের কাছে তুলে ধরতে হবে 'ইহাদের কথা', সমাজের বঞ্চনা আর অত্যাচারের শিকার এইসব মানুষের কথা, লক-আপে পশুর মত জীবন কাটানোর কথা আর পুলিশি নির্যাতনের নৃসংশতার কথা। ফিরে এলেন কোয়েম্বাটোরের বাড়িতে।

বাড়ি ফিরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে শুরু করলেন। জীবিকার জন্য অটো-রিকশা চালাতে শুরু করলেন। আর শুরু করলেন দিনলিপি লেখা আর ফেলে আসা দিনগুলির টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার কথা লেখা। এইসময় নানা পত্রপত্রিকা পড়ে জানলেন পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশি নির্যাতনের চিত্র একই। ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকার সময়ে বা যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকার সময়ই তিনি একটি খাতায় লিখতে লাগলেন নানা অভিজ্ঞতার বিবরণ। এক অটোচালক বন্ধুর পরামর্শে হাজত আর জেলবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৬ সালে লিখে ফেললেন মানুষের স্বাধিকারের অপমৃত্যুর দলিল 'লক-আপ'। আর সেই উপন্যাসের তামিল চলচ্চিত্র রূপ "ভিশরনাই", ভেনিসে চলচ্চিত্র উৎসবে পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। 'অ্যামেনেস্টি ইণ্টারন্যাশনাল ইটালিয়া'র পক্ষ থেকে জিতে নিল 'সিনেমা ফর হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড'।

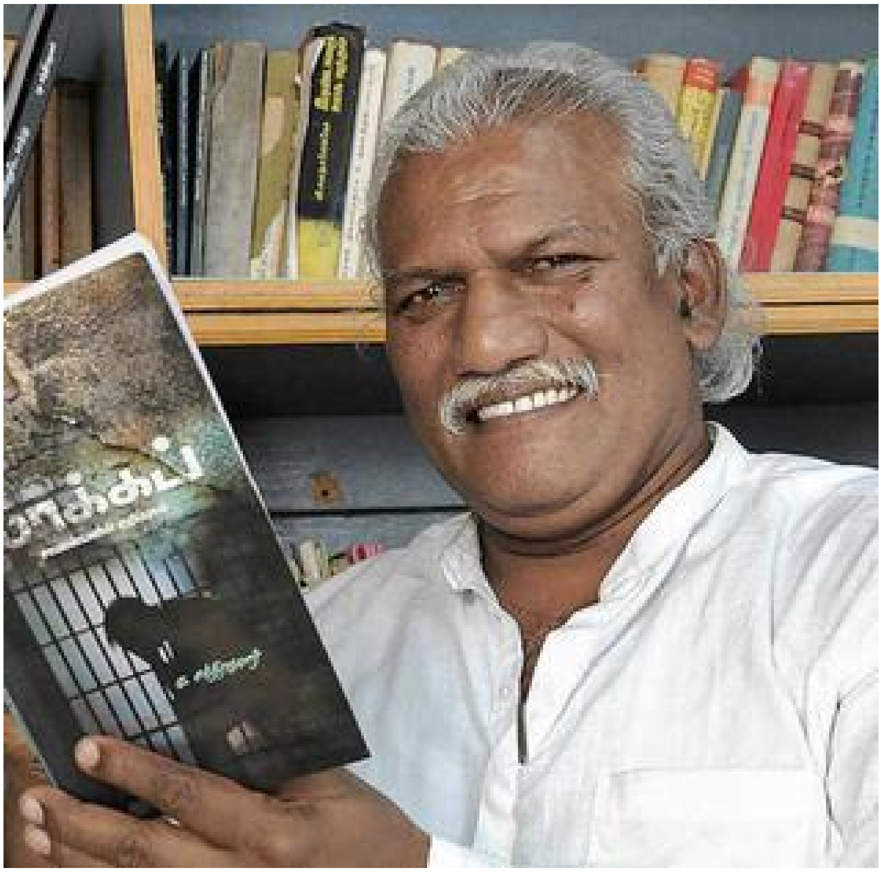

তামিলনাড়ুর এক বিচারক ভি আর কৃষ্ণআয়ার ছিলেন একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান। তাঁর হাত থেকে চন্দ্রকুমারের লেখা বইটি 'বেস্ট ডকুমেণ্ট অফ হিউম্যান রাইটস' পুরস্কার জিতে নিয়েছিল ২০০৬ সালেই। এর পর তামিল পরিচালক ভেট্রারামনের হাত ধরে সিনেমা হয়ে যায় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে।

চন্দ্রকুমার একটি উপন্যাসেই থেমে থাকেননি। সন্ত্রাসের ইতিহাস নিয়ে লেখা নানা প্রবন্ধের সঙ্কলন করে লিখেছেন, 'বুমিয়াই কোলাইকালাম'। বিখ্যাত জনদরদী কমিউনিস্ট নেতা জীবনানন্দনমকে নিয়ে লিখেছেন, 'কোভায়াইল জীভা'। প্রান্তিক জনজীবনের খেটে খাওয়া নারীদের নিয়ে লিখেছেন, 'আজহাগু থোডাট্টুমা'। তাঁর সব লেখাই সমাজের দলিত, নির্যাতিত মানুষের জীবনের ইতিহাস, যা তুলে ধরতে চাইছেন সভ্য সমাজের কাছে। বর্তমানে কাজ করছেন 'ইরিয়াম পাট্টাথাসারাই' নামে একটি প্রকল্প নিয়ে। সে বিষয়ে লেখাতে থাকছে তাঁর বাসস্থানের আশেপাশের দলিত মানুষদের প্রতি ঘটতে থাকা অবিচারের খতিয়ান।

এখন তাঁর জীবন এক সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা। সকালে উঠে যোগ-ব্যায়াম, হাঁটা, তারপর অটো নিয়ে জীবিকার সন্ধানে বেরোনো, দুপুরে বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়ার পর পত্রপত্রিকা পড়া ও বিশ্রাম। তারপর বিকেল ৩টে থেকে আবার রাত ৮টা পর্যন্ত অটো চালানো। তারপর অন্যান্যদের সঙ্গে নানা অসুবিধা, সমস্যা নিয়ে আলাপ- আলোচনা, কারও সমস্যা থাকলে তার সমাধানের চেষ্টা, কর্মীসংঠনের কাজকর্ম দেখা। তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়ার পর আবার লেখালেখি। তারপর বেশ রাতে ঘুমোতে যাওয়া। বেশি রাতে ঘুমোতে গেলেও ঘুম ভাঙতে কোনোদিন দেরি হয়না। এইভাবেই চলে চন্দ্রকুমারের এক একটি দিন।

বিচিত্র দেশ আমাদের ভারতের এক বিচিত্র, ব্যতিক্রমী মানুষ চন্দ্রকুমার। জীবনের প্রতিকুলতার কাছে হার না মানা এমন মানুষ, যিনি জীবনকে দেখেন সুন্দর, নিজেকে করে তুলতে পারেন আদর্শস্থানীয়, চেষ্টা করেন নিজের আশেপাশের মানুষদের জীবনকেও সুন্দর, আশাব্যঞ্জক করে তুলতে।

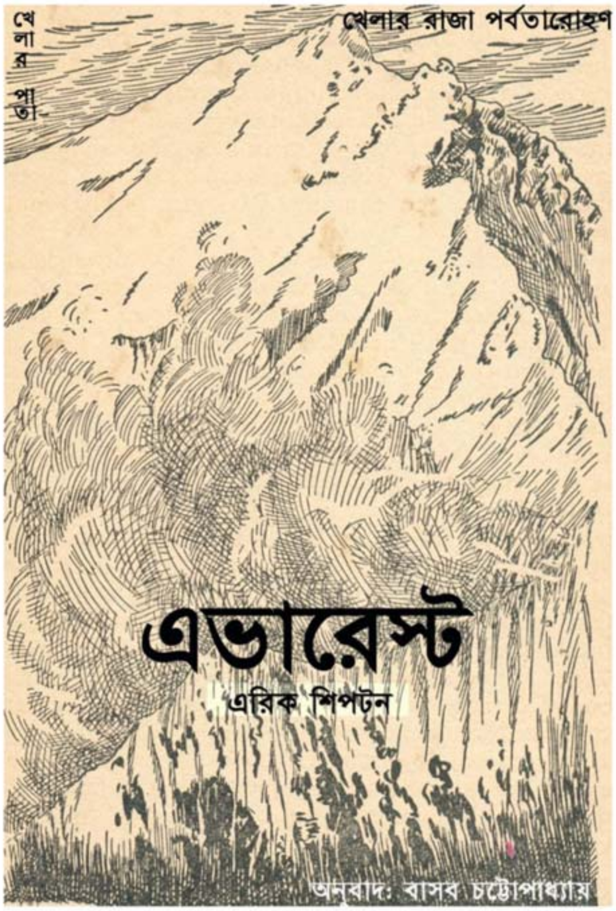

পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান

১৯৩৫ সাল, বসন্তকাল। এভারেস্ট কমিটির হাতে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গারোহণের পুনরায় অনুমতি এল। শুরু হল অভিযানের তোড়জোড় কিন্তু এভারেস্টের মতো এত বড়োমাপের অভিযান করার প্রস্তুতির পক্ষে সময় বড়ো কম, তা সত্ত্বেও অঞ্চলটি ভালো করে রেকি করে অর্থাৎ এলাকাটি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পর অভিযানে অগ্রসর হব মনস্থির করলাম। বিশেষত জানা প্রয়োজন বর্ষাকালে পর্বতে তুষার আচ্ছাদনের অবস্থা সম্পর্কে। দরকার পূর্বের অভিযানের জরিপ না হওয়া অঞ্চল সম্পর্কে সম্যক তথ্যাদি। অনুসন্ধান প্রয়োজন রংবুক হিমবাহের বেসিন থেকে C W M অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এভারেস্টের দক্ষিণ গাত্র বরাবর আরোহণ করতে এই বিকল্প পথেই অভিযান সম্ভব। আমরা নিশ্চিত উত্তর বরাবর এভারেস্ট আরোহণ নিরাপদ নয় কারণ উত্তর গাত্রের উপরের অংশের একটি ঝুলন্ত বরফের স্ল্যাব যেকোন সময় বিপদ ঘটাতে পারে।

মে মাস। দার্জিলিং থেকে এভারেস্টের উত্তর-পূর্ব দিকের সারি সারি পর্বতশ্রেণী দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে থাকলাম। সাথে চলল শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অন্বেষণ।

নদীর স্রোতের মতো সময় বয়ে চলতে চলতে ৬ই জুলাই রংবুক পৌঁছলাম। আরো তিনদিন পর সেখান থেকে সোজা চলে এলাম ৩ নং ক্যাম্পে।

মরিসের মৃতদেহ

৩ নং ক্যাম্প থেকে কিছুদূর এগিয়েই পড়ে থাকতে দেখলাম মরিস উইলসনের মৃতদেহ। গতবছর এই অভিযাত্রীই মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গ একক অভিযানের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। এর বেশি আমাদের কাছে এই অভিযাত্রী সম্পর্কে কোন তথ্যই ছিল না। তাঁর মৃতদেহের কাছেই আমরা খুঁজে পেলাম একটি ডায়েরি। সেই রোজনামচা পড়ে এবং আনুষঙ্গিক নানা প্রমাণ থেকে আশ্চর্যজনক সব তথ্য সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম ৩৭ বছর বয়সী এই পর্বতারোহী ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

লিপিবদ্ধ করেছিলেন আশ্চর্য সব তত্ত্বঃ তিন সপ্তাহ উপবাস করেও একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। পৌঁছতে পারে জীবন- মৃত্যুর সীমারেখার এক অর্ধচেতন স্তরে, যখন দৈহিক মন সরাসরি সংযোগ রক্ষা করে আত্মার সাথে। যখন মালিন্যহীন

রোগমুক্ত নবজাতকের শরীর- মন নিয়ে আবির্ভুত হয় পুণরায়, পূর্বাবস্থা অপেক্ষা তাঁর শারীরিক ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় আশ্চর্যজনক ভাবে। এই তত্ত্ব যেন উইলসনের কাছে ছিল উন্মাদের বিশ্বাস। বিশ্বাস করতেন স্বপ্নাদেশ পাওয়া সেই ধর্মোপদেশ যা মানবসভ্যতাকে এক অন্যস্তরে উত্তরণ ঘটায়। উইলসন যদি

একাকি এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ করতে সমর্থ হতেন, এই তত্ত্ব হয়তো মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশে বিদেশে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে মান্যতা পেত।

পর্বতারোহণ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু 'হাউসটন এভারেস্ট উড়ান অভিযান' প্রচার পেয়ে সংবাদের শীর্ষে চলে আসে। স্বীকার্য হিসেবে অদ্ভুত ধারণা উপস্থাপন করলেন – উড়তে উড়তে অনেক উচ্চতায় গিয়ে এরোপ্লেন যদি বিকল করে দেওয়া যায়, যদি দুর্ঘটনার ফলে তাঁরা পৌঁছে যান এভারেস্ট শৃঙ্গের খুব নিকটবর্তী কোন উচ্চতায়, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সহজে আরোহণ করতে পারেন শৃঙ্গের চূড়ায়। এই ধারণা মাথায় রেখে প্লেন চালানো শিখলেন উইলসন। ভারতবর্ষে

পৌঁছনোর জন্য কিনে ফেললেন ছোট্ট এরোপ্লেন। কিন্তু কায়রো এয়ারপোর্ট অথরিটির বাধা পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। অবশেষে পৌঁছলেন ভারতবর্ষের পুর্ণিয়া জেলায়। কিন্তু এরোপ্লেনটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হল। চলে গেলেন দার্জিলিং। চারমাস সেখানে থাকলেন। পর্বতারোহণের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হল। আবার প্রস্তুতি নিলেন এভারেস্ট অভিযানের। পরিচয় হল আমাদের পূর্বপরিচিত কিছু দক্ষ শেরপার সাথে। তারা তাঁকে গোপনে সিকিম এবং তিব্বতে পৌঁছে দেবে প্রতিশ্রুতি দিল। হোটেলে ছয়মাসের অগ্রিম ভাড়া দিলেন। তালাবন্ধ করে রাখলেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সবাই জানল বন্ধুদের আহ্বানে জঙ্গলে শিকারে গেছেন উইলসন। কয়েকমাস কেটে গেল। মুখে মুখে প্রচারিত হল পর্বতারোহী উইলসন নিরুদ্দিষ্ট।

এদিকে ছদ্মবেশে গভীর রাতে পদব্রজে সিকিম হয়ে তিব্বত পৌঁছলেন মরিস উইলসন। সঙ্গে কোনো তল্পিতল্পা না থাকায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁরা। বড় শহরকে এড়িয়ে চলায় তিনি এবং তাঁর তিন শেরপার প্রতি কৌতূহল ছিল না কোনো ব্যক্তির। এভাবেই পৌঁছে গেলেন রংবুক। রংবুক মনাস্ট্রিতে গিয়ে মঠকর্তার কাছে ১৯৩৩ সালের অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে পরিচয় দিলেন। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে ফিরে পেলেন ফেলে যাওয়া অভিযানের সাজসরঞ্জাম। মঠের সন্ন্যাসীর কাছে স্পষ্ট একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল উইলসনের। ১৯৩৫- এর এভারেস্টে অভিযানের সময় ঐ মনাস্ট্রিতে পৌঁছে আমরা তার প্রমাণও পেয়েছিলাম। রংবুকে শেরপাদের রেখে তিনি হিমবাহ ধরে রওনা হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন তিন থেকে চারদিনে শৃঙ্গ আরোহণ করবেন। দাড়ি কামানোর সরঞ্জামের মধ্যে তাঁর একটি ছোট্ট আয়না ছিল। ঠিক করলেন আয়নাটিকে হেলিওগ্রাফ (সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে সংকেত- বার্তা পাঠানোর যন্ত্র) হিসেবে ব্যবহার করে রংবুকের সহ অভিযাত্রীদের কাছে শৃঙ্গ থেকে আরোহণের প্রমাণ হিসেবে বার্তা পাঠাবেন। উপবাসের অভ্যাস তাঁর ছিল। জানতেন রাইস ওয়াটার অর্থাৎ ছাঙ খেয়ে দিনের পর দিন কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়। তখন এপ্রিলের শুরু- - বসন্তকাল। পূর্ব রংবুক হিমবাহে অপ্রত্যাশিত ঝোড়ো বাতাসের মুখোমুখি হলেন। চেষ্টা করতে থাকলেন ঝড়ের বেগ উপেক্ষা করে যত দ্রুত সম্ভব দ্বিতীয় শিবিরের নিরাপদ স্থানে যাতে পৌঁছনো যায়।

পনেরো দিন বিশ্রামের পর পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। যদিও এবারে শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় শিবির পৌঁছলেন এবং খুব কাছেই স্তূপীকৃত খাদ্যসামগ্রীর সন্ধান পেলেন তাঁরা। চকোলেট, ওভালটন, সাবডিনস, বেক্‌ড্‌ বিন্‌স এবং প্রচুর পরিমাণ বিস্কুট দেখে তখন তাঁরা উত্তেজিত।

তৃতীয় শিবিরে শেরপাদের রেখে আবার একাকি আরোহণ শুরু করলেন মরিস। সে বছর মরিসের আগেই সেই খাড়াই পথে আমরা ধাপ কেটে কেটে আরোহণ করি অবশ্যম্ভাবী ছিল সেই পথেই তাঁর পক্ষে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় অতিরিক্ত তুষারপাতে বরফের গায়ে নির্মিত সিঁড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাঁর সাথে ছিল আইসঅ্যাক্স। কিন্তু বরফকুঠারের সঠিক ব্যবহার জানতেন না মরিস। পাথুরে একটা জায়গায় শিবির স্থাপন করলেন তিনি। কল অতিক্রম করবার নিষ্ফল প্রয়াস চলতেই থাকল দিনের পর দিন। সঙ্গে প্রচুর খাবার থাকা সত্ত্বেও মানসিক অবসাদ এবং ক্লান্তিতে ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। রোজনামচায় পরিষ্কার এমন কিছু কথা লেখা ছিল যা সংক্ষেপে সামঞ্জস্যহীন- - - শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্ব পর্যন্ত স্বর্গীয় অনুপ্রেরণাকে আঁকড়ে ধরার তথাকথিত বিশ্বাস। তাঁর হাতে লেখা ডায়েরির

শেষ তারিখ ৩১ মে, ১৯৩৪। ছোট্ট তাঁবুতে চিরনিদ্রায় শায়িত মরিস উইলসন। ঝড়ে বিধ্বস্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া তাঁবুর ভাঙা অংশ বড় পাথরে কোন রকমে সংলগ্ন।

শেরপাদের কাছ থেকে জানা গেল তৃতীয় শিবিরে তাঁরা মাসখানেক মরিসের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

১৯৩৫-এ আমাদের সাথে ঐ শিবিরে যে দুজন শেরপা ছিল তাদের একজন ছিল জরিপের দলের সঙ্গে এবং অন্যজনকে ঐ দিন দ্বিতীয় শিবির পাঠানো হয়েছিল আরো কিছু শেরপা আনার জন্য। যাদের সাহায্যে আমরা মরিসের দেহ বরফের চোরা ফাটলে সমাধিস্থ করলাম।

আমরা ধরেই নিলাম বর্ষায় এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা অর্থহীন। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কারণ আমাদের বিশ্বাসের পাল্লা ভারী করছিল।

১৯৩৩-এর পূর্বে বর্ষা শুরু হওয়ার ঠিক কয়েকসপ্তাহ আগের আকর্ষণীয় মরসুমের প্রতি বেজায় ভরসা ছিল পর্বতারোহীদের। ফলে অভিযানে অকারণ বাড়তি নানা সম্ভাবনার চিন্তা মাথায় থাকত না তাঁদের। কিন্তু সেই বিশ্বাসের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল ১৯৩৩-এর অভিজ্ঞতা। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন বিলম্ব-বসন্তের চেয়ে বর্ষাকালে এভারেস্ট অভিযানে অগ্রগতির পক্ষে নিরাপদ এবং আরোহণের সফলতার সম্ভাবনাও বেশি। এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল ১৯২৯ এবং ১৯৩১-এ যথাক্রমে কারাকোরাম এবং জার্মান অভিযাত্রীদের কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের ভিত্তিতে। ১৯৩৫-এ অনেক কাজের মধ্যে আমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পূর্বোক্ত অভিযান সম্পর্কে সত্যান্বেষণ।

শুধু দুরকম পরিস্থিতির কথা আমাকে ভাবাত। নর্থকলের নীচের ঢাল থেকে

তুষারধ্বস নামার সম্ভাবনা এবং পর্বতের উপরের অংশের তুষার-অবস্থা। এ বিষয়ের সপক্ষে অনেক বছর আগের বিচ্ছিন্ন ঘটনার উদাহরণ কিছু আমার ছিল। যদিও সাম্প্রতিক কালে ঐ অঞ্চলের সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই। ১৯২২ সালের জুন মাসে দলটি নর্থকলে পৌঁছনোর সময় ভয়ঙ্কর তুষারধ্বসকে পাশ কাটিয়ে কোনো রকমে রক্ষা পেল। ১৯৩৩-এর জুন মাসে ক্রফোর্ড (Crawford) এবং ব্রকলব্যাঙ্ক (Brocklebank) নর্থকলের বিপজ্জনক ঢালের কথা জানালেন। (ক্রফোর্ড যদিও ১৯২২-এ তুষারধ্বসের সম্মুখে পড়া সেই অভিযাত্রী দলেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।) অন্যদিকে ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর মাসের অভিযানে তাঁরা নিরাপদেই নর্থকলে আরোহণ করেছিলেন কিন্তু পর্বতারোহী হিসেবে ম্যালরির দক্ষতার প্রতি পূর্ণ সম্মান

দিয়েই বলা যায় – সঠিক সিদ্ধান্তে থেকেও বেশি দরকারি হল অনুকূল পরিস্থিতি, যাকে আমরা সৌভাগ্য বলি। সঠিক প্রাকৃতিক জগৎ ও নিয়মসমূহ সম্পর্কিত অধ্যয়ণের মাধ্যমে আল্পসের আবহাওয়া, তুষারচরিত্র সম্পর্কে আমরা বিবিধ তথ্য জানতে পারি। কিন্তু তুলনায় হিমালয় সম্পর্কে আমরা এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে।

আমাদের বিশ্বাস পুরো জুন মাস জুড়েই এই ভয়ঙ্কর অবস্থা চলতে থাকে নর্থকলে। পশ্চিমদিক থেকে প্রবাহিত ঝোড়ো হাওয়ার সাথে চলতে থাকে তুষারপাত। তাপমাত্রা উত্তরোত্তর কমতে থাকায় পূর্বদিকের ঢালে অতিরিক্ত তুষারের আস্তরণে নির্মিত হয় কঠিন বরফের স্ল্যাব। পর্বতারোহণের পরিভাষায় কথিত এই 'উইন্ড স্ল্যাব' সর্বাপেক্ষা মারাত্মক তুষার বাধা। ফলে গ্রীষ্মকালের পর যে এই পথ ব্যবহারযোগ্য থাকে না, এই অনুসন্ধানের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে অসুবিধা হয় না পর্বতারোহীদের।

১৯৩৫-এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি যখন পৌঁছলাম, নর্থকলের পাদদেশের বিপজ্জনক ঢাল পরীক্ষা করলাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। দলের অন্যতম সদস্য কেম্পসনের আল্পসে শীতকালীন পর্বতারোহণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। হিমালয়ের তুষার চরিত্র বুঝতে কেম্পসনের অভিজ্ঞতা সামান্য হলেও অগ্রসর হতে সাহায্য করল। ঢাল অতিক্রম করার সময় কোনো সন্দেহজনক বিপদসংকুলতার চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। দশজন শেরপাকে নিয়ে কলের শীর্ষে পৌঁছোতে তিন দিন কেটে গেল।আবার শিবির স্থাপন করলাম। উইলসনের মৃতদেহ দেখে শেরপারা ভীত হয়ে পড়ল। তাদের বিশ্বাস এই মৃতদেহ কোনো অশুভ বার্তা বয়ে আনার পূর্বলক্ষণ। কলের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে পথের মাঝখানে হঠাৎ-ই তারা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করল। সেই রাতে শিবির স্থাপনের পর খুব আন্তরিকভাবে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হল।

আমাদের মধ্যে তিনজন ওয়ারেন, কেম্পসন ও আমি এবং আটজন শেরপা ষোলো দিন থাকতে পারার মত পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত করে নর্থকলে শিবির স্থাপন করলাম। সংকল্প করলাম অন্ততঃ ২৭০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত আমরা আরোহণ করব। মানসিক দিক দিয়ে আমরা এমনই অবস্থায় ছিলাম যে অনায়াসে শৃঙ্গ আরোহণ করতে পারি। বিচ্ছিন্নভাবে নগ্ন পাথুরে কিছু অংশ ছাড়া পুরো নর্থকল তখন পুরু বরফে আচ্ছাদিত। সূর্যের কম তাপমাত্রা এবং রাতের অতিরিক্ত শীতলতার যৌথ প্রতিক্রিয়ায় আরোহণের পক্ষে অনুকূল তুষারাচ্ছাদিত পথ তৈরি হয়। অভিযানের ফেলে আসা পনেরো দিনের আবহাওয়া শুধু সুন্দরই ছিল না, ২৬০০০ ফুট পর্যন্ত অতর্কিতে বরফ গলার সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। কিন্তু এই উচ্চতা থেকেই অতিরিক্ত বায়ুচাপে গুঁড়ো তুষারের মাত্রা বাড়তে থাকে। সামান্য তুষারাচ্ছাদিত আপার স্ল্যাব আরোহণ যে কত

কঠিন ১৯৩৩-এর অভিযানে হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছিলাম আমরা। আট থেকে দশ ফুট পুরু এই তুষারাচ্ছন্ন পথে প্রায় অনতিক্রম্য বাধা তৈরি হয়। তুষার আচ্ছাদনের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এই কারণেই অন্যান্য ঋতুর তুলনায় বর্ষাকালই আরোহণের অনুকূল পরিবেশ।

ক্রমশ

অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ
অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবারে ষষ্ঠ পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ আকাশ থেকে অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জ, দক্ষিণদিক থেকে দেখা
ফোটোঃ সের্গেই অ্যাশমেরিন

১০ই মে ভোরবেলা আমি, রেবুফত, ফুথারকে আর পানসি পূর্ব তিলিচো পাসের ক্যাম্প ছেড়ে মানাংভোটের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম। ওদিকে, আমরা রওনা হয়ে যাবার পর, বেলা ন'টা নাগাদ আংথারকে- কে সঙ্গে নিয়ে আইজ্যাকও বেরোল। ওদের লক্ষ্য ছিল ক্যাম্পের উত্তরপূর্বে মুক্তিনাথ হিমালয়ের ওপর কোনও উঁচু জায়গা, যেখান থেকে দক্ষিণের বিশাল তুষারপ্রাচীরটা ভালোভাবে দেখা যাবে। মোটামুটি ১৮,০০০ ফিট উচ্চতায় একটা সুবিধেজনক জায়গায় পৌঁছে আইজ্যাক কম্পাস আর সেক্সট্যান্ট বার করে প্রচুর মাপজোক নিল, অনেক ছবি তুলল। আর আইজ্যাক যখন এসব নিয়ে ব্যস্ত, আংথারকে পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে আট ফিট উঁচু একটা স্মারক স্তূপ বা কেয়ার্ন (cairn) বানিয়ে ফেলল। একটু পরেই ভোরবেলার মেঘেরা ফের ফিরে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল; ওরাও তাই বাধ্য হয়ে ক্যাম্পে ফেরার রাস্তা ধরল।

তাঁবুর ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে আইজ্যাক তার মাপজোক সমস্ত ম্যাপে ফেলল, "হুমমম... এইবারে বোঝা গেছে!! অবশেষে ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হচ্ছে!"

আইজ্যাকের পর্যবেক্ষণের ফলে যা প্রমাণ হয় তা হল, আমাদের ক্যাম্পের দক্ষিণদিক বরাবর বিস্তৃত যে দানবীয় তুষারপ্রাচীরের কথা এতবার বলছি, সেটাই আসলে অন্নপূর্ণা হিমাল বা অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জ (massif)। সেই সুদর্শন ত্রিকোণ শৃঙ্গটি, যার নাম গঙ্গাপূর্ণা, তার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা ঐ শৃঙ্গটি থেকেই বিভিন্ন দিকে আরও কতগুলি পর্বতশ্রেণী ছড়িয়ে পড়েছে যাদের একটিতে আছে অন্নপূর্ণা। তার মানে দাঁড়ায় একটাই – আমাদের পূর্ব তিলিচো পাসের ক্যাম্প থেকে দেখলে অন্নপূর্ণা ওই প্রকাণ্ড তুষারপ্রাচীরের পেছনেই কোথাও হবে।

অর্থাৎ রেবুফত আর আমি সোনার হরিণের পেছনে ছুটে মরছি। ইসস... আগে যদি জানতাম! অবশ্য ভৌগোলিক অনুসন্ধান ব্যাপারটাই এরকম; অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ভুলচুক, প্রচুর এলোপাথাড়ি খোঁজ... আর তারপর হঠাৎ একদিন তোমার সামনে উন্মোচিত হবে সত্য... এক আবিষ্কার!

পাসের ওপর ক্যাম্পে রাত নামল, স্তব্ধ হিমশীতল রাত। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার। সুযোগ পেয়ে আইজ্যাক ফের মাপজোক করতে লেগে পড়ল। পূবদিকে মানাংভোট উপত্যকার ওপারে বিরাট বিরাট কতগুলি শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল, তাদের সবার মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কু আকৃতির মানাসলু, নেপালের আরেক আট- হাজারি শৃঙ্গ।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশ মেঘলা হয়ে এল, জোর বাতাস বইতে লাগল। ক্যাম্পের সবাই তাঁবুর ভেতরেই সেঁধিয়ে রইল, আর মাঝে মাঝে দূরবীন চোখে মানাংভোটের রাস্তার দিকে দেখতে লাগল আমরা ফিরছি কিনা। তিনটে নাগাদ ফুথারকে এসে পৌঁছল, আর আইজ্যাককে আমার চিঠিটা দিল। আইজ্যাক জানত ও চিঠিতে নতুন কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই। এখান থেকে ওই তুষারপ্রাচীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই। বরং উল্টোদিকে মুক্তিনাথ হিমালয় বরাবর যতটা সম্ভব ওপরে উঠে দেখা যেতে পারে ওই তুষারপ্রাচীরের মাথার ওপর দিয়ে অন্নপূর্ণার দেখা পাওয়া যায় কিনা। আগের দিন আইজ্যাকরা যে অবধি গেছিল, সেখান থেকে ও একটা অসাধারণ হিমবাহ দেখেছে, তার ওপর একটা সুন্দর শৃঙ্গ, বিশ হাজার ফিটের ওপর উঁচু। আইজ্যাক ঠিক করল সেটায় চড়ে দেখবে।

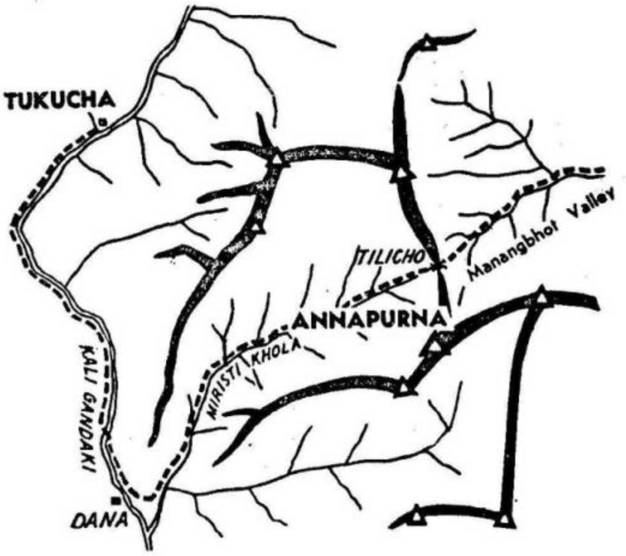

অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীঃ ভারতীয় সার্ভে বিভাগের ম্যাপে যেরকম দেখানো ছিল (তিলিচো পাসের ভুল অবস্থান লক্ষণীয়)

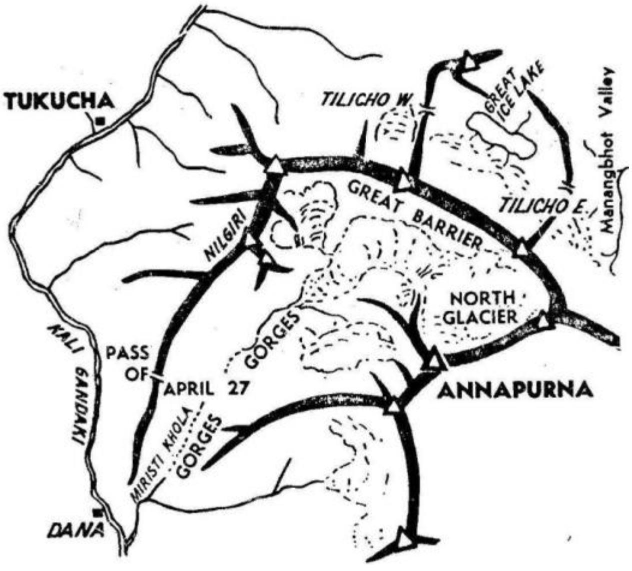

অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীঃ
বিন্যাসটি আসলে যেরকম

১২ই মে সকালে আবহাওয়া দেখা গেল চমৎকার। আইজ্যাক আর আংথারকে ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়ল। সকাল সাতটায় ওরা আগের দিন আংথারকের তৈরি সেই স্মারক স্তূপের কাছে পৌঁছে গেল; সাড়ে আটটায় পা রাখল হিমবাহের ওপর। হিমবাহটা খুব চড়াই নয়, তবে নতুন পড়া আলগা তুষারের আস্তরণে হিমবাহের শক্ত বরফ ঢেকে আছে, তাই খুব তাড়াতাড়ি চলা সম্ভব হচ্ছিল না। ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়িয়ে ওরা উপস্থিত হল ক্রিভাস বা ফাটলে ভর্তি হিমবাহের একটা অংশে। ওদিকে আকাশ ফের মেঘে মেঘে ছেয়ে আসছে।

আইজ্যাকদের উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব কম সময়ে যতটা পারা যায় ওপরে ওঠা, যাতে অন্নপূর্ণার দেখা মেলে। কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় পা বাড়াবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আইস অ্যাক্স দিয়ে বরফের ওপর ধাপ কেটে কেটে ওরা উঠতে শুরু করল। ভাগ্য ভাল যে কঠিন অংশটা খুব লম্বা ছিল না। একটু পরেই ওরা হিমবাহের ওপরের ঢালে পৌঁছে গেল আর ঘন কুয়াশার মধ্যে পা রাখল শৃঙ্গটির চূড়ায়।

কিন্তু হায়! অন্নপূর্ণা কোথায়? কুয়াশার জন্য দু'হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না যে! নিজে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই নিয়েই আইজ্যাকের মনে সন্দেহ দেখা দিল। আবহাওয়ার উন্নতির জন্য বৃথাই ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়ে বারোটা বাজল। অল্টিমিটারে উচ্চতা দেখাচ্ছে ২০,৩০০ ফিট। দমে অবশ্য ওদের খুব একটা টান পড়েনি, যা থেকে বোঝা যায় উচ্চতার সঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে বেশ ভালোই মানিয়ে নিচ্ছি। আইজ্যাকের জয় করা এই শৃঙ্গটিই এখন অবধি এই অভিযানের পক্ষ থেকে পৌঁছনো সর্বোচ্চ বিন্দু। আর এই প্রথম আমরা ২০,০০০ ফিটের চেয়ে উঁচু কোনও শৃঙ্গ জয় করলাম।

আবহাওয়ার কোনও উন্নতি হল না দেখে সওয়া তিনটে নাগাদ ওরা নামতে শুরু করল। তুষারপাত সত্ত্বেও যে পথে ওরা উঠেছিল তা আবছা দেখা যাচ্ছিল, নামতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। সাড়ে চারটে নাগাদ ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা, আর পৌঁছে দেখল অভিযানের নেতা কিনা দিনদুপুরে তাঁবুর ভেতর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু কী হয়েছে তার?

এদিকে মানাংভোটে, ১১ই মে ভোরবেলা, খুব কষ্টেসৃষ্টে আমাদের চোখ খুলল। সামান্য কিছু জলখাবার খেয়ে, সংগৃহীত রেশন আর আমার চিঠি নিয়ে, ফুথারকে তিলিচো পাসের ক্যাম্পের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। রেবুফত, পানসি আর আমিও একটু পরেই বেরোলাম; মার্সিয়ান্দি খোলার উপত্যকা ধরে নিচের দিকে এগিয়ে চললাম, যদি অন্নপূর্ণার কোনও খোঁজ পাই। আমাদের সামনে, অনেক দূরে, মানাসলু শৃঙ্গের চূড়া দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গাপূর্ণা থেকে এদিকে নেমে আসা পর্বতশ্রেণীটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই চিন্দি অবধি গিয়ে গিরিশিরাটিকে বেড় দিয়ে ঘুরে ওর পেছনে কী আছে দেখা। তবে সন্ধ্যের মধ্যেই মানাংভোটে ফিরে আসতে হবে সেটাও খেয়াল ছিল।

দুপুরবেলা চিন্দি পৌঁছে গেলাম। সেখানে চৌন্দিকিউ নদী এসে মিশেছে মার্সিয়ান্দি খোলায়। চৌন্দিকিউ- এর উজানে চেয়ে দেখলাম সেদিকে উপত্যকা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এক গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। বুঝলাম ওদিকে এগিয়ে আর কোনও লাভ নেই। নিশ্চিত হলাম যে অন্নপূর্ণা আর যেখানেই থাক, এদিকে নয়। চিন্দির অধিবাসী বা শিকারি, যাদেরই জিজ্ঞেস করলাম, কেউই অন্নপূর্ণার কথা জানে না। মহা উৎসাহে তারা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যে 'অন্নপূর্ণা' মানে হল শস্যের দেবী... ইত্যাদি ইত্যাদি। মানাংভোটে ফিরে আসা ছাড়া কোনও গতি ছিল না। সেটাও ফিরতে হল খালিপেটে, কেননা আমাদের সঙ্গে খাবারদাবার কিছু ছিল না।

চোঙ্গোর আর সেপচিয়া শৃঙ্গের মাথায় মেঘ জমতে শুরু করল। আমাদের ছবি তুলতে দেবে না! অথচ তথ্যপ্রমাণ হিসেবে ছবি তুলে রাখাটা জরুরি। ভাবলাম, মেঘেদের কিছুটা সময় দেওয়া যাক। একটু বিশ্রাম নিই, যদি মেঘ কেটে যায়। সবাই যে যার মত আরামদায়ক কোণ খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। রেবুফত তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। পানসি আরাম করে বসে তার শেষ সিগারেটটা ধরাল। আমি পাহারাদারের মত ঠায় বসে রইলাম, মেঘ কেটে গেলেই সবাইকে ডেকে তুলব।

অবশেষে, কিছুক্ষণ পরে চোঙ্গোর আর সেপচিয়া মেঘের ভেতর থেকে উঁকি দিল। রেবুফতের ছবি তোলা সারা হলে আমরা আবার মানাংভোট ফেরার রাস্তা ধরলাম। গরমের জন্য চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পথে, যখনই কারও সঙ্গে দেখা হল, কিছু রসদ অর্থাৎ সাম্পা ইত্যাদি পাওয়া যাবে কিনা জিগ্যেস করল পানসি। কিন্তু সবার মুখেই শুধু না আর না। যখন আমাদের আস্তানা সেই গুদামঘরে ফিরলাম, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে।

"তাহলে? আমরা খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছি শেষ অবধি?" রেবুফত হতাশভাবে বলল।

"এটুকু অন্তত জানা গেল যে অন্নপূর্ণা এদিকে নয়।"

"হুমমম... তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

"খাবারদাবার সামান্যই আছে। যেটুকু আছে নিয়ে নাও, তারপর পানসির সঙ্গে থোরাং পাস পেরিয়ে মুক্তিনাথ হয়ে তুকুচা ফিরে যাও। ও পথে গেলে তিলিচো পাসে ওঠার চড়াইটা ভাঙতে হবে না; তাছাড়া একদিন আগে তুকুচা পৌঁছে যাবে। খালিপেটে পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে; টাকাপয়সা যা আছে তাই দিয়ে মুক্তিনাথ থেকে ঘোড়া ভাড়া করে নিও।"

"আর তুমি?"

"আমার জন্য চিন্তা কোর না। এই একটা চকোলেটের বার নিলাম, এই জ্বালানির সাহায্যে আমি তিলিচো পাসের ক্যাম্পে পৌঁছে যাব।"

"কিন্তু সে তো অনেক লম্বা রাস্তা!"

"চিন্তা নেই। কাল সকালে ঐ ক্যাম্পে পৌঁছে যাব আমি। কাল আইজ্যাকের সঙ্গে ওই বিশাল তুষারপ্রাচীরটার দিকে এগিয়ে দেখার ইচ্ছে আছে।"

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আমরা আলাদা আলাদা রাস্তায় রওনা দিলাম।

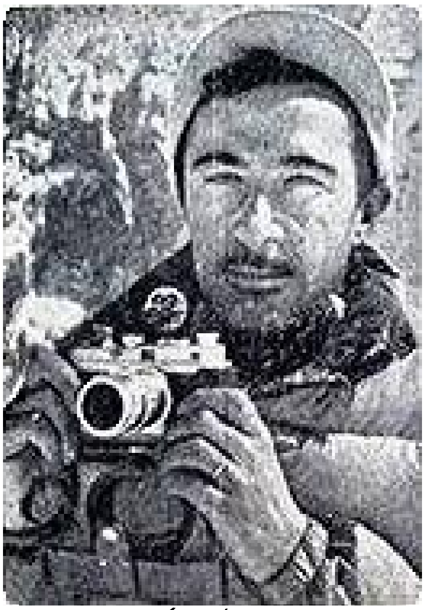

মার্সেল আইজ্যাক

গাসটন রেবুফত

আং থারকে

ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

এবারে রাস্তায় আমি একা। খাবার বলতে শুধু একটা চকোলেটের বার। ন'হাজার ফিট উচ্চতা থেকে উঠতে হবে ষোল হাজার ফিটেরও ওপরে। খুব হিসেব করে চলতে হবে। আমার পরিকল্পনা ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগোনোর। যেখানে সম্ভব সেখানে দৌড়ব। যতক্ষণ না আর এক পাও এগোনো অসম্ভব হয় ততক্ষণ থামব না।

এক ঘন্টা বাদে খাংসার পৌঁছলাম। এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে মার্সিয়ান্দি খোলার উপত্যকা ধরে উজানে এগিয়ে চললাম। পায়ে চলা রাস্তার চিহ্ন ক্রমশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে গিয়ে সরু হতে হতে হারিয়ে গেল। নদীখাত ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে এল। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। শক্ত মাটিতে ফুথারকে যেখানে ধাপ কেটেছিল সে জায়গাটা পেয়ে গেলাম। তারপর পড়ল নুড়িপাথরের ঢালগুলি। উঁচুনিচু ঢালগুলো পেরিয়ে অবশেষে এসে হাজির হলাম সেই জায়গাটায় যেখানে নদী পেরিয়েছিলাম।

নদীটা ফের পেরোতে হবে। এবার আর লম্ফঝম্পের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জুতো দুটো খুলে ঘাড়ের দু'পাশে ঝুলিয়ে নিলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। এই সময়ে নদীর বরফঠাণ্ডা জলে পড়ে গেলে ব্যাপারটা খুব সুবিধের হবে না। বেশ সাবধানে নামলাম নদীতে, জলের নিচের প্রতিটা পাথর পরখ

করে করে পা ফেলতে লাগলাম। প্রচণ্ড স্রোত জলে। হঠাৎ পিছলে গেলাম। সামলাতে গিয়ে আরও গভীর জলে গিয়ে পড়লাম। অনেক কসরত করে শেষমেশ ওপারে গিয়ে উঠতে পারলাম। একেবারে কাকভেজা হয়ে গেছি ততক্ষণে। জামাকাপড় নিংড়ে নিয়ে জুতোদুটো উপুড় করে ঘটির মতো ভেতর থেকে জল ফেললাম। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ফের ওই ভেজা জামাকাপড়ই পরতে হল। দাঁতে দাঁতে লেগে ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে তখন। তিলিচো ক্যাম্প এখান থেকে আরও চারঘন্টার পথ, অথচ খুব বেশি হলে আর মাত্র এক ঘন্টা দিনের আলো থাকবে। ভাবনাচিন্তার বেশি সময় ছিল না। সময় নষ্ট না করে ফের চড়াই ভাঙা শুরু করলাম। একটা শক্ত মাটির খাড়াই ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে দু'তিনবার পিছলে যেতে যেতে বাঁচলাম।

এই সময় নদীখাত থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল যা একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে গেছে। সামনে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আর এগোনো সম্ভব নয় বুঝে একটা সুবিধেজনক ঘাসে ঢাকা জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম যেখানে রাতটা কাটানো যায়। শেষে একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। উইন্ডচিটারটা দিয়ে পুরো শরীরটা ঢেকে নিয়ে বসলাম। পা দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাঁটুতে হাঁটুতে লেগে খটাখট আওয়াজ হচ্ছে। উইন্ডচিটারের হুডটা মাথার ওপর ভালো করে টেনে দিয়ে আমি গভীরভাবে ভাবতে বসলাম, চকোলেটের বারটা এখনই খেয়ে নেব, না কাল সকালে? শেষে খেয়েই নিলাম। আর তারপর আমার শেষ সিগারেটটা ধরালাম।

জায়গাটার উচ্চতা প্রায় ১৪,০০০ ফিট হবে। ভাবতে অদ্ভুত লাগছিল, এই বিশাল হিমালয় পর্বতের এক অজানা জায়গায়, অচেনা এক নদীর ধারে, এই অন্ধকার রাত্রে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, একা... সম্পূর্ণ একা আমি একটা ঝোপের মধ্যে বসে আছি। জামাকাপড়ের একটা সুতোও শুকনো নেই, সব ভেজা। অসম্ভব পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত; সঙ্গে কোনও খাবার নেই। আরও দু'হাজার ফিট চড়াই ভাঙতে হবে। পারব তো? একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া জামাকাপড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে আবার আমায় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল তুষারপাত। আমি চোখ বুজলাম, শরীরের মাংশপেশিগুলিকে শিথিল করে দিলাম; তারপর মনটাকে শান্ত, সমাহিত করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। নিচে প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে মার্সিয়ান্দি খোলা। তার আওয়াজে যেন মাটি কাঁপছে। সেই ভয়াল গর্জন সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একেই পুরো শরীর ভেজা, তার ওপর নদীখাত থেকে উঠে আসা স্যাঁতসেঁতে জলীয় বাষ্পে আরও ঠাণ্ডা লাগছে। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে হুডের নিচ থেকে মাথা বার করে চারদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম, আবহাওয়ার কোনও উন্নতি হচ্ছে কিনা। কোনও পরিবর্তন নেই। এরপর যদি কুয়াশা নেমে আসে তাহলে আর রাস্তাই চিনতে পারব না।

প্রায় অসাড় ও আধঘুমন্ত অবস্থায় একসময় অনুভব করলাম দিনের আলো ফুটছে। মনটা খুশি হয়ে উঠল। যাক, রাতটা তাহলে কাটিয়ে দিতে পেরেছি! চারদিক আরও কিছুটা পরিষ্কার না হলে এগোনো যাবে না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই শেষের মুহূর্তগুলো যেন বিশেষ করে দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। তর সইছিল না আর। উইন্ডচিটারটা পরে নিয়ে ফের এগোতে শুরু করলাম। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভাবলাম চড়াই ভাঙতে শুরু করলে ঠাণ্ডাটা কেটে যাবে, শরীর গরম হয়ে উঠবে। আবহাওয়ার সামান্য উন্নতি হয়েছে। তাও একটু পরপরই রাস্তা খুঁজে বার করার জন্য থামতে হচ্ছিল। দুর্বল হাঁটুদুটো কাঁপছিল আমার, এক পাও এগোতে চাইছিল না আর। তাও জোর করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। পেছনদিকে দেখতে পেলাম মানাংভোট সকালের সোনালি রোদে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু আমার এখানে এখনও রোদ এসে পৌঁছয়নি।

প্রতিবার বিশ্রামের সময় আমি কিছুদূরে একটা সুবিধেজনক বোল্ডার আগে থাকতে বেছে রাখছিলাম যার ওপর পরের বার বসব। ধীরে ধীরে সামনের পাথরগুলির দূরত্ব কমতে লাগল, অর্থাৎ

ঘন ঘন থামার দরকার হচ্ছিল, আর বিশ্রামের সময়ও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকল। মনে সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল, সত্যিই ক্যাম্পে পৌঁছতে পারব তো? কোনও রকমে শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে সামনের ঠিক করে রাখা পাথরটা অবধি নিয়ে গিয়ে পুরো শরীর ছেড়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ছিলাম। আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল শরীরটা একটু ভালো লাগছে, একটু যেন দম পাচ্ছি ফের। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর মনে হচ্ছিল, আর তো মাত্র একটু রাস্তা বাকি, এভাবে হাল ছেড়ে বসে থাকব? হেরে যাব আমি? তাই কখনও হতে পারে? আবার একটু দূরে একটা পাথর বেছে নিয়ে শরীরটা টেনে তুলে এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাওয়া। মনে হচ্ছিল বেশ তাড়াতাড়িই এগোচ্ছি যেন, আসলে এগোচ্ছিলাম কিন্তু শামুকের গতিতে। পরের পাথরটায় পৌঁছনোমাত্র ফের ধপাস করে বসে পড়ছিলাম। এক গজ দু'গজ করে উচ্চতা বাড়ছিল। শেষে এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম, যেখান থেকে ক্যাম্পটা দেখা যায় না বটে, কিন্তু জানি যে সেটা আর মাত্র দু'শো গজ দূরে।

চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজই বেরোল না। হাঁটুদুটো এত কাঁপছিল যে হেঁটে চড়াই ভাঙা তো দূরের কথা, স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ল। তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলাম। দেখলাম চার হাত- পায়ের সাহায্যে এগোনোটা তুলনায় সহজ আর নিরাপদ। মাথাটা সীসের মত ভারী লাগছিল, ঘুম পাচ্ছিল, দু'চোখ জুড়ে নেমে আসছিল ঘুম। অবশেষে, শরীরের শেষ শক্তিবিন্দুগুলি একত্র করে পাসের ওপর পৌঁছে একটা সমতল চাতালের মতো পাথরে শরীরটাকে ধড়াস করে ফেলে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম, শান্তির ঘুম! অবশেষে শান্তি। সময় বয়ে চলল। যখন চোখ মেললাম মনে হল যেন এক শতাব্দি পেরিয়ে গেছে। মাথা তুলে দেখলাম, আরে, ওই তো ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে! মাত্র কুড়ি গজ দূরে। আমি লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কুলিরা নিজেদের মধ্যে খোশগল্পে মত্ত। একটা বড়সড় আগুন জ্বালিয়েছে ওরা, তার চারিদিকে ঘিরে বসে চলেছে ওদের আড্ডা। ইস, ওরা যদি আমায় দেখতে পেত! যদি ওদের একজনও এদিকে একবার ঘাড়টা ফেরায়! আমি দু'একটা ছোট নুড়ি তুলে নিয়ে ওদিকে ছুঁড়লাম, কেউ শুনতে পেল না। গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না, চিৎকার করার প্রশ্নই নেই। কান- মাথা সব কেমন ভোঁ ভোঁ করছে।

ভাবলাম, একবার যখন ক্যাম্পের দেখা পেয়ে গেছি, তখন ওখানে পৌঁছনো আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। শরীরেও মনে হল একটু হলেও যেন শক্তি ফিরে পেয়েছি। দাঁতে দাঁত চেপে উঠে বসলাম। তারপর চার হাত- পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে একটা জন্তুর মতো ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ ফুথারকে ফিরে তাকাল, "বড়া সাহিব!!"

অবাক বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর সবাই মিলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি কি মরি ছুটে এল আমার দিকে। বেঁচে গেলাম! আমাকে একটা এয়ার ম্যাট্রেসের ওপর শুইয়ে দিল ওরা। একটা ছোট্ট ভেজা পাখির ছানার মত আমি তখন থরথর করে কাঁপছি। সামান্য কিছু খেয়ে নিলাম প্রথমে, অল্প একটু পানীয়। শুনলাম আইজ্যাক তখনও ফেরেনি, তবে যে কোনও সময়ই ফিরবে এবার। আমি কুলীদের আমার জন্য কিছু খাবার তৈরি করতে বললাম। কুলীদের সাহায্য নিয়ে ফুথারকেই রান্না চাপাল। একটু পরেই বড় বড় ডেকচিতে খাবার ফুটতে শুরু করল, এমনই তার সুঘ্রাণ যে আমার পক্ষে আত্মসংবরণ করে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল।

রান্না শেষ হওয়ামাত্র আমি সোজা সেই ডেকচিগুলো থেকেই খেতে শুরু করে দিলাম। এতটা ফুথারকে আশা করেনি! সে ক্যাম্পের সবার জন্য রান্না চাপিয়েছিল। প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে, বিরামহীন ভাবে, দ্রুত গতিতে এবং স্ফূর্তির সঙ্গে আমি খেয়ে চললাম, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভোজ। খেয়ে দেয়ে পেট ফুলিয়ে শেষে ঢুকে পড়লাম স্লিপিং ব্যাগের নিশ্চিন্ত আরামের ভেতর।

ভাবছিলাম, খাবারদাবার ছাড়া সন্ধের মুখে এভাবে একলা বেরিয়ে কী মারাত্মক ভুলটাই না করেছিলাম! অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে আর একটু হলে বেঘোরে প্রাণটাই যেতে বসেছিল! আজ

যদি কোনওভাবে এখানে এসে পৌঁছতে না পারতাম, তাহলে কী যে হত! কাল ১৩ই মে সকালে এরা ক্যাম্প গুটিয়ে তুকুচার পথে রওনা দিত, আমি নিজেই কিনা চিঠি লিখে ওদের নির্দেশ দিয়েছিলাম! ১৪ই বিকেলে তুকুচা পৌঁছে রেবুফতের কাছে খবর পেত যে আমি এ রাস্তায় রওনা দিয়েছিলাম। আমার খোঁজে যদি এখানে ফিরে আসত ওরা, তাহলেও সেটা ১৬ই বিকেলের আগে সম্ভব ছিল না। ততদিন কি আর আমি এই পৃথিবীতে থাকতাম?

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমের দেশে তলিয়ে গেছিলাম। ঘুম ভাঙল আইজ্যাকের ডাকে।

“হ্যালো মরিস, গুড মর্নিং।”

উঠে বসলাম, “আইজ্যাক!”

“২০,০০০ ফিটের চেয়েও উঁচু একটা শৃঙ্গ জয় করে এইমাত্র ফিরলাম আমরা।”

খবর আদানপ্রদান হল। আইজ্যাক মাপজোক করে কী কী বার করেছে বলল। যা বুঝলাম, অন্নপূর্ণার খোঁজে অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জের গোটা উত্তরদিকটাই আমরা চষে ফেলেছি।

“অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের চাবিকাঠি এই বিশাল তুষারপ্রাচীরের উত্তরে নেই, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,” বললাম আমি, “আমাদের দক্ষিণদিকেই যেতে হবে; কোজি, অডট আর শ্যাজ ২৭শে এপ্রিল মিরিস্তি খোলা ধরে যে রাস্তায় গেছিল সে দিক দিয়ে।”

“তাহলে এখানে বসে থেকে আর কিছু করার নেই আমাদের,” আইজ্যাক বলল, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুকুচায় ফিরে যেতে হবে।”

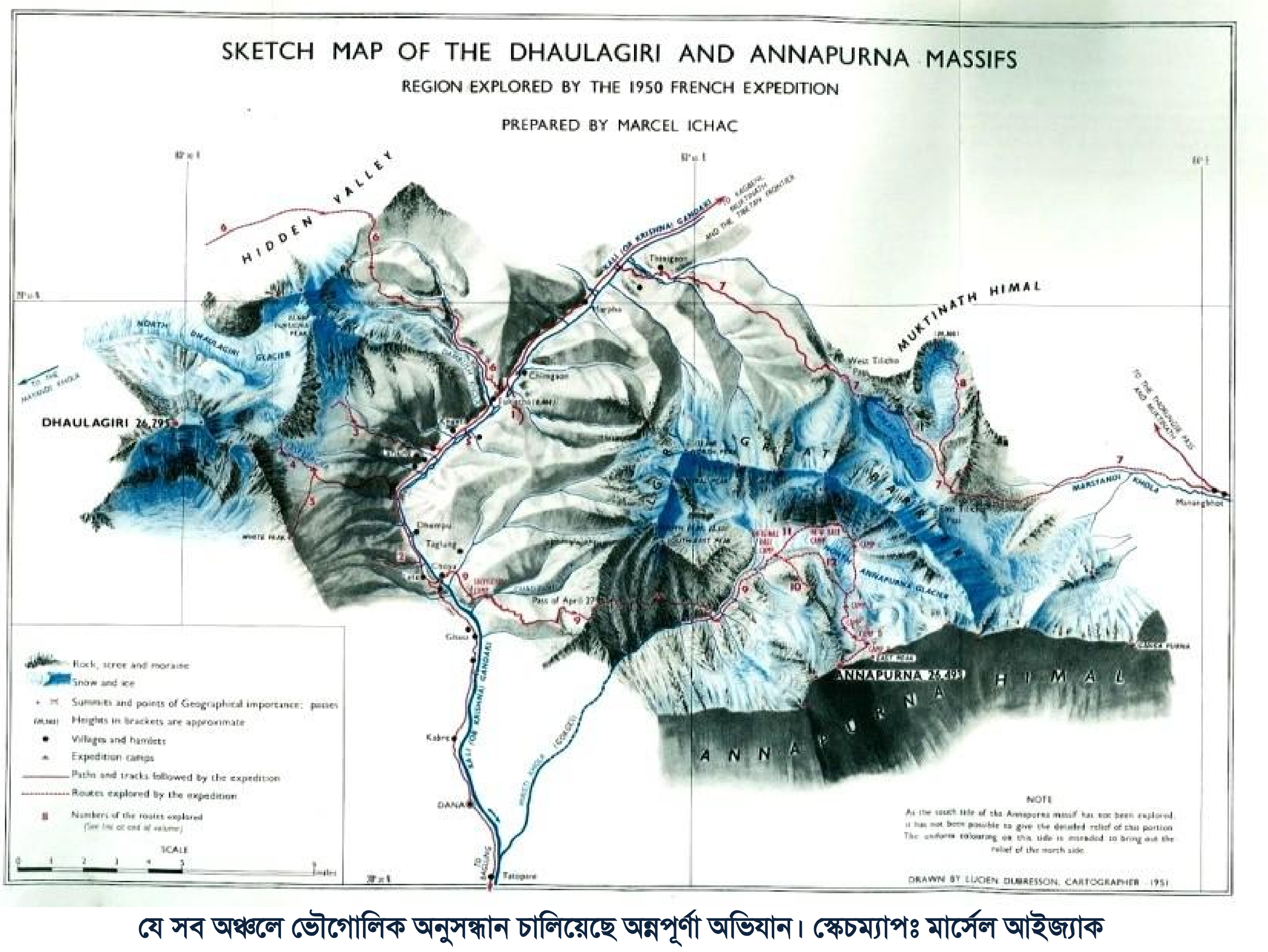

যে সব অঞ্চলে ভৌগোলিক অনুসন্ধান চালিয়েছে অন্নপূর্ণা অভিযান। স্কেচম্যাপঃ মার্সেল আইজ্যাক

পরদিন তুকুচার উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা। এ জায়গা ছাড়তে পেরে কুলিরা খুব খুশি। বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন দিন ধরে ওরা এখানে বসে আছে, তেমন কিছু কাজও

নেই কারও। ওদের তাড়া লাগাবার কোনও দরকারই পড়ল না তাই, এমনকি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁবু গোটানো, মালপত্র বাঁধাছাঁদা সব হয়ে গেল। আমি আর আইজ্যাক যখন গল্প করতে করতে তৈরি হচ্ছি, আংথারকের তত্ত্বাবধানে কুলিরা তখন সব সারি বেঁধে রওনা দিয়ে দিয়েছে। আংথারকে সোজা ওদের বরফজমা তিলিচো হ্রদের বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে গেল। এইবারে কুলিরা টুঁ শব্দটিও করল না, বিনা বাক্যব্যয়ে সোজা হেঁটে হ্রদ পেরিয়ে ওপারে চলে গেল।

এই তিনদিনে পশ্চিম তিলিচো পাসের ওপরের বরফ কিছুটা গলে গেছে। পাসের ওপর পৌঁছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম আমরা। পেছন ফিরে চেয়ে দেখলাম সেই চিরতুষারের রাজ্যের দিকে, সেই সুবিশাল দুধসাদা বরফজমা তিলিচো হ্রদ, দক্ষিণের সেই দানবীয় তুষারপ্রাচীর... জীবনে আর কোনওদিন হয়তো এখানে আসা হবে না!

এরপর হুড়মুড় করে নামার পালা। ট্রি লাইনে পৌঁছে গেলাম; দেওদার গাছের এক অসাধারণ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। জোরালো হাওয়া দিচ্ছে, তবে হাওয়াটা আমাদের পেছন থেকে আসছে, তাই চলতে সুবিধেই হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনিগাঁও পৌঁছে গেলাম।

পরদিন সকালে মারফা হয়ে তুকুচা ফিরে চললাম। ঘটনাবহুল ও কর্মক্লান্ত ছ'দিনের পর তুকুচার বেস ক্যাম্পে ফিরতে সবারই বেশ ভালো লাগছিল। যখন ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, অডট আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

"কী ডাক্তারবাবু, খবর আছে কোনও?"

"সবাই বেস ক্যাম্পে এখন। প্রত্যেকেই সুস্থ, এক্কেবারে ফিট। তোমাদের কী খবর?"

"রেবুফত ফিরেছে?"

"হ্যাঁ, গতকাল ফিরেছে ক্যাম্পে।"

"বেশ। আজ ১৪ই মে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আগামী কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। আজ বিকেলে জরুরি মিটিং- এ বসব সবাই।"

এদিকে আমরা যে ক'দিন ছিলাম না তখন ধৌলাগিরিতে কী কী হচ্ছিল? গত সোমবার, ৮ই মে বিকেলে ধৌলাগিরির পূর্ব হিমবাহের ক্যাম্প থেকে নোয়েল প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এল; প্রচণ্ড উত্তেজিত। বলল, ও যখন এক শেরপার সঙ্গে হিমবাহ ধরে নামছিল, তখন কোজি আর শ্যাজকে একটা নালার মতো প্রচণ্ড খাড়াই বরফের ঢালে উঠে যেতে দেখেছে। ওরা যদি ওই রাস্তায় সফল হয় তাহলে পূর্ব হিমবাহের ওপরের দিকের ঝুলন্ত বরফের চাঁইভর্তি বিপজ্জনক জায়গাটা আমরা এড়িয়ে যেতে পারব। আসলে এই নতুন রাস্তাটাও ওই আগের রাস্তার মতোই কঠিন আর বিপজ্জনক, এ পথে পদে পদে তুষারধ্বস নামার সম্ভাবনা। মাথা তুলে তাকালেই দেখা যাবে প্রায় ১৫০০ ফিট ওপরে নীল বরফের বিশাল বিশাল চাঙড় ঝুলে আছে, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ার অপেক্ষায়। ঠিক যখন নোয়েল ওপরে তাকিয়ে কোজি আর শ্যাজের কেরদানি দেখছিল, একটা বিশাল বরফের চাঁই খসে পড়ল, আর টন টন বরফ দুরন্ত গতিতে ভীম গর্জনে সেই নালা বেয়ে নেমে এসে নোয়েলের ঠিক পাশে পূর্ব হিমবাহের চাতালের ওপর পড়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

"অথচ কী দুর্ভাগ্য দেখো, ক্যামেরাটা বার করারই সুযোগ পেলাম না!" নোয়েল বলল।

কোজি আর শ্যাজ অবশ্য এগিয়ে চলল। এসব ছোটখাটো ব্যাপার ওদের দমিয়ে রাখতে পারে না! কিন্তু ওই নালা থেকে বেরিয়ে এসে পাশের পাথুরে ঢালে ওরা চেষ্টা করেও পা রাখতে পারল না। বহুক্ষণ লেগে ছিল ওরা, তবে বারো গজের বেশি এগোতে পারেনি; পাথুরে ঢালটা প্রচণ্ড পেছল আর একেবারেই নিরাপদ নয়। শ্যাজের একটাই সান্ত্বনা, হিমালয়ের বুকে ১৬,০০০ ফিটের ওপরে সে

প্রথম রক পিটন গেঁথে আসতে পেরেছে সেদিন। সমস্তরকম উপায়ে চেষ্টা করে দেখার পর ওরা হাল ছেড়ে দেয়, আর ন'তারিখে নিচে নেমে আসে।

এরপর ছিল অডট আর টেরের পালা। যাওয়ার সময় ওদের দেখা হল কোজি আর শ্যাজের দলের শেরপাদের সঙ্গে; বিমর্ষবদনে নেমে আসছিল ওরা; তবে তাতে অডট আর টেরে দমবার পাত্র নয়। ওরা পূর্ব হিমবাহের ডান তীরে (true right bank) প্রায় ১৬,৫০০ ফিট উচ্চতায় একটা বিশাল খাড়া পাথরের দেওয়ালের নিচে তাঁবু ফেলল। রাতের বেলা একটা পাথর ওদের তাঁবুর সামনে দিয়ে ঢুকে দিব্যি পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

১১ তারিখ অডট আর টেরে খুব ভোরবেলা রওনা দিল, ভোর তিনটের সময়, যাতে হাতে সারাদিনটা পাওয়া যায়। ক্র্যাম্পন পায়ে বেঁধে এগিয়ে চলল ওরা, আর অনেক কষ্টে সেই বিশাল বরফের দেওয়ালটার নিচে পৌঁছল যেটা বেয়ে প্রথমবার আমি, ল্যাচেনাল আর রেবুফত উঠেছিলাম। কোজি আর শ্যাজ এই কঠিন সবুজ বরফের ঢালটারই বাঁদিকে একটা নালার মত জায়গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। বরফের দেওয়ালটার বেশ খানিকটা অংশে ধাপ কেটে রাখাই ছিল, কিন্তু এখানে, ওই দেওয়াল বেয়ে না উঠে অডট ও টেরে হিমবাহটা পেরিয়ে তার বাঁ তীরে চলে এল। ধাপ কেটে কেটে এগিয়ে প্রচুর পরিশ্রমের পর তারা আগের অনুসন্ধান দলগুলি যে উচ্চতা অবধি পৌঁছতে পেরেছিল মোটামুটি সেই উচ্চতায় পৌঁছে গেল। হঠাৎ ওরা একটা সম্ভাব্য রুট আবিষ্কার করল যেটা আগের দলগুলোর পক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই রাস্তায় এগিয়ে তারা বেশ কিছুটা তুষারধ্বসপ্রবণ বিপজ্জনক এলাকা এড়িয়ে যেতে পারল। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়িয়ে অবশেষে সেই আইস ফল বা হিমানী প্রপাতটার ওপরে পৌঁছে গেল ওরা। পৌঁছে গেল পূর্ব হিমবাহের ওপরের ঢালে, যেখানে ঢালটার চড়াই অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

সেখানে পৌঁছে কী দেখল তারা? দেখল ওদের সামনে মাকড়শার জালের মত ফাটলে ফাটলে কণ্টকিত এক বিশাল তুষারক্ষেত্র। সেই ক্রিভাসের জালের মধ্য দিয়ে এগোনোর কোনও রাস্তা নেই। ডানদিকে তুষারক্ষেত্রটা ফের খাড়া চড়াই উঠে গিয়ে মিশেছে ধৌলাগিরির উত্তরপূর্ব গিরিশিরার সঙ্গে। ঝকঝক করছে সেই উত্তরপূর্ব গিরিশিরা, অলঙ্ঘ্য, অপরাজেয়। এদিক থেকে ওর ওপর ওঠার কোনও রাস্তা নেই।

অডট আর টেরে সুবিবেচকের মতোই হিসেব করে দেখল, এ রাস্তায় বাধাবিপত্তি আর বিপদের ঝুঁকি বড্ড বেশি। আর এগিয়ে কী হবে, যদি বাধ্য হয়ে ফিরেই আসতে হয়? ধৌলাগিরির শৃঙ্গে ওঠার চাবিকাঠি এই পূর্ব হিমবাহের পথে নেই। আর, অন্য কোনও রুট যদি না থাকে, তাহলে এই পর্বত অপরাজেয়ই থেকে যাবে। পূর্ব হিমবাহের রাস্তা নিয়ে আমাদের মনে অনেক রঙিন স্বপ্ন ছিল, এভাবে তা বাস্তবের রুক্ষ জমিতে আছড়ে পড়ল। অডট আর টেরে ভালমতোই জানত, ওরা ব্যর্থ হলে আমরা সবাই কী পরিমাণ নিরাশ হব, তাও শেষমেশ ফিরে আসাই মনস্থ করল। সেদিন সন্ধেবেলা ক্লান্ত পায়ে ওরা ফিরে এল পূর্ব হিমবাহের নিচের বেস ক্যাম্পে, আর তার পরদিন তুকুচায়।

অভিযানের সম্পূর্ণ শক্তি যদি আমরা ধৌলাগিরির পেছনে নিয়োগ করি, তাহলে সেটা বড্ড বেশি ঝুঁকির হয়ে যাবে; ও রাস্তা বড়ই অনিশ্চয়তায় ভরা, পদে পদে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পক্ষে- বিপক্ষে সমস্ত যুক্তি বিশদভাবে, খুব যত্ন করে বিচার করে তবেই ও রাস্তায় আমাদের পা বাড়ানো উচিত। এদিকে ধৌলাগিরি, আর ওদিকে অন্নপূর্ণা, আসলে পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমাদের একেবারে নতুন করে, বাস্তবসম্মতভাবে ভাবতে হবে।

১৪ই মে বিকেলে, তুকুচার বেস ক্যাম্পের মেস টেন্ট বা রান্না করার তাঁবুতে, অভিযানের সমস্ত সদস্য একত্রিত হল, বিশেষ এক জরুরি মিটিং- এর জন্য। এবারে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে!

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে' র ' হিন্দুস্হানী সঙ্গীত পদ্ধতি–ক্রমিক পুস্তক মালিকা' থেকে কিছু কিছু অংশ আমরা ব্যবহারিক ভাবে শেখার চেষ্টা করছি। এবারের জন্য ' ভৈরব' বা ' ভৈরোঁ' রাগটির অ, আ, ক, খ জানব। আমরা প্রথমে ' জনক' রাগগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। ' জনক' রাগ বা অঙ্গরাগ মানে ঠাটের নামে যে রাগগুলির নাম। যেমন এই রাগটি ভৈরব ঠাটের বা স্কেলের, আবার রাগটির নামও ভৈরব। ' জন্য' রাগ সেই রাগগুলো যেগুলো থেকে সেই ঠাটের অন্য রাগগুলোর জন্ম। যেমন বৈরাগী, রামকেলি, যোগিয়া ইত্যাদি রাগগুলি ভৈরব ঠাটের, মানে ঐ রাগগুলোর স্কেল এই ভৈরব রাগের স্কেলের মত। তার মানে অবশ্য এই নয় যে জন্য রাগগুলোতে জনক রাগ বা ঠাটের সবকটি স্বরই ব্যবহার করা হবে। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দশটি ঠাট সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি। সা থেকে নি অব্দি শুদ্ধ, কোমল মিলিয়ে এগারোটি স্বরের ভৈরব ছাড়া বাকী ঠাটগুলো হল - বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, পূর্ব্বী, মারওয়া, কাফি, আসাবরী, ভৈরবী ও টোড়ী। জনক বা অঙ্গরাগ (ভৈরবাঙ্গ) হওয়ার কারণে এই রাগটির অনেক কয়টি রূপ আছে - আনন্দ ভৈরব, বাঙাল ভৈরব, শিবমত ভৈরব, আহির ভৈরব, প্রভাত ভৈরব, সৌরাষ্ট্র ভৈরব ইত্যাদি।

ভৈরব ঠাটে ' রে' ও ' ধা' স্বরদুটি কোমল(' র' বা ' ঋ' , ও ' ধ' বা ' দ'), অর্থাৎ এই ঠাটে ব্যবহৃত স্বরগুলো হল - সা, র, গা, মা, পা, ধ, নি, র্সা। এই স্বরবিন্যাস দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকি পদ্ধতির মেলকর্তা মায়ামালবগৌল' র মত। মালব, গৌল(গৌড়া) এগুলো - গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের কিছু অঞ্চলের প্রাচীন নাম। কথিত আছে এইসব অঞ্চলের আদিবাসীরা ভৈরব দেবতার আরাধনায় এই সুরে গান গাইতেন।

পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাইজানটাইন স্কেল, ডাবল হারমনিক মেজর স্কেল, অ্যারাবিক, জিপ্‌সি মেজর স্কেল এই ভৈরব ঠাট বা স্কেলের সাথে তুলনীয়। বাইজানটাইন সফট ক্রোম্যাটিক মোড এর একটা লিঙ্ক দিলাম - সা, রে, গা, মা'র সাথে তুলনায় উচ্চারণগুলো এই রকম:

Ni-Pa-Vou-Ga-Di-Ke-Zo'-Ni' - **লিঙ্ক- ১**

নি- পা- ভূ - গা- দি- কে- যুও- নি

ভৈরব রাগে এখন যদিও শুধু শুদ্ধ নি ব্যবহার করা হয়, প্রাচীন রচনাগুলিতে এই রাগে কোমল নি' র ব্যবহার হতে দেখা যায়। মা স্বরটিতে রচনার কোন অংশ শেষ করে দাঁড়ালে যোগিয়া রাগের ছায়া পড়ে বলে এইস্বরটির ওপর ন্যাস করা হয় না।

ভৈরব ঠাটের অন্য জনপ্রিয় রাগগুলির মধ্যে আছে যোগিয়া, কালিংড়া, বিভাস, গুণকলি ইত্যাদি রাগগুলি।

লিঙ্ক- ২ এ ভাতখন্ডেজীর বইটিতে দেওয়া স্বরলিপির সফট- সিন্থ এ বাজানো স্হায়ী, অন্তরা - *এ হুঁ তো বারি বারি যাঁউ*

লিঙ্ক ৩ এ এই রাগের ওপর কয়েকটি কন্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অংশ দেওয়া হল।

৩(ক) উস্তাদ নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর (সিনিয়র ডাগর ব্রাদার্স মইনুদ্দিন আমিনুদ্দিন) ১০ মাত্রা- শিব আদি।

৩(খ) উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ সানাই

৩(গ) উস্তাদ এনায়েৎ খাঁ(সেতার)

আমরা কয়েকটি ভৈরব রাগ ভিত্তিক জনপ্রিয় গানও শুনে নেব - তাহলে সুরের চলনটা মনে রাখতেও সুবিধে হবে। এইসব গানের ইউ- টিউব লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হল।

৩(ঘ)জাগো মোহন প্যারে জাগো-

৩(ঙ) মোহে ভুল গয়ী সাওঁরিয়া -

৩(চ) ডাকিয়া ডাক লায়া

লিঙ্ক ৪ - ভৈরব রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত - *রাত্রি এসে যেথায় মেশে - অর্ঘ্য সেন*

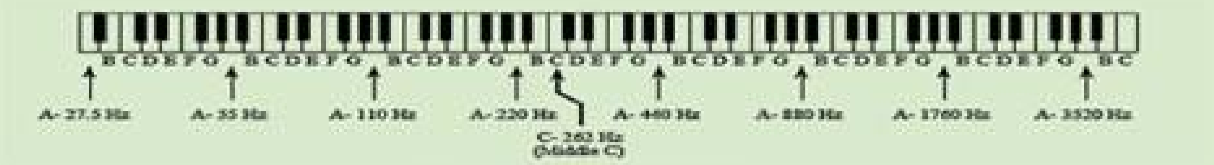

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

ভৈরব রাগটি ভারতীয় রাগসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান রাগ বা আদি রাগ। সন্ধিপ্রকাশ (সূর্য ওঠা বা অস্ত যাওয়ার সময়কাল) এই রাগটির প্রকৃতি গম্ভীর। ভক্তিমূলক, বাৎসল্য, আত্মনিবেদন, উপাসনা, দার্শনিকতা ইত্যাদি ভাব প্রকাশের উপযোগী। ঋতুর সাথের রাগের সুরের যোগসুত্র ধরলে শীত ঋতুর সাথে এই রাগটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তথাকথিত ' বড়' রাগ বলে এই রাগে সব ধরণের রচনা দেখা যায় - ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, খয়ালনুমা, তারানা, সাদ্রা, ভজন ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ রাগসঙ্গীতের তিন ভাগ রাগই ভৈরব, মারওয়া ও পূর্বী এই তিনটি ঠাটের অন্তর্গত।

ঠাট - ভৈরব (স র গ ম প ধ ন র্স)

জাতি - সম্পূর্ণ- সম্পূর্ণ (আরোহন ও অবরোহণে সাতটি স্বরেরই প্রয়োগ হয়।)

আরোহণ - স- র- ^{ম}গ- ম, প- ধ ন- র্স

অবরোহণ - র্স- ন- ধ- প- ^{গ}ম^{গ}- ^{ম}র র - স

পকড় (রাগরূপ প্রকাশী বিশেষ স্বরগুচ্ছ বা রাগস্বরূপ)-

গ ম ধ, প, গ ম রে, সা (কমা দিয়ে ধ ও রে স্বরে ন্যাস বোঝানো হচ্ছে) আরোহণে ম স্বরে ন্যাস নেই। রে স্বরটি অবরোহণে আন্দোলিত। আরোহণে পা কম প্রয়োগে এবং অবরোহণে পা স্বরে ন্যাস করলে রাগরূপ ফোটে।

গ ম ধ, ধ প, ম গ ম র, স; স, গর গর স, নধ ন স, ন স গ ম, গ ম গর, স;
র গ ম প, প গ ম নধ, ধ, প, প গমপগম গর, র স; গ ম নধ, ধ প, গ ম প ধ ন স,
র স ন স নধ, ধ, প।

বাদী - ধ

সম্বাদী - র । সময় - প্রথম প্রহর - সকাল ৬টা থেকে ৯ টা।

গানের যে উদাহরণগুলো আগের পাতায় দেওয়া আছে, সেখান থেকে ভাতখন্ডেজীর দেওয়া ' *এ হুঁ তো বারি বারি যাঁউ*' স্বরলিপিটি নিচে দেওয়া হল।

স্থায়ী

+				2				0				3			
												$^{র্স}$ন	র্স	^{প}গ	ম
												এ	ऽ	হুঁ	তো
^{ন}ধ	-	ধ	^{ন}ধ	-	ধ	প	প	^{ন}ধ	ধ	প	ধ	প	^{ম}প	ম	গ
বা	ऽ	র	বা	ऽ	র	জাঁ	উ	তু	স্হ	রে	গু	সৈ	ऽ	য়া	ऽ
^{ম}গ	ম	নধ	নধ	-	ধ	পম	প	গম	-	ম	মর	-	-	মগ	প
হ	ম	রি	বা	ऽ	ত	কো	ऽ	মা	ऽ	ন	লে	ऽ	ऽ	প্যা	ऽ
ম	-	-গ	-	-ম	-	-র	-	-র	-	-স	-				
রে	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ				

অন্তরা

+				2				0				3			
মপ	প	প	-	নধ	-	ন	ন	র্স	র্স	র্স	-	$^{র্স}$ন	র্স	র্স	র্স
নী	কে	আ	-	বো	ऽ	তু	ম	হ	ম	রে	ऽ	ঢিং	গ	বা	ক
র্র	র্র	র্স	-	$^{র্স}$ন	র্স	^{ন}ধ	প	^{প}গ	ম	প	^{ন}ধ	-	ধ	^{ধ}র্র	র্স
হি	ল	বা	ऽ	ব	তি	য়াঁ	ऽ	ঔ	ऽ	র	ডা	ऽ	রুঁ,	গ	র
$^{র্স}$ন	র্স	ধ	প	ম	গ	^{প}ম	গ	-র	-	-স	-	$^{র্স}$ন	র্স	^{প}গ	ম

লিংক ১ https://drive.google.com/file/d/0BxIqBj86OOMtdlU0MnV3eFkyMWs/view?usp=sharing

লিংক ২ https://drive.google.com/file/d/0BxIqBj86OOMtbl9vbHpBZnJmRUk/view?usp=sharing

লিংক ৩ক *https://www.youtube.com/watch?v=r9UjNZXmpwk*

লিংক ৩খ *https://www.youtube.com/watch?v=uqNV2eo1OII*

লিংক ৩গ *https://www.youtube.com/watch?v=21aFLr3YGGI*

লিংক ৩(ঘ)https://www.youtube.com/watch?v=uGNJ1xnSEWI

লিংক ৩(ঙ) https://www.youtube.com/watch?v=Vsxun4s9l-8

লিংক ৩(চ) - https://www.youtube.com/watch?v=DYe8hc-SmEM

লিংক ৪ https://www.youtube.com/watch?v=g4KPp3NFnvA

ক্যামেরায় কুম্ভলগড়

বন্ধুরা, মনে আছেতো? গতসংখ্যায় বলেছিলাম যে বেড়াতে যাব? চলো এবার আমরা বেড়িয়ে পড়ি। তোমাদের যে ধরণেরই ক্যামেরা থাক সেটা আগে থাকতেই কিন্তু গুছিয়ে রাখো। ব্যাটারি চার্জ দেবে আর চার্জারটা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে নেবে। লেন্স চেঞ্জিং ক্যামেরা হলে, ক্যামেরার ব্যাগ কিনে নেওয়াই ভাল। এইসব ব্যাগ লেন্স, ক্যামেরা নিরাপদে রাখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

যখন কোথাও বেড়াতে যাবে সেই জায়গার ইতিহাস ও ভূগোল জানা থাকলে বেড়ানোটি অনেক আকর্ষণীয় হয়। বেড়ানোর সঙ্গে তোমার হবি হল ফোটো তোলা। তাই নেট খুলে যদি ওই জায়গার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের ফোটোগুলি দেখে নিতে পারো তাহলে খুবই উপকার পাবে।

এবারে কুম্ভলগড়ে বেড়াতে যাবার আগে কুম্ভলগড়ের ফোটো গুগল সার্চ করে দেখে নিয়েছিলাম। ফোটোগুলি দেখে জানলাম যে সূর্যদায় ও সূর্যাস্ত এর সময়ে কুম্ভলগড় কেল্লার কোন দিক থেকে কোথায় আলো এসে পড়ে। সূর্যোদয়ের সময় বেশি সুন্দর নাকি সূর্যাস্তের সময়? কোন কোন দিক থেকে চারদিকের ভিউ পাওয়া যাচ্ছে ইত্যাদি।

প্রত্যেক জায়গারই কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে, কোনো বিশেষ উৎসব, মেলা পালন করা হয়। সেই সময়ে সেখানে বেড়াতে গেলে ফোটো তোলার আরো বিষয় পাওয়া যায়। রথযাত্রার সময়ে যদি পুরী বেড়াতে যাও,তা হলে রথযাত্রার ছবি তুলতে পারবে। বিভিন্ন ঋতুতে একএকটি জায়গার প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। বরফ দেখতে হলে যেমন শীতকালে কাশ্মীর,বর্ষাকালে পুরী বা দীঘা বেড়াতে গেলে অন্যধরণের ফোটো তোলার সম্ভাবনা বেশি পাওয়া যাবে।

আজ তোমাদের বলব একটু অচেনা জায়গার গল্প। তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই রাজস্থান বেড়াতে গেছ। জয়পুর,উদয়পুর এমনকি জয়শলমিরও হয়তো বেড়িয়ে এসেছ। কিন্তু কুম্ভলগড় কি বেড়াতে গেছ? ইতিহাস বইতে আমরা কুম্ভলগড়ের কথা পড়েছি। শিশোদিয়া রাজপুত রাজা রানাকুম্ভই এই কেল্লা প্রতিষ্টা করেন। পান্নাবাঈ এর গল্প আমরা সবাই পড়েছি। ছেলের প্রাণের

বিনিময়ে রাজপুত্র উদয় সিং কে শত্রুর হাত থেকে বাঁচান। একটা ফলের ঝুড়িতে করে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি পথের সব বিপদ তুচ্ছ করে চিতোরগড় থেকে কুম্ভলগড়ে পালিয়ে আসেন।

এই উদয় সিং ই পরে উদয়পুর শহর গড়েন। শত্রুরা অনেকবার এই কেল্লা আক্রমণ করেছে। রানা প্রতাপের জন্মস্থান হিসাবে ও এই কেল্লা বিখ্যাত। ৩৬ কিমি. লম্বা প্রাচীর এই কেল্লাটিকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীতে এটাই দ্বিতীয় দীর্ঘতম। চীনের প্রাচীরটা কেমন তার একটা আন্দাজ কুম্ভলগড়ের প্রাচীর দেখে বুঝে নেওয়া যায়। ১৫ ফিট চাওড়া প্রাচীরের ওপর স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়।

এই প্রাচীর বানানোর সময় কিছুতেই ঠিকঠাক হচ্ছিল না। এক পুরোহিতের পরামর্শে শেষমেষ কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজেকে বলিদান করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রধান প্রবেশদ্বার, হনুমানপোল আর মন্দির তৈরি করা হয়। এখানে ৩৬০ টি হিন্দু আর জৈন মন্দির আছে। সব ভাল করে দেখতে গেলে ৩/ ৪ দিন লেগে যাবে। কেল্লার ওপর থেকে থর মরুভূমিও দেখা যায়। এটি UNESCO World Heritage Site হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। শীতকালে এলে এই বিশাল কেল্লায় চড়ার কষ্টটা হবে না। প্রতিটি সিঁড়ির ধাপে ধাপে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আর কেল্লার উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য সব কষ্ট এক মুহূর্তে দূর করে দেবে।

এবার একটু ফটোর কথায় আসি। ক্যামেরা হাতে নিয়ে অন্য সবকিছু পিঠের ব্যাগে নিলে চড়াই ভেঙে উঠতে সুবিধা হবে। যখন সামনের ফটো তুলবে, মাঝে মাঝে পেছনের দৃশ্যও দেখে নিতে ভুলবে না। লেন্স চেঞ্জিং ক্যামেরা হলে অবশ্যই টেলিফটো লেন্স নিতে হবে দূরের দৃশ্য নেওয়ার জন্য। পাহাড়ে উঠলেও একই কথা মনে রাখতে হবে।

সব জায়গায় ট্রাইপড নিয়ে যাওয়া যাই না। ক্যামেরা যত কম নড়বে ফটো তত ভাল হবে, এই কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে। তাই সামনে রাখার মতন কোন জায়গা পেলেই সেখানে ক্যামেরা রেখে ফটো তুলতে হবে। ফটোর আঙ্গেল কিন্তু কাউকে শেখান যায় না। কেল্লার উপর থেকে যখন ভিউ নিচ্ছ তখন কেল্লার পাঁচিল এর অংশটি থাকবে কি থাকবে না এটা একেবারেই ফটোগ্রাফারের বাপার। তোমার চোখে যদি ভাল লাগে তুমি সেই ভাবে দৃশ্যটি ফ্রেমবন্দি করবে। আর যদি তখন বুঝতে না পার তবে কয়েকটি অ্যাঙ্গেল থেকে ফটো তুলবে। পরে যেটি ভালো লাগবে সেটিকেই চূড়ান্ত করবে।

সাধারাণত উদয়পুর থেকে এক দিনের ট্রিপে সবাই কুম্ভলগড়ে যায়। কুম্ভলগড়ের আশেপাশে খুব ভালো থাকার ব্যবস্থা আছে। জঙ্গল সাফারিতেও যাওয়া যাবে। উদয়পুর থেকে কুম্ভলগড়ে গেলে সেখানকার সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত কোনটাই দেখা সম্ভব নয়। আর ভালো করে ফটো তুলতে হলে সেই জায়গাতে অবশ্যই থাকতে পারলে ভাল হয়। মনে রাখতে হবে একই জায়গার দৃশ্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে দুরকম সুন্দর হয়। প্রকৃতির রংকে ধরতে পারলে সাধারণ ফটোটিও অসাধারণ হয়ে উঠবে।

আচ্ছা পুজোতে খুব আনন্দ কর। ক্যামেরা সাথে রেখো। পরের সংখ্যাতে আমরা কিন্তু এডিট ও ফটোশপ কীভাবে করবে এই বিষয়ে আলোচনা করব।

ছবিঃ লেখক

রাজকুমারি কাগুয়া

মহাশ্বেতা

সদ্য স্টুডিও ঝিবলি, যাকে কিনা বলা হয় জাপানের ডিজনি, থেকে অবসর নিলেন হায়াও মিয়াজাকি। তার হাত থেকে অতীতে বেরিয়েছে ঝিবলির বিখ্যাত সব সিনেমা, যেমন 'মাই নেইবার টোটোরো', 'পনয়ো' অথবা 'হাউলস মুভিং কাসেল।' অবসর নেওয়ার আগে তাঁর শেষ ছবি 'দ্য উইন্ড রাইজেজ'ও বিভিন্ন আসরে উচ্চপ্রশংসিত। 'দ্য টেল অফ প্রিন্সেস কাগুয়া' অথবা রাজকুমারি কাগুয়ার গল্প মিয়াজাকির অবসরের পর ঝিবলির প্রথম সিনেমা। নির্দেশক ইসাও তাকাহাতার হাতে তৈরি ছবিটার ট্রেইলার দেখেই মনে হয়েছিল এটি একেবারেই আলাদা। মিয়াজাকির ঘরাণার ছবিই নয় এইটা। রঙের ব্যবহার থেকে অ্যানিমেশনের ধরণ, সবই অন্যরকম।

গল্পটা বড়ই সরল, মূলে রয়েছে জাপানি এক উপকথা, 'বাঁশ- কাঠুরের গল্প।' এক গরিব কাঠুরে রোজ বাঁশ গাছ কাটতে যায় জঙ্গলে। একদিন যেতে যেতে সে দেখে যে একটা বাঁশের গুঁড়ি অদ্ভুত ভাবে জ্বলছে, সে গিয়ে সেটাতে একটা কোপ লাগাতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা মেয়ে। কাঠুরে ও তার বউ ভাবল এটা ভগবানেরই কীর্তি, আর সঙ্গে সঙ্গে কপালে একটা প্রণাম ঠুকে তাকে নিজেদের মেয়ে হিসেবে পালন করতে লাগল। নাম দিল 'রাজকুমারী।'

মেয়ে বাড়তে থাকল বিদ্যুতবেগে, তাই দেখে তো বাবা মায়ের চোখ ট্যাড়া। আর এদিকে রোজই বাঁশ কেটে আনতে গিয়ে বাঁশের মধ্যে কিছু না কিছু পায় তার কাঠুরে বাবা, কোনদিন সোনা দানা, কোন দিন দামি কাপড় জামা।

এমনি করে দেখতে দেখতে মেয়ে বড়ো হয়ে গেল। ততদিনে কাঠুরের কাছে অনেক ধনদৌলত জমে গেছে। আর রাজকুমারীকে দেখতেও রাজকুমারীদের মতনই। সে গ্রামে, জঙ্গলে, পাহাড়ে নদীতে খেলে বেড়ায় সারাদিন। গ্রামের বাচ্চারাই তার প্রিয় বন্ধু। এবার তার পালক বাবা ঠিক করল তাকে আর এইভাবে জংলিদের মত করে রাখা যাবে না, অতএব লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের শহরে যাওয়ার ব্যবস্থা করল সে।

একদিন খেলা থেকে ফিরে রাজকুমারী দেখে বাড়ি বন্ধ, মা বাবা বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে তারই অপেক্ষা করছে। শহরে যাবে শুনে আকাশ থেকে পড়ল রাজকুমারী। সে তার এই প্রিয় গ্রাম ছেড়ে থাকবে কী করে? কিন্তু বাবা বলেছে তাই একরকম জোর করেই সে গিয়ে পালকিতে উঠল, আর রওনা দিল শহরের দিকে।

শহরে এসে তার বাবা আর গরিব কাঠুরে রইল না। সে এখন গণ্যমান্য লোক। অনেক টাকাপয়সা। অতএব রাজকুমারীকেও হয়ে উঠতে হবে সত্যিকারের রাজকুমারীদের মত। শিখতে হবে তাকে নাচ, গান, লেখা, সাজতে হবে, গুজতে হবে। ভুলে যেতে হবে তার গ্রামের কথা।

কিন্তু শহরে তার দম আটকে যায়। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকতে তার ইচ্ছা করে না, বা তার নতুন শিক্ষিকার কঠোর নিয়মেও থাকতে গায়ে জ্বর আসে। ইচ্ছা করে দৌঁড়ে পালিয়ে যায় সব ছেড়ে; তারই স্বপ্ন দেখে সে। এদিকে তার রূপের সারা দেশ জুড়ে খুব নাম ডাক। তাকে নতুন নাম দেওয়া হল ‘কাগুয়া।’ কাগুয়া মানে জ্বলজ্বলে রাত।

কিন্তু কাগুয়া আসলে কে? আর সে কি কখনও পালাতে পারবে এই নিষ্ঠুর শহর থেকে? যখন পাঁচ অভিজাত ঘর থেকে পাঁচটা বিয়ের প্রস্তাব আসবে তার জন্য, সে কী করবে? তারপর যখন স্বয়ং সম্রাট তাকে বিয়ে করতে চাইবে তখন? সে কি আর কখনও তার গ্রামে ফিরে যেতে পারবে? পারবে পুরোন বন্ধুদের সাথে দেখা করতে? আর সব শেষে যখন ডাক আসবে দূরের দেশ থেকে তখন কাগুয়া কি আর থেকে যেতে পারবে?

‘রাজকুমারি কাগুয়া’র অ্যানিমেশানের কথা আগেই বলেছি। মোটামুটি সাদা প্রেক্ষাপটে সরল সব ছবি। তাছাড়াও জো হিসাইশির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর গোটা সিনেমাটিতে একটা স্নিগ্ধ, মধুর অথচ মরমী ভাব এনে দিয়েছে। রঙের ব্যবহারও খুব পরিমিত। কোথাও কোন অপব্যয় নেই, না রঙের, না আওয়াজের। কিন্তু তাতে কিন্তু কখনই মনে হয়না যে ছবিটি রসহীন। গল্পটিও ভীষণ মর্মস্পর্শী ও মানবিক, সেটাকেই উপযুক্ত ভাবে সিনেমাতে দেখাতে পেরেছেন পরিচালক। কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মিয়াজাকি চলে যাওয়ার পরেও ঝিবলি কোন অংশে পিছিয়ে পড়েনি।

দেখে ফেলো রাজকুমারী কাগুয়ার গল্প আর জানিও জয়ঢাককে কেমন লাগল তোমাদের।

কিছু তথ্যঃ

নাম – The tale of princess Kaguya (Kaguya hime no Monogatari)

দেশ – জাপান

ভাষা – জাপানি

পরিচালনা - ইসাও তাকাহাতা

বছর – ২০১৩

রেটিং – বড় কারুর সঙ্গে দেখাই ভাল

ট্রেইলার- https://www.youtube.com/watch?v=9lDrkokymLQ